সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬০

সম্পাদক

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সুমথনাথ ঘোষ

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা

চুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ

সিল্ক-স্ক্রীন ও

চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

একজন লেখক তাঁর উপলব্ধির প্রতিরূপ আবিষ্কার করেন শব্দে। অথবা আবিষ্কার না বলে বলা যায়, তিনি স্বতঃসিদ্ধান্তে একটি বক্তব্যে উপনীত হন। আমরা অনেক সময় সকালবেলায় জানালা খুলে আকাশের দিকে তাকাই, তখন হয়তো কুয়াশার অস্পষ্টতায় পাখী দেখি, মেঘ দেখি, এলোমেলো গাছের পাতা অথবা কাগজের টুকরো উড়ে যেতে দেখি, হয়তো গানের শব্দ কানে আসে, হয়তো অনেক পুরোনো ঘটনা সহসা মনে সাড়া তোলে। আমি যদি বুদ্ধিমান হই, তাহলে আমি তখন সমস্ত ঘটনার বিমিশ্রণে একটি কুশলী ভাষণ উপস্থিত করবো যার মধ্যে আমার চিন্তা ও অহমিকার পরিচয় থাকবে এবং অধীত বিদ্যার তাৎপর্য আবিষ্কৃত হবে। একটি উপলব্ধির পরিপূর্ণতায় এভাবেই লেখকের প্রথম পদক্ষেপ ঘটে। এ পরিপূর্ণতার পথে অন্তরঙ্গ ধ্যান এবং চিন্তায় শব্দগুলো আবেগ ও বিশ্বাসের উষ্ণতায় হৃদয়কে উন্মোচিত করে। সমস্ত ঘটনা এবং চিন্তা তখন শব্দ হিসেবে উদয় হয়।

শব্দ হচ্ছে দাবাখেলার গুটি। একটি বিশেষ মুহূর্তে জাতির সাহিত্যে যতগুলো শব্দ আছে তা নিয়েই তার বহু বিচিত্র কথার খেলা। আবার কখনও কখনও শব্দ যোগ করি, কখনও পুরাতন শব্দকে অস্বীকার করি এবং এভাবে আয়ত্তাগত শব্দের সামগ্রীকে অনবরত নব নব বিন্যাসে নতুন নতুন উপলব্ধির স্মারক করে তুলি।

সমাজ হচ্ছে শব্দবৈচিত্র্যের লীলাভূমি। মানুষের অনবরত সংলাপ, জিজ্ঞাসা, ইচ্ছা, অহমিকা, বেদনা, প্রতিদিন উচ্চারিত ধ্বনিকে ইঙ্গিতবহ করছে। আমরা যদি কখনও আমাদের কর্মে ও ইচ্ছায় সমাজ-বিমুখ হই, তাহলেও সমাজ আমাদের অনুসরণ করবে ভাষা হয়ে, কখনও জাগরণে, কখনও স্বপ্নে। শব্দ চিরকাল সমাজ ও সভ্যতার স্মৃতিকে ধারণ করে আছে, শব্দ হচ্ছে একটি জাতির ইতিহাস ও বিবেকের সাড়া। যিনি চিরকাল আকাশে স্বপ্ন ছড়াতে চান, তিনিও তাঁর শব্দকে মানবসমাজের চেতনার আড়ালে নিতে পারেন না। প্রতিদিনের গতি-বিধিতে যতটা অঞ্চল আমরা পরিক্রম করি, শব্দরূপে আমাদের ইচ্ছাগুলো তার চেয়েও অধিক অঞ্চল পরিক্রম করে, কিন্তু যেহেতু তা শব্দরূপে এবং যেহেতু শব্দসকল মুহূর্তেই সমাজের অনুভূতির উত্তাপ তাই আমাদের সকল ইচ্ছা, কল্পনা ও স্বপ্ন আমাদের সমাজ এবং সভ্যতার উৎপ্রেক্ষা মাত্র।

লেখায় প্রাথমিক পর্যায়ে যে সরলতা থাকে তা জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার

অভাবের জন্য, কিন্তু সর্বশেষের সরলতা অভিজ্ঞতার প্রগাঢ়তার জন্য। আমরা প্রথমে ভাষাকে পাই, কিন্তু অবশেষে তাকে আবিষ্কার করি শাসনের মধ্যে এবং অস্তিত্বের বিচিত্র খেলায়। রুদ্ধবাক থেকে মুক্তবাক এবং অবশেষে সর্বসঞ্চয়ের অভিজ্ঞতায় স্বল্পবাক—যে কোনও প্রধান লেখকের লেখক-জীবনের ক্ষেত্রে এ উক্তি চরমভাবে সত্য। যাকে ইংরেজীতে বলে crystallization অর্থাৎ স্ফটিক-বন্ধন, আমাদের অভিজ্ঞতা যখন স্ফটিকের নিশ্চিত স্বচ্ছতায় পরিণত হবে, তখন অনেক কথা বলবার প্রয়োজন করবে না। অতি অল্প কথায় আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে বাঙ্ময় করবো। আমরা প্রতিদিন জীবনের অলিন্দে দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞতার নিঃশ্বাস গ্রহণ করছি। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে জীবনের যে সঞ্চয়, অভিজ্ঞতার আহরণ নিয়ে একজন লেখকের জীবনে তা যেমন সত্য, অন্য কারোও জীবনে তেমন নয়।

পাঠকের বুদ্ধিকে দীপিত করা এবং আবেগকে পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্ব লেখকের। শব্দের বিন্যাসের মধ্যে নতুন ধ্বনি-ব্যঞ্জনা দান করে, বক্তব্যকে একই সঙ্গে চিন্তা ও আবেগের মধ্যে শিহরিত করে পাঠকের আপন বোধের রাজ্যে লেখক তার সত্তাকে কম্পিত দেখবেন। প্রতিদিনের কথা একটি তীব্র স্বাভাবিকতায় অথচ এ-মুহূর্তের সীমাকে অতিক্রম করে একটি জীবনের স্মরণচিহ্ন হবে। জ্ঞানের পরিধি বর্তমানে অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা যা জানি তা আমাদের প্রতি-দিনের প্রয়োজনের অনেক বেশী অর্থাৎ যতটা আমাদের ব্যবহারে লাগবে তার চেয়ে অনেক বেশী। একজন লেখককে এ জানার অসম্ভব প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে বাস করতে হয়। পাঠক যেখানে বাস করেন ব্যবহারের এবং প্রয়োজনের পৃথিবীতে লেখক সেখানে বাস করেন জ্ঞানের ক্রমবৃদ্ধিমান ভবিষ্যতের অগাধ ঐশ্বর্যের মধ্যে। তাই পাঠককে লেখকের কাছে পৌঁছতে হয়। সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে এ-কথা খুবই প্রযোজ্য।

সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে হলে আমাদের ভাষায় জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত শব্দের প্রতাপের কথা বলতে হয়। যেভাবে তিনি শব্দকে ব্যবহার করেছেন, শব্দকে তার বহুবিধ লৌকিক অঞ্চল থেকে মুক্ত করে সাহিত্যে প্রবাহিত করেছেন, মানুষের উচ্চারণগত বাণীভঙ্গীকে নির্মিত বাক্যের মধ্যে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন তার তুলনা হয় না। তিনি নিজেই নিজের তুলনা।

প্রতিদিনের জীবনে লঘুসম্পর্কের যে শিহরণ আছে, ক্ষণকালীন যে কৌতুক আছে, সময় অপহরণের জন্য কয়েকজন মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বরের যে কল্লোল

আছে—মুজতবা আলীর বলার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কোনও রচনাতেই তিনি নিঃসঙ্গ নন। তিনি আসর জমিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতেন, তাঁর লেখাতেও সেই আসরের আমেজ এসেছে। তাঁর শব্দের প্রবাহের মধ্যে তিনি শুধু একাকী উপস্থিত নন, আমরা অনুভব করি যে আসরের অন্যান্য লোকেরাও সেখানে উপস্থিত রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর রচনায় ব্যবহৃত শব্দ এবং তাদের বিন্যাস এমন স্বভাবের যে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন মানুষের কলরব সেখানে শোনা যায়। এই অসাধারণ দক্ষতার ফলেই মুজতবা আলী তাঁর রচনার মধ্যে একটি চতুর নাগরিক জীবনকে বাঙ্ময় করতে সক্ষম হয়েছেন। কেউ কেউ অনুযোগ করেন যে, মুজতবা আলী ইচ্ছা করলে তাঁর বিচিত্র জ্ঞানের নির্যাস নিয়ে জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধিগত কোন কিছু আমাদেরকে দিয়ে যেতে পারতেন। হয়তো বা পারতেন কিন্তু তা হলে আমরা সদাহাস্যময় মুজতবা আলীকে প্রাত্যহিক জীবনের লঘু স্পর্শের আনন্দ-কল্লোলের মধ্যে পেতাম না।

মুজতবা আলী অনেকদিন বিদেশে ছিলেন, বিশেষ করে জার্মানিতে। সেখানকার জীবনকে তিনি জেনেছিলেন, বিশেষ করে সেখানকার মানুষের সময়-ক্ষেপণের যে সমস্ত উপকরণ ছিল সেগুলো তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। আমরা সাধারণত যে জার্মানীকে জানি, শিলার গ্যয়টে অথবা হাইনের রচনায়, মুজতবা আলীর জার্মেনী সে জার্মেনী নয়, তাঁর জার্মেনী হচ্ছে প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে প্রবাহিত নগর-জীবনের বিচিত্র মানুষের অবসর-মুহূর্তের জার্মেনী। এ জার্মেনীকে দেখা যায় বিভিন্ন শহরের বিয়ারের আড্ডায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ক্লাবের সভায়, যন্ত্রণার মধ্যেও রহস্যপ্রিয়তায়। বিদেশীরা সাধারণত এ জার্মেনীকে দেখে নি। মুজতবা আলীর সৌভাগ্য যে তিনি সে জার্মেনীকে দেখেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন রচনায় তাঁর নিজস্ব স্বভাবের শব্দের ব্যবহারের মধ্যে তাঁর দৃষ্টিপাতই আমরা আবিষ্কার করি। এত অন্তরঙ্গভাবে একটি জাতির পরিচয় উদ্ঘাটন করা সহজ ক্ষমতার পরিচায়ক নয়। মুজতবা আলীর রচনায় আমরা হিটলারের সমসাময়িক জার্মেনীকে পাচ্ছি, আবার হিটলারের পরবর্তী জার্মেনীকে দেখছি এবং একেবারে শেষে নতুন শোভায় সমৃদ্ধ নতুন জার্মেনীকে পাচ্ছি। এক কথায় বলতে গেলে তিনি জার্মেনীর আর্তনাদকে দেখেছেন, তার বেঁচে থাকার প্রয়াসকে দেখেছেন এবং তাকে একটি উজ্জ্বল সমৃদ্ধির মধ্যে দেখেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি এ পরিচয়গুলো তথ্যভারাক্রান্ত গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন নি। জার্মেনীর বিচিত্র স্বভাবের মানুষের কল্লোলের মধ্যে তিনি জার্মেনীকে আবিষ্কার করেছেন।

ঠিক একইভাবে তিনি কলকাতাকে চিনেছিলেন এবং তার পরিচয় উদঘাটন করেছিলেন। কলকাতার যে পরিচয় সাহিত্যে অথবা কাব্যে অথবা বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত মানুষের জীবনযাত্রায়, সে কলকাতাকে মুজতবা আলী তাঁর প্রয়োজনের সামগ্রী করেন নি। বর্তমানকালের অর্থনৈতিক অব্যবস্থায় যে মানুষ প্রতিদিন জীর্ণ হচ্ছে সে মানুষের পরিমণ্ডলের মধ্যে আনন্দের যে উপকরণ আছে সে আনন্দের উপকরণকে তিনি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছেন। মুজতবা আলীর রচনায় সকল মানুষকে একই আসরে উপস্থিত হতে দেখি। পর্যাপ্ত রসিকতার মধ্যে, বিনয়ের লঘুস্পর্শে, চতুর সংলাপের মধ্যে যে সব মানুষকে আমরা দেখেছি তারা সর্বতোভাবে বর্তমান মুহূর্তের মানুষ। যদি সময়কে স্পষ্টভাবে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে বলা যায় যে মুজতবা আলীর রচনায় আমরা ঠিক এই মুহূর্তের চলমান বর্তমানকে পাই। কতদিন এই বর্তমান থাকবে জানি না, কিন্তু যতদিন থাকবে ততদিন মুজতবা আলীর রচনাকে আমরা বর্তমান সময়ের অন্তঃসার হিসেবে গণ্য করব।

প্রত্যেক লেখকের রচনার প্রতিকৃতি তাঁর প্রতিফলিত মানসিকতার বাণীরূপ। কখনও শ্রদ্ধায়, কখনও অবজ্ঞায়, কখনও নিরাসক্তিতে আমরা যখন পৃথিবীর বিভিন্ন কর্ম ও সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করি তখন আমাদের বর্ণনার শব্দসজ্জায় কখনও শ্রদ্ধা, কখনও অবজ্ঞা, কখনও নিরাসক্তি ধরা পড়ে। তথ্যের ব্যতিক্রমের সঙ্গে অনুভূতির ব্যতিক্রম যে সর্বত্র হবে তা বলা চলে না। তথ্যের সমৃদ্ধি তার স্থিরতায়, এবং অনুভূতির সমৃদ্ধি তার প্রবাহে। 'তিনি কবি', 'তিনি কবিতা লিখবার চেষ্টা করেন', 'তিনি কবিতা লেখেন'—এ তিনটি উক্তিতে একটি তথ্যই আছে যে, যে ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে তিনি কবি কিন্তু তিনটি উক্তি তিনটি বিভিন্ন মনোভাব ধারণ করছে। প্রথম উক্তিতে শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় উক্তিতে অবজ্ঞা এবং তৃতীয় উক্তিতে নিরাসক্তি স্পষ্ট। স্টাইল বা বাগ্‌-ধারা এভাবেই লেখকের প্রতিফলিত মানসিকতা। লেখকের মানসিকতার পশ্চাতে সক্রিয়রূপে অথচ প্রায়শঃই অজ্ঞাতে বিদ্যমান তাঁর সমাজ, পরিবেশ এবং শিক্ষা। যে সমাজ ও পরিবেশ লেখককে লালন করেছে এবং যার প্রশ্রয়ে তিনি সমৃদ্ধ অথবা লাঞ্ছিত তাঁর মানসরূপ নির্মাণকার্যে সে সমাজ সর্বদাই প্রতিশ্রুত। যে পাঠক্রম এবং শিক্ষার ধারায় তিনি অগ্রসর হয়েছেন এবং এখনও হচ্ছেন সে শিক্ষা তাঁর বক্তব্যকে বুদ্ধিদীপ্ত অথবা নির্বিকার, চাতুর্যময় অথবা নিরাভরণ, দ্বিধাহীন অথবা শঙ্কিত, প্রশান্ত অথবা অশোভন করে।

গদ্য লেখার প্রকৃতি নির্ধারণ এ জন্যই দুরূহ কর্ম। আমরা সকলেই কথা বলি,

গদ্যে, আমাদের প্রতি মুহূর্তের পরিচয়ের ভাষা গদ্য, তাই বিভিন্ন প্রকারের গদ্য রচনার মধ্যে যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে তা আমাদের নির্ণয়ে আসে না। কবিতা সম্পর্কে গভীর অনুধাবন সহজে সম্ভবপর না হলেও যে কোনও লোক একথা বলতে পারেন যে কবিতার একটি বিশেষ গঠন-সৌষ্ঠব আছে, ছন্দ আছে, শব্দের পুনরাগম আছে। কবিতা সম্পর্কে এ কথাই সব কথা নয় এবং হয়তো বিশিষ্টার্থক কোনও কথাই নয়। কিন্তু বিশ্লেষণবিহীন হঠাৎ মন্তব্যের জন্য এ কথাই আপাততঃ চূড়ান্ত: গদ্য সম্পর্কে এভাবে হঠাৎ কোনও মন্তব্য করা চলে না। মুজতবা আলী প্রসঙ্গে এ কথা কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাঁর স্বভাব, মানসিকতা, চিত্তগত প্রবণতা তাঁর শব্দের সম্ভারের মধ্যে বিচিত্র ভঙ্গীতে ধরা পড়েছে।

বাংলা শব্দ-ব্যবহারের বিচিত্র দ্যোতনায় মুজতবা আলী নিঃসন্দেহে এক অনন্য সমৃদ্ধমান ব্যক্তি।

বাংলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ আলী আহসান

BBC

অবিশ্বাস্য

বাঙলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক

সুরসিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকে—

মধুগঞ্জ মহকুমা শহর বলে তাকে অবহেলা করা যায় না।

মধুগঞ্জের ব্যবসা-বাণিজ্য নগণ্য; মধুগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে কুড়ি মাইল দূরে; মধুগঞ্জে জলের কল, ইলেক্‌ট্রিক নেই, তবু মানুষ মধুগঞ্জে বদলি হবার জন্য সরকারের কাছে ধন্নে দিত। কারণ এসব অসুবিধাগুলো যে রকম এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে শাপ, অন্যদিক দিয়ে আবার ঠিক সেইগুলোই বর। মাছের সের দু আনা, দুধের সের ছ পয়সা, ঘিয়ের সের বারো আনা এবং সেই অনুপাতে আণ্ডা মুরগী সবই সস্তা। আর সবচেয়ে বড় কথা, কাচ্চাবাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য মধুগঞ্জ পুববাঙলা-আসামের অক্সফোর্ড বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না; ওয়েলশ মিশনারীদের কৃপায় মধুগঞ্জে একটা হাইস্কুল আর দুটো প্রাইমারী স্কুল যে পদ্ধতিতে চলত তা দেখে বাইরের লোক মধুগঞ্জে এসে অবাক মানত। স্কুল-হস্টেলে সীটের জন্য পুববাঙলা-আসামে একমাত্র মধুগঞ্জেই আড়াই-গজ ওয়েটিং লিস্ট্‌ অফিসের দেওয়ালে টাঙানো থাকত। হস্টেলের খাই-খরচা মাসে সাড়ে চার টাকা, আর সীট-রেন্ট চার আনা!

মধুগঞ্জের আরেকটি সদ্‌গুণের উল্লেখ করতে লেখকমাত্রই ঈষৎ কুণ্ঠিত হবেন। লেখকমাত্রই সাহিত্যিক, কাজেই মধুগঞ্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁদের হৃদয় আকৃষ্ট করবে এ তো জানা কথা। কিন্তু সাহিত্যিকেরা এ তত্ত্বও বিলক্ষণ জানেন যে, এ সংসারে আর পাঁচজন শহরের দোষগুণ নির্ণয় করার সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জিনিসটাকে জমা-খরচের কোনো খাতেই ফেলার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ এ তত্ত্ব তো অতিশয় সত্য যে, নিছক প্রকৃতির মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে কেউ চাকরিতে বদলি খোঁজে না, কিংবা ব্যবসা ফাঁদে না।

এ সত্য জানা সত্ত্বেও যে দু-একজন সাহিত্যিক বরযাত্রীরূপে কিংবা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে এসেছেন তাঁরাই মধুগঞ্জের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গিয়েছেন। তাই দেখে খাস মধুগঞ্জীয় কাঁচা সাহিত্যিকেরাও মধুগঞ্জের আর পাঁচটা সুখ-সুবিধের সঙ্গে তার প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও প্রশস্তি গেয়েছেন।

পশ্চিম বাঙলা যেখানে সত্যই সুন্দর সেখানেই দেখি তার উঁচু-নিচু খোয়াইডাঙা আর দূরদূরান্তের নীলাভ পাহাড়। উঁচু-নিচুর ঢেউ-খেলানো মাঠের এখানে ওখানে কখনো বা দীর্ঘ তালগাছের সারি, আর কখনো বা একা দাঁড়িয়ে একটিমাত্র তালগাছ। এই তালগাছগুলো মানুষের মনে যে অন্তহীন দূরত্বের মায়া রচে দিতে পারে তা সমুদ্রও দিতে পারে না। সমুদ্রপাড়ে বসে

মনে হয়, এই আধমাইল দূরেই বুঝি সমুদ্র থেমে গিয়েছে—আকাশ নেমে গিয়ে নিরেট দেয়ালের মত হয়ে সমুদ্রের অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছে।

পশ্চিম বাঙলার খোয়াইডাঙা তাই তার শালতাল দিয়ে, দূর না হয়েও যে দূরত্বের মরীচিকা সৃষ্টি করে, সে মায়াদিগন্ত মানুষের মনকে এক গভীর মুক্তির আনন্দে ভরে দেয়। জানি মন স্বাধীন ; সে কল্পনার পক্ষিরাজ চড়ে এক মুহূর্তেই চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে সৃষ্টির ওপারপানে ধাওয়া দিতে পারে, কিন্তু সে স্বপ্নপ্রয়াণে তো আমার রক্ত-মাংসের শরীরকে বাদ দিয়ে চলতে হয়—আমাকে দেখতে হয় সবকিছু চোখ বন্ধ করে। আর এখানে আমার দুটি মাত্র চোখই আমাকে এক নিমেষে নিয়ে যায় দূর হতে দূরে, যেখানকার শেষ নীল পাহাড় বলে, 'আরো আছে, আরো দূরের দূর আছে' ; সে যেন ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি মুক্ত মানুষ, তুমি ওখানে বসে আছ কী করতে—চলে এসো আমার দিকে।'

এ মুক্তি-ধারণা নিছক কবি-কল্পনা নয়। বহুবার দেখা গিয়েছে সন্ধ্যার সময় পশ্চিমপানে তাকাতে তাকাতে সাঁওতাল ছেলে হঠাৎ দাওয়া ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে রওয়ানা দিল। তারপর সে আর ফিরল না। মড়া পাওয়া গেল পরের দিন খোয়াইয়ের মাঝখানে—বাড়ি হতে অনেক দূরে ; বুড়ো মাঝিরা বলে, ভূত তাকে ডেকেছিল, তারপর অন্ধকারে পথ হারিয়ে কী দেখেছে, কী ভয় পেয়ে মরেছে, কে জানে ?

পুববাঙলার সৌন্দর্য দূরত্বে নয়, পুববাঙলার 'মাঠের শেষে মাঠ, মাঠের শেষে/সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে' নয়, সেখানে মাঠের শেষেই ঘন সবুজ গ্রাম আর গ্রামখানির উপর পাহারা দিচ্ছে সবুজের উপর সাদা ডোরা কেটে কেটে সুদীর্ঘ সুপারি গাছ। আর সে সবুজ কত না আভা, কত না আভাস ধরতে জানে। কচি ধানের কাঁচা-সবুজ, হলদে-সবুজ থেকে আরম্ভ করে আম, জাম, কাঁঠালের ঘন সবুজ, কৃষ্ণচুড়া-রাধাচূড়ার কালো সবুজ। পানার সবুজ, শ্যাওলার সবুজ, কচি বাঁশের সবুজ, ঘনবেতের সবুজ—আর ঝরে-পড়া সবুজ পাতার রস খেয়ে খেয়ে পুববাঙলার মা-টি হয়ে গেছেন গাঢ় সবুজ—কৃষ্ণশ্যাম। তাই তাঁর মেয়ের গায়ের রঙে কেমন যেন সবুজের আমেজ লেগে আছে। সে শ্যামশ্রী দেশ-বিদেশে আর কে পেয়েছে, আর কে দেখেছে ?

কিন্তু মধুগঞ্জের সৌন্দর্য এও নয় ও-ও নয়। মধুগঞ্জ পুববাঙলার মত ফ্ল্যাট নয়, আবার পশ্চিমবাঙলার মত ঢেউ-খেলানোও নয়। ভগবান যেন মধুগঞ্জে

এক তিসরা খেলা খেলার জন্য নয়া এক ক্যানভাস নিয়ে বসে গেছেন। ক্যানভ্যাসখানা বিরাট আর তাতে আছে মোটামুটি তিনটি বড় রঙের পোঁচ— সামনের 'কাজলধারা' নদীর কাকচক্ষু কালো জল, নদী পেরিয়ে বিস্তীর্ণ সবুজ ধানক্ষেত, সর্বশেষে এক আকাশছোঁয়া বিরাট নিরেট নীল পাথরের খাড়া পাহাড়। এখানে পশ্চিম বাঙলার মত মাঠ ঢেউ খেলতে খেলতে পাহাড়ে বিলীন হয় নি—পাহাড় এখানে দাঁড়িয়ে আছে পালিশ সবুজ মাঠের শেষে সোজা খাড়া পাঁচিলের মত। তার গায়ে কিছু কিছু খাঁজ আছে কিন্তু এ খাঁজ আঁকড়ে ধরে ধরে উপরে চড়া অসম্ভব।

মধুগঞ্জের যেখানেই যাও না কেন উত্তরদিকে তাকালে দেখতে পাবে, কালো নদী, সবুজ মাঠ আর তার পর নীল পাহাড়। আর সেই পাহাড় বেয়ে নেমে এসেছে কত শত রুপালী ঝরনা। দূর থেকে মনে হয়, নীল ধাতুর উপর রুপোর বিদ্‌রী মিনার কাজ।

এ পাহাড় হাতছানি দিয়ে ডাকে না—এ পাহাড় বলে, যেখানে আছ সেইখানেই থাকো।

এরকম পাহাড় বিলেতে প্রচুর আছে, শুধু গায়ে নেই মিনার কাজ আর সামনে নেই সবুজ মাঠ, কাজলধারার কালো জল।

তাই আইরিশম্যান ডেভিড ও-রেলি মধুগঞ্জে অ্যাসিস্‌টেন্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস হয়ে আসামাত্রই জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেল।

॥ ২ ॥

প্রেমটা কিন্তু দু'তরফাই হল। ছোট্ট মহকুমার শহরটি ও-রেলিকে দেখে প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেললে।

তার প্রধান কারণ বুঝতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। ও-রেলি সত্যই সুপুরুষ। ইংরেজ বাঙালীর তুলনায় অনেক বেশী ঢ্যাঙা, তার উপর এদেশে বেশীদিন বাস করলে কেউ হয়ে যায় দারুণ মোটা, কেউ বড্ড লিকলিকে, কারো বা নাক হয়ে যায় টকটকে লাল, কারো দেখা দেয় সাদা চামড়ার তলায় বেগনি রঙের মোটা মোটা শিরা-উপশিরা। তার-ই মাঝখানে হঠাৎ যখন স্বাস্থ্যসবল আরেক ইংরেজ এসে দেখা দেয়—ইংরিজিতে যাকে বলে ফ্রেশ ফ্রম ক্রিসটিয়ান হোম্—তখন সে সুন্দর না হলেও তাকে প্রিয়দর্শন বলে মনে হয় ; রাজপুত্তুর না হলেও অন্তত কোটালপুত্তুরের খাতির পায়।

বয়স তার একুশ, জোর বাইশ। সায়েবদের ফরসা রঙ্ তো আছেই কিন্তু তার চুল খাঁটি বাঙালীর মতো মিশকালো আর তার সঙ্গে ঘননীল চোখ। এ জিনিসটি অসাধারণ; কারণ সায়েব-মেমদের চুল কালো হলে চোখও কালো, নিদেনপক্ষে বাদামী—আর চুল ব্লণ্ড্ হলে চোখ হয় নীল। আমাদের দেশেও যাদের রঙ ধবধবে ফরসা হয় তাদের চোখও সাধারণত একটুখানি কটা; তাই যখন তাদের চোখ মিশমিশে কালো হয় তখন যেন তাদের চেহারাতে একটা অদ্ভুত ঔজ্জল্য দেখা দেয়। কালো চুল আর নীল চোখও সেই আকর্ষণী শক্তি ধরে।

মধুগঞ্জ যদিও ছোট শহর তবু তার বিলিতি ক্লাব এ অঞ্চলে বিখ্যাত। শহর থেকে বিশ মাইল দূরে যে স্টেশন সে পথের দুদিকে পড়ে বিস্তর চা-বাগান আর রোজ সন্ধ্যায় সে সব বাগান থেকে হেটিয়ে আসত ক্লাবের দিকে সায়েব-মেম আর তাদের আণ্ডাবাচ্চারা।

ফুটফুটে ক্লাব-বাড়িটি। একদিকে লন টেনিসের কোর্ট আর ভিতরে বিলিয়ার্ড খেলার ব্যবস্থা—বিলিয়ার্ডের বল দেখে খানসামারা ক্লাবের নাম দিয়েছিল 'আণ্ডাঘর', আর সেই থেকে এ অঞ্চলে ঐ নামই চালু হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে মুরুব্বী রায়বাহাদুর কাশীশ্বর চক্রবর্তীরও একটা 'অনবদ্য অবদান' আছে। ক্লাব তখন সবেমাত্র খুলেছে। সায়েব-মেমরা ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে টুকটাক করে টেনিস খেলছেন—রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে রায়বাহাদুর ভীত নয়নে একটিবার সেদিকে তাকালেন। সে সন্ধ্যায় পাশার আড্ডায় রায়বাহাদুর গম্ভীর কণ্ঠে সবাইকে বললেন, 'দেখলে হে কাণ্ডখানা, সায়েবরা নিজেদের জন্য রেখেছে একখানা মোলায়েম খেলা; ধাক্কাধাক্কি মারামারি নেই—যে যার আপন কোর্টে দাঁড়িয়ে দিব্যি খেলে যাচ্ছে। আর তোমাদের মত কালো-আদমিদের জন্য ছেড়ে দিয়েছে একটা কালো ফুটবল। তার পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে বাইশটা নেটিভকে—মরো গুঁতোগুঁতি করে, আপোসে মাথা ফাটাফাটি করে। আর দেখেছ, সাহেবদের যদি বা কেউ তোমাদের খেলায় আসে তবে সে মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে বাজায় গোরা রায়ের বাঁশি—তার গায়ে আঁচড়টি লাগবার জো নেই।'

পাশা খেলোয়াড়রা একবাক্যে স্বীকার করলেন, এত বড় একটা দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্কার একমাত্র রায়বাহাদুরেই সম্ভবে, তদুপরি তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তানও তো বটেন!

সেই রায়বাহাদুরের সপ্তম দর্শনের বেলুনটি ফুটো করে চুপসে দিয়ে দেশে নাম

করে ফেললে বিদেশী ও-রেলি। চার্জ নেবার তিনদিন পরেই দেখা গেল, সে ইস্কুলের ছোঁড়াদের সঙ্গে ফুটবলে দমাদ্দম কিক লাগাচ্ছে; আর এদেশের ভিজে মাঠে খেলার অভ্যাস নেই বলে হাসিমুখে আছাড় খেল বার তিরিশেক।

রায়বাহাদুর বললেন, 'ব্যাটা বদ্ধ-পাগল নয়,—মুক্ত পাগল।'

পাশা খেলোয়াড়রা কান দিলেন না। পুলিসের বড় সাহেব ছোঁড়াদের নিয়ে ধেই ধেই করলে অভিভাবকদের আনন্দিত হওয়ারই কথা। কিন্তু এসব পরের কেচ্ছা।

ক্লাব জয় করেছিল ও-রেলি—প্রথম দিনই টেনিস খেলায় জিতে নয়—হেরে গিয়ে। মাদামপুর চা-বাগিচার বড সায়েব এ অঞ্চলের টেনিস চেম্পিয়ান। পয়লা সেট ও-রেলি জিতল; কারণ সে বিলেত থেকে সঙ্গে এনেছে টেনিস খেলার এক নূতন ঢঙ—মিডকোর্ট গেম আর বড় সাহেব খেলেন সেই বেজ লাইনে দাঁড়িয়ে আম্মিকালের কুটুস-কাটুস। অথচ পরের দু সেটে ও-রেলি হেরে গেল—দাবার ভাষায় বলতে গেলে অবিশ্যি গজচক্র কিংবা অশ্বচক্র খেল না বটে, আনাড়ি দর্শকেরা ভাবলে বড় সায়েব প্রথম সেটে সুতো ছাড়ছিলেন; জউরীরা বিলক্ষণ টের পেয়ে গেল, ও-রেলি প্রথম দিনেই 'ওভার চালাক', 'বাউন্সার' হিসাবে বদনাম কিনতে চায়নি। মেমেরা তো অজ্ঞান—যদিও হারলে তবু কী খেলাটাই না দেখালে, 'মাস্ট বি দি হীট, ইউ নো ফ্রেশ ফ্রম হোম্' ইত্যাদি। বড সায়েবও খুশি। সবাইকে বলে বেড়ালেন, 'ছোকরা আমার চেয়ে ঢের ভালো খেলে, তবে কি না, বুঝলে তো, আমার বুড়ো হাড়, হেঁ হেঁ, অফ কোর্স!'

পরদিনই দেখা গেল, ও-রেলি বুড়ো পাদ্রী সায়েব রেভরেণ্ড চার্লস ফ্রেডারিক জোনস্‌কে পর্যন্ত বগলদাবা করে নিয়ে চলেছে 'আণ্ডা-ঘরের' দিকে। বুড়ো পাদ্রী অতিশয় নীতিবাগীশ লোক, অবরে-সবরে ক্লাবে এলে নির্দোষ বিলিয়ার্ডকে পর্যন্ত ব্যসনে শামিল করে দিয়ে এক কোণে বসে সেই অজ ওয়েলসের দেড় মাসের পুরনো খবরের কাগজ পড়তেন কিংবা বাচ্চাদের সঙ্গে কানামাছি খেলতেন। ও-রেলির পাল্লায় পড়ে ধর্মপ্রাণ পাদ্রীর পর্যন্ত 'চরিত্রদোষ' ঘটল। দেখা গেল, পাদ্রী এখন প্রায়ই ক্লাবে এসে ও-রেলির সঙ্গে এক প্রস্ত বিলিয়ার্ড খেলে সন্ধ্যের পর তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে শহরের বাইরে ও-রেলির বাঙলোর দিকে চলেছেন।

পাদ্রী যে ও-রেলির সঙ্গে জমে গেলেন তার অন্য কারণও আছে।

ও-রেলির থানার কাছেই পাদ্রীদের ইস্কুল। চাকরিতে ঢোকার দিন দশেক পরে ও-রেলি লক্ষ্য করল ইস্কুলে কতগুলো সায়েব-মেমের বাচ্চাও ঘোরাঘুরি

করছে, কিন্তু দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না আসলে এরা ঠিক কী ?

ইনস্‌পেক্‌টর সোমকে ডেকে পাঠিয়ে বললে, 'সোম ?'

'ইয়েস স্যর !'

'নো, আমাকে "স্যর" "স্যর" করো না।'

'নো, স্যর।'

'ফের "স্যর" ?'

'ইয়েস স্য—।'

বাচ্চাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে সায়েব শুধাল, 'এরা কারা ?'

সোম চুপ করে রইল।

ও-রেলি বলল, 'দেখো সোম, তুমি আমার সহকর্মী। তুমি যা জান আমাকে খোলাখুলি না বললে আমি এখানে কাজ করব কী করে, আর তুমিই বা আমার সাহায্য পাবে কী করে ?'

'আজ্ঞে, এরা ইয়োরেশিয়ন।'

'ভালো করে খুলে বলো।'

'এরা দোআঁশলা; এদের অধিকাংশই চা-বাগান্ থেকে এসেছে। এদের বাপ—'

'থামলে কেন ?'

'চা-বাগানের সায়েব আর মা—এই, এই, যাদের বলে কুলী রমণী।'

ও-রেলি থ মেরে সব কিছু শুনল। তারপর অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে শুধাল, 'তা এদের সম্বন্ধে আমাকে কেউ কিছু বলেনি কেন, এমন কি পাদ্রী সায়েব পর্যন্ত না ?'

সোম বললে, 'এদের নিয়ে খাস ইংরেজদের লজ্জার অন্ত নেই, তাই, এরা তাদের ঘেন্না করে। পাদ্রী সায়েব ভালো মানুষ, তাই এ নিয়ে ওঁর দুঃখ হওয়ারই কথা। বোধহয়, আপনাকে ভালো করে না চিনে কোনো কিছু বলতে চাননি।'

সেদিনই থানা থেকে ফেরার সময় ও-রেলি সোজা পাদ্রীর টিলায় গেল। পাদ্রীকে সে কী বলেছিল জানা নেই। তবে পাদ্রী-টিলার ব্যাডমিণ্টন ক্লাবের প্রথম খাস ইংরেজ সদস্য ও-রেলি—অবশ্য পাদ্রী সায়েবদের বাদ দিয়ে—সে কথাটা ক্লাবের মিনিট বুকে সগর্বে সানন্দে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

খবর শুনে এস-ডি-ও প্লামার ও-রেলিকে বললেন, 'গো স্লো।'

ও-রেলি তর্ক জোড়েনি, তবে এ বিষয়ে তার মনের গতি কোন্ দিকে সেটাও জানিয়ে দিতে কসুর করেনি।

রায়বাহাদুর খবরটা শুনে বললেন, 'নাঃ, ছোঁড়াটাকে তো ভালো বলেই মনে হচ্ছে। তবে না আখেরে ডোবে। পাদ্রী-টিলার কোনো একটা ডপকা ছুঁড়িকে বিয়ে করলেই চিত্তির!'

আর ইস্কুলের ছোঁড়ারা তো ওর নাম দিয়ে ছড়া বানিয়েছিল,

'ও—রেলি, কোথায় গেলি?'

সাহেব মানে শুধিয়ে উত্তর শুনে ড্যাম্ গ্লাড্।

তারপর হাত-পা ছুঁড়ে আবৃত্তি করলে,

'O, Mary, go and call the cattle
Home,
Call the cattle home,
Across the sands of Dee,'

'আমাকে ঐ ক্যাট্‌ল্‌দের একটা মনে করেছ বুঝি? তাই সই, আমি না হয় তোমাদের দেবতা "হোলি কাও"ই হলুম।'

॥ ৩ ॥

এক বৎসর হয়ে গিয়েছে। ও-রেলিকে মধুগঞ্জ যে ক্রিকেট ম্যাচের মত লুফে নিয়েছিল সেই থেকে সে শহরের ছেলে-বুড়োর বুকে গোঁজা—ভারতীয় ক্রিকেটের ঐতিহ্যানুযায়ী তাকে 'ড্রপ' করা হয়নি।

ইতিমধ্যে ভর বর্ষায় মধুগঞ্জের জলে সাড়ম্বরে নৌকো-বাচ হয়ে গেল। বিলেত তার নৌকো-বাচ নিয়ে যতই বড়ফাট্টাই করুক না কেন, পুববাঙলার নৌকো-বাচের তুলনায় সে লাফালাফি বাচ্চাদের কাগজের নৌকো ভাসানোর মত। ও-রেলি উল্লাসে বে-এক্কেয়ার। নৌকো-বাচের আইনকানুন সোমের কাছ থেকে তিন মিনিটে রপ্ত করে বন্দুক কাঁধে করে উঠল মোটর বোটে। সোমকে বললে, 'তুমি এগিয়ে যাও আমার লঞ্চ নিয়ে ওদিকের শেষ সীমানায়, সেখানে যেন কোনো বদমাইশি না হয়। আমি এদিক সামলাব—এখানেই তো জেতার গোল!'

সোম বললে, 'সায়েব, নৌকো-বাচের "ফাউল" আর তারপর বৈঠে দিয়ে মাথা ফাটাফাটির ঠ্যালায় ফি বছর এ-দিনটায় ভাবি চাকরি রিজাইন দেব। আজ তুমি আমায় বাঁচালে।'

সায়েব বললে, 'তুমি কুছ্ পরোয়া কোরো না সোম, ফাউল বাঁচাতে গিয়ে

খুন-জখম আমিই করব। ইউ গো রাইট্‌ অ্যাহেড।'

তারপর ও-রেলি বন্দুক দেগে রেসের স্টার্ট দিলে, পিছনে পিছনে মোটর বোট, হেঁকে ফাউল সামলালে, উল্লাসে চিৎকার করে ঘন ঘন 'গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড, ও হাউ গ্র্যাণ্ড' হুঙ্কার ছাড়লে, কমজোর নৌকোগুলোকে 'চীয়ার আপ্‌' করলে আর সর্বশেষে প্রাইজের পাঁঠা, কলসী সকলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে করে স্বহস্তে বিতরণ করলে। মাথা-ফাটাফাটি যে হল না তার জন্য সোম আর বাইচওলাদের অভিনন্দন জানালে।

সর্বশেষে সোম খুশিতে ডগমগ হয়ে বিজয়ী নৌকোর গলুইয়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে, 'আসছে বছর যে নৌকো জিতবে সে পাবে হুজুর ও-রেলির পিতার নামে দেওয়া "মাইকেল শীল্ড"। পুববাঙলায় নৌকো-বাচে এই প্রথম শীল্ড—কম কথা নয়, আপনারা ভেবে দেখুন। আর সে শীল্ড লম্বায় তিন হাত হবে, হুজুরের কাছ থেকে সেটা আমি জেনে নিয়েছি। তার মানে পূর্ব বাঙলার যে-কোন ফুটবল শীল্ড তার তুলনায় "ছোড্ড আড্ডা পোলাডা।" হুজুর শীল্ড কী ধরনের হবে সেটা আমায় বলতে বারণ করেছিলেন; আমি সে আদেশ অমান্য করেছি। কাল আমার চাকরি যাবে। তা যাক। এখন আপনারা বলুন:

থ্রী চিয়ারস্‌ ফর ও-রেলি,
হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে।'

সে কী হুঙ্কারে হিপ্‌, হিপ্‌। গাঁয়ের লোক এ ধরনের স্থূল রসিকতা বোঝে। তার উপর তাদের আনন্দ, দু'দিনের চ্যাংড়া ফুটবল খেলার পাতলা দাপাদাপিকে তারা আজ হারিয়েছে। তাদের শীল্ড আসছে বছর থেকে সব ফুটবল শীল্ডের কান মলে দেবে।

ক্লাবের যে দু-একটি পাঁড় ইংরেজ কালা আদমিদের রেস দেখতে আসেননি তাঁরা পর্যন্ত হুঙ্কার শুনে আঙুল দিয়ে কান বন্ধ করে বলেছিলেন, 'ও-রেলি ইজ গন্‌ কমপ্লীটলি নেটিভ!'

অসম্ভব নয়। কিন্তু সেদিন শীল্ড-ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যদি ও-রেলি গা-ঢাকা না দিত তবে পঞ্চাশখানা গাঁয়ের লোক তাকে লিন্‌চ্‌ করত।

পাদ্রী-বাঙলোর নয়মি, রুথ, ইভা, মেরি সব ক'টা সোমথ মেয়ে জাত-বেজাত ভুলে পাইকেরী দরে পড়ল ও-রেলির প্রেমে। সে হাপা সামলাতে না পেরে ও-রেলিকে বাধ্য হয়ে প্রকাশ করতে হল, তার বিয়ে দেশে ঠিক হয়ে আছে, ছুটি পেলেই বিয়ে করে বউ নিয়ে আসবে।

ও-রেলি বুদ্ধিমান ছেলে। বিয়ের খবরটা সে ভেঙেছিল সোমের কাছে।

সোম খবরটাকে বিয়ে-বাড়িতে ফাটাবার বোমার মতই হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ আদর করার পর সেটি ফাটিয়ে দিলে হাটের মধ্যিখানে, কিন্তু তার থেকে বেরল টিয়ার গ্যাস। সে গ্যাস পৌঁছে গেল পাদ্রী-বাঙলোয় পোপের মৃত্যুসংবাদ ছড়াবার চেয়েও তেজে—এবং চোখের জলের জোয়ার জাগাল নয়মি, রুথ, ইভার হৃদয় ছাপিয়ে।

হায়, এরা তো জানে না ও-রেলিকে আশা করা এদের পক্ষে বামন হয়ে চাঁদ ধরার আশা করার মত। কিংবা তাতেই বা কি? এবং এ উপমাটাও হয়ত তারা জানে যে সামান্য একটা খরগোশ যখন চাঁদের কোলে প্রতি সন্ধ্যের অশ্বিনী-ভরণীকে টিট দিয়ে বসতে পারে তখন এরাই বা এমন কি ফেলনা? বিশেষ করে নয়মি। ভারতীয় সৌন্দর্যের নুন-নেমক আর ইংরেজের নিটোল স্বাস্থ্য নিয়ে গড়া এই তরুণী; এর সঙ্গে ফ্লার্ট করার জন্য পঁচিশটে বাগানের ইংরেজ ছোঁড়ারা ছোঁকছোঁক ঘুরঘুর করে তার চতুর্দিকে, যদিও সকলেরই জানা—শেষ পর্যন্ত তারা বিয়ে করে নিয়ে আসবে বিলেত থেকে কতকগুলো খাটাশমুখো ওল্ড মেড।

এ তত্ত্বটাও ও-রেলির জানা ছিল বলে সে একদিন সোমকে দুঃখ করে বলেছিল, 'দেখো সোম, আর যে যা-খুশি ভাবুক তুমি কিন্তু ভেবো না যে, আমি পাদ্রী-টিলার মেয়েদের নিচু বলে ধরে নিয়েছি। আমার বিয়ে ঠিক না থাকলে আমি ওদেরই একজনকে বিয়ে করতুম। মেয়েগুলির বড় মিষ্টি স্বভাব।'

সোম কানে আঙুল দিয়ে বললে, 'ও কথা বোল না সায়েব। জাত মানতে হয়।'

ও-রেলি আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ক্রিশ্চানের আবার জাত কি?'

সোম বললে, 'জাতের আবার ক্রিশ্চান কি?'

করে করে এক বছর কেটে গেল।

ও-রেলি ছুটি নিয়ে বিলেত থেকে বউ আনতে গেল।

॥ ৪ ॥

খাসপেয়ারা লোক যখন বিয়ে করে তখন তার একদল বন্ধু বউকে ভালোমন্দ বিচার না করে কাঁধে তুলে ধেই ধেই করে নাচে আবার আরেক দল তার দিকে তাকায় বড্ড বেশি আড়নয়নে। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হল না। সোম-কোম্পানি দিনের পর দিন মেমসায়েবকে ফুল পাঠাল, মিষ্টি পাঠাল, মেমের জন্যে

শথ জেনে ছোঁড়ারা তাকে নিত্যি নিত্যি ডিঙি চড়াল, পাদ্রীর টিলায় ঘন ঘন চড়ুইভাতে নেমতন্ন করল, ক্লাবে আর বাগিচা-বাগিচায় বেনকুয়েট ডিনার হল ; এ দলের খুশির অন্ত নেই।

অন্য দল বিস্তর যাচাই করার পর শুধু একটি কথা বললে, 'মেয়েটি ভালো, কিন্তু কেমন যেন মিশুক নয়।'

কিন্তু তাদের সর্দার রায়বাহাদুর চক্রবর্তীই তাদের কানা করে দিলেন আর-একটি মহামূল্যবান তত্ত্বকথা বলে—বললেন, 'নেটিভদের সঙ্গে ধেই ধেই করা উভয় পক্ষের পক্ষেই অমঙ্গল। ওরা রাজার জাত, রাজত্ব করবে : আমরা প্রজার জাত, হুজুরদের মেনে চলব। এর ভিতর আবার দোস্তি-ইয়ার্কি কী রে বাবা ? তোমরা ভেবেছ লিবার্টি পেলে তোমাদের নূতন কর্তারা তোমাদের কোলে বসিয়ে মণ্ডামেঠাই খাওয়াবেন ? দেখে নিয়ো, আজ আমি যা বললুম।'

তখনো স্বরাজের ছবি দিগদিগন্তেরও বহু পিছনে আণ্ডার ভিতরে বাচ্চার মত নিশ্চিন্দি মনে ঘুমুচ্ছেন। কাজেই রায়বাহাদুরের সঙ্গে এ বাবদে তর্ক করার উপায় ছিল না ; এবং এ ধরনের মুরুব্বীও তখন সর্বত্রই বিস্তর, মজলিস গুলজার করে এই রায়ই ঝাড়তেন। রায়বাহাদুর আবার বললেন, 'নেটিভ সাহেব যেন তেলে-জলে। সাবধান!' কিন্তু মধুগঞ্জ এ সাবধানবাণীতে কোন প্রয়োজনই অনুভব করল না।

রায়বাহাদুর অবশ্য মেমসায়েবকে সেলাম দিতে প্রথম দিনই কুঠিতে গিয়েছিলেন। মেমসায়েব তাঁর গালকম্বল মান-মনোহর দাড়ি দেখে একেবারে স্ট্রাক্, থ! রায়বাহাদুর ভাল করেই জানতেন আজকের দিনের দাড়ি-গোঁফ-কামানো ছোঁড়ারা তাঁর দাড়িতে উকুন অথবা ছারপোকা আছে কি না তাই নিয়ে ফিসফাস গুজগাজ করে, কিন্তু অন্তরে তাঁর দৃঢ়তম বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর দাড়ি-গোঁফের কদর প্রকৃত রসিক-রসিকাদের কাছে কিছুমাত্র নগণ্য নয়।

আদালতে বিস্তর সায়েবকে তিনি বহুবার যে কাবু করেছেন তার দুটি কারণ :

প্রথম, তাঁর আইনজ্ঞান এবং দ্বিতীয় তাঁর মনস্তত্ত্ববোধ। সায়েবের সাদা মুখ লাল, নীল, বেগুনি রঙের ভোল বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চটপট সমঝে যেতেন সাহেব চটেছেন, খুশি হয়েছেন, হকচকিয়ে গিয়েছেন কিংবা আইনের অথই দরিয়ায় হাবুডাবু খাচ্ছেন।

প্রথম দর্শনেই তিনি বুঝে গেলেন, মেমসায়েব তাঁকে নেকনজরে দেখেছেন। তারই পুরা ফায়দা উঠিয়ে তিনি তাঁকে মেলা অভিনন্দন আর অভ্যর্থনা জানালেন,

উনি যে তাঁর সেবার জন্য সব সময়ই তৈরী সে কথা বললেন, তাঁর স্বামী যে অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি সে কথাও উল্লেখ করলেন এবং বলতে বলতে উৎসাহের তোড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আদালত যে এ দেশে শুভাগমন করেছেন—' বলেই তাঁর মনে পড়ল, এ আদালত নয়। ঝুপ করে বসে পড়ে বললেন, 'সরি, ম্যাডাম, আই ফরগট !'

মেম তো হেসেই লাল। রায়বাহাদুর ঘেমে কালো। শেষটায় মেম বললেন, 'ইটস্ ও' রাইট, রে ব্যাডুর; থ্যাঙ্কয়্যু ভেরী মাচ্ ইনডীড্।'

রায়বাহাদুরের এ ভুল জীবনে এই প্রথম নয়। বুড়ো বয়সে সিনিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের প্রথম পুত্রসন্তান হওয়াতে তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে টিফিনের পূর্বে 'বারের' পক্ষ থেকে বলেছিলেন, 'আদালতের পুত্রসন্তান হওয়াতে আমরা সকলে বড়ই আনন্দিত হয়েছি।'

এ ভুলটাও তিনি গোপন রাখেননি। সেদিক দিয়ে তিনি সত্যই সরল প্রকৃতির লোক। মেমসায়েবের সঙ্গে তাঁর ভেট তিনি সবিস্তর বাখানিয়া বললেন, চাপরাসী ইন্তাজ আলীকে যে তিনি দু আনা বখশিশ দিয়েছেন সেটাও বলতে ভুললেন না।

সর্বশেষে খানিকক্ষণ কিন্তু কিন্তু করে বললেন, 'সায়েবের সঙ্গে তো আমার বিশেষ পরিচয় নেই, তবু কেমন যেন মনে হল একটু বদলে গিয়েছে। ঠিক বুঝতে পারলুম না ?'

আড্ডা বললেন, 'আপনিও তাজ্জব বাত বললেন, রায়বাহাদুর। বিয়ে করে কোন্ মানুষ বদলায় না, বলুন দিকিনি ? অন্তত কিছু দিনের জন্য ?'

সোম উপস্থিত ছিল। কেউ কেউ লক্ষ্য করল সেও কোনো আপত্তি জানাল না।

রায়বাহাদুর বললেন, 'কী জানি ভাই, আমার অতশত স্মরণ নেই। বিয়ে করেছিলুম কবে, সেই ঠাকুদ্দার আমলে।'

জুনিয়ার তালেবুর রহমান বললে, 'সে কি, স্যার ! বিয়ের পূর্বের কেস-গুলোও তো আপনার খুঁটিনাটি শুদ্ধ মনে আছে !'

উকিল মেম্বাররা সায় দিলেন।

রায়বাহাদুর গুণী লোক। মুনিঋষিরা যে রকম এককালে এক্স্‌রে দৃষ্টি দিয়ে হাঁড়ির খবর জানতে পারতেন তিনিও হয়তো খানিকটা আসল খবর ধরতে পেরেছিলেন, তবে কি না ঋষিদের তিন হাজার বছরের পুরনো লেন্স্ অনাদর-অবহেলায় ক্ষয়ে ঘষে গিয়েছে বলে ছবিটা আবছা-আবছা হয়ে ফুটল।

ও-রেলি তাগড়া জোয়ান, তার উপর পার্টি-পরবে ভোর অবধি বেদম নাচতে পারে—একটা ডান্সও মিস্ না করে। তাই বিয়ের পর আড্ডা-ঘরের 'গ্যালা'-নাচে সবাই আশা করেছিল ও-রেলি হয় বউকে কোমরে ধরে লাফ দিয়ে টেবিলের উপর তুলে দিয়ে নাচতে শুরু করবে কিংবা হলের মধ্যিখানে বউকে দুই ঠেঙে তুলে ধরে পাঁই পাঁই করে তার চতুর্দিকে সার্কেসি ঢঙে চক্কর খাওয়াবে। অন্তত-পক্ষে টাঙ্গো নাচের সময় সে যে বউকে নিবিড় আলিঙ্গনে ধরে নিয়ে গভীর দোদুলদোলা জাগাবে সে আশা—এবং বুড়ী মেমেরা সে আশঙ্কা—নিশ্চয়ই মনে মনে করেছিলেন; কারণ বউকে, তাও আবার আনকোরা বউকে নিয়ে নাচের সময় যে ঢলাঢলি করা যায় সেটা ইংরেজ সমাজে পরকীয়াতে চলে না। ফ্রান্সে চলে, তবে নাচের মজলিসে নয়।

ও-রেলি নেচেছিল এবং তার নাচে প্রাণও ছিল, কিন্তু আয়ারল্যাণ্ডে নব বর এ রকম নাচের সময় যে কুরুক্ষেত্র জাগিয়ে তোলে এখানে সেটা হল না। কেউ কেউ কিঞ্চিৎ নিরাশ হল বটে তবে ঝানুরা জানেন নব বর (অর্থাৎ নওশাহ্—নূতন রাজা) পয়লা রাতে কী রকম আচরণ করবে তার ভবিষ্যদ্বাণী কেউ কখনো করতে পারে না। মদ খেলে বাচাল হয়ে যায় চুপ আর বোবা হয় মুখর—আর বিয়ে করা তো সব নেশার চেয়ে মোক্ষম নেশা, খোঁয়ারি ভাঙাতে গিয়েই বাদ-বাকি জীবনটা কেটে যায়। কিন্তু তাই বলে যে সব সময় ঠিক উলটোটাই ফলবে তারও তো কোনো স্থিরতা নেই। আবহাওয়ার জ্যোতিষীরা বললেন, বৃষ্টি হবে অতএব আপনি ছাতা না নিয়ে বেরুলেন; ফলং? ভিজে কাঁই হয়ে বাড়ি ফিরলেন। ব্যত্যয়ও তো হয়।

কাজেই পালোয়ান এবং নাচিয়ে ও-রেলি আড্ডা-ঘরকে তার হক্কের পাকী সের থেকে এক ছটাক বঞ্চিত করাতে অল্প লোকই তাই নিয়ে মাথা চুলকোল।

গ্যালা নাচের পর পাদ্রী-বাঙলো দিলে পিকনিক। বাইরের বেশী লোককে নেমন্তন্ন করা হয়নি কিন্তু সোমের ডাক পড়েছিল কারণ পাদ্রীরা এ বাবদে বাঙালী সায়েব কারোরই মত এত মারাত্মক নাকতোলা নয়। পাদ্রী-টিলার পিছনে যে ছোট ছোট টিলা আর বনবাদাড়ের আরম্ভ তার শেষ হয় কুড়ি মাইল দূরে রেলস্টেশন পৌঁছে। এ বনে বুনো আম, কাঁঠাল, বৈঁইচি, কালোজাম, মিষ্টি মধুর সন্ধানে সকাল-সন্ধ্যে কাটিয়ে দেওয়া যায়। মৌসুমের সময় মাটিতে ফোটে অগুনতি লুট্কি ফুল আর গাছের গা-ঝুলে ফুলে ওঠে রঙ-বেরঙের অর্কিড ('বাঁদরের ন্যাজ')। এ জায়গাটায় পিকনিক করতে গেলে তাস-পাশা নিয়ে যেতে হয় না, গাছতলায় বসে দুটি খেয়ে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে

হয় না,—এখানে একা একা কিংবা ছোট ছোট দল পাকিয়ে অনেক কিছুর অনুসন্ধানে বেরনো যায় আর লুকোচুরি খেলার অলিম্পিক যদি কোনোদিন তার সদর অপিস খুলতে চায় তবে গড়িমসি না করে এখানেই সোজা চলে আসবে।

পাদ্রী-টিলাতে আপোসে বিয়ে হলেই এখানে তার পরের দিন পিকনিক। পিকনিকওয়ালারা আবার বর-বধূকে নানা ছুতোয় একা একা এদিক-ওদিক গুম হয়ে যেতে দেয় এবং নিজেদের মধ্যে তাই নিয়ে চোখ-ঠারাঠারি করে।

বর-বধূ বিয়ের পর প্রথম কয়েক দিন একে অন্যকে চিনে নেয় ঘরের ভিতরে বাইরে, বারান্দায়, নদীর পারে চাঁদের আলোতে কিংবা সমাজে আর পাঁচজনের ভিতর। এখানে নিভৃতে বনের ভিতর একে অন্যকে চিনে নেওয়ার ভিতর আরেক অভিনব মাধুর্য আছে—ওদিকে বন্ধুবান্ধব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও তারা নয়। ডাক দিলেই সাড়া মিলবে—ওরা তো এসেছে নব বরের নূতন শাহের খেদমত করার জন্যে।

খোয়াইডাঙ্গার দিগ্‌দিগন্ত-মুগ্ধ কবি, পদ্মার অবিচ্ছিন্ন অবিরল স্রোতের সঙ্গে যে কবি তাঁর জীবনধারার মিল দেখতে পেয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, গ্রহসূর্যে-তারায় বিশ্ব-স্রোত বিশ্ব-গতি হৃদয় দিয়ে আবিষ্কার করলেন, সে কবি পর্যন্ত আপন বঁধুয়ার যে ছবিটিকে বুকের ভিতর এঁকে নিতে চেয়েছিলেন সেটি পত্রপল্লবের অর্ধ-আচ্ছাদনে, বনানীর মাঝখানে;—

'পাতার আড়াল হতে বিকালের
আলোটুকু এসে
আরো কিছুক্ষণ ধরে ঝলুক তোমার
কালো কেশে॥
হাসিয়ো মধু উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে—
বনসরসীর তীরে ভীরু কাঠ-বিড়ালিরে
সহসা চকিত কোরো ত্রাসে।'

ও-রেলি বসে রইল বুড়ো পাদ্রী সায়েবের সঙ্গে বটগাছতলায়—পিকনিকের হেড অফিসে। অবশ্য বউ মেব্‌লও তার গা ঘেঁষে।

বুড়ো পাদ্রী গল্প বলে যেতে লাগলেন,—চল্লিশ বছরের আগেকার কথা। এ-সব গল্প মধুগঞ্জ বহুবার শুনেছে, কিন্তু ও-রেলির কাছে নূতন।

'বুঝলে ডেভিড, তখন আমি ছোকরা পাদ্রী হয়ে এদেশে এসেছি। সোম

এ-সব জানে, তার বাপ তখন এখানে সাবরেজিস্ট্রার। আমাকে অনেক করে বোঝালে টিলাতে বাঙলো না বানিয়ে যেন নদীপাড়ে আসন পাতি। তখনকার দিনে দুপুরবেলায় এখানে বাঘ চরাচরি করত, আমার একটা বাছুর চিতে নিয়ে গেল আমার চোখের সামনে, ব্রেকফাস্টের সময়।'

ও-রেলি শুধালে, 'টিলার মোহটা কী? আপনি তো হরিণ কিংবা পাখী শিকারও করেন না।'

পাদ্রী বললেন, 'বাঘ আর ম্যালেরিয়ার ভিতর আমি বাঘই পছন্দ করি বেশী। টিলার উপর ম্যালেরিয়া হয় কম। বন্দুক দিয়ে বাঘ শিকার করা যায়, কিন্তু মশা মারা কঠিন। কী বলো সোম, তুমি তো রববার হলেই বন্দুক নিয়ে মত্ত। কতবার বলেছি সোম, রববার স্যাবাথ—শান্তির দিন। এ-দিনটায় রক্তারক্তি নাই করলে।'

সোম বললে, 'স্যার, তেত্রিশ কোটি দেবতা ছেড়ে একজন দেবতা পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি?' তারপর ও-রেলির দিকে তাকিয়ে শুধাল, 'আপনি-ই বলুন চীফ, তেত্রিশ কোটি টাকার মাইনে ছেড়ে দিয়ে এক টাকার চাকরি নেয় কোন্ লোক?'

পাদ্রী বললেন, 'ওর যে-সব কটা মেকি।'

সোম বললেন, 'আমি পুলিসের লোক, স্যার, মেকি টাকা চিনতে না পারলে আমার সায়েবই কাল আমাকে ডিসমিস করবেন। মেকি খাঁটিতে তফাত আমি বেশ জানি। কিন্তু এদিককার তেত্রিশ কোটি আর ওদিককার একজন কেউ তো কখনো আমার থানায় এসে এজহার দেননি। বাজিয়ে দেখব কী করে? মাঝে মাঝে সন্দ হয়, সব কজনাই মেকি।'

পাদ্রী বললেন, 'মাই বয়! কী বলছ?'

পাদ্রীর বুড়ী বউ স্বামীকে বললেন, 'তোমাকে কতবার বলেছি, সোমের সঙ্গে কক্খনো ধর্ম নিয়ে আলোচনা করো না। ও যে শুধু হিন্দু তাই নয়—হিন্দুদের ভিতর অনেক সৎ লোক আছেন—ও একটা আস্ত ভণ্ড।'

তারপর ও-রেলিকে শুধালেন, 'সোম আমাদের টিলায় এত ঘন ঘন আসে কেন?'

ও-রেলি হেসে পালটে শুধালেন, 'কেন, আপনাদের ঝগড়া মেটাতে?'

বুড়ী রেগে বললেন, 'বিয়ে করেছ তো মাত্র সেদিন! ঝগড়ার তুমি কী জান হে, ছোকরা? সে কথা থাক, সোম আসে শুধুমাত্র মুর্গী খেতে, বাড়িতে পায় না বলে।'

সোম বললে, 'মাম্মি, আপনি যে ধরতে পেরেছেন, সে কথাটা এতদিন

বলেন নি কেন ?'

বুড়ী থ হয়ে বললেন, 'সে কী রে ! তোকে একশবার বলেছি, তোর বাপকে পর্যন্ত লুকিয়ে রাখি নি।'

সোম বললে, 'কই, আমার তো মনে পড়ছে না ? তা কাল থানাতে গিয়ে দেখব, কোনো পুরোনো নথিতে রিপোর্ট লেখা আছে কি না।'

বুড়ো পাদ্রী ও-রেলি আর মেব্‌লের চোখের উপর কয়েকবার স্নেহের চোখ বুলিয়ে বললেন, 'এই যে ডেভিড বললেন, সোম আসে আমাদের ঝগড়া মেটাতে, তা সে কিছু ভুল বলে নি। আজ যে রকম ডেভিড মেব্‌ল্‌কে নিয়ে এসেছে ঠিক তেমনি আমিও একদিন নিয়ে এসেছিলুম গ্রেসিকে। পনেরো বছর কেটে যাওয়ার পর একদিন আমাদের ভিতর সামান্য কথা-কাটাকাটি হওয়াতে হঠাৎ গ্রেসি বললে, "তবে কি আমাদের 'হনিমুন' আজ শেষ হল !" সেই সেদিনই আমি সামলে নিলুম। তারপর দেখো, কেটে গেছে আমাদের 'হনিমুনের' আরো পঁইত্রিশ বছর।'

সোম বললে, 'সে কথা মধুগঞ্জের কে না জানে বলুন। কিন্তু আমার বেলায় উল্টো। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর মানে চৌদ্দ বছরের জেল। আমার বেলা তারও বেশী। বিয়ে করেছি চৌদ্দ বছর বয়সে, তারপর কেটে গেছে প্রায় আঠারো বৎসর। এখনো কেউ খালাস করবার কথাটি তোলে না।'

পাদ্রী সোমের পাগলামিতে কান না দিয়ে বললেন, 'ঠিক এই গাছতলাতেই বসেছিলুম গ্রেসিকে নিয়ে, বাঘ-ভালুকের ভয় না করে। পাশের ঝোপে কোকিল কুহু কুহু করছিল। আমাদের মনে কী আনন্দ, এমন সময় একটা হনুমান "হুম" "হুম" করে আমাদের সামনে এসে দাঁত-মুখ খিঁচোতে লাগল। গ্রেসি কখনো বাঁদর দেখে নি, প্রায় ভিরমি খেয়ে আমার কোলে মুখ গুঁজল।'

বুড়ি মেম লজ্জায় রাঙা হয়ে বললেন, 'ব্যস, ব্যস হয়েছে।' এর পরও ডেভিড মেব্‌ল্ উঠল না।

॥ ৫ ॥

দেখা যেত দুজনকে, রাস্তা থেকে, তাদের বাঙলোর বারান্দায় ছাতা-ল্যাম্পের নিচে আরাম-চেয়ারে বসে আছে। কখনো সায়েব মেমসায়েবের হাত-পাখাখানা এগিয়ে দিচ্ছে, কখনো মেমসায়েব ঘরের ভিতর গিয়ে দু'হাতে দুটো লাইমজুস নিয়ে আসছে। আর কখনো বা সিংহলী বাটলার জয়সূর্য বারান্দার এক-

প্রান্তে গ্রামোফোনে রেকর্ডের পর রেকর্ড বিলিতি বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই নির্জন বারান্দায় কিংবা টিলার বাগানের লিচুগাছতলায় দুজন পাশাপাশি বসে, সামনের কালাই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে।

জ্যোৎস্না রাতে দুজনা ডিনারের পর বারান্দা থেকে নেমে লিচুবাগানের ভিতর দিয়ে নেমে আসত সদর রাস্তায়। সেখান থেকে চলে যেত নদীপারে। নদী-পার দিয়ে হেঁটে হেঁটে পৌঁছোত গিয়ে রামশ্রী গ্রামে, যেখানে ছোট্ট কিসাই নদী বড় নদী কাজলধারার সঙ্গে মিশেছে।

কিংবা তাদের মাথায় চাপত অদ্ভুত খেয়াল। কিসাই-কাজলের মোহনায় খেয়াঘাট ; তারা সেই রাত দশটায় হাট-ফের্তাদের সঙ্গে বসত খেয়া-নৌকায় —বাতার উপর। তারপর দুপুররাত অবধি খেয়া-নৌকোয় বসে এপার-ওপার করে বাড়ির পথ ধরত চাঁদ যখন ডুবুডুবু।

মেম আসার পর সায়েব ট্যুরে গেছে মাত্র একবার। মেমকে সঙ্গে নিয়েই গেল। ভাওয়ালি-নৌকোয় করে দু'দিনের রাস্তা। রোজ সন্ধ্যায় সায়েব-মেম ভাওয়ালির ছাদের উপর বসে বসে মাঝি-মাল্লার ভাটিয়ালি গান শোনে, আর কখনো বা জয়সূর্য ভগলা-মাঝির গান গ্রামোফোনে বাজায়। মাঝি-মাল্লারা সে গীত শুনে তাজ্জব মানে, আর মাঝে মাঝে তার নকল করতে গিয়ে মেম-সায়েবের কাছে ধমক খায়। মেম বলে ভাটিয়ালিই ভালো—মাঝিরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ;—তাদের গান সায়েবদের কলে বাজানো গাওনার চেয়ে ভালো, এও কি কখনো সম্ভবে ! তবে কি না সায়েব-সুবোদের খেয়াল, আল্লায় মালুম, ওদের দিল, ওদের দরদ কখন কোন্ দিকে ধাওয়া করে। একদিন তো মেমসায়েব নায়ের মশলা-পেষা ছোকরাটার বাঁশের বাঁশি চেয়ে নিয়ে সাবান দিয়ে ধুয়ে-পুঁছে ভাটিয়ালির সুর অনেকক্ষণ ধরে বাজালে।

এবারে নৌকোর বারোয়ারী ডাবাহুকোতে এনরা গুড়ুক খেলেই হয়েছে আর কি !

মাঝি-মাল্লারা কিন্তু একটা বিয়য়ে নিজেদের ভিতর বিস্তর আলোচনা করল। সায়েব-মেম এক অন্যের সঙ্গে অত কম কথা কয় কেন ? ভাগ্যিস ওরা জানত না যে, বিয়ের আগে ও-রেলি সাহেবের বাচাল বলে একটুখানি বদনাম ছিল বটে।

ভাওয়ালির হালদার বুড়ো মাঝি তালেবুদ্দি বললে, 'খুদাতালা কত কেরামতিই দেখালে ; গোরা হল রাজার জাত—আমাদের ডাঙর জমিদারের

গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারলে উনি সেটা আল্লার মেহেরবানি সমঝে দিল-খুশ হয়ে হাবেলী চলে যান। আর সেই গোরা দেখো, মেমের রুমালখানা হাত থেকে পড়ে গেলে তথ্‌খুনি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মেমকে এগিয়ে দেয়। আমি তো এ মামলা বিলকুল বুঝতে পারলাম না।'

শুকুরুল্লা বললে, 'কইছো ঠিকই কিন্তু আমাগো সায়েব তো কথনো কাউরে চড় মারে নি। বক্কে, আমার মনে লয়, সায়েবরা হামেশাই কথা কয় কম, কাম করে বিস্তর। দেখছো না, যারা হাম্বাই-তাম্বাই করে বেশী, তারাই কাম করে কম।'

মশলা-পেষা বললে, 'বউয়ের লগে যদি দুই-চারটা মিডা মিডা কথা না কইলা তয় বিয়া করলা ক্যান্।'

একই বিষয় নিয়ে আমাদের দেশে মাঝি-মাল্লা চাষা-ভূষো অনেকক্ষণ ধরে তর্ক-বিতর্ক করতে পারে না—অবশ্য পুববাঙলার পটভূমি নিয়ে লেখা নভেলে তারা 'গোরা' এবং 'বিনয়ের' মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা নব্যন্যায়ের তৈলাধার জ্বালিয়ে রাখতে পারে। তারা আপন আপন রায় জাহির করেই চুপ করে যায়। তর্ক করে যুক্তি দেখিয়ে একে অন্যের অভিমত বদলাবার চেষ্টা করে না। তাই বোধ করি ভদ্রসমাজে নিছক অবাস্তব তর্কাতর্কির ফলে যে রকম মনকষাকষি এবং মুখ-দেখাদেখি-বন্ধ হয়, চাষা-ভূষোদের ভিতর সেরকম হয় না।

তাই আলোচনার মোড় বদলে গিয়ে সভাস্থলে প্রশ্ন উত্থাপিত হল, 'সায়েব-মেমরা সাঁতার কাটতে ভালোবাসে, কিন্তু নদীর জল ঘোলা হলে গোসল করে না কেন?'

পুববাঙলার লোক জানে না, সায়েবদের কাছে সাঁতার কাটা হচ্ছে স্পোর্টস-বিশেষ—স্নানের খাতিরে তারা সাঁতার কাটতে নামে না। আমাদের কাছে স্নান যা, সাঁতার কাটাও তা।

ট্যুর থেকে ফিরে এসে ও-রেলি পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে একা কলকাতায় চলে গেল। সোম কিন্তু সবাইকে বললে, 'হুজুর সরকারী কাজে কলকাতা গেছেন; জানেন তো, আজকাল যা স্বদেশী-ফদেশী আরম্ভ হয়েছে।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'দুদিকেই বিপদ দেখতে পাচ্ছি। সায়েব যদি "স্বদেশীর" পিছনে লাগে, তবে তাদের দফা-রফা! নেটিভদের সঙ্গে দোস্তি জমিয়ে ও তাদের সব হাড়হদ্দ শিখে নিয়েছে, কড়ি চালালে আর কারো রক্ষে নাই। ওদিকে ছোকরা আবার আইরিশম্যান; ওর আপন দেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে

চলেছে জোর "স্বদেশী"। ও যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে, তবে তার প্রমোশনেরও তেরোটা বেজে যাবে। চাই কি কমপল্‌সরি রেটায়ারমেণ্টও হতে পারে। থাক, ও-সব কথা কইতে নেই।'

জুনিয়ার তালেবুর রহমান বললে, 'নৌকো দিয়েছেন ভাসিয়ে মাঝগাঙে —আর তারপর করছেন নোঙরের খোঁজ। সোমের সামনে খুলে দিয়ে দিয়েছেন শুটকির হাঁড়ি, আর এখন বলছেন নাক বন্ধ করো!'

রায়বাহাদুর বললেন, 'বাবা, সুধাংশু—'

সোম জিভ কেটে দু'কানে হাত দিয়ে বললে, 'রাম, রাম!'

এবারে ও-রেলি যখন কলকাতা থেকে ফিরল, ওখন সকলেরই চোখে পড়ল তার মুখের উপর গাম্ভীর্যের ছাপ।

সায়েবরা কলকাতা থেকে ফিরলে, তা সে রাত বারোটাই হোক, তথ্‌খুনি যায় ক্লাবে, সবাইকে কলকাতার তাজা খবর বিলিয়ে দেবার জন্য—শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এলে মেয়ে যে রকম ধুলো-পায় সইয়ের বাড়িতে ছুট লাগায়। ক্লাবের সবচেয়ে নীরস বেরসিকও তখন কয়েক দিন ধরে আরব্য উপন্যাসের শেহেরজাদীর কদর পায়।

ও-রেলি ক্লাবে গেল ফিরে আসার তিনদিন পরে।

বুড়ো পাদ্রীর চোখের জ্যোতি কম। তার উপর এতখানি সাংসারিক বুদ্ধি নেই যে, কারো চেহারা খারাপ দেখালে তদ্দণ্ডেই সে সম্বন্ধে প্রশ্ন শুধাতে নেই। ও-রেলিকে দেখামাত্রই শুধালেন, 'সে কি হে ডেভিড, তোমার চেহারা ও-রকম শুকিয়ে গেছে কেন?'

মাদামপুরের বুড়া-সায়েব ঝানু লোক। ও-রেলি আমতা আমতা করছে দেখে বললেন, 'অসুখ-বিসুখ করেছিল হয়তো। কলকাতা বড় নাস্‌টি প্লেস—ডিসেণ্ট্রি আর ডিসেণ্ট্রি! কেন যে মানুষ কলকাতা যায় বুঝতে পারি নে। আমি যখন প্রথম মাদামপুর আসি—'

বিষ্ণুছড়া বাগিচার মেম বললেন, 'তা মিস্টার ও-রেলি, কলকাতার নূতন খবর কী?'

মাদামপুরের বড় সায়েব তখনো আশা ছাড়েন নি; বললেন, 'কলকাতায় যেতে আঠারো দিন লাগত, আর—'

বিষ্ণুছড়া বাগিচার বড় মেমে আর মীরপুর বাগিচার ছোট মেমে যেন সাপে-নেউলে। একে অন্যের দেখা হলেই টুকাটুকি ঠোকাঠুকি। বললেন, 'মিস্টার ও-রেলি, কলকাতার সব খবরই নূতন। ফার্পোতে নেটিভরা ঢুকতে পারছে,

সে-ও নূতন খবর। ময়দানে ঘাস গজাচ্ছে, সে-ও নূতন খবর।'

বিষ্ণুছড়ার মেম ছোবল মারতেন, কিন্তু তাঁর সায়েব শান্তভাবে মেমের হাতের উপর হাত রেখে তাঁকে চেপে দিয়ে বললেন, 'তাজা-বাসি আমরাই যাচাই করে নেব ও-রেলি। ও-সব ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না।'

আগে হলে ও-রেলি এতক্ষণ সুবোধ ছেলের মত 'টু বী সীন, নট টু বী হার্ড' হয়ে বসে থাকতো না। ততক্ষণ হয়তো সপ্রমাণ করে দিত গড়ের মাঠে সত্যই কত রকম নূতন ঘাস গজাচ্ছে, তার রঙ গোলাপী, ফুল সবুজ আর সে ঘাস নেটিভ মাঠে পা ফেললেই গোখরোর মত ছোবল মারে—ডেঞ্জারেস পয়জন্—কিংবা হয়তো গম্ভীরস্বরে বয়ান করত, নেটিভরা এখনো ফার্পোতে ঢুকতে পায় নি; তবে কি না এ খবর কিছুটা সত্য, এখন ফার্পোর টেবিল-চেয়ার সরিয়ে সেখানে কার্পেটের উপর গোবর নিকনো লেপানো হয়েছে, আর তারই উপর সায়েবরা থালা পেতে হাপুর-হুপুর শব্দ করে খিচুড়ির সঙ্গে মালেগাটানি সুপ মাখিয়ে খাচ্ছেন।

অবশ্য ও-রেলি একেবারে চুপ করে বসে রইল না। কিন্তু খবর বিলোতে গিয়ে দেখল এবারে কলকাতায় সে তেমন কিছুই দেখে নি। গ্র্যাণ্ডে বসে লাঞ্চ খেয়েছে অথচ চারদিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে কিছুমাত্র লক্ষ্য করে নি। ক্যালকাটা ক্লাবের বারে বসে অনেকক্ষণ ধরে এটা-ওটা চুকচুক করেছে, কিন্তু এখন আর স্মরণ করতে পারল না পরিচিত কার কার সঙ্গে সেখানে দেখা হয়েছে।

বিষ্ণুছড়া বললেন, 'ও-রেলি গোপন সরকারী কাজে গিয়েছিলেন কলকাতায়, আর তার ফাঁকে করেছেন পার্টি-পরব। জুটোয় জট পাকিয়ে গিয়েছে বলে কী বলবেন, কী বলবেন না, ঠিক করতে পারছেন না।'

ও-রেলি বুঝলে, এটা সোমের কীর্তি।

প্রকাশ্যে বললে, 'ঠিক তা নয়, তবে এখন কলকাতার মৌসুমটা মন্দা যাচ্ছে। বেশীর ভাগই দার্জিলিং কিংবা শিলঙে। আমার পরিচিত অল্প লোকের সঙ্গেই সেখানে দেখা হল।'

মীরপুর বললেন, 'সে কি মিস্টার ও-রেলি? আপনি তো এক সেকেণ্ডে আলাপ জমিয়ে ফেলতে পারেন বদ্ধ কালা-বোবার সঙ্গে, আর আপনি করছেন পরিচয় অভাবের শোক!'

মনের ভিতর চমক খেয়ে ও-রেলি দেখলে, কথাটা একেবারে খাঁটি। এই তার জীবনে প্রথম যে সে কলকাতায় কোনো নূতন পরিচয় জানতে পারে নি। তবে কি সে জানাতে চায় নি? কেন, কী হয়েছে তার?

কিছু একটা বলতে হয়—যে লোক গল্পবাজ, সে কোনো কারণে চুপ মেরে গেলে সমাজে তার বড় দুরবস্থা—তাই আমতা আমতা করে বললে, 'না না, সে দিক দিয়ে আটকায় নি।' বলতে বলতে মনে পড়ে গেল, ক্রিকেটার হেণ্ডারসনের সঙ্গে হুয়াইটওয়ের দোকানে তার দেখা হয়েছিল। ও-রেলি বেঁচে গেল। শুধালে—

'ক্রিকেটার হেণ্ডারসনকে চেনেন ?'

বিষ্ণুছড়ার মেম বললেন, 'আমার দূর সম্পর্কের বোন-পো হয়।'

মীরপুর মেম কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার পূর্বেই ও-রেলি ক্রিকেটের গল্প জুড়ে দিল। মীরপুর-বিষ্ণুছড়ার কথা-কাটাকাটিকে সে, স্বদেশী' বোমার চেয়েও বেশী ডরাত—বললে, 'একটা ভালো ইংলিশ ক্রিকেট টীম নিয়ে আসছে-শীতে ইণ্ডিয়া আসতে চায়। ছেলেটার তাই নিয়ে উৎসাহের অন্ত নেই। ভারতবর্ষের সব কটা "পিচ" সে তার আপন হাতের তেলোর চেয়েও ভালো করে চেনে। আমার তো মনে হল "পিচ"গুলোর ঘাস বকরির মত চিবিয়ে খেয়ে যাচাই করে নিয়েছে, কোন্‌টা বোলারের স্বর্গ আর কোন্‌টা ব্যাটসম্যানের—দরকার হলে 'কোয়ের ম্যাটিঙ'ও চিবুতে তৈরী।

"আমি বললুম, অতশত মাথা ঘামাচ্ছ কেন হেণ্ডারসন, এদেশের ক্রিকেট বড্ড কাঁচা, তোমরা অনায়াসেই জিতে যাবে।"

"হেণ্ডারসন বললে, তার কিছু ঠিক ঠিকানা নেই। বোম্বাইয়ের জ্যাম সায়েব —তোমরা নাকি নামটা অন্য ধরনে উচ্চারণ করো, তিনি 'জ্যাম' হোন আর জেলিই হোন, বিলেতে তিনি তাড় হাঁকড়ে সবাইকে ক-শো বার জেলি বানিয়ে দিয়েছেন, তার খবরও তো তোমার অজানা নেই। কে বলতে পারে বলো, কালই এদেশে আরো পাঁচটা জ্যাম বেরিয়ে যাবে না এবং হয়তো জ্যাম নয়, তার চেয়েও শক্ত মাল—'হার্ড নাট'।"

'আমি উত্তরে বললুম, অসম্ভব তো কিছুই নয়, তবে কি না কাল আমার ন্যাজ গজাতে পারে বলে আজ তো আমি তাই নিয়ে মাথা ঘামাই নে কিংবা ন্যাজ সাফসুতরো রাখার জন্য বরুশও কিনি নে!'

মাদামপুরের বুড়ো সায়েব লক্ষ্য করলেন, ক্রিকেটের গল্পে উত্তেজিত হয়ে ও-রেলি তার মন-মরা ভাবটা কাটিয়ে ফেলেছে। খুশি হয়ে উৎসাহ দিয়ে বললে, 'তা তুমি এখানে একটা ক্রিকেট টীম বানাও না কেন ?'

ও-রেলি বললে, 'ভাবছি, শমশেরগঞ্জের জমিদারের কাছ থেকে কিছু টাকা বাগাব। সম্প্রতি লোকটা গুম-খুনে জড়িয়ে পড়েছিল—অথচ সোম পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে প্রমাণ খাড়া করতে পারলে না। আমি কিন্তু জমিদারকে ভাঁওতা

মারলুম, সব প্রমাণ তৈরী, এবারে বাছাধনকে ঝুলতে হবে। পায়ে জড়িয়ে ধরে আর কি, তখন ভবিষ্যতের জন্যে তার বুকে যমদূতের ভয় জাগিয়ে দিয়ে যেন নিছক মেহেরবানি করে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। টাকা চাইলে এখন তার ঘাড় দেবে।'

সবাই কলরব তুলে নূতন করে আবার সেই গুম-খুনের পোস্টমর্টেমে লেগে গেলেন। ইংলণ্ডে হিজ ম্যাজেস্টির পরেই ক্রিকেট-আলোচনা আড্ডার রাজা কিন্তু পূববাঙলার গুম-খুন রাজারও রাজা, অর্থাৎ মন্ত্রী—অবশ্য দাবা খেলার—রাজার চেয়ে ঢের বেশি তাগদ ধরেন। কত রকম কথা-কাটাকাটিই না হল, বিষ্ণুছড়ার মেম বলছেন, জমিদারের হুকুমে বড় ভাইয়ের চোখের সামনে ছোট ভাইকে জ্যান্ত পোঁতা হয়েছিল, মীরপুরের মেম বললেন, গুলতান, লোকটার বড় ভাই-ই নেই আর সে খুন হয় নি আদপেই; মীরপুরের জমিদারের টাকা খেয়ে গুম হয়ে গিয়েছে শমশেরগঞ্জকে জড়াবার জন্য।

অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলেছিল। ইতিমধ্যে ও-রেলি কেটে পড়েছে।

মাদামপুরকে বাগানে ফেরার সময় বিড়বিড় করে বলতে শোনা গেল, 'ও-রেলিকে বোঝা ভার'।

॥ ৬ ॥

বরঞ্চ ইংরেজ সকালবেলার বেকন আণ্ডা বর্জন করে দেবে, বরঞ্চ ইংরেজ বড়দিনে গির্জে কট করতে পারে, এমন কি শাশুড়ীর জন্মদিনও ইংরেজের পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু ক্লাব-গমন বন্ধ করা ইংরেজের পক্ষে হৌস-অব-কমনস্ পুড়িয়ে দেবার সামিল—মুসলমানের কলমা ভুলে যাওয়া, হিন্দুর গো-মাংস ভক্ষণের তুলনায় চুলে চিমটি কাটার মত।

ডেভিড, মেব্‌ল্ তিন মাস ধরে ক্লাবে যায় নি!

যে মীরপুরের ছোট মেম ডুমুরের ফুল সাপের ঠ্যাঙ দেখেছেন বলে ক্লাবে দাবি করে থাকেন, তাঁকে পর্যন্ত স্বীকার করতে হল, মধুগঞ্জের তাবৎ খানসামা-বাটলার, মেথর-ঝাড়ুদারকে ফালতো চা বকশিশ দিয়েও তিনি কারণটা বের করতে পারেন নি।

এ-সব বাবদে সোজাসুজি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ইংরেজের সর্বশাস্ত্রে বারণ। এক-মাত্র পাদ্রীদের কিছু হক্ক আছে। বুড়ো পাদ্রী সন্তর্পণে প্রশ্ন শুধিয়ে নিরাশ হলেন। বুড়ী মেম একবার ডেভিডের মফস্বল-বাসের সময় মেব্‌লের সঙ্গে তেরাত্তির কাটান। চতুর্দিকে কড়া নজর ফেলে, এমন কি শেষটায় জিজ্ঞেসবাদ

করেও কোনো খবর যোগাড় করতে পারলেন না।

বুড়ী বেদনা পেয়েছিলেন। তৃতীয় রাত্রিতে ছিল পূর্ণিমা। জানালা দিয়ে চোখে চাঁদের আলো পড়তে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। পাশের খাটের দিকে তাকিয়ে দেখেন মেব্‌ল্‌ নেই। পা টিপে টিপে বারান্দায় এসে দেখেন মেব্‌ল্‌ ডেকচেয়ারে সামনের দিকে ঝুঁকে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে—তার দীর্ঘ বাদামী চুল হাত-মুখ ছাপিয়ে ফেলেছে। বুড়ী মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, চুলে আঙ্গুল চালাতে চালাতে হঠাৎ চুলের ডগাগুলো ভেজা ঠেকল।

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি পাদ্রী-টিলার বহু তরুণী, বিস্তর যুবতীর অনেক বুকফাটা কান্না দেখেছেন, কোনো কোনো স্থলে সলা-পরামর্শ দিয়ে নানা দিকে নানা রকম কলকাঠি চালিয়ে এদের মুখে হাসি ফোটাতেও সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু এ নারীর বেদনা কী হতে পারে, সে সমস্যার সন্ধানে কোন্ দিকে হাতড়াতে হবে তার সামান্যতম অনুমানও তিনি করতে পারলেন না।

বুড়ো পাদ্রী সব শুনে বললেন, 'এসো, দুজনাতে মিলে প্রার্থনা করি।'

সোম একদিন ও-রেলিকে প্রশ্ন শুধাল মাত্র দুটি শব্দ দিয়ে, 'এনি ট্রাবল ?'

উত্তরের জন্য মাত্র এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে সোম 'গুড বাই' বলে বারান্দা থেকে নেমে লিচুতলা দিয়ে গেট খুলে বড় রাস্তায় নেমে গেল।

ও-রেলি ভাবলে মাত্র দুটি কথা, 'এনি ট্রাবল !'

স্মরণই করতে পারল না, তার জীবনে কখনো কোনো শক্ত ট্রাবল এসেছিল, কি না যেটাকে সে কাত করতে পারে নি। সে তাগড়া জোয়ান, লেখাপড়ায় ব্রিলিয়াণ্ট না হলেও ভালো, গায়ের জোরে কমতি নেই, আর পাঁচটা ইংরেজের মত তিনটে কথা বলতে গেলে সাতবার হোঁচট খায় না—তার আবার ট্রাবল ! হ্যাঁ, একটা সামান্য ট্রাবলের কথা মনে পড়ছে বটে। এমনিতে তার মুখে শুধু খই ফোটে না, টোস্ট পর্যন্ত সেঁকা যায় তবে প্রেমের ব্যাপারে একটু মুখচোরা বলে মেব্‌ল্‌কে বিয়ের প্রস্তাব পাড়তে তার তিনটে রবির সন্ধ্যা লেগেছিল বটে, কিন্তু তারপরের অবস্থা দেখে সে থ—মেব্‌ল্‌ বাহান্ন রববারের আগের থেকেই নাকি তাকে বিয়ে করবে বলে মনস্থির করে ট্রসোর ডিজাইন বানাতে লেগে গিয়েছিল।

ইস্কুলের ব্লু, চাকরির জন্য পরীক্ষা, রাগবিতে একখানা পাঁজর গুঁড়িয়ে যাওয়া—এ-সব ও-রেলির কাছে কখনো ট্রাবল বলে মনে হয় নি। তার একমাত্র ভয় ছিল মেব্‌ল্‌ যদি তাকে গ্রহণ না করে। সেই মেব্‌ল্‌কে পেতে তার তিনটে রববার—অর্থাৎ একুশ দিনের দিবারাত্র দুশ্চিন্তা—লেগেছিল বটে কিন্তু

আজকের তুলনায় সে কত সহজ। সেদিন পথহারা ও-রেলির সামনে থেকে হঠাৎ যেন কুয়াশা কেটে যায় আর সুমুখে দেখে বসন্তের মধুরৌদ্রে, নীল আকাশের পটে আঁকা মেব্‌ল। 'উতলা পবন বেগে মেঘে মেঘে' যেন তার খোলা চুল উড়ে উড়ে চলেছে। হাতে তার একটি ছোট ফুল। তারই এক-একটা পাপড়ি ছিঁড়ছে আর বলছে 'হি লাভস্ মী', পরেরটায় বলছে 'হি লাভস্ মী নট্'—এই করে করে ভাগ্য-গণনা করছে। সর্বশেষের পাপড়িতে 'হি লাভস্ মী' না 'হি লাভস্ মী নট'-এ এই জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান মিলবে।

ও-রেলির মনে পড়ল, মেব্‌ল সেদিন তার কানের ডগায় চুমো খেয়ে বলেছিল, 'আমি সব সময়ই জানতুম, শেষ পাপড়ি 'হি লাভস্ মী'-তেই শেষ হবে। একদিন যখন হল না তখন রীতিমত হকচকিয়ে গেলুম। পরে দেখি একটা পাপড়ি আগের থেকেই ছিঁড়ে গিয়েছিল—টুকরোখানা তখনো বোঁটায় লেগে আছে।'

সে সব দিন চলে যাওয়ার পর আজ সোম জিজ্ঞেস করলে, 'এনি ট্রাবল্!'

তারপর আরো তিন মাস কেটে গিয়েছে। এ তিন মাসের ভিতর আরো পরিবর্তন ঘটেছে। ও-রেলিরা ক্লাব দূরে থাক কারো বাড়িতে পর্যন্ত যায় নি। তার থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল তারাও চায় না কেউ তাদের বাড়িতে আসুক। শেষ পর্যন্ত এক পাদ্রী মেম ছাড়া আর কেউ ও-রেলি টিলায় আসত না এবং তিনিও আসতেন যেন অতিশয় দায়ে পড়ে, অন্ধভাবে অন্ধকারে কোন এক ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আবছা বুঝতে পেরে মানুষ যেরকম আত্মজনের কাছে এসে দাঁড়ায়।

তারপর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের খরদাহের পর নামল বর্ষা। কলকাতার বদখদ দালান-কোঠার উপর বর্ষা যখন নামে তখন বড়বাজারের বেরসিক মারোয়াড়ী পর্যন্ত আকাশের দিকে দু-একবার না তাকিয়ে থাকতে পারে না, আর কলেজের মেয়েরা নাকি ছাদের উপর বৃষ্টির জলে ভেজবার অছিলা করে মেঘের জলের সঙ্গে চোখের জল মেলায়। আর তাতে আশ্চর্য হবারই বা কী আছে!. ছেলেরা তো কলেজ পাসের পর অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রেম-বিয়ে-শাদি মন থেকে কুলোর বাতাস দিয়ে খেদিয়ে দেয়; মেয়েরাই শুধু অজানা ভবিষ্যৎকে অতখানি ডরায় না বলে বে-এক্তেয়ার প্রেমে পড়ে আর তারই প্রকাশ খুঁজতে গিয়ে রবিঠাকুরের গান আর কবিতা বাঁচিয়ে রাখে। তবে কি রবিঠাকুর এ তত্বটা জানতেন, তাই ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের গান শিখিয়েছেন অনেক বেশী সযত্নে?

মধুগঞ্জে এ-সব বালাই নেই—মারোয়াড়ী নেই বললেও চলে, কলেজ নেই তাই কলেজের মেয়েও নেই। মধুগঞ্জী বালিকাদের বিয়ে হয়ে যায় চোদ্দ পেরতে না পেরতেই। এ বিষয়ে ওয়েলস পাদ্রী সাহেবও নেটিভ বনে গিয়েছেন, রুথ্-মেরীদের ষোলো পেরতে না পেরতেই বরের সন্ধানে লেগে যান। তাঁর যুক্তি—প্রাচ্যে মেয়েরা বিবাহযোগ্য হয়ে যায় অল্প বয়সেই, এদেশে বিলিতি কায়দা মেনে নিলে শুধু অনর্থেরই সৃষ্টি হয়।

বিবাহ মাত্রই প্রেমের গোরস্তান, কিন্তু শান্তির আস্তানা।

তাই এখানে কোনো তরুণী অকারণ বেদনায় কাতর হয়ে রবিঠাকুরের কবিতা-গান নিয়ে নাড়াচাড়া করে না। রবিঠাকুর তাই সেযুগে মধুগঞ্জে অচল।

ঠিক সেই কারণেই প্রকৃতির সৌন্দর্যবোধ মধুগঞ্জে মদনভস্মের মত শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ এখানকার লোক নববরষণে ময়ূরের মত পেখম তুলে নাচে না, আবার উত্তরের পাহাড় পেরিয়ে দলে দলে নবীন মেঘ এসে যখন শহরের বনের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে তখনও মানুষ সেখানে বর্ষার মধুর দিকটা সম্বন্ধে অচেতন হতে পারে না। আর হবেই বা কী করে? প্রথম যেদিন মধুগঞ্জে কদম ফুল ফোটে সেদিন তার গন্ধে সমস্ত শহর ম-ম করতে থাকে। সে গন্ধে নেশা আছে—রায়বাহাদুর চক্রবর্তীর মত রসকষহীন মানুষকেও দেখা যায় বেড়িয়ে বাড়ি ফেরার সময় একডাল কদম হাতে নিয়ে ফিরছেন।

কিন্তু পুববাঙলা আসামের সায়েবরা বর্ষাকালে প্রায় পাগল হয়ে যায়। বিশেষ করে যারা বাগানের ছোট ছোট টিলাতে নির্জনবাসে থাকতে বাধ্য হয়। পাঁচ মাইলের ভিতরে একটা ইংরেজ নেই যার সঙ্গে দুটি কথা বলতে পারে, দিনের পর দিন অনবরত বৃষ্টি, রাস্তাঘাট জলে-জোয়ারে ভেসে গিয়েছে, ক্লাবে যাবার কথাই ওঠে না। শেষ পর্যন্ত গ্রামোফোন বাজানো পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছে বেশীর ভাগ সায়েবরাই এই সময় দিশী রমণী গ্রহণ করে। কেউ কেউ ম্যালেরিয়ায় তাদের শুশ্রূষা লাভ করে সেরে ওঠার পর, আর কেউ কেউ একটানা নির্জনবাসের ফলে হন্যে হয়ে গিয়ে।

ও-রেলির মাথার ইস্ক্রুপগুলো জোর টাইট করে বসানো। বর্ষা তাকে কাবু করতে পারে না। তার ওপর মেব্‌ল্ পাশের চেয়ারে বসে।

তবু বোঝা গেল, এ বর্ষা ও-রেলিকে পর্যন্ত অনেকখানি ঘায়েল করে দিয়েছে। ও-রেলি মুষড়ে পড়েছে।

॥ ৭ ॥

মাদামপুরের বড় সায়েব বললেন, 'এ কথাটা আমি কী করে বিশ্বাস করি বলো তো, পার্সি? মেব্‌ল্ মিশুকে হোক আর না-ই হোক, ওর মত ডিসেণ্ট গার্ল আমি জীবনে অল্পই দেখেছি। কলেজ পর্যন্ত পড়েছে, উত্তম রুচি। সে কী করে অতখানি স্টুপ করবে? তুমি ছাড়া অন্য কেউ এ কথাটা বললে তার সঙ্গে আমার হাতাহাতি হয়ে যেত।'

বিষ্ণুছড়ার সায়েবের বয়স যদিও কম তবু এ অঞ্চলে তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি বিচক্ষণ লোক হিসাবে। আর পরচর্চা, গুজোব রটানো থেকে তিনি থাকেন সব সময়েই দূরে এবং আশ্চর্য, যারা এ-সব জিনিসে কান দেয় না, পাকা খবর তারাই পায় বেশী এবং আর সকলের আগে। বললেন, 'আমার কাছে এখনো সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমাকে তো বললুম, কিছুটা বিশ্বাস না করলে তোমার কাছে আমি কথাটা পাড়তুম না। অবশ্য একথাও আমি বলব, এ-সব জিনিস আমি শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস করারই চেষ্টা করি।'

'তোমার মেম, মীরপুরের মেম, এরা সব জানতে পেরেছে?'

'নিশ্চয়ই এখন পর্যন্ত না। শার্ল'ট জানতে পারলে আমাকে রাত তিনটেয় খবরটা দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে মীরপুর ছুটত এমিলিকে টেক্কা মারবার জন্য—অ্যাণ্ড ভাইস ভার্সা। তবে খুব বেশী দিন গোপন থাকবে না। সত্যই হোক আর মিথ্যেই হোক, যে-সব মেয়েরা মেব্‌লের রুচিশীল ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেদের ছোট মনে করত তাদের জিভের লকলকানি খুব শিগগিরই আরম্ভ হয়ে যাবে।'

সন্ধ্যের পর টেনিস লনের এক কোণে বসে দুই সায়েব অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে ভাবলেন। মধুগঞ্জ অঞ্চলের ইংরেজ কলোনির আসল সর্দার এঁরাই। বিষয়টি তাঁরা আলোচনা করছিলেন সেই কর্তব্যবোধ থেকে—এ সম্বন্ধে তাঁরা কিছু করতে পারেন কি না।

শেষটায় মাদামপুর হুঙ্কার দিলেন, 'বয়, দো ব্রা পেগ্।'

খবর কিংবা গুজোব যা-ই হোক, ব্যাপারটা মারাত্মক—গড্ ড্যাম্ সিরিয়স—মেব্‌ল্ না'কি নেটিভ বাটলারটার প্রতি অনুরক্ত!

ঐ মিশকালো, অষ্টপ্রহর মদে-মাতাল-রাঙা-চোখওলা ভোঁতকা লোকটার প্রতি মেব্‌ল্ অনুরক্ত, একথা কে বিশ্বাস করবে? একমাত্র 'স্ত্রীচরিত্র দেবতারাও জানে না' তত্ত্ব মানলে সব কিছুই বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু এই সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য স্ত্রী-নিন্দার সামনে দাঁড়িয়ে বরঞ্চ জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে যায়, দেবতারা না হয় দেবীদের চরিত্র চিনতে পারেন নি, তাই বলে পুরুষকেও তার স্ত্রী-জাত সম্বন্ধে

এই অজ্ঞতা মেনে নিতে হবে এবং মেনে নিয়ে স্ত্রী-জাতকে অপমান এবং নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে লাঞ্ছনা করতে হবে?

কিন্তু এ-সব তো পরের কথা। প্রথমেই যেটা মনে আসে সেইটেই মাদামপুরের বড় সায়েব বিষ্ণুছড়াকে বললেন, 'হাতা-হাতি হয়ে যেত।' তারপর হুড়হুড় করে মনে আসে একসঙ্গে দশটা প্রতিবাদ; ও-রেলির মত সুপুরুষকে ছেড়ে? এক বৎসর যেতে না যেতে? ও-রেলির এতখানি আদর-যত্ন পেয়েও? ও-রেলি কি তবে জানে না?

ঠাণ্ডা-মাথা মাদামপুর বললেন, 'পার্সি, তবে কি তাই তারা পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছে?'

বিষ্ণুছড়া একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু মেলামেশাটা বজায় রাখলেই তো মানুষের সন্দেহ হত কম।'

মাদামপুর দুই ঢোকে ডবল হুইস্কি খতম করে বললেন, 'মাই গড, নেটিভরা জানতে পারলে লজ্জার সীমা থাকবে না। ওঃ!'

'তা ঠিক, তবে কি না জিনিসটা যখন চা-বাগিচার ভিতরে আগেও হয়েছে তখন—'

মাদামপুর বাধা দিয়ে বললেন, 'সে হয় শহর থেকে দূরে, বনের ভিতর, টিলার উপরে।'

'সে কথা ঠিক কিন্তু পাদ্রী-টিলার বাচ্চারা কোথা থেকে আসে সে তত্ত্বও তো নেটিভদের অজানা নয়।'

মাদামপুর একটুখানি অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'সে তো সাধারণভাবে, যে রকম ধরো অনাথাশ্রম হয়। কিন্তু এখানে যে ব্যক্তিবিশেষ, সমাজ যাকে চেনে। তা আবার এ. এস. পি.র মেম! মাই গড! আমি ভাবতুম, পুরুষরা এ-সব ঢলাঢলিতে যতখানি নিচু হতে পারে, স্ত্রীলোকেরা ততখানি পারে না।'

দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। দেখা গেল বিষ্ণুছড়া আর মীরপুরের মেম আসছেন। সাপে-নেউলে গল্প করতে করতে আসছেন এ জিনিস প্রাণীজগতে কখনোই দেখা যায় না। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন এক লেঙ্গোটার ইয়ার—উঁহুঁ, এক ফ্রকের সই। অথচ এঁরা আসছেন ইনি ওঁকে ছোবল মারতে মারতে, উনি এঁকে কামড় দিতে দিতে। চোখ লাল না করে, দাঁত না খিঁচিয়ে, ফণা না বাগিয়ে ঝগড়া করতে পারে একমাত্র মানুষই—অবশ্য স্ত্রীলোকেরাই পায় মাইকেল ও-রেলি শীল্ড—পুরুষের কপালে কনসোলেশন প্রাইজ।

গুজোবটা ছড়াতে কত দিন লেগেছিল বলা শক্ত। গুজোবের স্বভাব হচ্ছে যে,

প্রথম ধাক্কাতেই সে যদি কিছুটা সাহায্য না পায় তবে কেমন যেন দড়কচ্চা মেরে যায়। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে মাদামপুর আর বিষ্ণুছড়া যদি সেটার টুঁটি চেপে না ধরতেন, তবে কী হত বলা যায় না ; এস্থলে গুজোবটাকে ফের চাঙ্গা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে বেশ একটুখানি সময় লেগেছিল।

মধুগঞ্জের 'আণ্ডা-ঘরে' গুজোব মাত্রেরই জন্ম-মৃত্যু জরা-যৌবনের বেশ একটা সুনির্দিষ্ট ঠিকুজি আছে। গুজোবের জননী যদি মীরপুরের ছোট মেম হন, তবে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অবশ্য জানা কথা, বিষ্ণুছড়ার বড় মেম তখন আঁতুড়ঘরেই বাচ্চাটাকে নুন খাইয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেন এবং আরো জানা কথা, বেশীর ভাগ স্থলেই বাচ্চা ঘোঁত-ঘোঁত করে নুনটা খেয়ে ফেলে দিব্য ট্যাঁ-ট্যাঁ করে দুধের জন্য আপন ক্ষুধা জানিয়ে দেয়। তার কারণ বিষ্ণুছড়ার বড় মেম পাঁঠা কাটতে চান তাঁর পদমর্যাদার ভার দিয়ে—তিনি বড় মেম, মীরপুর ছোট মেম—আর মীরপুর কাটে ধার দিয়ে। তার উপর ক্লাবে ছোট মেমদের সংখ্যা বেশী, কাজেই তারা সদলবল সায় দেয় মীরপুরের কথায় কথায়—হায়, কার্লমার্কস্ যদি আণ্ডা-ঘরে একটা ঢুঁ মেরে যেতেন, তবে তিনি 'পতি বুর্জুয়াজী' আর 'অৎ বুর্জুয়াজী'র আড়াআড়ি সম্বন্ধে কত তত্ত্বকথা না রপ্ত করে যেতে পারতেন!

আবার বিষ্ণুছড়া যদি কোনো গুজোবের 'গড্‌মাদার' হন তবে সে বেচারীকে ষষ্ঠী-পূজোর দিন পর্যন্ত বাঁচতে হয় না।

মেব্‌লের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, তার সম্বন্ধে গুজোবটা বিষ্ণুছড়া ক্লাবে বাপ্তিস্ম করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই মীরপুর বললেন, এ গুজোব তাঁর কানে এসেছে বহুদিন হল। তিনি এটা একদম বিশ্বেস করেন নি। ও-রেলি বিপ্লবীদের পিছনে লেগেছে বলে নেটিভরা হিংসেয় এইসব আজগুবী যাচ্ছেতাই কেচ্ছা রটাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে কথা-কাটাকাটি হয়েছিল। সে ময়না তদন্তে মেব্‌লের গোপনতম অন্তবস্ত্রের সাইজ, রঙ কিছুই বাদ পড়ল না। সেদিন কিন্তু আরেকটু হলে মীরপুরই লড়াইয়ে হেরে যেতেন, কারণ দেখা গেল মেব্‌লের সৌন্দর্যে হিংসুটে খাটাসমুখোগুলো পাইকারী হিসেবে জুটেছে বিষ্ণুছড়ার পিছনে। আরেকটু হলে মীরপুরকে রণে ভঙ্গ দিতে হত, কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তার ফিফ্‌থ কলাম জুটে গেল, বিষ্ণুছড়ার বড়সায়েবের সাহায্যে।

এ-সব কেলেঙ্কারি-কোঁদল মেমেরা করে সায়েবদের বাদ দিয়ে। আজকের আলোচনা কিন্তু এতই তপ্ত-গরম হয়ে উঠেছিল যে, বিষ্ণুছড়ার বড় সাহেব যে কখন এসে একপাশে দাঁড়িয়েছেন কেউ লক্ষ্য করে নি।

হঠাৎ একসময় তাঁর স্ত্রীর কথা কেটে দিয়ে বললেন, 'শার্লট, তুমি যে

কথা বলছ সেটা কি খুব রুচিসঙ্গত ?'

তারপর আর পাঁচজনের দিকে একটুখানি বাও করে, 'আপনারা আমাকে মাফ করবেন', বলে আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেলেন।

সবাই থ। একে অন্যের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। বরঞ্চ যদি বিষ্ণুছড়া তাঁর খাণ্ডার মেমের কথার প্রতিবাদ না করে কোট-পাতলুন ফেলে দিয়ে আণ্ডাখেলার টেবিলের উপর ধেই-ধেই করে নেচে নেচে ধর্মসঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করতেন তবু আণ্ডা-ঘর এতখানি আশ্চর্য হত না, কারণ এ অঞ্চলে সবাই জানে, বিষ্ণুছড়া তাঁর মেমকে ডরান কুলীদের স্ট্রাইকের চেয়েও বেশী। তাঁর যে এতখানি দুঃসাহস হতে পারে সেকথা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। সবাই থ। না, থ নয়—একেবারে দ, ধ, দন্ত্য ন—বর্ণমালার শেষ হরফ পর্যন্ত।

সম্বিতে ফেরার পর মীরপুরের ছোট মেম ফিসফিস করে এস. ডি. ও'র মেমকে বললেন, 'নিশ্চয়ই এক জালা হুইস্কি খেয়েছে, বাঘের চর্বির সঙ্গে ককটেল বানিয়ে।'

এস. ডি. ও'র মেমের সুরসিকারূপে খ্যাতি ছিল। ক্লাব থেকে বেরতে বেরতে বললেন, 'হ্যাঁ, একটা ছবিতে দেখেছিলুম, হুইস্কির পিঁপে থেকে ছ্যাদা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা হুইস্কি চুইয়ে বেরচ্ছে। এক ইঁদুরছানা সেইটে চুকচুক করে চুষে হয়ে গিয়েছে বেহেড মাতাল। লাফ দিয়ে পিঁপের উপর উঠে আস্তিন গুটিয়ে চিৎকার করে বলছে, 'ঐ ড্যাম্ ক্যাটটা গেল কোথায় ? নিয়ে এসো এইখেনে —আমি ব্যাটার সঙ্গে লড়ব।'

মীরপুর বললেন, 'ভালো গল্প ; টম্‌কে বললে হবে। আপিসের কাউকে ডিসমিস করতে হলে সে সেই সাতসকাল ছটার সময় হুইস্কি খেয়ে আপিস যায়।'

এস. ডি. ও-মেম বললেন, 'আজ রাত্রে বেচারা পার্সির ডিনার জুটবে না। ওকে "পট-লাকে" নেমন্তন্ন করলে হয় না ?' হঠাৎ কথা বন্ধ করে বললেন, 'ঐ দেখো, পার্সিকে ফেলে বেটি মোটর হাঁকিয়ে বাড়ি রওয়ানা হয়েছে। এই বয়সে পার্সি বেচারার কী করে টাক হল বুঝতে কষ্ট হয় না। তালুতে যে কুল্লে আড়াইখানা চুল আছে সেগুলোও আজ রাত্রে ছেঁড়া যাবে।'

মীরপুর ততক্ষণে আপন ভাবনায় ডুব দিয়েছেন। গুজোবটা তিনি বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু এই যে বিষ্ণুপুরের বড় সায়েব জিনিসটাকে এত সিরিয়সলি নিলে যে মেমকে পর্যন্ত ধমক দিলে—তবে কি ?—কে জানে ?

'গুড্ নাইট !'

'গুড্ নাইট !'

॥ ৮ ॥

কিষ্ণুছড়া আগুা-ঘরে গুজোবটার উপর যে বম্‌-শেল ফাটিয়েছিলেন তার ধুঁয়ো কাটতে কাটতে কেটে গেল পুরো তিনটি মাস। তাঁর সাহসকে পুরস্কার দেবার জন্যই বোধ করি গুজোবটাকে মৃতের প্রতি সম্মান দেখানো হল—সায়েবের উপর চটে গিয়ে বিষ্ণুছড়ার মেমও হপ্তা-তিনেক ক্লাবে হাজিরা দেন নি—ও নিয়ে বহুদিন ক্লাবে আর কোনো আলোচনা হল না। আর যত বড় রগরগে খবর কিংবা পরনিন্দা, পরচর্চাই হোক—মানুষ এক জিনিস নিয়ে বেশীদিন লেগে থাকতে পারে না। পারলে কোনো ছেলেই পরীক্ষায় ফেল হত না, কোনো আবিষ্কারই অনাবিষ্কৃত হয়ে থাকত না। ইংরেজিতে এই মনোবৃত্তিরই নাম, 'গ্রাসহপার মাইণ্ড', প্রতি মুহূর্তে হেথায় লম্ফ, হোথায় ঝম্প। ইতিমধ্যে আবার লাকাউড়া বাগিচায় একটা খুন হয়ে গেল। কুলি-সর্দারের ডপকা বউ—'মিস্ লাকাউড়া' –ডিস্পেনসারির কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে ইয়ার্কি-ফাজলামো করছিল বলে সে তার গলাটি কেটে, গামছায় বেঁধে থানায় নিয়ে গিয়ে স্বহস্তে পেশ করেছে। পথে পড়ে চ্যাঙের খাল, তার সাঁকোতে এক-এক পয়সা করে 'পোল্' ট্যাক্স দিতে হয়। সর্দারকে বাধা দিতে সে বললে, সরকারী কাজে থানায় যাচ্ছে, তার ট্যাক্সো লাগবে না!

'কি সরকারী কাজ?'

সর্দার গামছা খুলে মুণ্ডুটা দেখালে। সবাই নাকি দেখামাত্র পরিত্রাহি চিৎকার করে চুঙ্গীঘরের দরজায় হুড়কো মেরে জানালা দিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'তুই শিগগির যা, তোর ট্যাক্সো লাগবে না, এ সত্যই বড্ড জরুরী সরকারী কাজ!'

সর্দার নাকি এদের ভয় দেখে একটুখানি তাজ্জব বেনে গিয়েছিল। ধীরে সুস্থে মুণ্ডুটা ফের গামছায় বেঁধে হেলেদুলে থানার দিকে রওনা দিয়েছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট মরতুজা সায়েবের এজলাসে যখন সর্দার দাঁড়ালে তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই মেয়েটাকে খুন করতে গেলি কেন?'

সর্দার বললে, 'করব না? বেটি আমাকে বললে, "দেখ্ সর্দার, আমার উপর তুই যদি চটে গিয়ে থাকিস তবে আর কোনো মেয়েছেলেকে নে না, এই দুনিয়াতে আমিই তো একহ-ই-ঠো লড়কী নই! আর তোকে যদি আমার ভালো না লাগে তবে তুইও তো একহ-ই-ঠো মর্দ নস; তুই বেছে নে তোর-ঠো, আমি বেছে নিই হমার-ঠো।" ঐসী বেতমীজ? হারামজাদী আমার মুখের উপর এইরকম বেশরম বাত বললে। তাকে খুন করে আমি সরকারী কাম করেছি হুজুর। আমাকে এরা বেহক্ হাজতে পুরে রেখেছে, আপনিই বলুন হুজুর।'

ম্যাজিস্ট্রেট সর্দারকে দায়রায় সোপর্দ করার সময় সরকারী উকিলের দিকে

তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'দেয়ার ইজ এ লট্ অব ট্রুথ ইন ওয়াট দি গার্ল সেড! ঐ খাঁটি কথাটি মেনে নিলে পৃথিবীতে খুনের সংখ্যা অনেক কমে যেত।'

এই নিয়ে ক্লাব মেতে রইল খুনের খবর পৌঁছনোর থেকে সর্দারকে চোদ্দ বছর জেল পর্যন্ত। তারপর এই লাকাউড়া বাগিচার ছোট সায়েব করলে আত্মহত্যা। কেন করল তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। কেউ বললে, দেশে যে মেমসায়েবের সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকাপাকি ছিল সে নাকি আর কারো সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছে, কেউ বলে, সায়েব যে এদিকে এক কুলী-রমণীর কৃষ্ণালিঙ্গনে চব্বিশ ঘণ্টা চুর হয়ে থাকত সেই খবর শুনে সে রমণী অন্য পুরুষ খুঁজে নিয়েছে, কেউ বললে, তিনমাসব্যাপী ঝাড়া বাদলের ঠেলায় টিলার নির্জন বাসে খেপে খিয়ে মদ ধরে—তাও আবার কুলীদের ধান্যেশ্বরী—তারপর দিবা-রাত্তিরে সে মদের নেশায় ছ-ঠ্যাঙওলা বাঘের দিকে সে অনবরত গুলি ছুঁড়তে থাকে, শেষটায় বাঘ নাকি তার মাথার ভিতর ঢুকে যায়, চিৎকার করে সেই ফরিয়াদ জানাতে জানাতে একদিন সেই বাঘকে আপন কানের ভিতর দিয়ে পিস্তলের গুলি চালিয়ে খুন করে।

ততদিন ও-রেলিদের কথা প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে। ক্লাব যখন গুজোবের তাড়িতে মত্ত তখন ও-রেলিদের বংশধর জন্মের খবর পৌঁছল পানসে শরবতের মতো। কেউ সামান্য চাখলে, অর্থাৎ জিজ্ঞেস করলে, তাই নাকি, কবে হল? কেউ সামান্য ভুরু কোঁচকালে। মুরুব্বীরা বললেন, 'ভালোই হয়েছে, বাচ্চাই অনেক সময় বাপ-মায়ের মাঝে সেতু হয়ে দুজনাকে এক করে দেয়।'

শুধু বিষ্ণুছড়ার মেম বাঁকা হাসি হেসেছিলেন।

'সে হাসির অর্থ বলা শক্ত কারণ এটা ব্যক্ত'—দু জাহাজের মাঝখানে তক্তা পেতে যেমন এ-জাহাজে ও-জাহাজে জোড়া লাগানো যায়, ঠিক তেমনি ঐ তক্তা তুলে ধাক্কা মেরে দু-নৌকোর মাঝখানের দূরত্ব বাড়িয়েও দেওয়া যায়।

পয়লা বাচ্চার বাপ্তিস্ম করার সময় ক্যাথলিকরা ধুমধাড়াক্কা করে বাঙালী ঠাকুরদার পয়লা নাতির অন্নপ্রাশনের চেয়েও বেশী। মেব্‌ল্ কিন্তু সব-কিছু সারতে চেয়েছিল সাদামাটাভাবে। ও-রেলি দেখা গেল ঠাকুরদা-গোত্রের। সে চায় পালা-পরব করতে। ওদিকে পাদ্রী জোনস্ সাহেব প্রটেস্টানট্—তিনি ক্যাথলিকের বাচ্চাকে বাপ্তিস্ম করবেন কী করে? এ যেন পাঁড় বোষ্টমের ছেলেকে শাক্ত দিচ্ছে মন্ত্রদীক্ষা—শ্মশানে মড়ার উপর মুখোমুখি বসে মড়ার খুলিতে কারণ-ভর্তি-হাতে! ও-রেলি কিন্তু জোনস্‌কেই অনুরোধ করলে বাপ্তিস্মের তাবৎ ব্যবস্থা করতে।

গড্-ফাদার অর্থাৎ ধর্মপিতার অভাব মধুগঞ্জে হত না। মাদামপুরের বড় সায়েব, ডি. এম , যে-কেউ আনন্দের সঙ্গে রাজী হতেন, 'পুয়োর ডেভিল—বেচারা! একলা-একলি মনমরা হয়ে থাকে, ঐটুকুতে যদি সে খুশি হয় তবে হোয়াই নট্—নিশ্চয়ই—অফ কোর্স—অবশ্যি, অতি অবশ্যি।' কিন্তু ওদিকে দেখা গেল, ও-রেলি পাঁড় ক্যাথলিক। ক্যাথলিক বাচ্চার গড-ফাদার হবে প্রটেস্টানট্! মন্ত্র যে খুশি পড়াক, বাপ্তিস্ম যে খুশি করুক, সে তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার; কিন্তু ধর্মবাপ তামাম জীবনের। সেখানে প্রটেস্টানট্ হলে চলবে কেন? কলমা যে খুশি পড়াক, কিন্তু মুরশীদ ধরার সময় দেখে-বেছে নিতে হয়।

ও-রেলি পরিবার বাদ দিলে মধুগঞ্জে আছে মাত্র একজন ক্যাথলিক—বাটলার জয়সূর্য। ও-রেলিদের মতই একেবারে খাঁটি। ও-রেলি বললে, সেই হবে ধর্মবাপ। শুনে পাদ্রী সায়েব পর্যন্ত অনেক 'যদি' অনেক 'কিন্তু' অনেক 'ইউ নো হোয়াট আই মিন' অনেক 'বাট অফ কোর্স' বলে ইতি-উতি করে মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলেন, এমন কি, কলকাতা থেকে তাঁর পরিচিত ভদ্র ক্যাথলিক আনাবার ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু ও-রেলি একদম নেই-আঁকড়া,—বলে ধর্মের চোখে সব ক্যাথলিকই বরাবর—পোপ যা, জয়সূর্যও তা।

ও-রেলির কথার কোনো জমা-খরচ পাওয়া গেল না। বাপ্তিস্মের বেলায় সে দিলদরিয়া—হেরেটিক প্রটেস্টানট্ই সই, অথচ ধর্মবাপের বেলা সে কট্টর—ক্যাথলিক না হলে জর্ডনের জল অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তখন 'বিদেশী ঠাকুর ছেড়ে দেশের কুকুর'। ওদের ভাষায় বলতে হলে 'মাই রিলিজিয়ন রাইট অর রঙ্, মাই মাদার—ড্রাঙ্ক অর সোবার।'

হ্যাঁ, 'ড্রাঙ্ক অর সোবার' কথাটা ওঠাতে ভালই হল। জয়সূর্য পৃথিবীর আর পাঁচ লক্ষ বাটলারের মতো অধিকাংশ সময়ই থাকে ড্রাঙ্ক আর সোবারের মাঝখানে। আর মোকা পেলেই গুত্তা খেয়ে ড্রাঙ্কের দিকেই কাত। অবশ্য তাকে গড্-ফাদার হতে হবে শুনে তন্মুহূর্তেই বেচারার নেশা কেটে গিয়েছিল। গবেটের মত বিড়বিড় করে কী একটা বলতে গিয়ে খেল ও-রেলির ধমক আর কড়া তম্বি,—অন্তত পরবের দিনটায় যেন সে সাদা চোখে গির্জায় যায়।

সে এক বিচিত্র বাপ্তিস্ম। মেব্‌ল্ দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে অল্প অল্প কাঁপছে, ও-রেলি পাথরের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে, পাদ্রী সায়েব নার্ভাস আর জয়সূর্য তার বরাবরের গির্জের পোশাক পরে বিহ্বলের মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সবাই ভাবলে, ব্যাটা আজ টেনে এসেছে।

একমাত্র সোমই ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছুর তদারক করলে। পাদ্রী-টিলার

মেয়েদের বেশীর ভাগই জয়সূর্য জাতের—পরবের উৎকট দিকটা শুধু তাদেরই চোখে ধরা পড়ল না।

বাপ্তিস্মের পরই কিন্তু গির্জে থেকে বেরিয়ে জয়সূর্য না-পাত্তা। সন্ধ্যের সময় সোম তাকে খুঁজে বের করল উজান গাঙের ঘাটে বাঁধা এক নৌকোর ভিতর। দু'বোতল ধান্যেশ্বরী শেষ করে বুঁদ হয়ে বসে আছে।

সব খবরই আণ্ডা-ঘরে পৌঁছল।

বিষ্ণুছড়ার মেম বললেন, 'ডিসগ্রেসফুল!'

মাদামপুর তাঁর অন্তরঙ্গজনকে বললেন, 'থাক! এবার থেকে ওদের আর একদম ঘেঁটিও না। কাট দেম একদম ডেড। কী যে হল, কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি নে।'

দিশী কথায় বলে, ঐ বুঝলেই তো পাগল সারে।

॥ ৯ ॥

মুসলমান শাস্ত্রে বর্ণনা আছে, লাশ গোর দিয়ে লোকজন চলে আসার পর গোরের ভিতর কী কাণ্ড-কারখানা হয়।

কুরানে স্পষ্ট বলা আছে, ইয়োম্-উল্-কিয়ামত—অর্থাৎ প্রলয়ের দিন সবাইকে আল্লাতালার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তিনি তখন সকলের বিচার করে ধার্মিককে পাঠাবেন স্বর্গে আর পাপীকে নরকে। এখন প্রশ্ন, কিয়ামত কবে হবে তার তো কোনো হদিস পাওয়া যায় না, এই মুহূর্তেই হতে পারে আবার এক কোটি বৎসর পরেও হতে পারে—ততদিন অবধি গোরের ভিতর মরাদের কী গতি হয়?

কুরান নয়—অন্য শাস্ত্রে বলেন,—গোর দিয়ে আত্মীয়স্বজন চল্লিশ পা চলে আসার পর দুই ফিরিস্তা—দেবদূত গোরের ভিতর ঢুকে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তার ইমান (ধর্মমত) কী? সে যদি খাঁটি মুসলমান হয় তবে তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, 'আল্লা এক, আর মুহম্মদ সাহেব তাঁর প্রেরিত পুরুষ।' ফিরিস্তারা উত্তর শুনে খুশি হয়ে বলেন, 'তোমার ইমান ঠিক, কিন্তু এখনো তো কিয়ামতের কিছু দেরি আছে। ততক্ষণ অবধি এই নাও এক গাছা তসবী, আল্লার নাম স্মরণ করো।' তারপর শাস্ত্র বলেন, লোকটি খুশি হয়ে তসবী হাতে নিতেই তার সুতোটি ছিঁড়ে গিয়ে তসবীর দানাগুলো কবরময় ছড়িয়ে পড়বে। সে তখন ব্যস্ত হয়ে দানাগুলো কুড়োতে না কুড়োতে দেখবে, কিয়ামতের শিঙে ফুঁকে

উঠেছে—ছুটে গিয়ে আল্লার সামনে দাঁড়াবে আর-সকলের সঙ্গে সারি বেঁধে।

আর যদি সে পাপাত্মা হয় তবে সে ইমান বলতে পারবে না। ফিরিস্তারা তখন তাকে ধনুরীরা যেমন তুলোর ভিতর যন্ত্র চালিয়ে দেয় ঠিক তেমনি তার সর্বসত্তা ছিন্নভিন্ন করে দেবেন—তুলোর মতো সে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে পড়বে। আবার সব কটা টুকরো জুড়ে দিয়ে ফিরিস্তারা আবার ঐ প্রক্রিয়া চালাবেন। পাপীর মনে হবে, এ যন্ত্রণা যেন যুগ যুগ ধরে চলছে।

অথচ পুণ্যাত্মা হয়তো মরেছিল কিয়ামতের এক লক্ষ বৎসর পূর্বে; পাপাত্মা মরেছিল কিয়ামতের এক সেকেণ্ড আগে।

অর্থাৎ পুণ্যাত্মার বেলা আল্লা এক লক্ষ বৎসরকে তার চৈতন্যের ভিতর এক সেকেণ্ডে পরিণত করে দেবেন আর পাপাত্মার বেলা এক সেকেণ্ডকে লক্ষাধিক বৎসরে।

আজকের দিনের ভাষায় তুলনা দিতে বলা যেতে পারে পুণ্যাত্মার বেলা যেন তিন মিনিটের রেকর্ডের গতিবেগ বাড়িয়ে এক সেকেণ্ডে বাজিয়ে দেওয়া হল, পাপাত্মার বেলায় সেই রেকর্ডই বাজানো হল এক ঘণ্টা ধরে।

তাই বোধহয়, হিন্দু পুরাণেও আছে, নরের এক লক্ষ বৎসরে ব্রহ্মার এক মুহূর্ত।

কিন্তু এ কি শুধু মৃত্যুর পরই? জীবিত অবস্থায়ও তো ঐ-ই। মিলনের শত বৎসর মনে হয় এক মুহূর্ত, আর 'ক্ষণেক আড়ালে বারেক দাঁড়ালে' মনে হয় 'লাখ লাখ যুগ' ধরে সে যেন কোন্ সুদূরে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে।

'মোতির মালা' গল্পে তাই দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের দুঃখ-দুর্দৈবের বর্ণনা মোপাসাঁ দিয়েছেন দশ ছত্রে আর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত খুনীর তিনদিন মেয়াদের বর্ণনা দিয়েছেন য়্যুগো পুরো একখানা কেতাব লিখে।

বাপ্তিস্ম-পরবের পর চার বৎসর কেটে গিয়েছে। এ চার বৎসর মেব্‌ল্ ডেভিডের কেটেছে তসবীর দানা কুড়োতে কুড়োতে না তুলো-ধুনো হয়ে হয়ে—তার খবর দেবে কে? কাজল-ধারা নদীর মত নিরবধি তাদের জীবনগতি সমুখ পানে ধেয়ে চলেছিল, না সামনের নীলপাথরী পাহাড়ের মত স্থাণু হয়ে পড়েছিল তাই বা বলবে কে? মধুগঞ্জ শুধু দেখল, যে বারান্দায় সায়েব আর মেম বসে থাকত, বাটলার রেকর্ডের পর রেকর্ড বদলে যেত সেখানে একটি চতুর্থ প্রাণী প্রথম দোলনায় শুয়ে তারপর পেরেম্বুলেটারে বসে এবং সর্বশেষে টলমল হয়ে হেঁটে হেঁটে বারান্দাটাকে চঞ্চল করে তুলল। যেখানে আর দুটি প্রাণী—জয়সূর্যকে ধরলে কখনো বা তিনটি—আপন আপন আসনে ধ্যানমগ্ন,

সেখানে এই নূতন প্রাণীটির আনাগোনার অন্ত নেই। কখনো সে মেব্‌লের কোলে মাথা গুঁজে দুটি খুদে হাত দিয়ে উরু জড়িয়ে ধরে, মেব্‌ল্ তার কালো চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালিয়ে দেয়, কখনো সে ডেভিডের আস্তিন ধরে টানাটানি আরম্ভ করে, তখন সে তার দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আর কখনো বা জয়সূর্যের গলা জড়িয়ে ধরে তার-ই কাছ থেকে শেখা গান ধরত—

'কৃ-কৃ-কৃ-কেটি, হুয়েন দি ম্-ম্-মুন শাইনস্—'

একমাত্র ওরই জীবনে এখনো তসবী, ধুনুরী কেউই আসে নি। 'সময়' কী বস্তু সে এখনো বোঝে নি—টেকোর ভয় নেই উকুনের।

বাচ্চা প্যাট্রিকের চতুর্থ জন্মদিনে ও-রেলিরা স্থির করলে, মেব্‌ল্ বাচ্চাকে নিয়ে বিলেত চলে যাবে, সেখানে বাসা বেঁধে তার পড়াশোনার ব্যবস্থা করবে। মধুগঞ্জের ইস্কুল দিশীর কাছে অক্সফোর্ড-সম হতে পারে, কিন্তু সায়েবের বাচ্চা যদি সেখানে ট্যাঁশ উচ্চারণ শেখে তবেই চিত্তির! বড় হয়ে সে বাপ মাকে প্রতি সন্ধ্যায় অভিসম্পাত না দিয়ে হুইস্কি-সোডা স্পর্শ করবে না, সে যে ইয়োরেশিয়ান নয়, সেকথা বোঝাতে গিয়ে গলদঘর্ম হতে হবে, বোঝাবার মোকা না পেলে সেই ঘর্মে ডুবে মরতে হবে।

টমাস কুক্, অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস, আর দুনিয়ার যত জাহাজ কোম্পানির ছবির বিজ্ঞাপন, চটি বই, জাহাজের টাইম-টেবলে ও-রেলির বারান্দা ভরতি হয়ে গেল। হিন্দীতে বলে:

'বাঘ কা ভাই বাঘেরা
কুদে পাঁচ তো কুদে তেরা'

'বাঘ যদি দেয় পাঁচ লম্ফ, তবে তার ভাই বাঘেরা মারে তেরোটা।' বাঙলায় প্রবাদ 'ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে।' অর্থাৎ যাত্রী যদি কোম্পানিকে লেখে আমি লণ্ডন যাব, তবে তারা যে শুধু ঐ জাহাজেরই খবরওয়ালা চটি বইই পাঠায় তাই নয়, সঙ্গে পাঠায় আরেক হন্দর 'পথিক-দিক্-দর্শন'—তাতে আছে নরওয়ের ফিয়োর্ডে যেতে হলে কোন্ জামা-কাপড় অপরিহার্য, মধ্য আফ্রিকায় উট চড়তে হলে আগে-ভাগে ইনকোলেশন নিতে হয় কি না। ফলে সেই পর্বত-প্রমাণ কাগজপত্রের মাঝখানে বিলাতগামী জাহাজের বিশল্যকরণী খুঁজে বের করা হনুমানের—অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। ও-রেলি সেই অষ্টাদশ পর্বে উদয়াস্ত ডুব মেরে পড়ে রইল।

সোম এসেছিল একদিন সরকারী কাজে। কাগজপত্রের ডাঁই দেখে

শুধালে, 'স্যার, গুষ্টিসুদ্ধ নর্থপোলে চললেন নাকি? এর চেয়ে অল্প দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে তো মঙ্গল কিংবা শনিতে ভ্রমণ করে আসা যায়।'

ও-রেলি এক তাড়া কাগজ সোমের দিকে ছুঁড়ে ফেলে বললে, 'মঙ্গল-শনির কথা বলতে পারি নে, কিন্তু নর্থপোলে যেতে হলে এ-সবের দরকার হয় না। সেখানে যাবার জন্যে কোনো স্টীমার-সার্ভিস নেই—আস্ত জাহাজ চার্টার করতে হয়। এখানে ঠিক তার উল্‌টো। কত সব অল্‌টারনেটিভ দেখো। বোম্বাই থেকে জাহাজ ধরবে, না কলম্ব থেকে কিংবা মাদ্রাজ থেকে? পি. এণ্ড. ও. নেবে, না মার্কিন জাহাজ, না জর্মন? ফরাসীও নিতে পারো—জাহাজগুলো বড্ড নোংরা, কিন্তু রান্না ভারী চমৎকার। তুমি কি একটা প্রবাদ বলো না, দি ডোম ইজ্‌ ব্লাইণ্ড ইন দি ব্যাম্বু-জাঙ্গল্‌? আমার হয়েছে তাই।'

বহুকাল পরে সায়েবের তাজা-দিল দেখে সোম খুশি হল। বললে, 'তাহলে সায়েব, অত্র ভক্ষ্য ধনুর্গুণ—ইট্‌ দি বো স্ট্রিং টুডে—অর্থাৎ সবচেয়ে সস্তা জাহাজ নিলেই হয়।'

ও-রেলি বললে, 'দেখো সোম, আমাকে আর ধাপ্পা দেবার চেষ্টা কোরো না। গোড়ার দিকে কিছু জানতুম না বলে তুমি তোমার আপন মাল গুড্‌ ওল্ড ইণ্ডিয়ান উইজডম্‌ বলে পাচার করেছ বিস্তর। এখন আর সেটি চলছে না। আমার পন্‌চা-টান্‌ট্রা, হিটোপ্‌ডেস পড়া হয়ে গিয়েছে। ধনুর ছিলে খেতে গিয়ে তোমার ঐ শেয়ালের কী হয়েছিল মনে আছে?'

সোম ইস্কুলের ছেলেদের ভঙ্গীতে তড়াক করে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'খুব মনে আছে, স্যর! ছিলে ছিঁড়ে গিয়েছিল। তা যাবে না? আপনারাই তো বলেন, "ডিম না ভেঙে মমলেট বানানো যায় না"।'

ও-রেলি বললে, 'ডিম দিয়ে মামলেড্‌ কী করে হয় হে? মামলেড্‌ তো হয় কমলালেবুর খোসা দিয়ে।'

'আজ্ঞে মামলেড্‌ নয়, মমলেট?'

'ও! অমলেট!'

'আজ্ঞে না। অমলেট হয় বিলেতে, বিলিতি ডিম দিয়ে। দিশী ডিমে হয় মমলেট। তা যখন মামলেড্‌ মমলেটের কথাই উঠল, ওসব তৈরি করেন মেয়েরা। জাহাজ বাছাইয়ের ভার মেমসাহেবের হাতে ছেড়ে দিলে হয় না?'

ও-রেলির মুখ কঠিন হল। সোমের দৃষ্টি এড়াল না।

সুরসিক যদি বদমেজাজী আর খামখেয়ালী হয়, তবে তাকে নিয়ে বড় বিপদ। যন্ত্র চট করে বেসুরো হয়ে যায় আর তার বিকৃত স্বর সব-কিছু বরবাদ করে দেয়।

ও-রেলির 'হুঁঃ' বীণাবাদ্যের মাঝখানে প্যাঁচার কণ্ঠের মত শোনাল।

সোম বুঝলে, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে ঢোঁড়া বেরিয়েছে। এইখানেই থামা উচিত, না হলে হয়তো কেউটে বেরুবে। কিন্তু হঠাৎ থেমে গিয়ে বিদায় নিলে সেটা হবে আরো বেতালা। একটুখানি ইতি-উতি করে শুধালে, 'আপনি পোর্টে ওদের সী অফ্ করতে যাচ্ছেন তো?'

ও-রেলি বললে, 'না।'

তারপর একটু ভেবে নিয়ে, জিজ্ঞেস না করা সত্ত্বেও বললে, 'বাটলার পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে সে দেশে যাবে। অনেককাল ছুটি নেয় নি বলছিল।'

কণ্ঠে কিন্তু বিরক্তির সুর।

সোম না হয়ে আর কোনো নেটিভ হলে ভাবত, এই সাদামুখগুলোর মতিগতি বোঝা ভার, কিন্তু সোম মেলা ইংরেজ চরিয়েছে। সে অত সহজ সমাধানে সন্তুষ্ট নয়। বড় ভারী মন নিয়ে সোম বাড়ি ফিরল। ও-রেলিকে সে সত্যই ভালোবেসে ফেলেছিল।

'সোনামুগ সরু চাল সুপারি ও পান
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি ; কিছু ঝুনা নারিকেল
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল—'

এই সব পর্বতপ্রমাণ মালপত্র নিয়ে আমরা সফরে বেরুই, আর সায়েবরা কিরকম মাত্র একটা সুটকেস হাতে নিয়েই গটমট করে গাড়িতে ওঠে, তাই দেখে বাঙালীর ভারি ঈর্ষা হয়। কিন্তু ঐ সুটকেসটির ভিতরকার মালপত্র তৈরি করতে গিয়ে সায়েবদেরও হিমসিম খেতে হয়। মোকামে পৌঁছনোর পর বাঙালী যদি দেখে ধুতির অনটন তাহলে সে কারো কাছ থেকে ও জিনিসটি ধার নিয়ে পরতে পায়—এমনকি কুর্তাতেও খুব বেশী আটকায় না—কিন্তু সায়েবরা কোট-পাতলুন ধার নিয়ে পরতে পারে না, ফিট হল কি না সেটা মারাত্মক প্রশ্ন।

মেব্‌লকে তাই বাচ্চার কাপড়-জামা তৈরি করতে বেশ বেগ পেতে হল। ভূমধ্যসাগর অবধি আবহাওয়া গরম, মধুগঞ্জের জামাকাপড়েই চলবে। কিন্তু তার পরের জন্য যে গরম জিনিসের প্রয়োজন, সে তো মধুগঞ্জে পাওয়া যায় না। তাই ফ্লানেল, সার্জ, টুইড আনাতে হল শিলঙ থেকে, আর আনাতে হল শহরের বুড়ো খলিফাকে। তাই নিয়ে পড়ে রইল মেব্‌ল্ দিনের পর দিন, আর ও-রেলি বাক্স-সুটকেস-হ্যাটকেসে সাঁটতে লাগল জাহাজের

লেবেল। যে বাক্স যাবে কেবিনে তার এক রঙ, যেটা যাবে স্টোররুমে তার অন্য রঙ এবং যেটা হাতে থাকবে তার জন্য কোনো লেবেলের প্রয়োজন নেই। এই রামধনুর রঙের প্যাঁচে ও-রেলি তো একবার মতিচ্ছন্ন হয়ে বাচ্চার পিঠে লেবেল লাগিয়েছিল আর কি!

বিদায়ের আগের সন্ধ্যায় জিনিসপত্র সব ফিটফাট ছিমছাম হল। পরদিন ভোর ছ'টায় ও-রেলি মোটর হাঁকিয়ে সবাইকে কুড়ি মাইল দূরে স্টেশনে পৌঁছিয়ে দেবে। চাকর-বাকরদের বললে তারা যেন বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে, কারণ পরদিন ভোরেবেলা এসে মালপত্র ওঠাতে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন। কম্পাউণ্ডে রইল শুধু বাটলার—অন্য চাকর-বাকরদের সেখানে রাত্রিবাসের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

পরদিন ভোরের দিকে বৃষ্টি হল। চাকর-বাকরেরা কোনোগতিকে ছ'টায় বাঙলো পৌঁছে দেখে সবাই চলে গিয়েছে—গারাজ খালি, বাড়ি তালাবন্ধ। ও-রেলি সায়েবের সব-কুছ তড়িঘড়ি, ঝটপট, কাঁটায় কাঁটায়। চাকরেরা আন্দাজ করলে সামান্য পাঁচ মিনিট দেরিতে আসার জন্য তাদের একটুখানি বকুনি খেতে হবে।

সায়েব ফিরল বেশ বেলা গড়িয়ে যাবার পর। আরদালি আসমৎউল্লা সায়েবের জন্য দুখানা কাটলিস আর আলুসেদ্ধ করে রেখেছিল, কিন্তু সে কিছু না খেয়ে সোজা দোতলায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সব-কিছু শুনে রায়বাহাদুর কাশীশ্বর চক্রবর্তী বললেন, 'আহা, বেচারা, এবারে একদম একা পড়ে গেল।'

তাঁর জুনিয়র তালেবুর রহমান বললেন, 'আমি ভাবছি অন্য কথা। বাচ্চাটা বিলেত গেল বাঘ হয়ে ফিরে আসবার জন্য। তখন লাগাবে নেটিভদের উপর জোর ডাণ্ডা। এ-মুল্লুকে থাকলে তাদের তরে দরদী হয়ে যেত, ছাতির খুন ঠাণ্ডা আর দিলেও মোলায়েম মেরে যেত।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'সে কী কথা! ও-রেলির মত ভদ্রলোকের ছেলে কি কখনো বৈরীভাব নিতে পারে? কী বলো সোম?'

সোম বললে, 'আপনার ছেলের বিলেত যাওয়ার কী হল?'

রায়বাহাদুর বললেন, 'জানেন ব্রাহ্মণী?'

তালেবুর রহমান বললেন, 'সোম ভাবে সে একটা মস্ত ঘড়েল।'

ক্লাবে হল অন্য প্রতিক্রিয়া। প্রায় সবাই বললে, 'গেছে গেছে, আপদ গেছে। কেলেঙ্কারিটা তো চাপা পড়ল। এখন ক্লাবের ছেলে ও-রেলি ক্লাবে

ফিরে এলেই হয়।'

কিন্তু আরেকটি বৎসর কেটে গেল। ও-রেলি ক্লাবে এল না।

॥ ১০ ॥

বাড়ির সামনে জ্যোতিষ্মান এবং অন্ধকারে মানুষের তৃতীয় চক্ষুস্বরূপ ল্যাম্প-পোস্টটা সম্বন্ধেই যখন সে দুদিন বাদেই অচেতন হয়ে যায়, তখন অদৃশ্য ও-রেলিকে ক্লাব যে ভুলে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে! কিন্তু যেদিন খবর এল ও-রেলি মধুগঞ্জ থেকে বদলি হয়ে গিয়েছে, সেদিন ক্লাবে তার সম্বন্ধে আর-এক প্রস্ত আলোচনা করে নিলে।

মাদামপুর আর বিষ্ণুছড়াই প্রথম খবর পেলেন ডি. এম-এর কাছ থেকে।

মাদামপুর বললেন, 'ভালোই হল। যাচ্ছে কক্সবাজার না কোথায়, সেখানে কেলেঙ্কারিটা হয়তো পৌঁছয় নি এবং পৌঁছলেও সেটা বাসি হয়ে গিয়েছে। ওখানে গিয়ে হয়তো পুয়োর ডেভিল আবার নর্মাল লাইফে ফিরে আসতে পারবে। আমি সত্যি তাকে বড্ড মিস করতুম।'

বিষ্ণুছড়া চুপ করে রইলেন, ভালো মন্দ কিছু বললেন না।

মাদামপুর শুধালেন, 'কী হে, চুপ করে রইলে যে? হুইস্কি চড়েছে নাকি?'

বিষ্ণুছড়া বললেন, 'সাতটা ছোটায়? আই লাইক দ্যাট—আপনিও যেমন!' তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে খাড়া হয়ে বসে বললেন, 'আমি সে কথা ভাবছি নে। আমার কানে এসে সেদিন পৌঁছল, মেব্‌ল্‌রা নাকি আদপেই ইংলণ্ড পৌঁছয় নি।'

মাদামপুর বললেন, 'আমিও শুনেছি, কিন্তু তারা পৌঁছল কি না তার খবর দেবে কে? মেব্‌লের সঙ্গে ক্লাবের কারো তো এমন দহরম-মহরম ছিল না যে, বন্দর বন্দর থেকে পিকচার-পোস্ট-কার্ড পাঠাবে আর লণ্ডন পৌঁছে কেব্‌ল্‌। মোকামে পৌঁছে প্রতি মেলে স্কার্ফ, সুয়েটার আর গরম মোজা, প্যোর স্কটিশ উলে তৈরী! হোম মেড!'

বিষ্ণুছড়া বুঝলেন, সায়েবের একটু চড়েছে—বয়স রয়েছে কি না, অল্পেই একটু কেমন যেন হয়ে যান—না হলে স্কার্ফ, সুয়েটারের কথা বলবেন কেন? ও বস্তু মধুগঞ্জে পরবে কে? সাদা চোখে এ ভুলটা করতেন না, হয়তো বলতেন টিনের বেকন, সার্ডিন। চেপে গিয়ে বললেন, 'কলকাতার ও. শী-র সঙ্গে নর্থ ক্লাবে দেখা হয়েছিল, সে বললে, মেব্‌ল্‌ আর তার বাচ্চাকে সে মাস তিনেক আগে দেখেছে মসুরিতে, সঙ্গে ছিল ও-রেলি। তোমার মনে আছে কি না জানি নে,

ও-রেলি তখন ছুটি নিয়ে মসুরি গিয়েছিল।

এবারে মাদামপুর হা হা করে হেসে উঠলেন, 'কে বলেছে ? ও. শী. ? কটা মেব্‌ল্ আর কটা ডেভিড্ দেখেছিল জিজ্ঞেস করো নি ? ও তো সকালে খায় কড়া হর্স-নেক, দুপুরে জিন, সন্ধ্যায় রম্ আর রাত্রে হুইস্কি। সন্ধ্যায় দেখে থাকলে নিশ্চয়ই দুটো, আর রাত্রে দেখে থাকলে চারটে ও-রেলি দেখেছে। কটা মসুরি দেখেছে সেকথা জিজ্ঞেস করেছিলে কি ?'

বিষ্ণুছড়া বুঝলেন, এখন আর কথা-কাটাকাটি করে কোনো লাভ নেই। তাই বললেন, 'সোমও বলছিল মেব্‌ল্‌রা লণ্ডনে আছে।'

মাদামপুর আশ্চর্য হয়ে শুধালেন, 'সোম বললে ? আশ্চর্য! ও তো কখনো কোনো খবর কাউকে দেয় না। মধুগঞ্জের বানান জিজ্ঞেস করলে ভাবখানা করে যেন সরকারী টপ সিক্রেট। আমি তাকে একদিন বলেছিলুম, "ফাইন ওয়েদার, সোম।" মুখখানা করলে যেন আলিপুরের আবহাওয়া দফতর থেকে রিপোর্ট না এলে সে ঐ একস্‌ট্রিমলি কনফিডিয়েনশেল খবর কনফার্ম করতে প্রস্তুত নয়। তাই বলছি সোম যখন বলেছে তখন ওটা বাইবেল-বাক্য।'

কিন্তু বিষ্ণুছড়ারই ভুল। হঠাৎ চেয়ারখানা তার কাছে টেনে এনে মাদামপুর একটুখানি সামনের দিকে ঝুঁকে নিচু স্বরে অত্যন্ত সাদা গলায় গম্ভীরভাবে বললেন, 'কোথায় আছে, কোথায় নেই, ওসব খোঁচাখুঁচি করতে গেলে আবার সেই ধামাচাপা ডার্টি লিনেন বেরিয়ে পড়বে। তাতে ইয়োরোপীয়ন কমিউনিটির কী লাভ ? বরঞ্চ ক্ষতিরই সম্ভাবনা। নো নিউজই যদি হয়, তবে জান তো প্রবাদ, "নো নিউজ ইজ গুড নিউজ"।'

বিষ্ণুছড়া অভয় পেয়ে বললেন, 'বিশেষ করে সোমের কথাই পাকি খবর। কিন্তু ও-রেলিকে একটা বিদায়ভোজ দিতে হবে না! ক্লাবে আসুক আর না-ই আসুক, চাঁদা তো ঠিক ঠিক দিয়ে গিয়েছে, এমন কি টেনিসের একস্ট্রা ও চ্যারিটি-ফ্যারিটির পয়সাও কামাই দেয়নি।'

মাদারপুর বললেন, 'সাউণ্ড করে দেখতে পার। কিন্তু আসবে কি।'

এ সম্বন্ধে মাদামপুর এবং বিষ্ণুছড়ার মনে সন্দেহ জাগা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ও-রেলি আসতে রাজী হল। তবে ইঙ্গিত করলে যে, ডিনারের বদলে মামুলী টি-পার্টি হলেই ভালো হয়। ক্লাব রাজী হল।

ক্লাবের প্রায় সবাই সেদিন হাজিরা দিলেন। ও-রেলি সঙ্গে নিয়ে এল তার বদলী সমারসেট ডীনকে। চটপটে ছোকরা, সমস্তক্ষণ কথা কয় আর এক সিগরেট থেকে আরেক সিগরেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের খর্চা বাঁচায়। ও-রেলি

ডীনকে ক্লাবের সঙ্গে সাড়ম্বর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে, 'ইনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে খাশ-তালিম নিয়ে তৈরি হয়ে এদেশে এসেছেন, মধুগঞ্জ এঁর সেবায় উপকৃত হবে।'

গুজোব রটাতে ফিসফাস-গুজগাজ করতে ইংরেজ এবং বাঙালীতে কোনো তফাৎ নেই, কিন্তু যাকে নিয়ে এ-সব করা হয়, তাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করাটা ইংরেজের অভ্যাস নয় এবং এটিকেটের খেলাফ। তাই মেব্‌ল্ সম্বন্ধে ও-রেলিকে মুখের উপর কেউ কোনো প্রশ্ন শুধালে না। একেবারে কোনো প্রকারের অনুসন্ধান না করাটা আবার মুরুব্বীদের পক্ষে ভালো দেখায় না। তাই বুড়ো মাদামপুর ও ডি. এম. শ্রেণীর দু-একজন ও-রেলির পরিবারের খবর নিলেন কোনো প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে, অর্থাৎ শুদ্দু আশা প্রকাশ করলেন, মেব্‌ল্‌রা বিলেতে ভালো আছে নিশ্চয়ই। ও-রেলি ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

মোটের উপর পার্টিতে কোনরকমের অস্বস্তি কিংবা আড়ষ্টতার ভাব দেখা গেল না। ও-রেলি ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে কথা কইলে। বাঙলাদেশে তখন স্বদেশী আন্দোলন প্রায় সব শহরেই ছোট-বড় দ'য়ের সৃষ্টি করেছে—কথাবার্তা হল সেই সম্বন্ধেই বেশী। ও-রেলি আইরিশম্যান, তাই সে বুঝিয়ে বললে, এ-সব আন্দোলন নির্মূল করা পুলিসের কর্ম নয়, বিলেতের পার্লামেণ্ট যদি সময়োপ-যোগী ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তবে সন্ত্রাসবাদ বাড়বে বৈ কমবে না। অবশ্য তার অর্থ এই নয়, পুলিশ হাত-পা গুটিয়ে বসে বসে বিড়ি ফুঁকবে—সে তার কর্তব্য করে যাবে, তবে তারও একটা সীমা আছে।

মাদামপুর এ বাবদে কট্টর। কিন্তু ও-রেলি তার বক্তব্য এমনভাবে গুছিয়ে বললে যে, তিনি পর্যন্ত বাগান ফেরার সময় বিষ্ণুছড়াকে বললেন, 'পিটি, ছোঁড়াটার পারিবারিক জীবন সুখের হল না। ওকে কিন্তু দোষ দিয়ে লাভ নেই। ছোঁড়ার মাথাটা ঘাড়ের সঙ্গে ঠিকমত স্ক্রু করাই আছে। আমি সত্যই প্রার্থনা করি, ও যেন জীবনে সুখী হয়।'

বিষ্ণুছড়াও সায় দিয়ে বললেন, 'হোয়াই নট্। ইট্ ইজ নেভার টু লেট্ টু বিগিন্ এগেন্।'

মীরপুরের মেম দরদী রমণী। তিনি ও-রেলিকে একবার এক লহমার তরে একলা পেয়ে তার ডান হাত চেপে বলেছিলেন, 'ও-রেলি, তুমি আমার ছেলের বয়সী তাই তোমাকে বলি, জীবনটা একেবারে হুবহু জিগশো ধাঁধার মতো—প্রথমবারেই সব কটা মেলাতে না পারলে নিরাশ হবার মতো কিছু নেই। তোমার উপর আমার আশীর্বাদ রইল।'

ও-রেলি স্পষ্টই বিচলিত হয়েছিল। আধো-আধো ধন্যবাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে কেটে পড়েছিল।

পার্টি শেষ হতেই ও-রেলি নিয়ে গেল ডীনকে তার বাঙলোয়। ডিনার খেয়ে ও-রেলি তার ডেরা তুলে মোটরে যাবে স্টেশন, আর ডীন খাটাবে তার বাঙলোতে আপন ডেরা। চাকরি-জগতে সরকারী বাসা সম্বন্ধে এ-ই হচ্ছে এদেশে আইন—অবশ্য সাদা কালিতে লেখা।

ডীন সবেমাত্র বিলেত থেকে এসেছে, তার উপর সে বকর-বকর করতে ভালোবাসে—এককালে ও-রেলিও গালগল্প জমাতে কিছুমাত্র কম ওস্তাদ ছিল না —কাজেই সে একটানা গল্প বলে যেতে লাগল। ও-রেলিরও ব্যবস্থাটা মনঃপূত হল, তাই যদি বা ডীন দু-একবার ভদ্রতার খাতিরে তাকে কথা বলাবার চেষ্টা করলে সে তাতে সাড়া না দিয়ে উলটে দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ওকে আবার বকর-বকর করাতে তাতিয়ে দিলে।

ও-রেলির মালপত্র মোটরে তোলা হয়ে গিয়েছে—এখন তার ওঠবার সময় হল দেখে ডীন শুধালে, 'এখানে ভালো করে কাজ চালাবার জন্য আপনি কোন টিপ্‌স্ দেবেন কি? আমার তাতে উপকার হবে।'

ও-রেলি বললে, 'সে কথা যে আমি ভাবি নি তা নয় এবং দেবার মতো টিপ্‌স্ থাকলে আমি অনেক আগেই এ প্রস্তাব পাড়তুম—'

ডীন বললে, 'সরি, আমি বড্ড বেশি কথা বলি,—না?'

ও-রেলি বললে, 'নটেটোল। চুপ করে অন্যের কথা শুনলেই অপর পক্ষকে বেশি চেনা যায় তা নয়। অনেক সময় নিজে কথা বলে অন্যের উপর কী প্রতিক্রিয়া হয়—তার মাথা নাড়াতে, হাঁ না বলাতে, কোন্ প্রসঙ্গে সে ইন্‌টরেস্ট নিচ্ছে, কোন্‌টাতে নিচ্ছে না—তাই দিয়ে মানুষ চেনা যায় অনেক বেশি। তার উপর সমস্তক্ষণ কথা বললে অন্য পক্ষ কোনো প্রশ্ন শুধাবার সুযোগ পায় না—যে প্রস্তাব তোলার ইচ্ছে নেই, সেটা বেশ এড়িয়ে যাওয়া যায়। মধুগঞ্জ লোক্যাল-বোর্ড চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে চ্যাম্পিয়ন। অপ্রিয় কথা ওঠবার সম্ভাবনা দেখলেই তিনি পাখি শিকার, ৯০ সালের ভূমিকম্প, আর গিরের ফিতে না ইঞ্চির ফিতে ভালো, এ-সব নিয়ে এমন গল্প জোতেন যে, তাঁর ঘর থেকে বেরনোই মুশকিল হয়ে ওঠে।

'সে কথা যাক, আমি মাত্র একটা টিপ্ দেব। আপনার আপিসের সোম—তার সঙ্গে তো আপনার আলাপ হয়েছে—বড় খাঁটি আর বুদ্ধিমান লোক। আপনি তো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে অনেক নূতন পদ্ধতি শিখে এসেছেন, সেগুলোর

কটা এখানে কাজে খাটবে জানি নে, তবে একথা আপনাকে বলতে পারি সোম যেখানে ফেল মারে, সেখানে করার মতো বড় কিছু একটা থাকে না। অন্তত আমি কিছু পারি নি।'

ডীন একটুখানি অবিশ্বাসের সুরে বললে, 'দেখে তো কিন্তু বুদ্ধু বলে মনে হয়।'

ও-রেলি হেসে বললে, 'প্রিসাইসলি! ঐ তার একটা মস্ত রেস্ত। কিন্তু এদেশে অল্ দ্যাট্ স্টিন্কস ইজ নট্ রটন্ ফিশ্—"ঝলঝল করলেই সোনা নয়" হচ্ছে তার উল্টো প্রবাদ। বর্মাতে একরকম ফল আছে, তার গন্ধ পচা নর্দমার মতো, কিন্তু একবার সে ফল যে খেয়েছে, তার ঐ ফলের জন্য নেশা হয় আফিমের চেয়েও বেশী। সোম ঐ বর্মী-ফল।'

'তাহলে গুড-নাইট।'

'গুড-নাইট।'

॥ ১১ ॥

'খ্রীষ্টালয় থেকে সদ্যাগত'—'ফ্রেশ ফ্রম ক্রিস্টিয়ান হোম'-ওলাদের এদেশে এসে বায়নাক্কার অন্ত থাকে না। এটা নেই, ওটা চাই, সেটা কোথায়—সুবো-শাম লেগেই আছে। তবু যত বড় উন্নাসিকই হোক না কেন, পুলিস সায়েবের বাঙলোটি কিছুমাত্র ফেলনা নয়।

ডিনার খেয়ে দুজনাই এসে বসেছিল চওড়া বারান্দায়। বস্তুত ঐ বারান্দা-টাই বাড়ির সবচেয়ে আরামের জায়গা। ও-রেলি চলে যাওয়ার পর ডীন বেয়ারাকে দিয়ে সিগারেটের তাজা টিন খুলিয়ে আরাম করে গা এলিয়ে বসল। লণ্ডন ছেড়েছে অবধি জাহাজে ট্রেনে সর্বত্র হৈ-হুল্লোড়ের ভিতর দিয়ে তার সময় কেটেছে, দু-দণ্ড নিজের মনে নূতন নূতন অভিজ্ঞতার জমা-খরচ মিলিয়ে নিতে পারে নি—অথচ গুণীরাই জানেন, যারা কথা কয় বিস্তর তারাই নির্জনতা খোঁজে শান্তজনের চেয়ে বেশী।

পেট্রোমাক্স জ্বলছে। তার আলো বারান্দার বাইরের অন্ধকার কিন্তু ফুটো করতে পারছে না। ওদিকে আবার বর্ষার গুমোট। আকাশ থমথম করছে। গাছগুলো অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। সিগারেটের ধোঁয়া পর্যন্ত ডাইনে-বাঁয়ে, উপর-নিচে কোনো দিকে যেতে চায় না। এ অবস্থায় মুখের ধোঁয়া দিয়ে খাশা রিং বানানো যায়। মুখ থেকে বেরিয়েই রিংগুলো একটার

পিছনে আরেকটা সারি বেঁধে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন সিগারেট-খেকোরা আর সিগারেটের নেশা করে না—রিঙের নেশায় পিলপিল করে চক্করের পর চক্কর বের করতে থাকে।

ব্যাচেলাররা দেরিতে শুতে যায়, এ-কথা সবাই জানে, আর তামাকখোররা যায় আরো দেরিতে। 'আরেকটা খেয়েই উঠছি', 'আরেকটা খেয়েই উঠব' করে করে ঘুমে আর সিগারেটে যখন লড়াই বেশ জমে ওঠে তখন অনেক সময় রেফরি লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিয়ে ঘুমের শরণ নেয়, সিগারেটও চটে গিয়ে কার্পেট পোড়ায়।

ডীনের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে, ডান হাত চেয়ারের হাত থেকে খসে ঝুলে পড়ছে, ঢিলে আঙুল থেকে সিগারেটটা খসিখসি করছে, এমন সময়—

এমন সময় ডীন দেখে তিনটি প্রাণী—মূর্তি—কী বলি?—বেড-রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় নেমে গেল। সে বসে ছিল বারান্দার এক প্রান্তে, বেড-রুম অন্য প্রান্তে—সিঁড়ি তার-ই গা ঘেঁষে।

ডীনের চোখে কাঁচা ঘুমের ছানি। তার ভিতর দিয়ে সবকিছু যেন আব্‌ছা আব্‌ছা, যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখা দিল, কিংবা যেন সিনেমার পর্দাতে ঢিলে ফোকাসের ছবি।

তিনটি মূর্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার পূর্বেই তারা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গিয়েছে। ডীন শুধু দেখলে প্রথমটি দৈর্ঘ্যে মাঝারি, দ্বিতীয়টি ছোট এবং তৃতীয়টি বেশ লম্বা—ব্যস আর কিছু না।

সম্বিতে ফিরে ডীন ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নামল। চতুর্দিকে ঘোরঘুট্টি অন্ধকার, নিচের তলায় ছাতা-ল্যাম্প বেয়ারা অনেকক্ষণ হল নিবিয়ে দিয়েছে, উপরের তলার আলো সেখানে পৌঁছয় না। ডীন সদ্য বিলেত থেকে এসেছে—মফঃস্বলে টর্চের কী প্রয়োজন এখনো জানতে পারে নি। তার টর্চ নেই। ছুটে গেল গেটের কাছে; সেখানে রাস্তার ক্ষীণ আলোতে দেখলে, চতুর্দিকে জনমানবশূন্য।

সাপ, চোর, শেয়াল দেখলে আমরা চিৎকার করে চাকর-বাকরদের ডাকি, কারণ আপন দেহ রক্ষার জন্য এদের উপর আমরা নির্ভর করেছি যুগ-যুগ ধরে। বিলেতের লোক কাজকর্ম চালাচ্ছেন বিনা চাকরে বহুকাল ধরে। তাই সম্বিতে ফিরেও ডীন চেঁচামেচি আরম্ভ করলে না। ধীরে ধীরে বারান্দায় ফিরে আবার চেয়ারে বসল।

আকাশ-কুসুম কেউ কখনো দেখে নি—সে শুদ্ধ কল্পনামাত্র; স্বপ্ন আমরা

দেখি, কিন্তু তার পিছনে কোনো বাস্তবতা নেই ; রজ্জু দেখে যখন সর্প ভ্রম হয় তখন সে সর্প বাস্তব নয় বটে, কিন্তু ভ্রম কেটে যাবার পরও রজ্জুটিকে ধরতে-ছুঁতে পাই। ডীন যা দেখল সেটা এর কোনো পর্যায়েই পড়ে না। তাহলে কি সে বাস্তব জিনিস প্রত্যেক্ষ করল ? তাই বা কী করে ? বেড-রুমে থাকার কথা নয় —ডিনার শেষ হওয়ার পর চাকররা চলে গিয়েছিল, ও-রেলি যাওয়ার পর উপরের তলায় তো সে একেবারে একা বসে ছিল। তবে কি ওরা মেথরের দরজা দিয়ে বাথ-রুম বেড-রুম হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল ? ডীন চেক্-আপ করে দেখলে মেথরের দরজা ডবল বন্টে বন্ধ।

তবে কি মদ্যপান ? অসম্ভব। খেয়েছে মাত্র ছোট্ট দু পেগ—তাও ডিনারের আগে। দু পেগে বঙ্গ-সন্তানেরই চিত্ত-চাঞ্চল্য হয় না—ও দিয়ে তো ইংরেজ কপালে তিলক কাটে।

ছুটোছুটি আর উত্তেজনায় ডীনের ঘুম ততক্ষণে ক্ষীণ নয়—লীন হয়ে গিয়েছে। বিছানায় ছটফট করার চেয়ে বরঞ্চ চেয়ারে বসে প্রতীক্ষা করাই ভালো, যারা গেছে তারা ফিরে আসে কি না। পুলিসের লোক—প্রথম সম্বিতে ফেরা মাত্রই সে ঘড়ি দেখে নিয়েছিল। এরা বেরিয়েছিল ১২টা ৩০ এবং ৩৫-এর মাঝামাঝি। যদি তারা নিতান্তই ফেরে তবে তো ফিরবে ভোরের আলো ফোটবার আগেই। ডীন পিস্তলটা স্যুটকেস থেকে বের করে পেগ-টেবিলের উপর রেখে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘণ্টা চারেক সিগারেট পোড়ানোর পর লুপ্ত ঘুম ফিরে এল কিন্তু যাদের জন্য এত অপেক্ষা তারা আর এল না।

সকালবেলা বেয়ারা বেড-টী এনে দেখে সায়েব চেয়ারের উপরে বেঘোরে ঘুমে কাতর। শেষ সিগারেট হাত থেকে পড়ে গিয়ে পেগ-টেবিলের বানিশ পুড়িয়ে দিয়েছে।

আরো একটু ক্ষতি হল ডীনের। সেদিনই আণ্ডাঘরের বেয়ারামহলে রটে গেল, নূতন সায়েব বোতল-বাসী-পিয়াসী। কেউ প্রশ্ন পর্যন্ত করল না, যে-বেয়ারা চা এনেছিল সে বোতল খালি পেয়েছিল না ভর্তি।

সকাল হতে না হতেই ভিজিটারদের ঠ্যালা। তাদের সঙ্গে লৌকিকতা করতে করতে ডীন ভাবছে আগের রাত্রের কথা। দিনের আলো প্রখর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডীনের কাছে রাত্রের প্রহেলিকা হাসির বিষয় হয়ে দাঁড়াল। স্বপ্নের ঘোরে কিংবা ঘুমের জড়তায় কী দেখতে কী দেখেছে তাই নিয়ে সে ছুটোছুটি

করলে—ইস্তেক পিস্তল বের করলে! কী আশ্চর্য! এদেশে একটানা বিশ বছর কাটানোর পর অসহ্য গরম আর সুদীর্ঘ বর্ষার ঠ্যালায় ইংরেজদের মাথায় ছিট জন্মায়—দেশে ফিরে গিয়ে তার ধকল কাটায় পুডিং দিয়ে খানা আরম্ভ করে আর সুপ দিয়ে শেষ করে। তাদেরই একজন, ডীনের এক মামাকে নিয়ে সে কতই না ঠাট্টা-মশকরা করেছে, আর বেচারী মামা কিছু না বলতে পেরে শুধু হুম-হুম করেছে। আর তার নিজের সেই অবস্থা এই প্রথম রাত্রেই। পিস্তল ওঁচায় স্বপ্নের পেট ফুটো করতে? তার হল কী?

এমন সময় সোম এসে খবর দিলে, কাল রাত্রে তের-সতীতে জলে ডাকাতির খবর এসেছে। বোধ হয় গোটা তিনেক খুনও হয়েছে। সে অকুস্থানে যাচ্ছে।

ইংরেজের বাচ্চা নিজেকে এতক্ষণে সংযত করতে শিখেছে। কোনো চাঞ্চল্য না দেখিয়ে শুধালে রাত কটায় কাণ্ডটা ঘটেছে?

'কী জানি, ঠিক বলা যাচ্ছে না, দুপুর কিংবা শেষ রাতে।'

সোম চলে গেল।

'টু হেল'—অর্থাৎ চুলোয় যাগগে বলে ডীন মধুগঞ্জের ম্যাপ মেলে গেজেটিয়র খুলে পড়তে বসল।

কিন্তু 'চুলোয় যাগগে' বললেই যদি সব আপদ চুলোয় যেত তাহলে গোটা পৃথিবীটাকেই হামেহাল নরককুণ্ডের মতো জ্বালিয়ে রাখতে হত। সন্ধ্যে হতে না হতেই দিনের-বেলায়-হেসে-উড়িয়ে-দেওয়া আপদ ডীনের মনের ভিতর 'কিন্তু কিন্তু' করে ইতি-উতি করতে লাগল। ডিনারে বসে মনে হল কাল রাত্রের ঘটনা স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রমও নয়—ইংরিজিতে ভাবতে গেলে ইলুশন, ডিলুশন, হ্যালুসিনেশন কিছুই নয়। প্রেসটিডিজিটেশনও নয়—কারণ ঐ রাত সাড়ে চব্বিশটার সময় তাকে ম্যাজিক দেখিয়ে বোকা বানাতে যাবে কোন্ ভাঁড়?

বাগানের আম-জাম-লিচুর অন্ধকার ক্রমেই যেন বারান্দার দিকে গুড়িগুড়ি এগিয়ে আসছে। প্রতিপদ আকাশের মেঘময় অন্ধকারও নেবে আসছে নিচের দিকে, দুই অন্ধকারের ভিতর কী যেন গোপন যোগ-সাজস রয়েছে। সেই নিরেট জমে-ওঠা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে গাছপালার মধ্যে সূক্ষ্ম—অতি সূক্ষ্ম—ছিদ্র করে কাজলধারার উপর দিয়ে বেয়ে যাওয়া নৌকার ক্ষীণ প্রদীপের আলোক মাঝে মাঝে এসে পৌঁছচ্ছে বাঙলোর দিকে। কিন্তু সে আলোক চোখে পড়ে ঐ দিকে অনেকক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে। সে আলো তখন যেন চোখকে আরো কানা করে দেয়—চতুর্দিকের অন্ধকার যে কতখানি পুঞ্জীভূত নীরন্ধ্র তখনই ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

অন্ধকারে মানুষ যেমন নিজেকে সাহস দেবার জন্য শিস দেয়, পেট্রোমাক্সটাও ঠিক তেমনি মৃদু একটানা শাঁ—শব্দ করে যাচ্ছে আর ভয়ে মরছে হঠাৎ কখন অজানতে অন্ধকার তার লম্বা আঙুল দিয়ে বাতির চাবিতে দম দিয়ে তার দম বন্ধ করে দেবে।

ডীন চাকর-বাকরকে বিদায় দিয়ে পিস্তল কোলে নিয়ে বসেছে সিঁড়ির দিকে মুখ করে। টিপয়ের উপর রিস্টওয়াচ।

রাত ঘনিয়ে এল। আগের রাত্রে ভোরের দিকে চোখের দু পাতা জুড়েছিল মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য, দিন কেটেছে নানা কাজের ঠেলায়, এখন বারে বারে ঘুম পাচ্ছিল, কিন্তু আজ তো সর্বচৈতন্য কোলম্যান মাস্টার্ডের মতো তীক্ষ্ণ সজাগ রাখতে হবে। সে আজ আদৌ মদ খায় নি, জাস্ট টু বি অন ১০০% সেফ সাইড।

ঘড়িতে বারোটা বেজেছে। ডীন ভাবলে, এবারে আরো সজাগ হতে হবে। রুমালটা ভিজিয়ে এনে চোখে বোলাবার জন্য এদিক ওদিক জল খুঁজছে এমন সময় হঠাৎ দেখে সেই ত্রিমূর্তি বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। ডীন মন স্থির করে রেখেছিল দেখামাত্র পিস্তল হাতে ছুটে গিয়ে ওদের ঠ্যাকাবে কিন্তু কাজের বেলায় এক মুহূর্ত দেরি হয়ে গেল—ছুটে গিয়ে যখন নিচের বারান্দায় নামল তখন ত্রিমূর্তি বাগানের বড় জামগাছটার কাছে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। ঘড়িতে দেখে তখনো বারোটা—অর্থাৎ সকালে দম দেওয়া হয় নি।

এবারে ডীন ছুটোছুটি করলে না। 'মাই গড' বলে চাপরাসীর টুলে বসে পড়ল—ভীষণ বিপাকে না পড়লে ইংরেজ 'মাই গড' বলে না। অনেকক্ষণ পর সে বেড-রুমে ঢুকল। ক্লান্তিতে নিদ্রা-জাগরণে মেশা আসুপ্তির ভিতর দিয়ে কাটল।

সকালবেলা সোম এল। তিনটে নয়, দুটো খুন।

সেদিকে খেয়াল না করে ডীন শুধালেন, 'সোম, এ বাড়ি ভূতুড়ে?'

সোম বললে, 'জানি নে স্যর।'

'তুমি ভূত মান?'

'নো, স্যর।'

'তাহলে এ বাড়ি কিংবা যে কোনো বাড়ি ভূতুড়ে হয় কী করে?'

'জানি নে স্যর।'

ডীন বলতে যাচ্ছিল, 'তুমি একটা গবেট, আর তোমার প্যারা বস্ একটা আস্ত গাড়ল—না হলে তোমাকে শার্লক হোমসের মতো ঠাওরালে কেন?' ঠিকই

তো, বোকাকে বুদ্ধিমান মনে করা, এ যেন গাধা দেখে বলা এটা ঘোড়া। যে এ কথা বলে সে শুধু গাধা চেনে তা নয়, ঘোড়াও চেনে না।

তারপর ডীন আরও পাকাপাকি ভাবে আটঘাট বেঁধে ত্রিমূর্তির জন্য ত্রিরাত্রি অপেক্ষা করল, কিন্তু তাকে নিরাশ হতে হল।

সপ্তাহের শেষে আই. জি-কে রিপোর্ট লেখার সময় ডীন এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে লিখব-কি-লিখব-না করে করে কী করে যে লিখে ফেললে নিজেই বুঝতে পারলে না। ভাবলে ওটা কেটে ফেলি—সে বিলক্ষণ জানত, ইংরেজ এ সব কেচ্ছা নিয়ে নির্মম হাসাহাসি করে—কিন্তু তাহলে আবার নূতন করে রিপোর্ট লিখতে হয়, আর লেখালেখির ব্যাপারে পুলিস বাবাজীরা হামেশাই একটুখানি কাহিল।

যাগ কে বলে শেষটায় পয়লা পাঠই পাঠিয়ে দিলে।

তিন দিন বাদে উত্তর এল। তার শেষ ছত্র, 'ড্রিঙ্ক লেস স্পিরিট'।

ডীন খাপ্পা হয়ে বললে, 'ড্যাম দি স্পিরিট।'

॥ ১২ ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জয় করে ইংরেজ সগর্বে তার ইতিহাস রচনা করেছে। যুদ্ধে হেরে জর্মন তার সলজ্জ ইতিহাস লিখেছে। দুটোর কোনোটা থেকেই প্রকৃত সত্য জানবার উপায় নেই। তাই মনে হয়, ইংরেজের ইতিহাসটা যদি জর্মন লিখত এবং জর্মনেরটা ইংরেজ, তাহলেও হয়তো খানিকটে সত্যের কাছে যাবার উপায় থাকত। কিংবা যদি ভারতবাসী লিখত—কারণ সে যে এ বাবদে অনেকখানি নিরপেক্ষ সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

তাই চা-বাগানের আশেপাশের, বিশেষ করে মধুগঞ্জের লোক বিলক্ষণ জানে ইংরেজ তার শৌর্যবীর্য নিয়ে যতই লম্ফঝম্প করুক না কেন, চা-বাগিচার সায়েবদের ভিতর লেগে গিয়েছিল ধুন্ধুমার। তার ইতিহাস লেখা হয় নি, কোনো কালে হবেও না।

হাতিম-তাই না সিন্দবাদ কোন্ এক দেশে গিয়েছিলেন যেখানে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে বুড়ো হয়ে কিংবা অসুখ-বিসুখ করে মরে না। প্রতি সন্ধ্যেয় সবাই এক জায়গায় ম্লান মুখে বসে কিসের যেন অপেক্ষা করে, আর হঠাৎ এক গম্ভীর ডাক শুনে ওদের একজন লাফ দিয়ে উঠে দূর দিগন্তে পালিয়ে যায়, কেউ তার পিছু নেয় না, সে-ও আর কোনো দিন ফিরে আসে না।

চা-বাগিচার বড় মেজো ছোট বেবাক সায়েব রোজ সন্ধ্যেয় ক্লাবে বসে প্রতীক্ষা করেন, লড়াইয়ে যাবার জন্য বিলেত থেকে কোন দিন কার ডাক পড়ে। এবং কাজের বেলা দেখা গেল হাতিম-তাই-এর গল্পের লোকগুলোর মত এঁরা পত্রপাঠ বিলেতের দিকে ছুট দেন না—এঁদের অনেকেই আছেন ডাক এড়াবার তালে। সিভিল সার্জেন ইংরেজ, তার উপর কট্টর সাম্রাজ্যবাদী, সার্টিফিকেট পাওয়া অসম্ভব, কাজেই এদের উর্বর মস্তিষ্ক তখন লেগে যায় নূতন নূতন ফন্দিফিকিরের অনুসন্ধানে। এক ভীতু তো সাহস করে বাঁ হাতের কব্জীতে গুলি মেরে সেটাকে জখম করে লড়াই এড়ালে। মাদামপুর বিষ্ণুছড়া নিজেদের ভিতর লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন।

তাঁরই মাঝখানে কে যেন খবর এনে দিল ও-রেলি লড়ায়ে যাবার জন্য নিজের থেকে প্রস্তাব পেড়েছিল, কিন্তু ভারত সরকার রংরুটের অসুবিধা হবে বলে তাকে যেতে দিল না, কারণ সে ইতিমধ্যেই জনপঞ্চাশেক বাঙালী ছোকরাকে রিক্রুট করেছে এবং তার ভিতর গোটাপাঁচেক টেরোরিস্টও আছে।

ও-রেলি সম্বন্ধে আর সব কথা ক্লাব এক মুহূর্তেই ভুলে গিয়ে এক বাক্যে বলে, শাবাশ।

পুলিসের ক্লাবে আই. জি. এসেছিলেন মধুগঞ্জে টুরে। ক্লাবে বসে ও-রেলির উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি শুনে নিজের ডিপার্টমেণ্টের প্রতি গর্ব অনুভব করলেন। তার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে না বলতেই ক্লাবের নয়া-ঝুনা সব সদস্য দফে দফে তার গুণকীর্তন করলেন, এবং বিষ্ণুছড়ার ছোট মেমই বিগলিতাশ্রু হলেন সব চেয়ে বেশী।

ক্লাব ভাঙল অনেক রাত্রে, পরদিন কাইজারের খড়ের মূর্তি পোড়াবার সুব্যবস্থা করে। বেয়ারারা তাই নিয়ে নিজেদের ভিতর হাসাহাসি করলে। সায়েবদের বড়ফাট্টাই যে কী বেহদ বেশরম ফঙ্গাবেনে সে-কথা তারা লড়াই লাগাবার কয়েক মাস পরেই টের পেয়ে গিয়েছিল। ওদিকে আবার তাদের যে সব ভাই-বোনেরা সাত জন্মে কখনো লড়াই দেখে নি তারা যেতে আরম্ভ করল ইরাকে। তাই নিয়ে পূব বাঙলায় গান পর্যন্ত রচনা হয়ে গেল। সেপাই ফিরে এসেছে মেসপট থেকে দেশে ; বউ জিজ্ঞেস করছে,

মিয়া, গেছলায় যে বসরায়,
দেখছনি দালান ?
ছোট ছোট সেপাইগুলি লাল কুর্তি গায়
হাঁটু পানিৎ ল্যামা তারা

পিস্তত মারাৎ যায়—
মিয়া গেছলায় যে বসরায়, মিয়া গে— (সম) !

এ গীতে তবু বরঞ্চ গ্রাম্য মেয়ের সরলতা আর কল্পনাশক্তির খানিকটা বিকাশ পেয়েছে, কিন্তু সায়েবদের ছেলেমানুষি কত চরমে পৌঁছে গিয়েছে তার প্রমাণ বেয়ারাগুলো পেল যেদিন মধুগঞ্জের পাগলা চেঁচিয়ে গান ধরলে,

মরি, রাই, রাই, রাই,
জর্মনিরে ধরে এনে,
হার্মনি বাজাই !

এ গানের না আছে মাথা না আছে কাঁথা—পাগলা জগাইয়ের 'গানে' কখনো থাকতও না—অথচ সায়েবরা গান শুনে ভাবলেন জগাই জর্মনির কান খুব করে মলে দিচ্ছে। পাগলকে ডেকে এনে ক্লাবে তার 'নৃত্যসম্বলিত' গান শোনা হল, প্রচুর বকশিশ দেওয়া হল, এবং তাকে একটা মেডেল দেওয়া যায় কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা হল।

'বাঙাল' গাছে ফলে না, 'বাঙালে'র চাষ পুব-বাঙলার একচেটে নয়, তাই সায়েবদের 'বাঙালপনা' দেখে বাঙাল বেয়ারাগুলো হাসলে জোর একপেট আর পাগলা জগাইকে খেতাব দিলে 'জঙ্গীলাট'।

রাত্রে আই. জি'র নিমন্ত্রণ ছিল ডীনের বাংলোয়।

সূপ শেষ হতে না হতেই ডি. এম-এর বাংলো থেকে জরুরী খবর এল 'স্বদেশী'দের আড্ডায় বোমা ফেটে দুজন মারা গিয়েছে—ডীন যেন তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ডীন তাদের অভিসম্পাত দিতে দিতে খানা ছেড়ে উর্দি চড়ালে।

আই. জি. বাঙাল ভাষা বেশ শিখে গিয়েছিলেন। একা একা খানা খাওয়ার একঘেয়েমি কাটাবার জন্য বাটলারদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। এককালে বড়লোকদের যদি শখ হত ছোটলোকদের সঙ্গে গল্প করার তবে তাঁরা ডেকে পাঠাতেন চন্দ্রবৈদ্যকে—মুখ-চন্দ্রটিকে বিচক্ষণ বৈদ্যের মতো খাফসুরত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নাপিত হুজুরকে দুনিয়ার নানা খবর নানা গুজব শুনিয়ে ওকিবহাল করে তুলত। বিলেতে এখনো ও কর্মটি করে বাটলার এবং খানদানী সায়েবদের যাঁরাই দেশী ভাষা শিখতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরাই এ-দেশে সেই রেওয়াজটি চালু রেখেছেন।

সায়েবের মতির গতি ধরতে পেরে খয়রুল্লা আলোচনা আরম্ভ করলে জিনিস-পত্রের দাম বেড়ে যাওয়া নিয়ে—সায়েব সায় দিলেন; তারপর ভরসা দিলে

লড়াই শিগগিরই খতম হয়ে যাবে—সায়েব শুধু 'হুঁ' বললেন—খয়রুল্লা কথার মোড় ফিরিয়ে বললে, দিশী লোক বসরা থেকে বেশ দু পয়সা বাড়িতে পাঠাচ্ছে—সায়েব আনন্দ-প্রকাশ করলেন।

খানার শেষ পদ ছিল পনিরে রান্না আস্ত আণ্ডা। বহুকাল ধরে বিলেত থেকে পনির আসছে না বলে বড় সায়েব তাই নিয়ে প্রশংসা ও বিস্ময় প্রকাশ করলেন। খয়রুল্লা দেমাক করে জানালে এ পনির বিলেতি নয়, এ জিনিস তৈরি হয় মৈমনসিংহের অষ্টগ্রামে। বিদেশী পনির যখন এ-দেশে পাওয়া যেত সেই আমলেই ও-রেলি সায়েবের মেম দিশী পনিরের সন্ধান পেয়ে তাই দিয়ে এই নূতন সেভারি আবিষ্কার করেন। খয়রুল্লার মতে তাঁর মতো পাকা রাঁধুনি এ দেশে কখনো আসে নি। সে তখন জয়সূর্যের মেট—তার কাছ থেকে সে এ জিনিসটে বানাতে শিখেছে।

বড় সায়েব জানতেন মিসেস ও-রেলি বিলেতে। তবু কথার পিঠে কথা বলার জন্য আপন মনেই যেন শুধালেন, 'তা মেম সায়েব তো এখন বিলেতে ?'

খয়রুল্লা একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'বোধ হয় তাই। তবে সঠিক কেউ বলতে পারে না। মীরপুর বাগিচার বেয়ারা বলছিল তিনি মসুরি না সিমলে কোথায় যেন।'

এবারে সায়েব একটুখানি আশ্চর্য হলেন। বললেন, 'সে কী হে? এই সামান্য খবরটাও সঠিক জান না ?'

খয়রুল্লার দিলে চোট লাগল। পুলিস সায়েবের বেয়ারা হিসেবে জাত-ভাইদের ভিতর তার খুশ-নাম ছিল যে, সে দুনিয়ার সকলের নাড়ীনক্ষত্র জানে, তাকে কি না সায়েব পষ্ট ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন সে একটা আস্ত উজবুক, দুনিয়ার কোনো খবর রাখে না। তার চেয়ে যদি তিনি তাকে খবর দিতেন যে সে এদিকে, জানে না, ওদিকে কিন্তু তার বিবি বিধবা হয়ে গিয়েছেন, তা হলেও তার কলিজা এতখানি ঘায়েল হত না। তাই ইজ্জত বাঁচাবার জন্য বললে, 'সঠিক খবর তো দিতে পারেন শুধু ও-রেলি সায়েবই। তা তিনি তো কারো সঙ্গে কখনো কথা বলেন না, তাঁকে শুধাতে যাবে কে ?'

বড় সায়েব খানদানী ঘরের ছেলে। সায়েব-মেমদের নিয়ে চাকর-নফরের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতে চান না ; আলোচনাটা ওদিকে মোড় নিচ্ছে দেখে বললেন, 'ঠিক বলেছ।'

খয়রুল্লাও পেটে আক্কেল ধরে। সায়েব যদি বা কথার মোড় ফেরালেন সে তাঁর সামনে খাড়া করে দিলে একখানা নিরেট পাঁচিল।

বললে, সে বহু মেহন্নত করে ক্লাব থেকে কিঞ্চিৎ উত্তম কফি যোগাড় করে এনেছে, পারকুলেটরে সেটা চড়িয়ে রেখেছে, সায়েব যদি একটু মর্জি করেন?

ডিনার শেষ হলে পর খয়রুল্লা বললে, সে সায়েবকে সার্কিট হাউসে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য নিচের তলায় অপেক্ষা করবে। কফি-লিকার-সিগার তিনটিই উত্তম শ্রেণীর ছিল বলে সায়েব তদ্দণ্ডেই ডেরা ভাঙবার কোনো প্রয়োজন বোধ করলেন না। জানালেন, তিনি একাই সার্কিট হাউস যেতে পারবেন।

রাত একটার সময় ডীন ফিরে এল। বড় সায়েবকে নিতান্ত একা-একা ডিনার খেতে হল বলে আবার দুঃখ প্রকাশ করলে।

বড় সায়েব সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, 'মিসেস ও-রেলি এখন কোথায় তুমি জান?'

ডীন হেসে বললে, 'কেন? আপনিও কিছু শুনেছেন নাকি?'

'না, তো। আমি শুনেছি, তিনি বিলেত না মসুরিতে সে-কথা কেউ জানে না। আমার কাছে একটু আশ্চর্য ঠেকল।'

ডীন বললে, 'ঠেকারই কথা। কিন্তু এ নিয়ে কারো কোনো কৌতূহল নেই। এর পিছনে আবার একটুখানি কেলেঙ্কারি কেচ্ছা রয়েছে। মেব্‌ল্‌ এখান থেকে সরে পড়াতে কেচ্ছাটা প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে।'

তারপর ডীন ক্লাবে যা-কিছু শুনেছিল সে কথা তাঁকে সংক্ষেপে জানিয়ে বললে, 'পাছে আমি ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুঝতে পেরে এলোপাতাড়ি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, তাই মাদামপুরের সায়েব—এ অঞ্চলে তিনিই মুরুব্বী—আমাকে এখানে আসার দিনই সমস্ত কথা খুলে বলে ইঙ্গিত করেন যে, এ ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করে কোনো লাভ নেই, ক্ষতিরই সম্ভাবনা। আমিও তাঁকে বলেছি, ব্রাদার অফিসারের ফ্যামিলি অ্যাফেয়ারে আমি কনসার্নড্‌ নই।'

বড় সায়েব বললেন, 'ঠিক বলেছ!'

আরো পাঁচ রকমের কথা হল—বিশেষ করে লড়াই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। দুজনেই ইয়র্কশারের লোক, কাজেই দুজনারই পরিচিত অনেক লোকের প্রমোশন, জখম, বাহাদুরি, মৃত্যু নিয়ে অনেক সুখ-দুঃখ প্রকাশ করা হল।

রাত প্রায় একটার সময় বড় সায়েব শেষ ক্রেম দ্য মাৎ খেয়ে উঠলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ বললেন, 'কই হে, তোমার ত্রিমূর্তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না?'

ডীন যেন শুনতে পায় নি এমনভাবে বললে, 'আপনি বাগদাদের কাজীর

গল্প জানেন ?'

বেমক্কা হঠাৎ কাজীর গল্প কেন উপস্থিত হল তার হদিস না পেয়ে বড় সায়েব বললেন, 'না তো।'

ডীন বললে, 'মুর্গী খেতে খেতে কাজী বাবুর্চীকে শুধালেন, মুর্গীর আরেকটা ঠ্যাং কোথায় ? বাবুর্চী বললে, মুর্গীটার ছিল মাত্র একটা ঠ্যাং। কাজী বললেন, একঠ্যাঙী মুর্গী কেউ কখনো দেখে নি। বাবুর্চী বললে, বিস্তর হয়, সে দেখিয়ে দেবে। তারপর শীতকালে একদিন আঙিনায় একটা মুর্গী এক ঠ্যাং পালকের ভিতর গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিল—বাবুর্চী কাজীকে দেখিয়ে দিলে একঠ্যাঙী মুর্গী। কাজী দিলেন জোর হাততালি। মুর্গী দুসরা ঠ্যাং বের করে ছুটে পালাল। কাজী বললেন, ঐ তো দুসরা ঠ্যাং। বাবুর্চী বললে, সেদিনও খাওয়ার সময় তিনি হাততালি দিলে দুসরা ঠ্যাং বেরোত।'

বড় সায়েব বললেন, 'উত্তম গল্প কিন্তু—'

ডীন বললে, 'এতে আবার কিন্তু কী ? আপনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন কম হুইস্কি খেতে—ত্রিমূর্তি হুইস্কির চোখে দেখেছিলুম কি না ! আপনি যদি আচ্ছা করে আজ হুইস্কি খেতেন, তবে তার-ই 'হাততালিতে' ত্রিমূর্তি বেরিয়ে আসতো।'

অথচ সায়েব খেয়েছিল পাঁচটা 'ব্রা'—বড়া।

মনে মনে ভাবলেন, 'ছোকরা তুখোড়।' বাইরে হেসে বললেন, 'আচ্ছা, আসছে বারে না হয়, ম্যাকবেথের তিন ডাইনীর স্মরণে তিন বোতল খেয়ে ত্রিমূর্তিকে ইনভোক করা যাবে।'

ডীন বললে—'থাইস ওথ—তিন সত্যি।'

॥ ১৩ ॥

লড়াইয়ের জন্য টাকা তোলার মতলবে ইংরেজ নানা ফন্দি-ফিকির চালালে—তারই একটা 'আওয়ার ডে', পুব বাঙলার এই প্রথম ফ্ল্যাগ ডে। নেটিভরা বিদ্রূপ করে 'আওয়ার ডে'-কে নাম দিলে 'আওর দে' অর্থাৎ 'আরো দে'। ওদিকে ভারতবাসীদের কাছ থেকে এ দুঃসংবাদ আর লুকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না যে, ইংরেজ ক্রমাগতই লড়াই হারছে। চতুর্দিকের অভাব অনটনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের গৌরবও কমে যাওয়াতে পুব বাঙলায় আরম্ভ হল বাজার লুট। ইংরেজ ভয় পেয়ে গেল যে, একবার যদি এ অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে, তবে সেটা ঠেকানো

সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

দেখা গেল, ও-রেলির এলাকায় কোনো বাজার লুট হয় নি। আই. জি. গেলেন ঐ এলাকা পরিদর্শন করতে আর ও-রেলির কাছ থেকে সলা-পরামর্শ নিতে।

ও-রেলির বাঙলোয় বসে আলাপচারি করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল দেখে সে সায়েবকে 'পট্‌লোক্' খেয়ে যেতে বললে।

খেতে বসে সুখ-দুঃখের আলাপ আরম্ভ হল। বড় সায়েবের পরিবারও বিলেতে, তাই নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অবাধ নেই, তবে সান্ত্বনা এই যে, তাঁর স্ত্রী লড়াইয়ের কাজে যোগ দিয়েছেন আর বড় মেয়ে তো নার্স হয়ে ফ্রান্সে গিয়েছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সায়েব বললেন, 'লড়াইয়ে যে শুধু মানুষ জখম হয় আর মরে সেইটেই তো শেষ কথা নয়, কত পরিবার যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় তার কি কোনো স্টাটিস্‌টিকস্ কেউ নেয়? তোমার বউ-বাচ্চা কী রকম আছে?'

'ভালোই।'

'চিঠিপত্র ঠিকমতো পাচ্ছ তো?'

'হুঁ।' তারপর বলল, 'ও-সব কথা বাদ দিন। আমি আমার মনকে আদপেই বিলেতমুখো হতে দিই নে। যতটা পারি কাজকর্মে ডুব মেরে থাকি।'

বড় সায়েব বললেন, 'সরি! কিছু মনে কোরো না, ও-রেলি। আমি পরের পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথা সচরাচর জিজ্ঞেস করি নে; নিজের দুশ্চিন্তারই আমার অবসান নেই।'

ও-রেলি চুপ করে রইলো।

মাস দুই পর সায়েব ডীনকে চিঠি লিখলেন,

'প্রিয় ডীন,

আমি বড় সমস্যায় পড়ে তোমাকে চিঠি লিখছি। প্রায় দু'মাস হল আমি রাধাপুর মফঃস্বল যাই। সেখানকার অবস্থা খুব সন্তোষজনক সে খবর তুমি জান—তার জন্য ও-রেলিকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে হয়, সে কথাও তোমার অজানা নয়। দেশে যে সে শান্তিরক্ষা করতে পেরেছে, সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা নয়, আমি মুগ্ধ হয়েছি অন্য কারণে।

ভারতবর্ষে একদিন আমাদের প্রাধান্য আর থাকবে না, এ জিনিসটা আমার কল্পনার বাইরে নয়, কিন্তু আমরা জর্মনির কাছে পরাজিত হব এবং ফলে আমরা জর্মন হুনদের তাঁবুতে আসতে পারি, এ জিনিসটার কল্পনাও

আমি করতে পারি নে। এ-লড়াই জেতার জন্য ভারতে শান্তি গৌণ—মুখ্য, ভারতকে এই যুদ্ধে আমাদের হয়ে লড়ানো। ও-রেলি এ-কাজটি তার এলাকায় অবিশ্বাস্যরূপে সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। তার কার্যপন্থা ও সরলতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

তাই আমাদের সকলের কর্তব্য তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা।

গতবার যখন তার সঙ্গে দেখা হয়, তখন পরিবারের কথা উঠেছিল। আমার প্রশ্নের সামান্যতম উত্তর না দিয়ে সে আমার দিকে যে ভাবে তাকালে তাতে আমার মনে হল, এই বিষয় নিয়ে তার মনের কোণে এক গভীর বেদনা লুকনো আছে। আমার মনে হল, তার সম্বন্ধে আমরা যে-সব গুজব শুনেছি, সেগুলোর কিছুটা তার কানে পৌঁছেছে এবং গুজবের বিরুদ্ধে লড়াই অসম্ভব জেনে চুপ করে সব অপবাদ সয়ে নিয়েছে।

হয়তো এটা বিচক্ষণের কর্ম। কিন্তু আমার মনে হল, এ বিষয়ে আমাদেরও কর্তব্যবোধ থাকা দরকার। যে মানুষ তার সম্বন্ধে জঘন্য অপবাদ সহ্য করেও আপন দেশের জন্য অম্লানমুখে অবিশ্রাম খেটে যাচ্ছে—এবং খাটছে কাদের জন্য? যারা তার বিরুদ্ধে গুজব রটিয়েছে তাদেরই জন্য—তার মনের জ্বালা লাঘব করার জন্য যদি আমরা আমাদের কড়ে আঙুলটিও না তুলি, তবে আমরা যে নুন খেয়েছি তার উপযুক্ত নই। আর যদি আমাদের প্রফেশনের কথা তুলি তবে বলব, 'তুমি আমি পুলিস; অসৎকে সাজা দেওয়া যেমন আমাদের কর্তব্য, সজ্জনকে অন্যায় আক্রমণ থেকে রক্ষা করা আমাদের ততোধিক কর্তব্য,—ভারতীয় পুলিস এ কথা ভুলে গিয়েছে।

আমি তাই স্থির করলুম, ও-রেলিকে না জানিয়ে তার স্ত্রীর অনুসন্ধান করে সত্য খবর মধুগঞ্জের ইয়োরোপীয় সমাজকে গোচর করাব। এবং তারপরও কারো বিষ-জিভ যদি লকলকানি আরম্ভ করে, তবে রাস্কেলটাকে মধুগঞ্জের ক্লাবহাউসের সিঁড়িতে চাবকে দেব।

মেব্‌ল্ এবং তার বাচ্চা কোন মাসে বিলেত গিয়েছিল সে খবর বের করে আমি বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, কলম্বো এমন কি চাটগাঁর বন্দরের সব প্যাসেঞ্জার লিস্ট তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করেও তাদের নাম পেলুম না।

ও-রেলিকে মসুরিতে নাকি মেব্‌ল্‌দের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল—সব কটা ইউরোপীয় হোটেলে অনুসন্ধান করেও ওদের নাম পাওয়া গেল না, অথচ ও-রেলির নাম সাভয় হোটেলের রেজিস্ট্রিতে রয়েছে।

ভারতবর্ষের হিল-স্টেশনে কোনো ইউরোপীয় রমণীর পক্ষে নাম ভাঁড়িয়ে

বেশী দিন কাটানো প্রায় অসম্ভব, ছদ্মনামে ছদ্ম পাসপোর্ট নিয়ে বিলেতে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সব দিক যখন ব্ল্যাঙ্ক বেরল তখন আমি মেব্‌ল্‌দের বাটলারটার অনুসন্ধান করলুম সিংহলে তার গ্রামে। খবর এল সাত বৎসর ধরে সে গ্রামে ফেরে নি।

তাই আমি বড় সমস্যায় পড়েছি।

তুমি কি মধুগঞ্জে অত্যন্ত সাবধানে এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে কোন্ পথে এগোতে হবে, সে সম্বন্ধে কিছু হদিস দিতে পার ?

মনে রেখো, আমি এ যাবৎ সব অনুসন্ধান করেছি অতিশয় গোপনে, এবং বেশির ভাগ নিজে নিজেই—পাছে ও-রেলি খবর পেয়ে মর্মাহত হয় যে, আমিও মধুগঞ্জের বক্সওয়ালাদের* মতো কুচুটে। তুমিও সাবধানে কাজ করবে। আমাদের উদ্দেশ্য ও-রেলিকে মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্ত করা। সে-কর্মে সফলতা নাও পেতে পারি, কিন্তু তাকে আরো দুঃখ দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত হবে।

শুভেচ্ছাসহ

ডাড্‌নি।'

ঠিক সাতদিন পর বড় সায়েব ডীনের কাছ থেকে একখানি ছোট চিঠি পেলেন।

'যতদূর সম্ভব শীঘ্র এখানে আসুন; সব আলোচনা মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজন।'

বড় সায়েব খবর দিয়ে মধুগঞ্জে পৌঁছলেন। মোটরেই জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা কী ?' ডীন উত্তর না দিয়ে শুধু ড্রাইভারের দিকে আঙুল দেখালে।

রাত্রে ডিনারের পর চাকরদের বিদায় দিয়ে ডীন বড় সায়েবকে তার স্টোর-রুমের তালা খুলে ভেতরে নিয়ে গেল।

সায়েব দেখলেন, টুকরো টুকরো হাড়ে জোড়া তিনটি কঙ্কাল। একটা বড়ো, একটা মাঝারি, আরেকটা ছোট্ট শিশুর।

তালা বন্ধ করে দুজনে ফিরে এলেন। বড সায়েব একটা নির্জলা বড় হুইস্কি খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় পেলে ?'

---

* টী-চেস্ট বা চায়ের বাক্স নিয়ে কারবার করে বলে চা-বাগিচার সায়েবদের অবজ্ঞার্থে অন্য ইংরেজ নাম দিয়েছে 'বক্সওয়ালা'। হিন্দী 'ওয়ালা' প্রত্যয় ব্যবহার করার অর্থ যে তারা 'হাফ-নেটিভ'।

'বাগানে লিচুগাছের তলা খুঁড়ে।'

'কী করে সন্দেহ হল?'

ডীন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আপনার চিঠি থেকে আমি দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে, মেব্‌ল্‌দের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আমি অবিশ্বাস্য জিনিসে বিশ্বাস করে আপন অনুসন্ধান আরম্ভ করলুম—বরঞ্চ বলতে পারেন শেষ করলুম।

'এ বাঙলোয় প্রথম দু রাত্রে আমি যে ত্রিমূর্তি দেখেছিলুম, সেগুলো আমার মন থেকে কখনো মুছে যায় নি। যে গাছতলায় ছায়ামূর্তিগুলো হঠাৎ মিলিয়ে যায়, সে গাছটাকেও আমি স্পষ্ট মনে রেখেছিলুম। আপনার সব তল্লাসীই যখন নিষ্ফল হল, তখন আমি যে কাজ করলুম সেটা শুনলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আমার গুরুরা হাসবেন। কিন্তু যে জিনিস আমি স্পষ্ট দেখেছি, যার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই, সে জিনিস স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কাছে—আপনার কাছে—যতই অবিশ্বাস্য হোক না কেন, আমার কাছে তা-ই বিশ্বাস্য, সে-ই আমার খেই।

'জায়গাটা খোঁড়ার আরেকটা কারণ : যদি কিছু না পাই, তবে আমি সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারব।'

বড় সায়েব দু হাতে মাথা চেপে ধরে রইলেন অনেকক্ষণ ধরে।

ডীন সায়েবকে আরেকটা পেগ দিলেন।

সায়েব শুধালেন, 'তোমার কী মনে হয়?'

ডীন কোনো উত্তর দিলে না, প্রশ্নটা যেন সে শুনতেই পায় নি।

এবারে সায়েব মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এ কাজ যদি ও-রেলির হয়, তবে বলব, যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত কারণ না থাকলে তার দ্বারা এটা কথনো সম্ভবপর হত না।'

ডীনও উঠে দাঁড়াল। বললে, 'খোঁড়াখুঁড়ি করার আমার তৃতীয় কারণ সেইখানেই। আপনার শেষ সিদ্ধান্ত যদি ও-রেলির সপক্ষে যায়, তবে এই কঙ্কালগুলো নিয়ে আপনি যা ভালো মনে করেন তাই করতে পারবেন। এটা তো আপনার কেস।'

বড় সায়েব বললেন, 'মাই কেস! ও গড।'

বড় সায়েব পরদিন রাধাপুর গিয়ে সোজা উঠলেন ও-রেলির বাঙলোয়। কোনো ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'ও-রেলি, মধুগঞ্জে তোমার বাঙলোর বাগান খুঁড়ে তিনটি কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। এ সম্বন্ধে তোমার কিছু বলবার আছে

কি ? কিন্তু তার পূর্বে তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি—তুমিও জান—'

সায়েব বাক্য শেষ করলেন।

ও-রেলি তখন একটু শুকনো হেসে বললে, 'আমাকে কিছু সাবধান করতে হবে না। এই নিন।' বলে সে কোটের ভিতর বুকের পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করে সায়েবের হাতে দিলে।

॥ ১৪ ॥

প্রিয় সোম,

এ চিঠিটা তোমাকে লিখছি ; এ চিঠিটা বিশ্বসংসারের যে কোনো লোককে লেখা যেত। তবু তোমাকেই কেন লিখছি তার কারণ তুমি আমাকে হৃদয় আর মন দিয়ে যে রকম বুঝতে চেষ্টা করেছ এ রকমটা আর কেউ কখনো করে নি—না এদেশে না আমার আপন দেশে—এক মেব্‌ল্‌ ছাড়া। 'হৃদয় আর মন' দিয়ে বলবার সময় আমি ইচ্ছে করেই 'হৃদয়' আগে ব্যবহার করেছি ; তার কারণ আমি আইরিশম্যান, আমি ইংরেজ নই। আমি আমার পাঁচটা জাতভাইয়ের মতো হৃদয় দিয়ে ভাবি, আর মন দিয়ে অনুভব করি। ইংরেজ তার মনকে হৃদয়ের আগে স্থান দেয়—এবং বহু ইংরেজের আদপেই হৃদয় আছে কি না তাই নিয়ে আমার মনে সন্দেহ আছে। কিন্তু থাক, এ-সব সস্তা পাইকারি হিসেবে কোনো জাত কিংবা দেশ সম্বন্ধে রায় প্রকাশ। শুধু শেষ একটা কথা বলি, বাঙালীর সঙ্গে এ বাবদে আইরিশম্যানের অনেকখানি মিল আছে। জানি নে, তোমার কাছে খবর পৌঁছেছে কি না, আলিপুরের মামলায় যারা হাজতে ছিল তাদের প্রতি দরদ দেখিয়ে এক আইরিশ ডাক্তারকে এদেশের ইংরেজ কর্তাদের কাছে হুমকি খেতে হয়েছে। এই আইরিশ ডাক্তারের সঙ্গে আমার এবং তোমার হৃদয়ের মিল রয়েছে। দেশে আমার জাতভাইরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ছে স্বাধীনতার জন্য। তাদের জন্য আমার হৃদয়ে যথেষ্ট দরদ। ওদিকে ইংরেজ আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে সেটাকেও অস্বীকার করতে পারি নে। তোমার বেলাও তাই, অরবিন্দ-কোম্পানির প্রতি তোমার সহানুভূতি ; ওদিকে যে ইংরেজ রাজতন্ত্র এ দেশে প্রচলিত তার সদ্‌গুণগুলো তোমার চোখ এড়ায় না। আইরিশ ডাক্তার, তোমার এবং আমার, আমাদের সকলের ভিতর একই দ্বন্দ্ব।

সাধারণ লোক এ ক্ষেত্রে বলে, 'তাহলে চাকরি ছেড়ে দিলেই পার !'

এর সদুত্তর যখন আমি আপন মনে খুঁজছি তখন তোমার মুরুব্বী—যাকে

প্রথম দর্শনে মনে হয়, আস্ত একটা গড-ড্যাম ফুল—কাশীশ্বর চক্রবর্তীকে এক পুরস্কার-সভার বক্তৃতাতে অন্য কথাপ্রসঙ্গে বলতে শুনলুম, 'সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব সংসারে তো চিরকালই লেগে থাকবে; তাই কি আমরা সবাই সংসার ত্যাগ করে বনবাসে চলে যাই? আর যদি যাই-ও, তাতেই বা কী? সেখানে কি দ্বন্দ্ব নেই?'

কথায় কথায় কোথায় এসে পড়লুম! কিন্তু তোমার স্মরণ আছে, সোম, আমি যখন প্রথম এদেশে আসি তখন কী রকম মারাত্মক বাচাল ছিলুম। তুমিই নাকি মীরপুরকে একদিন বলেছিলে, 'সায়েব কথা কয় যেন ম্যাক্সিম্ গানের মতো—কট্ কট্ কট্ কট্ ট্-ট্-ট্!' ঠিকই বলেছিলে। এবং আমিও মন্তব্যটা শুনে সেটাকে সবিশেষ প্রতিপন্ন করার জন্য আরো শ তিনেক রৌণ্ড তদ্দণ্ডেই ছেড়েছিলুম।

সে বাচালতা একদিন আমার লোপ পায়। আজ আবার সেটা ফিরে এসেছে। দীর্ঘ সাত বছরের জমানো কথা আজ তোমাকে বলতে যাচ্ছি। যে কলম-ধরাকে আমি ভূতের মতো ডরাতুম, আজ আমাকে সেই কলম ধরেছে। আমার একমাত্র দুঃখ এ-চিঠি হয়তো কোনোদিন তোমার হাতে পৌছবে না। এটা হয়তো জবানবন্দী রূপে আদালতে পেশ করা হবে। যে অন্ন তোমাকে সাদরে আপন হাতে খাওয়াতে চেয়েছিলুম, সেটা পৌছবে তোমার কাছে, পাঁচশো জনের এঁটো হয়ে।

হ্যাঁ, আমার-ই কর্ম, আমিই করেছি। এর জন্য আর কেউ দায়ী নয়। আমি একাই দায়ী আমি জানি, একমাত্র তুমিই জানতে পেরেছিলে যে, আমি দায়ী। তুমি আমাকে ধরিয়ে দাও নি কেন তারও আন্দাজ আমি খানিকটা করতে পেরেছি। বিশ্বের আদালতে আমাকে খাড়া না করে তুমি আমাকে তোমার নিজের আদালতে খাড়া করে হয়তো যথেষ্ট প্রমাণ পাও নি, হয়তো তোমার প্রত্যয় হয়েছিল যে, এ অবস্থায় পড়লে তুমিও ঠিক এই রকম ধারাই করতে, হয়তো ভেবেছিলে আমি তোমার ওপরওলা,—ওপরওলার অপরাধের বিচার করবেন তাঁর ওপরওলা, গুরুর বিচার করবেন ভগবান, চেলার তাতে কিসের জিম্মেদারি! এ নিয়ে আমার কোনো কৌতূহল নেই। জজ যখন আসামীকে খালাস দেয় তখন জজ কেন তাকে ছেড়ে দিলে তাই নিয়ে মাথা ঘামায় কোন্ আসামী?

তুমি যে আমাকে হৃদয় দিয়ে খানিকটে বুঝতে পেরেছিলে সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, তুমি যেন অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে গুপ্তধনের কাছে

পৌঁছে গিয়েছিলে, এইবারে আমি তোমাকে হাত ধরে বাকি পথটুকু নিয়ে যাব। কিন্তু যদি গুপ্তধনের কলসী তখন ফাঁকা বেরোয়, কিংবা যদি তার থেকে বেরোয় কেউটে…? তখন তুমি আমাকে দোষ দিয়ো না। আর তুমি যদি তখন তোমার রায় বদলাও তবে আমিও তোমাকে দোষ দেব না।

তাহলে গোড়া থেকেই আরম্ভ করি।

একদিন কথায় কথায় আমি তোমাকে আমার বাপ-মা সম্বন্ধে কী যেন সামান্য কিছু একটা বলি। তুমি সুযোগ পেয়ে এমন একটা প্রশ্ন শুধালে যার থেকে আমি আবছা-আবছা বুঝতে পারলুম, তুমি জানতে চাও আমি আমার রক্তে এমন কোনো দ্বন্দ্ব নিয়ে জন্মেছি কি না যার তাড়নায় আত্মবিস্মৃত হয়ে আমি অপরাধের পন্থা বরণ করলুম, এখানে বলে রাখি, সে স্থলে তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলে আমিও ঠিক সেই প্রশ্নই জিজ্ঞেস করতুম। কারণ অপরাধী নিয়ে আমাদের কারবার। হয় তাদের গায়ে বদ-খুন,—না হয় তারা বড় হয়েছে বদ আবহাওয়ার ভিতরে। আজ আমার আর স্পষ্ট মনে নেই তবে এটুকু এখনো স্মরণে আছে যে, তুমি কিন্তু প্রশ্নটি করেছিলে এমনি সুচতুরভাবে যে, আমি কোনো অফেন্‌স্ নিই নি।

তাই বলে রাখি, আমি আমার বাবার যেটুকু দেখেছি তার থেকে এমন কিছুই মনে পড়ছে না যা দিয়ে আমার চরিত্র বিশ্লেষণ করা যায়। তিনি ছিলেন খাঁটি আইরিশম্যান, অর্থাৎ দু মুঠো অন্ন আর তিন পাত্তর মদের পয়সা হয়ে গেলেই কাজে ক্ষান্ত দিয়ে সোজা চলে যেতেন পাড়ার মদের দোকানে—তারপর তাঁকে আর এক মিনিটের তরে কাজ করানো যেত না। তুমি আয়ারল্যাণ্ডের মদের দোকান কখনো দেখ নি, তাই তুলনা দিয়ে বলছি সে হল কাশীশ্বর চক্রবর্তীর বৈঠকখানার মতো। সেখানে কুঁড়েমি আর গালগল্প ছাড়া অন্য কোনো জিনিস হয় না—মদ সেখানে আনুষঙ্গিক মাত্র। মেয়েদের সামনে এ সব জিনিস ভালো করে জমে না বলে মেয়েরা 'পাবে' যায় না, চক্রবর্তীর বৈঠক-খানায়ও তাদের প্রবেশ নিষেধ।

আমার বাবা ছিলেন গল্প বলায় ওস্তাদ, তাই তিনি ছিলেন 'পাবের' প্রাণ—চক্রবর্তীর বৈঠকখানায় শুনেছি সেই ব্যবস্থা।

তাঁর কোনো প্রকারের চরিত্র-দোষ ছিল না, তাঁকে কোনো প্রকারের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতে আমি কখনো দেখি নি। অথচ তিনি আমাকে জীবনে একটিমাত্র উপদেশ লক্ষাধিকবার দিয়েছেন, সেটি—'ডেভিড, যা খুশি তাই করবি, কারো পরোয়া করিস নি।' কেন তিনি এ উপদেশ দিতেন জানি নে, এর ভিতর

কোনো দ্বন্দ্ব আছে কি না সে তুমি ভেবে দেখো। মা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু, তিনি মৃদু আপত্তি জানাতেন। বাবা তখন অন্য কথা পাড়তেন, কিন্তু যেদিনই ঝড় দুর্যোগে 'পাবে' যেতে পারতেন না, সেদিনই আমাকে মজাদার কেচ্ছা-কাহিনী শোনাতেন এবং তার সবগুলোতেই ইঙ্গিত থাকত,—'যা খুশি তাই করো', এমন কি 'যাচ্ছেতাই করো'।

এ উপদেশ কিন্তু আমার মনের উপর কোনো দাগ কাটতে পারে নি—অন্তত তাই আমার বিশ্বাস।

এ ধরনের পরিবার আয়ারল্যাণ্ডে বিস্তর—এর মধ্যে কোনো বিদ্‌ঘুটে নূতনত্ব নেই। এর থেকে আমি কোনো হদিস পাই নি—দেখো, তুমি পাও কি না।

তবে কি বাইরের দূষিত আবহাওয়া? এমন কোনো পৈশাচিক ঘটনা যা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি, এবং সেই স্তম্ভনের সময় আমার অজানতে সে ঘটনা আমার হৃদয়মনে ঢুকে গিয়ে দুষ্ট জীবাণুর মতো বছরের পর বছর ধরে আমার সর্ব অচেতন সত্তা বিষিয়ে দিয়ে দিয়ে শেষটায় হঠাৎ একদিন আমার মগজে ঢুকে আমায় বিবেকবুদ্ধিহীন উন্মাদ করে দিল? কিংবা কোনো মারাত্মক প্রবঞ্চনা, —যে-দেবীকে হৃদয়ের পদ্মাসনে বসিয়ে দিনযামিনী পূজা করেছি, হঠাৎ দেখি সে মায়াবিনী, পিশাচিনী—আমার বুকের উপরে বসে আমারই হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে রক্ত শোষণ করছে? কিংবা প্রেমের দেউলের মমতাপ্রতিমা গোপনে গোপনে বারাঙ্গনার আচরণ করছে—হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে গেল, আমার বিশ্বসংসার অন্ধকার হয়ে গেল?

না। আমার চোখের সামনে ঘটে নি। শুনেছি। তা সে তুমিও শুনেছ, সবাই শুনে থাকে, বইয়ে পড়ে থাকে।

তবু কি উলটোটা? অবিশ্বাস্য আত্মবিসর্জন, বহুযুগের বিরহ-দহনের পর মধুময় পুনর্মিলন, সমরে লুপ্ত পুত্রের গৃহ-প্রত্যাগমনে মাতার বিগলিত আনন্দাশ্রু সিঞ্চন?

না। তাও দেখি নি। সেখানেও ইউ উইল ড্র ব্ল্যাঙ্ক!

তবে হ্যাঁ, আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা, মেব্‌লকে দেখা, তাকে পেয়েও না-পাওয়া।

॥ ১৫ ॥

আমার বাবা মা দুজনেই এক মাসের ভিতর মারা যান। আমি বৃত্তি পেয়ে লণ্ডনে পড়াশুনো করতে এলুম।

আমার মনে হয় বড় শহরে মানুষের জীবন বৈচিত্র্যহীন। অকস্মাৎ সাঙ্ঘাতিক সেখানে কিছু একটা ঘটে না। তার কারণ বড় শহরের জীবনস্রোত বয় অতিশয় তীব্র গতিতে। তুমি তার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছ খরবেগে। সে বেগে চলার সময় ডাইনে বাঁয়ে মোড় নেওয়া অসম্ভব। আর ছোট শহর, কিংবা গ্রামে জীবনগতি শান্ত, মন্দ। সে যেন গ্রামের নদী। তার উপর দিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় সামান্য খড়-কুটোটি নানা চক্করে বহু প্যাঁচ খেয়ে খেয়ে এগিয়ে যায়। দেখে মনে হয় তার জীবনে স্বাধীনতা অনেক বেশী।

মানুষের জীবনের উপর লণ্ডনের চাপ জগদ্দল, তার দাবি বহুল—কিন্তু বৈচিত্র্যহীন। সকাল থেকে রাত বারোটা অবধি মানুষ যে কী বদ্ধ পাগলের মতো ছুটোছুটি হুটোপুটি করে সেই তুমি মধুগঞ্জের লোক বুঝবে কী করে? এবং যতদূর দেখতে পাচ্ছি, থ্যাঙ্ক গড্, মধুগঞ্জকে কখনও বুঝতে হবে না।

কিন্তু জানো সোম, সেই খরস্রোতে ভেসে ভেসে হঠাৎ আমি একদিন শেষ সীমানায় পৌঁছে গেলুম। দেখি সম্মুখে ঘন নীল সমুদ্র আর তার উপর ফিরোজা আকাশের ঢাকনা। বিলেতের সমুদ্র আর আকাশ সচরাচর নীল রঙের বাহার ধরতে জানে না—কুয়াশা, বৃষ্টি আর বরফ তাকে করে রাখে ঘোলাটে, তামাটে, পাঁশুটে। আমার সঙ্গে সমুদ্রের চারি চক্ষের মিলন হল নিদাঘ মধ্যাহ্নে—নীলাম্বুজ আর নীলাকাশ সেদিন বর্ষণশেষে আতপ্ত কিশোর রৌদ্রে দেহখানি প্রসারিত করে দিয়েছিল।

সে সমুদ্র মেব্‌ল্।

তোমাকে বোঝানো অসম্ভব, সোম, কারণ এ জিনিস বোঝার জিনিস নয়। তোমার বহু সদ্‌গুণ আছে স্বীকার করি, কিন্তু প্রেম কী বস্তু তা তুমি জান না। কতবার দেখেছি ছোঁড়া-ছুঁড়ি পালিয়ে গিয়ে কেলেঙ্কারি করেছে, তুমি সর্বদাই সমাজের হয়ে তাদের উপর কড়া শাসন করেছ, পুলিসের কুলিশ-পাণি দিয়ে। তারা কিসের নেশায় পাগল হয়ে সমাজের সব বেড়া ভাঙল, সব দড়াদড়ি ছিঁড়ল তুমি কখনো বুঝতে পার নি। আমি দু-একবার ইঙ্গিত করে দেখেছি তুমি অন্ধ, বরঞ্চ নৈতিক, সামাজিক ধর্ম রক্ষা করা যার সর্ব প্রধান কর্তব্য সেই পাদ্রী বুড়ো-

বুড়ীর হৃদয়ে অনেক বেশি দরদ, তাদের চিত্ত বহুগুণে প্রসারিত।

মেব্‌ল্‌ সেই গ্রীষ্মের দুপুরে হাইড পার্কের গাছতলার বেঞ্চিতে বসে অলস নয়নে সার্পেন্টাইনের জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন দেখছিল।

তুমি তাকে দেখেছ, বহুবার বহু পরিবেশে দেখেছ, অবশ্য আমার চোখ দিয়ে দেখ নি, কিন্তু তুমি জান সে সুন্দরী। অসাধারণ সুন্দরী।

হিন্দু ধর্ম, হিন্দু দর্শনের অনেক কিছু আমি এদেশে এসে শুনেছি, পড়েছি; কিন্তু তার অল্প জিনিসই আমি বিশ্বাস করতে শিখেছি। তার একটা জন্মান্তরবাদ। না হলে কী করে বিশ্বাস করি সেই সামাজিক কড়াকড়ির যুগে বিনা মাধ্যমে কী করে আমাদের আলাপ হল, প্রথম দর্শনেই কী করে দুজনার হৃদয়ে একে অন্যের জন্য ভালোবাসা জন্মাল? এ যুদ্ধ বিলেতের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে, অজানা মানুষের সঙ্গে বিলেতে আলাপ-পরিচয় করা এখন আর কঠিন নয়, তার ধাক্কা সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমাদের আণ্ডাঘরেও এসে পৌঁছেছে, সে খবর তুমি জান, কিন্তু সে যুগে দু-দণ্ডের ভিতর এতখানি হৃদ্যতা পূর্বজন্মের সংস্কার ছাড়া অন্য কোনো স্বতঃসিদ্ধ দিয়ে বোঝানো যায় না।

মেব্‌ল আমার কাছে সমুদ্রের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল।

মধুগঞ্জ আমাদের লণ্ডনকে হার মানায়। এই বক্সওয়ালারা কেন যে ভ্যানর-ভ্যানর করে মধুগঞ্জের নিন্দে করে আমি ঠিক বুঝতে পারি নে, বোধহয় করাটা ফ্যাশান, কিংবা হয়তো ভাবে, না করলে খানদানী সায়েবরা ভাববে ওরা বুঝি নেটিভ, কালা আদমী বনে গিয়েছে।

লণ্ডন থেকে মধুগঞ্জ! এর চেয়ে দূরতর পরিবর্তন আমি কল্পনা করতে পারি নে।

সেই মধুগঞ্জে আমি অনেক কিছু পেলুম। ভগবান অকৃপণভাবে ঢেলে দিলেন তাঁর সব দৌলত, তাঁর তাবৎ ঐশ্বর্য। নৌকো বাচ থেকে আরম্ভ করে পাদ্রী-টিলার মেয়েগুলি।

ভালোই। এদের কথা উঠল। তুমি জান আমি ওদের সঙ্গে ঢলাঢলি করার মতলব নিয়ে পাদ্রী-টিলায় যাই নি, কিন্তু এক জায়গায় আমার অজানতে আমি একটা ভুল করে ফেলি। প্রাচ্য দেশের মেয়েরা যে এত স্পর্শকাতর হয় আমি অনুমান করতে পারি নি তাই আমি তাদের সামান্যতম গতানুগতিক হৃদ্যতা জানাতেই হঠাৎ দেখি, ওরা দিচ্ছে তরুণীর অকুণ্ঠ প্রেম। আমার আপসোসের অন্ত নেই যে, সে ভালোবাসার ন্যায্য সম্মান আমি দেখাতে পারি নি। আশা করি ওরা জানতে পেরেছে যে, আমি ওদের ফিরিঙ্গি বলে অবহেলা করি নি।

আমি জানতুম, তুমি এই বিশ্বাসটি ওদের ভিতর জন্মাতে পারবে তোমার পাকা মুন্সিয়ানা দিয়ে, তাই তোমারই হাতে এটি সঁপে দিয়েছিলুম।

তারপর আমি বিলেতে গেলুম মেব্‌ল্‌কে নিয়ে আসতে।

এই পৃথিবীর গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে সর্বত্রই প্রতি মুহূর্তে নরনারীর ভিতর প্রেম মুকুলিত হচ্ছে বিকশিত হচ্ছে, তার ফল কখনো মধুময় কখনো তিক্ত—এই হল জীবনের দৈনন্দিন, গতানুগতিক ধারা। কিন্তু যদি প্রেমের মেলা দেখতে চাও, প্রেম যেখানে অন্য সব-কিছু ছাপিয়ে উপচে পড়ছে, তবে একটি-বারের জন্য কোনো এক জাহাজে করে সপ্তাহ তিনেকের জন্য কোথাও চলে যেয়ো। দেখবে কী উন্মাদ অবন্ধন মেলার ফূর্তি সেখানে চলে—ইচ্ছে করেই 'মেলা' বলছি কারণ এ জিনিস দৈনন্দিন নয়। জাহাজের অধিকাংশ নরনারী সেখানে সমাজের সর্বপ্রকার কড়া বন্ধন থেকে মুক্ত, প্রতিবেশীকে ডরিয়ে চলতে হয় না পাছে সে কেলেঙ্কারি কেচ্ছা সর্বত্র রটিয়ে দেয়—জাহাজ মোকামে পৌঁছলেই তো সবাই ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি, কে কাকে জানাতে যাবে, কে কী করেছে? এবং সবচেয়ে বড় কথা, এ তিন হপ্তা মানুষ জীবন-সংগ্রাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সর্বপ্রকারের দায়িত্ব থেকে পূর্ণ মুক্ত। আহার নিদ্রা আশ্রয়—এ তিন সমস্যার সমাধান হওয়া মাত্রই, তা সে যত সাময়িকই হোক না কেন,—তিন সপ্তাহ কি কম সময়?—মানুষের জাগে আসঙ্গলিপ্সা, যৌনক্ষুধা! সে যেমন বিরাট তেমনি বিকট—স্থলবিশেষে। তাই এ রকম জাহাজে মানুষ এডনিস না হয়েও পায় কার্তিকের কদর, মোনা-লিসা না হয়েও ভিনাসের পূজা।

বৃথা বিনয় করবো না। আমি জানি আমি কুরূপ কুচ্ছিত নই। তাই আমার কাছে তখন বহু হৃদয় অবারিতদ্বার, বহু যুবতী আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘন ঘন সাপ খেলাবার বাঁশি বাজাতে আরম্ভ করেছিল। আর দু-চারটি ভীরু লাজুক তরুণী নির্জনে পেলে ফিক করে একটুখানি হেসে কিশোরী-সুলভ নাতিস্ফীত নিতম্বে সচেতন ঢেউ তুলে দিয়ে জাহাজের নির্জনতর কোণের দিকে রওয়ানা দিত।

কিন্তু আমি তো চলেছি আমার বধূর সন্ধানে। আমার ফিয়াঁসে, যে আমার ব্রাইড হতে যাচ্ছে, আমার বঁধু, যে আমার বধূ হতে চলেছে। প্রপেলারের প্রতি আঘাত আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারই কাছে, এই লক্ষ লক্ষ টাকার জাহাজ, হাজার হাজার টাকার বেতনভোগী কর্মচারীরা এরা সবাই অহোরাত্র খাটছে আমাকেই, শুধু আমাকেই, আমার রাণীর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। ঝড়-

ঝঞ্ঝায় এ জাহাজ ডুবতে পারে না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোপ পেলেও এ জাহাজ পৌঁছবে মার্সেলেস বন্দরে, যেখানে জাহাজ থেকে দেখতে পাব, আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন মেব্‌ল্ যে পোশাক পরে হাইড পার্কে বসে ছিল, সেই পোশাক পরে বন্দরের পারে দাঁড়িয়ে তার মভ্ রঙের রুমাল দোলাচ্ছে।

'ভগবান কোথায়?'—নাস্তিক জিজ্ঞেস করেছিল সাধুকে। কৃচ্ছ্রসাধনাসক্ত দীর্ঘতপস্যারত চিরকুমার সাধু বলেছিলেন, 'তরুণ-তরুণীর চুম্বনের মাঝখানে থাকেন ভগবান।' আমার হৃদয় আর আমার মেব্‌লের রুমাল-নাড়ার মাঝখানে থাকবেন স্বয়ং ভগবান।

থাক, সোম। আগেই বলেছি তোমাকে এ-সব বলা বৃথা। তবু বলছি, কেন জান। হয়তো বুঝতে পারবে, হয়তো হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারবে। অবিশ্বাস্য তো কিছুই নয়, অসম্ভবই বা কোথায়?

॥ ১৬ ॥

তুমি যে-সব ইংরেজদের চিনেছ তাদের ভিতর সত্যকার শিক্ষিত লোক কম। এবং যে দু-একটি লোক সাহিত্য বা অন্য কোনো রসের সন্ধান কোনোকালে-বা হয়তো রাখত, তারাও আণ্ডাঘরের আবহাওয়ায় পড়ে এবং রসকষহীন সরকারী-বেসরকারী কাজ করে করে স্থূল এবং অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। শেলি, কীট্‌স পড়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার জন্য বহুদিন বহু বৎসর ধরে মনে মনে হৃদয়ের অন্তস্তলে এক বিশেষ 'ধর্মসাধনা' করতে হয়। অল্প ইংরেজই সেটা করে থাকে, এবং করলেও সে আর পাঁচজনকে সে সম্বন্ধে কোনো খবর দেয় না। তাই ইচ্ছে করেই 'ধর্মসাধনা' সমাসটা ব্যবহার করলুম, কারণ তোমরা ঐ জিনিসকে করে থাক গোপনে গোপনে। আমার মনে হয় দুটো একই জিনিস, ধর্মসাধনা এবং কাব্যসাধনার শেষ রস নেই।

ফরাসীরা তোমাদের মতো। শক্ত সোমথ জোয়ান যদি গালগল্পের মাঝ-খানে হঠাৎ কবিতা আবৃত্তি আরম্ভ করে তবে আর পাঁচটা ফরাসী হকচকিয়ে ওঠে না, কিংবা বিষম খায় না। ফ্রান্সে তাই কাব্যজীবন এবং ব্যবহারিক জীবনের ভিতর কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তাদের প্রেম যে রকম অনেকখানি খোলা-খুলি, সে প্রেমকে তারা তেমনি কবিতা আবৃত্তি করে গান গেয়ে আর পাঁচজনের সামনে রূপ দিতে, প্রকাশ করতে লজ্জিত হয় না। তাই ইংরেজ হনিমুন করতে যায় ফ্রান্সে—জীবনের অন্তত ঐ কটা দিনের জন্য সে খোলাখুলি প্রেম

করতে চায়। তার জীবনের এ কটা দিন তোমাদের হোলির মতো। মাতব্বর কাশীশ্বর চক্রবর্তীকেও সেদিন আমি রং মেখে সং সেজে ঢং করতে দেখেছি। মুরুব্বী রায় বাহাদুর যদি প্যারিসে হনিমুন করতে যেতেন (ভাবতেই কি রকম হাসি পায়—প্যারিসের রাস্তায় চোগা-চাপকান-পরা রায়বাহাদুরের সঙ্গে নোলক-পরা চেলিতে জড়ানো আট বছরের বউ!) তবে তিনি অতি অবশ্য রাস্তার পাশের গাছতলায় দাঁড়িয়ে গলায় ঝুলানো হারমনিয়ামের প্যাঁ প্যাঁর সঙ্গে ভাটিয়ালি ধরতেন, খনে কনে-বউয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে ধেই ধেই করে খেমটা কিংবা পল্‌কা নাচ জুড়তেন। ফ্রান্স দেশের বোতলেই শ্যাম্পেন নয়, তার আকাশে বাতাসে শ্যাম্পেন ছড়ানো।

মার্সেলেস থেকে দশ মাইল দূরে ছোট্ট শহর আক্‌স্-আঁ-প্রভাঁসে আমরা বিয়ে করব বলে স্থির করলুম। বিয়ের ব্যবস্থা করতে করতে যে তিনদিন লাগল সে সময়টা আমরা মার্সেলেসের সেরা হোটেলে কাটালুম আলাদা কামরায়—তখনো বিয়ে হয় নি, এক ঘর করি কী করে? ফরাসীরা তাই দেখে কত না চোখ টিপে মুচকি হাসি হাসলে। একেই বলে ইংরেজের 'লেফাফা-দুরুস্তমি', ব্রিটিশ প্রুডারি, তোমাদের ভাষায় এদিকে ঘোমটা, ওদিকে খেমটা!

সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তার ঘরে যে যেতে পারতাম না তা নয়। এমন কি হোটেলওয়ালা বুদ্ধি করে আমাদের যে দুখানা ঘর দিয়েছিল তার মাঝখানে একটি দরজাও ছিল। সে দরজাটি ওয়ালপেপারের সঙ্গে এমন নিখুঁত কারিগরিতে মেশানো যে, আমাদের কারো নজরেই পড়ে নি। যে লিফ্‌ট্-বয় আমাদের স্যুটকেশ ঘরে নিয়ে এসেছিল তার বুঝতে বাকি রইল না যে, প্রেমের মন্দিরে আমরা একদম গাঁইয়া ভক্ত, আর ফরাসীরা সেখানে আমাদের তুলনায় বিদগ্ধ নাগরিক পাণ্ডা। অর্থাৎ ফরাসী লিফ্‌ট্-বয় পর্যন্ত বিলেতের ডন জুয়ানকে প্রেমের মুশায়েরায় দু-চারখানি মোলায়েম বয়েত শুনিয়ে দিতে পারে। একবাক্য ইংরেজি না বলে ছোকরা অতিশয় সংস্কৃত কায়দায় শুধু মুদ্রা দিয়ে বুঝিয়ে দিলে দরজাটা কোন্ জায়গায় এবং সেইটেই যেন আসল কথা নয়, যেন আসল কথা—ওটাকে দুদিক থেকেই বন্ধ করা যায়। মেব্‌লের মুখ একটুখানি রাঙা হয়ে গিয়েছিল।

যে দরজা বন্ধ করা যায়, সেটা খোলাও যায়। বাঙলা কথা।

জানি নে, মেব্‌ল্ তার দিকটে খোলা রেখেছিল কি না।

তোমাদের রাধাকেষ্টর দেখা হত কুঞ্জবনে, সেখানে দরজা-দেউড়ির বায়নাক্কা নেই। আমাদের দেশে দরজা নিয়ে বিস্তর কবিত্ব করা হয়ে গিয়েছে। অবশ্য তোমাকে সে বোঝানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম।

আমি কিন্তু যাই নি অন্য কারণে। যাকে দুদিন বাদে সব দিক দিয়ে আমি পাবই পাব, যে খনির সব মণি একদিন আমারই হবে, যে সমুদ্রের সব মুক্তা আমারই—একমাত্র আমারই গলায় একদিন দুলবে, সে খনিতে আমি ঢুকতে যাব কেন চোরের মতো, সে সমুদ্রে আমি কেন হতে যাব বোম্বেটে? মেব্‌লুকে আমি বরণ করতে যাব বিশ্বসংসারের প্রসন্ন আশীর্বাদ নিয়ে।

এবং সবচেয়ে বড় কথা, যৌন সম্পর্কে যদিও আমার দেশ তোমাদের তুলনায় অনেকখানি ঢিলে তবুও জিনিসটে আমার কাছে কখনো সরল বলে মনে হয় নি। আমার মনে কেমন জানি একটা ভয় কী যেন একটা সন্দেহ সব সময়েই জেগে থাকত। আশ্চর্য, নয় কি? যে সরল রহস্যের ফলে বিশ্বসংসারে প্রতি মুহূর্তে নবজীবন লাভ করছে পশুপক্ষী, ফুলে রেণুতে যার সহজ প্রকাশ, তার প্রতি ভয়, তার প্রতি সন্দেহ! এ ভয়, এ সন্দেহ আমার এখনো যায় নি। তুমি হয়তো এ চিঠি শেষ করার পর তার কারণ আমার চেয়েও ভালো করে বুঝতে পারবে।

১৫ই আগস্ট

আমি ভেবেছিলুম, এ চিঠি আমি একদিনেই শেষ করতে পারব; এখন দেখছি, ভুল করেছি। এত কথা যে আমার বুকের ভিতর জমা হয়ে আছে সে-কথা আমি জানতুম না। আমার অজানতে যে আমি এতখানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি এবং তারও এতখানি এখনো আমার স্মরণে রয়েছে সে-তত্ত্বই বা জানাব কী করে?

ওদিকে তুমি হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে সব-কিছু এক ঝটকায় জেনে নেবার জন্য। কিন্তু সোম, জীবন তো আর রহস্য-উপন্যাস নয় যে, কৌতূহল দমন না করতে পারলে শেষ ক-খানা পাতা পড়েই সব-কিছু জেনে নেওয়া যায়। জীবন বরঞ্চ গানের মতো। তার গতি বিচিত্র, তার বিস্তার বহু। আমার সে গান তোমাদের ভাটিয়ালীর মত মধুর হয় নি এবং সরলও হয় নি—তা না হলে আজ আমার এ অবস্থা কেন—এ গানে অনেক কমসুরা, অনেক বেসুরা। সে গানের রেকর্ড তুমি এক মিনিটে বাজাতে গেলে আরো বেসুরা ঠেকবে, আমার প্রতি অবিচার করা হবে।

অ্যাক্‌স্‌-আঁ-প্রভাঁসের একটি ছোট্ট গির্জেয় যেদিন আমাদের বিয়ে হয়, সেদিন বিধাতা ছিলেন আমাদের উপর অপ্রসন্ন। পুরোত যখন ভগবানের নামে একে অন্যকে স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিচ্ছেন, তখন বাইরে ভগবান ছাড়ছিলেন তাঁর হুঙ্কার—বৃষ্টি ঝড় আর বজ্রপাতের ভিতর দিয়ে। অ্যাক্‌স্‌

সেদিন যেন প্রথম আষাঢ়ে মধুগঞ্জ যে রুদ্র রূপ নেয় তাই নিয়েছিল। আমি যখন মেব্‌ল্‌কে বিয়ের আঙটি পরাচ্ছিলুম ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকে উঠে গির্জের সমস্ত রঙীন শার্সিগুলোতে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। মেব্‌ল্ তখন শিউরে উঠেছিল। আমি তার হাতে একটু চাপ দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করেছিলুম। পুরোত যখন গভীর কণ্ঠে গির্জাতে সেই গতানুগতিক প্রশ্ন শুধালেন, এই যুবক-যুবতীর মিলনে কারো কোনো আপত্তি আছে কি না, তখন কড়কড় করে বাজ পড়েছিল—আরেকটু হলে গির্জের গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে মেব্‌ল্‌ আমাকে জড়িয়ে ধরত। মেব্‌ল বড় ধর্মভীরু, আকাশে বাতাসে, ঘাসে ঘাসে সে ভগবানের অদৃশ্য অঙ্গুলি দেখতে পায়। আমি তার হাতে আরো একটু চাপ দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করেছিলুম।

সেদিন কিন্তু এ-সব দুর্যোগ আমার মনে কোনো দাগ কাটে নি। সেদিনের সে দুর্যোগে আমি ভগবানের করাঙ্গুলিসঙ্কেত দেখি নি, আজও দেখছি নে কিন্তু কেন জানি নে আজ যেন সমস্ত জিনিসটা এক ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে ধরা পড়েছে। দিনের আলোতে যে মাঠে ফুল কুড়িয়েছি, যে ঝরনায় পা ডুবিয়ে বসে ক্লান্তি জুড়িয়েছি, সন্ধ্যের অন্ধকারে সেখানে যেন প্রতি গর্তে কেউটের ফণা দেখতে পাচ্ছি। কী জানি, সব যেন ঘুলিয়ে গিয়েছে। কতবার ভেবেছি এ-সব কথা। কখনো এ-সব এলোমেলো চিন্তা পাট করে ভাঁজে ফেলে গুছিয়ে তুলতে পারি নি।

সে রাত্রে আবেগে, উত্তেজনায় মেব্‌ল্ আমার বুকে তার মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে তার ঢেউ-খেলানো শরীরে যেন আরেক ধরনের ঢেউয়ের পর ঢেউ জেগে উঠেছিল। আমার হাত 'ছল তার কোমরের উপর। আমি আমার হাত দিয়ে তার বিক্ষোভ শান্ত করার চেষ্টা করেছিলুম। চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, এ দু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয় হয় বেশি, রসগ্রহণ করা যায় কম। স্পর্শের মাধ্যমে পাওয়া যায় রস—অনুভূতি জ্ঞান যেটুকু সঞ্চয় হয় তা নগণ্য। স্পর্শের নিবিড়তা রসলোকে গভীরতম। সে মানুষকে একে অন্যের যত কাছে টেনে আনতে পারে অন্য কোনো ইন্দ্রিয় তা পারে না। চোখ দিয়ে যখন প্রিয়াকে দেখি কান দিয়ে যখন শুনি তার প্রেম নিবেদন, তখন সর্বচৈতন্য ভরে ওঠে এক বিপুল মাধুরীতে কিন্তু চুম্বনের ভিতর যখন তার স্পর্শলাভ করি তখন পাই গভীরতম একাত্মবোধ। বরঞ্চ চুম্বনেরও সীমা আছে, সেখানেও ক্লান্তি আছে; কিন্তু গায়ে হাত বুলনোর কোনো সীমাবন্ধন নেই। তাই মায়ের গভীরতম ভালোবাসার প্রকাশ পুত্রের

গাত্রস্পর্শে। আরেকটু সাদামাঠা ভাষায় বলি, তোমাদেরই ভাষায়, মিঠে কথায় চিঁড়ে ভেজে না—তাতে দিতে হয় জল আর গুড়ের স্পর্শসুখ।

একটু চেষ্টা করলে হয়তো স্মরণ করতে পারবে ঠিক ঐ সময় মধুগঞ্জ অঞ্চলে হঠাৎ স্বদেশী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কর্তারা বিচলিত হয়ে আমাকে তার করেন, তদ্দণ্ডেই ছুটি বাতিল করে কর্মস্থলে ফিরে আসতে। সে তার লণ্ডন, প্যারিস বহু জায়গায় বিস্তর গুত্তা খেয়ে শেষটায় এসে পৌঁছয় অ্যাক্স্-আঁ-প্রভাঁসে আমাদের বিয়ের পরদিন ভোরবেলায়। তৎক্ষণাৎ ছুট দিতে হল মার্সেলেস বন্দরের দিকে।

মার্সেলেস বন্দরে জাহাজ ধরা আমাদের মধুগঞ্জের বাজার-ঘাটে নৌকো ধরার মতো। সেখানে দুনিয়ায় জাত-বেজাতের জাহাজ—এমন কি গ্রীক, মিশরী, তুর্কী পর্যন্ত—খেয়া নৌকার মতো বসে থাকে এবং সেখানে দিব্যি দরদস্তুর করা যায়, কত দামে তোমাকে ভূমধ্যসাগরের খেয়া পার করে পোর্ট সঈদ নিয়ে যাবে—মধুগঞ্জের ঘাটে যেরকম দর-কষাকষি করি। মার্সেলেসে ভারতগামী বড় জাহাজ না পেলে পোর্ট সঈদে গিয়ে সেখান থেকে অনায়াসে অন্য জাহাজ ধরা যায়—ঐ খাড়ি দিয়েই তো সব জাহাজকে বোম্বাই, কলম্ব যেতে হয়।

আমাদের কপাল ভালো না মন্দ বলতে পারব না; কোনো ভালো ব্যবস্থাই করতে পারলুম না। শেষটায় একটা মাল-জাহাজ জুটে গেল, সেটাই দেখলুম হিন্দুস্থান পৌঁছবে সক্কলের আগে, কারণ ছাড়বে ঘণ্টা তিনেক পরেই। তবে অসুবিধে এই যে, আমাদের নিজেদের জন্য কোনো কেবিন আর তাতে খালি নেই। আমাকে ঢুকতে হবে একটা পুরুষদের কেবিনে, আর মেব্‌ল্‌কে একটা মেয়েদের। একেবারে ভারতীয় ব্যবস্থা। মর্দানা জানানা।

মেব্‌ল্ খুঁত-খুঁত করেছিল।

আমি হেসে বলেছিলুম, যে দেশে যাচ্ছ সেখানে ঠিক এই ব্যবস্থা। বিলেতে স্মোকিং, নন্-স্মোকিং। ওদেশে লেডিজ এবং জেণ্টলমেন।

আমার মনে হয়েছিল, ভালোই হল, তাড়াতাড়ির কী?

ছোট জাহাজের এক কোণে, নিভৃতে, গুটনো দড়াদড়ির মাঝখানে আমরা দুজনায় পাশাপাশি বসতুম। সমুদ্রের উদ্দাম হাওয়া মেব্‌লের চুল নিয়ে হুলস্থুল বাধাত, কখনো খানিকটে নোনা জলের সূক্ষ্ম কণা তার গালে চুমো খেয়ে যেত, কখনো বা সমুদ্রের চাঁদের জোরালো আলো এসে তার মুখ অদ্ভুত দীপ্তিতে উজ্জ্বল

করে তুলত। রাত একটা, দুটো, তিনটে বেজে যেত। একে অন্যের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গসুখ বর্জন করে কেউই আপন কেবিনে যেতে রাজী হতুম না। কী হবে কেবিনে গিয়ে। সেখানে তো শুধু ঘুমের অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি নেই। এখানে সমুদ্র-আকাশ, আলো-অন্ধকার, চন্দ্র-তারা তাদের কত অফুরন্ত সৌন্দর্য রাত্রির পর রাত্রি উছলে ঢেলে দিচ্ছে। কেউ দেখবার নেই। এই বিরাট সমুদ্রের ক ইঞ্চি জায়গা জুড়ে আছে ক-খানা জাহাজ? এবং সেই কটি জাহাজে সুষুপ্তিতে নিমগ্ন না হয়ে এ সৌন্দর্য পান করছে কটি নরনারী? আমিও এ সৌন্দর্য এ রকম ভাবে, তার পরিপূর্ণরূপে, ক্রমবর্ধমান গতিতে আগে কখনো দেখি নি। এর পূর্বে যে একবার এসেছি গিয়েছি তখন বেশির ভাগ সময় কেটেছে লাউঞ্জে তাস খেলে, 'বারে' হুইস্কি খেয়ে, কিংবা কেবিনে নাক ডাকিয়ে। 'বার' থেকে শেষ গেলাস খেয়ে কেবিনে যাবার সময় ডেকে দাঁড়িয়ে হয়তো দু-পাঁচ মিনিটের জন্য টুরিস্টদের মতো 'ও হাউ গ্র্যাণ্ড' বলেছি। পাকা ইংরেজ পাঁচজনের সামনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনেকক্ষণ ধরে দেখবার সাহস ধরে না—পাছে লোকে ভাবে লোকটা হয়তো কবি। 'ওয়াট? হ্যাট চ্যাপি রাইটস্ পোয়েম্স্? গশ্! ওয়া(ট)ফ(র)! মাই গিনেস্ (গুডনেস্)!' তার উপর আমি—অব অল পার্সন্স্—পুলিসের লোক!

আমরা জাহাজে উঠেছিলুম কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে আর বোম্বায়ে নামি পূর্ণিমাতে।

এখানে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, সোম, কিছু মনে কোরো না, সেটা যদি উল্লেখ করি। এর সঙ্গে আমার মূল বক্তব্যের কোনো যোগ নেই। তোমার মনে আছে কি না জানি নে, মধুগঞ্জে তোমার সঙ্গে পরিচয়ের দুদিন পরেই তুমি কথায় কথায় বলেছিলে, 'পরশু তো পূর্ণিমা, সমস্ত রাত নৌকো বাওয়া যাবে।' আমি তখন কিছু বলি নি। পরে দেখলুম, শুধু তুমি না, তোমাদের দেশের আর সবাইও চাঁদের বাড়া-কমা সম্বন্ধে সব সময়েই সচেতন। আমরা কেন অচেতন থাকি তার কারণ আমাদের দেশে বারো মাস যে কোন রাত্রে বৃষ্টি, ঝড় হতে পারে, শীতকালে বরফ, আর কুয়াশা তো লেগেই আছে চার শ পঁয়ষট্টি দিন—ইচ্ছে করেই চার শ বললুম। ওখানে কে হিসেব রাখে চাঁদ রাতের বেলায় কখন যায়, কখন আসে, মাজা-ঘষা কাঁসার থালার মতো ঝকঝক করে, না নরুনে কাটা নখের মতো আকাশ থেকে কেটে পড়ে গাছের ডগায় আটকে থাকে।

ভারতবর্ষের চাঁদকে না চিনে মফস্বলে কোন্ পুলিস ঠিকঠিক কাজ করতে পারে? পূর্ণিমাতে চুরির এলাকায় মোতায়েন করলে আধা ডজন পুলিস,

অমাবস্যায় তিনটে! একমাত্র বর্ষাকালেই আগেভাগে কিছু ঠিক করা যায় না। বিলেতে বারোমাস তাই।

কিন্তু আমি চাঁদকে সত্যি চিনতে শিখলুম জাহাজে, মেব্‌লের সঙ্গে। কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে চাঁদ কখন ওঠেন, কতখানি কাত হয়ে ওঠেন আর শুক্লা সপ্তমীতে চাঁদ কখন অস্ত যান, এদিকে কাত হয়ে না ওদিকে কাত হয়ে সে আমি ভালো করে জানলুম জাহাজে, ডেক-চেয়ারে, মেব্‌লের গা ঘেঁষে। ক্লান্তিতে সে বেচারী চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ত, তবু কেবিনে ঘুমুতে যাবে না। আমি ডেক-চেয়ারে ঘুমুতে পারি নে তাতে কিন্তু আমার কোনো ক্ষোভ ছিল না।

১৭ই আগস্ট

ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে প্রচ্যের প্রথম পরিচয় হয় পোর্ট সঈদে।

পোর্ট সঈদের সঙ্গে গোটা মিশরের অতি অল্পই যোগসূত্র। তাই পোর্ট সঈদ দেখে মিশর সম্বন্ধে রায় প্রকাশ ভুল। ও-শহরটা জন্মেছে এবং বেঁচে আছে জাহাজ-যাত্রীদের কল্যাণে। এবং জাহাজে যে রকম বহু যাত্রী কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত হয়ে নব নব উল্লাস-উত্তেজনার সন্ধান করে, এখানেও ঠিক তাই। বরঞ্চ বলব বেশি। বরঞ্চ বলব, জাহাজে তুমি কী করলে না করলে তার সন্ধান তবু কেউ কেউ পেয়ে যেতে পারে, এখানে সে বালাই-ই নেই। এখানে তুমি ঘণ্টা পাঁচেক কী করে কাটালে, তার খবর জানবে কে? দেশভ্রমণ বড় ভাল্‌ জিনিস—তার 'এক্‌সস্‌ট্‌ পাইপ' দিয়ে মেলা পাপ বেরিয়ে যায়।

পোর্ট সঈদের পাপ লুকিয়ে রাখা যায় না। মেব্‌লের চোখে পর্যন্ত তার অভদ্র ইঙ্গিত খোঁচা মেরেছিল—যদিও আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি, ও যেন সামান্য দু-একটা কেনাকাটা করে, আর গোটা দুই মসজিদ দেখেই জাহাজে ফেরে।

শেষটায় মেব্‌লকে বললুম, ও যে-দেশে যাচ্ছে, সেখানকার লোক লাঞ্চ, ডিনার আরম্ভ করে তেতো জিনিস দিয়ে। প্রাচ্যের সঙ্গে মোলাকাত-দাওয়াতের আরম্ভেই পোর্ট সঈদের উচ্ছেভাজা, যদিও অনেক বুড়বক্‌দের কাছে সেই বস্তুই ক্রিসমাসকেক্‌ লেডি ক্যানিং বলে মনে হয়।

পোর্ট সঈদ মিশরের প্রতীক নয়, বোম্বাইকে বরঞ্চ ভারতবর্ষের শহর বলা চলে। তাই যখন বোম্বাই দেখে মেব্‌ল খুশি হলো, তখন আমার ভয়-ভাবনা অনেকখানি কেটে গেল। যদিও সে বেচারী বোম্বাইয়ের রাস্তায় হাতি সাপ আর গৌরীশঙ্করের জন্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে, দেখতে না পেয়ে একটু মন-মরা হয়েছিল বৈকি!

বোম্বাইয়ে নেমেই ধরতে হল কলকাতার মেল। সেখানে নেমে তড়িঘাড় ফের শেয়ালদা—গোয়ালন্দ-চাঁদপুর হয়ে মধুগঞ্জে। মেব্‌ল্‌ অভিভূতের মতো গাড়িতে জানালার কাছে বসে, গোয়ালন্দী জাহাজে ডেক-চেয়ারে খাড়া হয়ে দুচোখ দিয়ে বাইরের দৃশ্য যেন গিলছিল। তার কাছে সবই নূতন, সবই বিচিত্র। তার আনন্দে কিন্তু কাঁটা ফোটাত তোমাদের দেশের দারিদ্র্য। স্টেশনে স্টেশনে ভিখিরি দেখে দেখে শেষটায় বেচারী অন্য দিকে মুখ ফেরাত। বরঞ্চ আমি আয়ারল্যাণ্ডের ছেলে, ইংরেজ রাজত্বের ফলে আমার দেশে কী হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমি কিছুটা সচেতন, কিন্তু লণ্ডনের মেয়ে মেব্‌ল্‌ এ-সব জানবে কী করে? আবার সব দারিদ্র্যের জন্য কেবল ইংরেজই দায়ী, এই সহজ সমাধানই বা তাকে বলি কী প্রকারে? ভাবলুম, মেব্‌ল্‌ বোকা মেয়ে নয়, নিজের থেকেই আস্তে আস্তে সবকিছু বুঝে নেবে।

মধুগঞ্জ আর আমাদের বাঙলোটি দেখে মেব্‌ল্‌ মুগ্ধ—ঠিক একদিন আমি যে রকম মুগ্ধ হয়েছিলুম। আম, জাম, নিম, লিচু গাছের কোনোটাই সে কখনো দেখে নি। খানার টেবিলে যে-সব ফল রাখা হল, তারও সব কটাই তার অজানা। 'কারি' যে এক নয়, দশ-বিশ রকমের হয়, সে কথা মধুগঞ্জে এসে প্রথম শুনল। এ-সব দেখে শুনে মেব্‌লের বিশ্বাস হল, অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার-ল্যাণ্ডে ওয়াণ্ডার করবার মতো কিছুই নেই।

এ-সব জিনিস তোমাকে এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলছি কেন সোম? একটু পরেই বুঝতে পারবে।

অ্যাক্‌স্‌-আঁ-প্রঁভাস ছাড়ার পর মধুগঞ্জে এসেই আমাদের সত্যকার হনিমুন আরম্ভ হল। হনিমুন! হায় ভগবান, না শয়তান—কাকে ডাকব?

এক মাস ধরে প্রতি রাত্রে যে মর্মান্তিক সত্য আমার সর্বাঙ্গে চাবুক মেরে গেল, তার মূল ট্রাজেডি—আমি নির্বীর্য—ইম্পোটেণ্ট। মেব্‌লকে যৌনতৃপ্তি দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

কথাটা কত সহজে বলা হয়ে গেল। এ রকম সহজ কথা শোনা তোমার আমার দুজনেরই অভ্যাস – পুলিসের লোক হিসেবে। জজ কত সহজ সরল ভাষায় আসামীকে বলেন, 'তাই তোমার ফাঁসি।' কিন্তু সে কি তখন তার পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারে? পরেও কি পারে? এর অর্থ তাকে বুঝতে হয় প্রাণ দিয়ে এবং প্রাণ দেবার পর বোঝাবুঝির রইলই বা কী?

আমি ইম্পোটেণ্ট। রায়টা কত সহজ। কিন্তু এর সম্পূর্ণ অর্থ আমি এখনো বুঝি নি। দিনে দিনে পলে পলে পদাঘাত খেয়ে খেয়ে যেটুকু বুঝতে

পেয়েছি সে জিনিস আমি তোমাকে কিংবা এ সংসারের অন্য কাউকে বোঝাব কী করে? আমার যেদিন ফাঁসি হবে সেদিন আমি বোঝাবুঝির বাইরে চলে যাব বটে, কিন্তু তোমরা হয়তো সেই দিনই খানিকটে বুঝতে পারবে।

পনেরো দিন পরে তাই আমি কলকাতা গিয়েছিলুম, ডাক্তারদের কাছে। তাঁরা অনেক পরীক্ষা করে যা বললেন সেটাও অতি সহজ। নিজের থেকে যদি না সারে তবে ওষুধপত্রে কিছু হবে না। কলকাতার ডাক্তারদের হাইকোর্টে আমার মৃত্যুদণ্ড বহাল রইল।

ফিরে এসে যখন শুনলুম তুমি রটিয়েছ আমি কলকাতা গিয়েছি সরকারী কাজে তখনই বুঝতে পারলুম, তোমার আনক্যানি ষষ্ঠবুদ্ধি দিয়ে তুমি বুঝতে পেরেছ যে, কিছু একটা হয়েছে এবং আর পাঁচজন যেন তার কোনো ইঙ্গিত না পায়—তাই ও গুজবটা রটিয়েছ। থ্যাঙ্কস্।

এত সরল জিনিস, কিন্তু আমার কাছে এখনো এটা রহস্য।

আমি দেখতে ভাল, সৌন্দর্যবোধ আমার আছে, আমি প্রাণবান পুরুষ, আমার স্বাস্থ্য ভালো, আবার জোর দিয়ে বলছি, সোম, আমার মতো স্বাস্থ্য পৃথিবীর কম লোকই পেয়েছে, আমার অর্থের অভাব নেই, বিলাসেও আমার ঝোঁক নেই, পাঁচজনের তুলনায় আমাকে বোকা বলা যেতে পারে না, এবং সব চেয়ে বড় কথা মেব্‌লের মতো সুন্দরী, প্রেমময়ী রমণী আমি পেয়েছি প্রিয়ারূপে পত্নীরূপে, সে আমাকে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবাসে, আমাকে সে হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিয়েছে—

এই পরিপাটি প্যাটার্নটি বোনার পর ভগবানের এ কি নিষ্ঠুর ঠাট্টা না শয়তানের অট্টহাসি! এই পার্ফেক্ট প্যাটার্নটির উপর কে যেন ছড়িয়ে দিলে নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করে তার তাজা রক্ত। তোমাদের ভাষায় বলতে হলে, সুন্দর দুর্গাপ্রতিমা বহু যত্নে তৈরি করার পর তার উপর কে যেন ছিটিয়ে দিলে গোরক্ত। মর্মর মসজিদের মেহরাবে না-পাক শুয়রের খুন!

কেন, কেন, কেন?

আমি কোনো উত্তর পাই নি।

অনেক ভেবেছি। অনেক ভেবেছি বললে অল্পই বলা হল। আট বছর ধরে ঐ একটি কথাই ভেবেছি বললে ভুল বলা হবে না। কাজকর্মে লিপ্ত থাকার সময় আমার চেতন মন এ সমস্যা ভুলে যেত সত্য, কিন্তু হাতের কাজ শেষ হওয়া মাত্রই মন আবার সেই প্রশ্নে ডুব মারত। এখনো মারে। আমার এ জীবন-চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার মন ঐ কথাই ভাববে। আমি শেষ

দিন পর্যন্ত ইডিয়ট ইম্বেসাইলের মতো খাদ্য শুধু চিবিয়েই যাব, কখনো গিলতে পারব না। এই যে পাঁচ লক্ষ ক্যাণ্ডল-লাইটের জোর সার্চলাইট আমার চোখের উপর জ্বলছে সেটাকে কখনো সুইচ্-অফ্ করতে পারব না।

নিরাশ হয়ে আমি এক বৎসর ধরে অনেক ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি নি। সব ধর্মই দেখি সন্ধান করে একই বস্তু—তার নাম স্যালভেশন, মোক্ষ, নির্বাণ, নজাত। কিন্তু আমি তো স্যালভেশন চাইছি নে! আট বছরের বাচ্চা কি সুন্দরী কামনা করে?

তোমরা অর্থাৎ প্রাচ্যের লোকই তাবৎ ধর্ম বানিয়েছ। আমরা পশ্চিমের লোক, কী এক অদ্ভুত যোগাযোগের ফলে তারই একটা, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছি। কিন্তু মনে হয়, স্যালভেশন জিনিসটের প্রতি আমাদের ক্ষুধা নেই বলে আমরা ধর্মটা নিয়েও নিই নি। তা না হলে এদিকে বলছি, কেউ ডান গালে চড় মারলে বাঁ গাল এগিয়ে দেবে, ওদিকে দেখো জর্মনদের মারার জন্য আমরা শত শত কৌশল বের করছি, লক্ষ লক্ষ লোক মারছি। শুধু কি তাই? 'ডান গালে চড় মারলে বাঁ গাল এগিয়ে দেবে', এ ধর্মে যে লোক বিশ্বাস করে না তাকে এটা গেলাবার জন্য কত শার্লমেন, কত পোপ কত লোককে মেরেছে! পাদ্রী-টিলার বুড়ো জোন্‌কে বাদ দাও। বাদবাকি মিশনারিরা কী করছে? অসহায় নিরুপায় নিগ্রোদের জীবন অতিষ্ঠ করে তাদের ক্রীশ্চান বানাচ্ছে।

শুধু একটা ধর্মে আমি কিছুটা হদিস পেয়েছি। এবং আশ্চর্য সে ধর্মে আজ পৃথিবীতে বিশ্বাস করে বড জোর দশ লক্ষ লোক। পার্সীদের ধর্ম, জরথুস্ত্রী ধর্ম।

জরথুস্ত্র বলেন, সৃষ্টির প্রথম থেকেই আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব। আলোর প্রতীক আহুর মজদা—আমাদের ভাষায় ভগবান—আর অন্ধকারের প্রতীক আহির মন—আমাদের ভাষায় শয়তান। জরথুস্ত্রীদের মতে যারা আহুর মজদার পক্ষে তাদের বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত এ যুদ্ধে জয়ী হবেন তিনিই। আহির মন আহুর মজদার সঙ্গে পেরে উঠবে না।

সংসারে যা কিছু সত্য শিব সুন্দর—তা আহুর মজদার সৃষ্টি, আর যত কিছু মিথ্যা, অমঙ্গল, কদর্য—তা আহির মনের।

তবে কোন্ সুস্থ মানুষ এই শয়তানের পক্ষ নেবে?

সেই তো মজা সোম, সেই তো মজা।

দেখো নি, এ সংসারে উন্নতির জন্য, স্বার্থের খাতিরে মানুষ কতখানি মিথ্যাচারী, ক্রূর, মিত্রঘ্ন হয়। আমরা পুলিসের লোক, আমাদের বিশ্বাস এই ধরনের

লোকই পৃথিবীতে বেশি। এরা মুখে ভগবান আহুর মজদাকে মানে, পুজো চড়ায়, শিরনি বিলোয়, গির্জাতে মা-মেরির সামনে মোমবাতি জ্বালে, কিন্তু আসলে কি এরা আহির মনকেই জীবনদেবতারূপে বরণ করে নেয় নি? আপন জানা-অজানায় এরা কি মেনে নেয় নি যে—সুদূর ভবিষ্যতে যা হবার হবে, মজদা জিতুন আর মনই জিতুন, আমার এ জীবনকালে যখন দেখতে পাচ্ছি ক্রূর কঠিন মিথ্যাচারী না হয়ে আমি সাংসারিক উন্নতি করতে পারব না তখন আর গত্যন্তর কী?

এদের সবাইকে আমি দোষ দিই নে, সোম। কাচ্চা-বাচ্চা রয়েছে, তাদের খাওয়াতে পরাতে হবে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবের কাছে, বিশেষ করে স্ত্রীর কাছে—যে তোমাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে বসে আছে—, প্রতিদিন মাথা হেঁট করে স্বীকার করা যে আমি জীবনযুদ্ধে হেরেই চলেছি! কে শুনতে চায় সত্যাবলম্বন করে কিংবা না করে—এ কর্ম কি সহজ?

তবেই দেখো সোম, পৃথিবীতে অধিকাংশ লোকই এ যাবৎ কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে যে, উপস্থিত আহির মনই শক্তিশালী, তাকে না মেনে উপায় নেই। এমন কি তাদের একটা 'বনাফাইডি' 'ডিপেন্স্' পর্যন্ত রয়েছে। শেষ বিচারের দিন যখন আহুর মজদা এদের শুধাবেন, 'তোমরা আহির মনের পক্ষ নিয়েছিলে কেন?' উত্তরে তারা ক্ষীণকণ্ঠে বলবে—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তখন তিনিই শক্তিমান—'তখন, হুজুর, তিনিই ছিলেন শক্তিশালী, তাঁকে না মেনে উপায় ছিল কি?' এটা কি খুব সদুত্তর? কেন ভেবে দেখো, গ্রামের জুলুমবাজ জমিদারের ভয়ে যখন প্রজারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তখন তুমি কি সব সময় "ধর্মের শোলোক্" কপচাও?'

কিন্তু আমার জীবনে এ দর্শনের প্রয়োগ কোথায়?

পৃথিবীর সর্বত্র প্রাচীন শাস্ত্রেই আছে, অতি পূর্বযুগে নাকি একবার এক বিরাট বন্যা হয়েছিল; প্রাচীন আসিরীয় বাবিলনীয় প্রস্তরগাত্রে সে ঘটনার কথা খোদাই করা আছে, বাইবেলে তার বর্ণনা আছে, তোমাদের শাস্ত্রেও আছে কেশব তখন মীন-শরীর ধরে বেদ বাঁচিয়েছিলন, অর্থাৎ সে বন্যায় তোমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি ভেসে যায় নি, কোনো এক মহাপুরুষ তার শ্রেষ্ঠতম জিনিস বাঁচাতে পেরেছিলেন।

এই বন্যা নিয়ে একটি আধা-খ্রীশ্চানী আধা-মুসলমানী গল্প আছে।

সেই বন্যা আসার পূর্বে জেহোভা তখনকার দিনের পয়গম্বর নূহকে ডেকে বললেন, বন্যায় সব ভেসে যাবে, তুমি একটা নৌকো বানিয়ে তাতে পৃথিবীর সব গাছ, ফুলের বীজ এবং যত প্রকারের প্রাণী এক-এক-জোড়া করে রেখো। বন্যায়

পর তাই দিয়ে পৃথিবী আবার আবাদ করবে। সাবধান, কিছু যেন খোয়া না যায়।

নূহ তাই করলেন, কিন্তু বন্যার পর দেখেন কী, ইঁদুরে তাঁর আঙুরের বীজ খেয়ে ফেলেছে। আঙুর ফলের রাজা। গোঁজামিল দিয়ে সে ফলটা হারিয়ে যাওয়ার কেচ্ছা তিনি চাপা দিতে পারবেন না। ভারি বিপদে পড়লেন।

ওদিকে কিন্তু হুঁশিয়ার শয়তানও সব মাল এক-এক প্রস্ত করে রেখেছিল। সে তখন নূহকে তার বাঁচানো আঙুরের বীজ দেবার প্রস্তাব করলে—তার বীজ তো আর ইঁদুর শয়তানি করে খেতে পারে না—অবশ্য কুমলতব নিয়ে। নূহের মনেও ধোঁকা ছিল, কিন্তু তিনি তখন নিরুপায়—বে-আঙুর দুনিয়া নিয়ে তিনি আল্লাকে মুখ দেখাবেন কী করে ?

পৃথিবীর জমিতে শয়তানের স্বত্ব নেই। তাই শর্ত হল, নূহ দেবেন জমি, শয়তান দেবে আঙুরের বীজ। গাছের তদারকিও ৫০-৫০।

নূহ তো যত্ন করে সকাল সন্ধ্যা চারার গোড়ায় ঢালেন সুমিষ্ট, সুগন্ধি বসরাই গোলাপজল আর শয়তান ঢালে গোপনে গোপনে না-পাক শুয়রের রক্ত।

নূহের পাক পানির ফলে, ফলে উঠল মিষ্টি আঙুর ফল। আঙুরের মতো ফল পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু শয়তান যে দিয়েছিল না-পাক চীজ; তারই ফলে আঙুর পচিয়ে তৈরী হয় মদ। সেই মদ খেয়ে মানুষ করে মাতলামো, যত রকমের জঘন্য পাপ।

আহুর মজদা আমার জীবনের প্যাটার্ন গড়েছিলেন অতি যত্নে, ভালো কোনো রঙই তিনি সে প্যাটার্নে বাদ দেন নি, সে কথা তোমাকে পূর্বেই বলেছি।

আহির মন আড়ালে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। সে তার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। প্যাটার্ন যখন শেষ হবার উপক্রম তখন সে তার ভিতর ছেড়ে দিল মাত্র একটি পোকা, এক রাত্রেই প্যাটার্ন কুটিকুটি হয়ে গেল।

বিশ্বকর্মা তিন ভুবনের সুন্দর সুন্দর জিনিস নিয়ে তিলে তিলে গড়লেন অনবদ্যা তিলোত্তমা। আহির মন তার রক্তে ঢেলে দিল গলিত কুষ্ঠের ব্যাধি।

এ প্যাটার্ন রিপু-করা, এ গলিত কুষ্ঠকে নিরাময় করা আহুর মজদার মুরদের বাইরে।

১৮ই আগস্ট

যৌবনে বেঁচে থাকার আনন্দেই (জোয়া দ্য ভিভ্র্) মানুষ এত মত্ত থাকে যে, মোক্ষের সন্ধান সে করে না। শেলি না কে যেন বলেছেন,

I have drunk deep of joy
And I will taste on other wine to-night.

যখন মানুষ সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়, অথবা যখন বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে ভয় পায় তখনই সে ও-সব জিনিস খোঁজে। এ-কথা শুধু ব্যক্তির পক্ষে সত্য নয়, গোটা জাতির পক্ষেও খাটে। তোমাদের জাতি যে কত পুরনো সেটা শুধু এই তত্ত্ব থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে তোমরা মোক্ষের অনুসন্ধান আরম্ভ করেছ খ্রীষ্ট-জন্মের পাঁচ শ কিংবা হাজার বছর পূর্বে। মুসলমানরা করল খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় ছ শ বছর পরে। তাই দেখো, এই মধুগঞ্জের মুসলমানরাই তোমাদের তুলনায় ফুর্তি-ফার্তি করে বেশি; কামায় টাকাটা, খর্চা করে পাঁচসিকে।

আইরিশম্যানদের কাছেও মোক্ষ-সন্ধান এসেছে সম্প্রতি—তাও পাঁচহাত হয়ে, ঘষা-মাজা খেয়ে। তাই আমার জীবনে না ছিল মোক্ষ-সন্ধানের জাতীয় ঐতিহ্য, না ছিল কণামাত্র ব্যক্তিগত প্রয়োজন। যে সব ধর্মের কথা এসে যাচ্ছে সেগুলোর অনুসন্ধান আমি করেছি আহির মনের মার খেয়ে। এবং যে সব মীমাংসায় পৌঁছেছি (তার কটা সম্বন্ধেই বা আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ?—সম্পূর্ণ সত্য তো ভগবানের হাতে, মানুষের চেষ্টা তো ক্রমাগত যতদূর সম্ভব কাছে আসবার—) সেগুলো মাত্র কিছুদিন হল।

তাই আমার এ 'জবানবন্দিতে' আহুর মজদা, আহির মনের কথা আসা উচিত ছিল হয়তো সর্বশেষে। কিন্তু তা-ই বা বলি কি করে? আমরা ইতিহাস লিখি ক্রনোলজিকালি—কোন্ ঘটনা আগে ঘটেছিল, কোন্‌টা পরে সেই অনুযায়ী। কিন্তু অভিধান লেখার সময় অ্যালফাবেটিকালি; যে শব্দ পৃথিবীতে প্রথম জন্ম নিয়েছিল সেইটে দিয়েই আমরা অভিধান লেখা আরম্ভ করি নে। আমার জীবন অভিধান তো নয়ই, ইতিহাসও নয়। আমি মরে যাওয়ার পর আমার জীবন তোমার কাছে ইতিহাসের রূপ নেবে। ইতিহাসের বর্তমান থাকে না, ভবিষ্যৎ নেই, তার আছে শুধু ভূত। আমি বেঁচে আছি, কাজেই আমার ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু সে থেকেও নেই আর ভূত আর বর্তমান এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে, তার জট ছাড়িয়ে পাকাপাকি কালানুক্রমিকভাবে সব কিছু বলতে পারব না।

আহির মনকে স্বীকার করে আমি অধর্ম করেছি? অধর্ম অন্যায় যাই করে থাকি নে কেন, আমি কিন্তু ভণ্ডামি করি নি। সে-ই আমার সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা। কিন্তু আবার দেখো, আরেক নূতন ডিলেমায় পড়ে গেলুম। আমি যদি ভণ্ডামি ঘৃণা করি তবে আমি আবার আহুর মজদাপন্থী হয়ে গেলুম! ভণ্ডামি

তো আহির মনের, সত্যনিষ্ঠা মজদার। এ দ্বন্দ্বের কি অবসান নেই?

হয়তো আছে হয়তো নেই। তাই হয়তো তখন অন্তরের দ্বন্দ্ব মুলতবী রেখে দেখতে হয় কর্মক্ষেত্রে মানুষ কী করে। সেখানে তো মানুষকে অহরহ ডিসিশন— মীমাংসা, নিষ্পত্তি—করতে হয়। এ সংসারে সকলের ভিতরেই কিছু না কিছু হ্যামলেট লুকিয়ে আছে যে সর্বক্ষণ 'টু বি অর নট টু বি'র সন্দেহ-সমুদ্রে দোদুল দোলায় দোলে. কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডন্ কিকৃসট্ও রয়েছে যে ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে, নঙা-তলোয়ার হাতে নিয়ে যাকে তাকে তাড়া লাগায়—আমরা যাকে বলি বার্কস আপ দি রঙ্ ট্রী—যে গাছে বেড়াল ওঠে নি তারই তলায় দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে করতে থাকে ঘেউ-ঘেউ।

বেচারী মেব্ল্! সে আমার ডন কিকৃসট্ রূপটাই চিনত। লণ্ডনে অ্যাক্স্-আঁ-প্রভাঁসে কিছুটা ঘটলেই আমি তড়িঘড়ি অ্যাক্শন নিয়ে তার একটা সমাধান করে দিতুম। ভুল যে করি নি তা নয়। একটা ঘটনার কথা বলি। অ্যাক্সের বনে গিয়েছি মেব্ল্কে নিয়ে বেড়াতে। হঠাৎ শুনি নারীকণ্ঠে পরিত্রাহি চিৎকার। ছুটে গিয়ে দেখি এক ছোকরা একটা মেয়েকে জাবড়ে ধরে চুমো খাবার চেষ্টা করছে, আর মেয়েটা—বাপরে বাপ সে কী তীক্ষ্ণকণ্ঠ—চেঁচাচ্ছে। আমি ডন কিকৃসটের মতো ছোঁড়াটার কলার ধরে দিলুম হ্যাঁচকা টান আর গালে গোটা দুই চড়। মেয়েটা আমার দিকে তাকালে। আমি ভাবলুম, সে বুঝি আমার শিভালরির কদর জানাতে গিয়ে আমাকেই চুমো খেয়ে বসবে! কী হল, জান, সোম? মেয়েটা দৃঢ়পদে এগিয়ে এল আমার কাছে। তারপর বলা-নেই কওয়া-নেই, দুহাত দিয়ে ঠাস ঠাস করে মারলে আমার গালে—ছোঁড়াটার গালে নয়, আমার গালে—গণ্ডা পাঁচেক চড়! মোজা বুহুনির স্পীডে। আমি তো বিলকুল বেকুব। তারপর মেয়েটা ছোঁড়াটার হাত ধরে হনহন করে চলে গেল বনের ভিতর।

মেব্ল্ শেষ অঙ্কটা দেখতে পেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে হাসছিল।

কী করে জানব, বলো, কোন্টা প্রেমের ন্যাকরামোর চিৎকার আর কোন্টা ধর্ষণভীতির সকরুণ আর্তরব! একেই বলে বার্কিঙ আপ দি রঙ্ ট্রী!

সেই আমি কলকাতার ডাক্তারদের শেষ রায় শুনে ফিরে এলুম মধুগঞ্জে। মেব্ল্কে আদর না করে ঝুপ করে বসে পড়লুম ডেক-চেয়ারে ঘণ্টা তিনেকের তরে। ডন তখন হ্যামলেটের রূপ নিতে আরম্ভ করেছে। মেব্ল্ তখন আমার কপালে হাত বুলিয়ে আদর করছিল—আমি সাড়া দিই নি।

সব কথা মেব্ল্কে খুলে বলার প্রয়োজন হয় নি। কলকাতা থেকে ফিরে

আসার পর আমি তার গাত্র স্পর্শ করছি নে দেখেই সে সমস্ত ব্যাপার নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছিল। পরের দিন ভোরবেলা দেখি, মেব্‌ল্‌ ঘরে নেই। বারান্দায় পেলুম তাকে, একটা মোড়ার উপর দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার সাহস পর্যন্ত করতে পারলুম না।

তোমাদের দেশে নাকি নিষ্কাম প্রেমের আদর্শ আছে। যৌনক্ষুধাকে অবহেলা করে তোমাদের বহুলোক জীবনধারণ করে। আমাদের ক্যাথলিক পাদ্রী আর মিস্টিকরা রমণী-সঙ্গ কামনা করে না, তোমাদের বিধবারা যে রকম যৌনক্ষুধার নিবৃত্তি করে থাকেন। কিন্তু সঙ্গে এঁরা সর্বপ্রকার প্রেমকেও কাঁটার মতো দেহ-মন থেকে তুলে দূরে ফেলে দেন। তাঁদের শুধু লড়তে হয় শারীরিক প্রলোভনের সঙ্গে। আমার বেলা তো তা নয়, আমি ভালবাসতে পারি, বাসিও, কিন্তু শরীর দিয়ে বাসতে পারব না। সেও হয়তো অসম্ভব কঠিন মনে হত না যদি মেব্‌ল্‌ আর আমি একসঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে নিতুম, আমরা আমাদের প্রেম দেহের স্তরে নিয়ে যাব না।

তোমার মনে আছে, সোম, তোমার আমার সামনে আমাদের জেলের একটা ঘটনা? স্বদেশী কয়েদীকে শেষ বিদায় দিতে এসেছে তার স্ত্রী, বাচ্চাকে কোলে করে। বাপ চেয়েছিল ছেলেকে কোলে নিতে, বাচ্চাটাও মায়ের কোল থেকে ঝাঁপ দিচ্ছিল বাপের দিকে। মাঝখানে লোহার জাল।

আমরা দুজনাই সে জায়গা ছেড়ে চলে এসেছিলুম। অবান্তর, তবু যখন সুবাদটা এল তাই বলি, পরে আমার কাছে খবর এল, তুমি নাকি গোপনে তাদের মিলনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে। খবরটা আমাদের দিয়েছিল জেলার, আরো গোপনে—তোমার বিরুদ্ধে আমাকে তাতানোর জন্য। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, ব্যাটাকে ধরে হাণ্টার নিয়ে তার ন্যাংটো পাছায় আচ্ছা করে চাবকাই। ভাষাটা একটু অভদ্র হল, না সোম? কিন্তু আমি তখন খুনিয়া রাগের মাথায় যে অভদ্র ভাষা মনে মনে ব্যবহার করেছিলুম তারই হুবহু প্রকাশ দিলুম মাত্র। আহির মনকে মেনে নিয়েও ভণ্ডামি মেনে নিতে পারি নি, সে কথা আমি পূর্বেই বলেছি। সে কথা থাক।

আমার অবস্থা তখন আরো কঠোর। আমার আর মেব্‌লের মাঝখানে যে জাল রয়েছে সেটা একদিন ছিন্ন হয়ে গেলে যেতেও পারে—কলকাতার ডাক্তাররা সেই অতি ক্ষীণ আশাই দিয়েছিল—এবং প্রতিদিন প্রতি রাত্রি সেই আশাই আমাকে মুখ ভেঙচিয়েছে।

নিষ্কাম প্রেমের কথায় ফিরে যাই। কাব্য যদি মানবজীবনের দর্পণ হয় তবে

শুধাই তোমাদের সে দর্পণে নিষ্কাম প্রেমের কতটুকু আভাস মেলে ? রায়বাহাদুর কাশীশ্বর আমাকে দিয়েছিলেন দুখানি সংস্কৃত কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ। মেঘদূত আর গীতগোবিন্দ। (পর্নোগ্রাফি আর রিয়েল আর্টের মধ্যে তফাত কী তাই নিয়ে তখন একটা মোকদ্দমা চলছিল ; রায়বাহাদুরের মতে মেঘদূত-গীতগোবিন্দ আর্ট আর মিস্ট্রেজ অব দি কোর্ট অব লণ্ডন অশ্লীল, যদিও তাতে শরীরের খুঁটিনাটি বর্ণনা অনেক, অনেক কম)। এ বই দুখানিতে কী নিষ্কাম প্রেমের ছড়াছড়ি ? অন্য বইয়ে থাকতে পারে এই ভেবে আমি রায়বাহাদুরের দ্বারস্থ হই। তিনি কবুল জবাব দিয়ে বললেন, 'সংস্কৃতে নিষ্কাম প্রেমের বালাই নেই, সে বস্তু এসেছে মুসলমান আগমনের পর বাঙলা-হিন্দীতে। খুব সম্ভব সুফীদের নিষ্কাম প্রেম থেকে এ বস্তু এ-দেশে পাচার হয়েছে। আমি তা হলে বলব, তোমরা যতদিন ভিরাইল, বীর্যবান ছিলে ততদিন নিষ্কাম প্রেম সম্বন্ধে ছিলে সম্পূর্ণ অচেতন। নিষ্কাম প্রেম অনৈসর্গিক। কিন্তু থাক তোমাদের হিন্দু-শাস্ত্র। আমি ক্রীশ্চানের ছেলে। আমি বরঞ্চ বাইবেলে যাই।

আমি বিলক্ষণ জানি বুড়ো পাদ্রী তোমাকে অনেক বাইবেল উপহার দিয়েছেন, বহুবার তোমাকে বইখানা পড়বার জন্য অনুরোধ করেছেন, কিন্তু তুমি পড় নি। কাজেই যে কটি লাইন তোমাকে শোনাব সেগুলো তুমি আগে কখনো শোন নি।

"How beautiful are thy feet with shoes, O prince's daughter !! The joints of thy thighs are like jewels, the work of the hands of cunning workman.

Thy navel is like a ronnd goblet, which wanteth not liquor : thy belly is like an heap of wheat set about with lilies.

Thy two breasts are like two young rose that are twins.

Thy neck is a tower of ivory ; thine eyes like the fish-pools in Heshbon, by the gate of Bathrabbim : thy nose is as the tower of Lebanon, which looketh toward Damascus.

Thine head upon thee is like Carmel, and the hair of thine head like purple ; the king is held in the galleries.

How fair and how pleasant are thou, O love for delights !

This thy stature is like to a palm tree, and thy breasts to clusters of grapes.

I said, I will go up to the palm tree, I will take hold of the boughs there of : now also thy breasts shall be as clusters of the vine, and the smell of thy nose like apples ;

And the roof of thy mouth like the best wine for my beloved, that goeth down sweetly, causing the lips of those that are asleep to speak.

I am beloved's, and his desire is towards me."

কী গম্ভীর, হাউ সাবলাইম ! পাশবিক যৌনক্ষুধাকে সৃষ্টির কী মহিমময় অনিন্দ্যসুন্দর নন্দন কাননে তুলে নিয়ে গেল তার স্বর্ণপক্ষ দিয়ে এ কবিতা ! এ যৌনক্ষুধা নন্দনের সুধায় সিঞ্চিত না থাকলে এর বর্ষণে ইন্দ্রপুরীর হাসি মুখে মেখে নিয়ে দেবশিশুরা মর্ত্যে অবতীর্ণ হত কী করে ?

বিরাট বাইবেলে এই একটি মাত্র প্রেমের কবিতা ছিটকে এসে পড়েছে। কী করে পড়ল তার সদুত্তর কোনো পণ্ডিত এখনো দিতে পারেন নি। তাই বোধ করি তাঁরা ধমক দিয়ে বলেন, এ প্রেম রূপক-রূপে নিতে হবে, এ প্রেমের সঙ্গে মানব-মানবীর প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই—এ প্রেম নাকি 'দি মিউচেল লাভ অব ক্রাইস্ট্ আণ্ড হিজ চার্চ' বর্ণনা করেছে। চার্চের বড় কর্তা স্বয়ং পোপ। এখানে আমি পোপের স্বার্থান্বেষী করাঙ্গুলি-সঙ্কেত দেখতে পাই।

তোমাদের আদিরসাত্মক কামরসে-ঠাসা বৈষ্ণব কবিতাও নাকি শুধু বৈকুণ্ঠের দেবদেবীর জন্য। সেগুলোকেও নাকি প্রতীক হিসেবে নিতে হয়। এখানে কার স্বার্থ লুকোনো আছে জানি নে।

আমি মানি নে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ-সব কবিতা শব্দার্থে নিতে হবে। যৌন সম্পর্ক জীবনের অন্যতম গভীর সত্য। তাকে স্বীকার করে আমাদের কবিরা সত্যকে স্বীকার করেছেন মাত্র। এতে কোনো দুঃসাহস বা মূঢ়তার প্রশ্ন ওঠে না। তোমাদের কোনো মন্দিরে যৌন সম্পর্কের নগ্ন প্রস্তরমূর্তি দেখে কেউ কেউ আশ্চর্য হয়। আমি হই নে। কাব্যে যে সত্য কবিরা অকুণ্ঠ ভাষায় বর্ণনা করে স্বীকৃতি দিয়েছেন, শিল্পী প্রস্তর-গাত্রে সেটা খোদাই করবে না কেন ?

তুমি বলবে, এ-সব গুরুগম্ভীর তত্ত্বের টীকা-টিপ্পনী কাটার কী অধিকার আমার? অধিকার তবে কার? পুরুত-পাণ্ডাদের, পাদ্রী-গোসাঁইদের? কিন্তু ভগবান তো তাঁদের পকেটের ভিতর। এ-সব তত্ত্বে তাঁদের কী প্রয়োজন? গীতগোবিন্দ, বাইবেল এগুলো তো আমার মতো পাপীতাপীদের জন্ম সৃষ্ট হয়েছে। যে ভক্ত ভগবানকে পেয়ে গিয়েছেন তিনি মন্দিরে যাবেন কী করতে? মন্দিরে তো যাব আমি। এ-সবের মূল্য যাচাই করব আমি, অর্থ বের করব আমি।

জীবনের এই গভীরতম রহস্যাবৃত সত্যের অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছি বলেই কি আহির মন আমাকে এর অনুভূতি থেকে বঞ্চিত করল?

২০শে আগস্ট

পলে পলে তিলে তিলে কত যুগ ধরে আমি কি দহনে দগ্ধ হয়েছি, সে শুধু আমিই জানি। এ দহন কিন্তু সময়ের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। বেদনা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তোমাদের সাধকেরা বলেন, বেদনা আসে মনের বট্‌ল্‌নেকের ভিতর দিয়ে, সেই মনকে তুমি যদি আয়ত্তে আনতে পার তবে আর কোনো বেদনা-বোধ থাকবে না। এ-তত্ত্বটা আমি যাচাই করে দেখি নি, কারণ আমার মনে হয়েছে মনের বট্‌ল্‌নেক যদি আমি বন্ধ করে দিয়ে বেদনা-বোধকে থামিয়ে দি, তবে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দবোধের অনুভূতিও আমার চৈতন্যে প্রবেশ করতে পারবে না। তার অর্থ, সর্বপ্রকার অনুভূতি বিবর্জিত হয়ে জড়জগতে ইঁট-পাথরের মতো সুদ্ধমাত্র খানিকটে স্পেস নিয়ে এগসিস্ট করা। তাহলে আত্মহত্যা করলেই হয়। পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিলে গিয়ে যে যার পরিমিত জায়গা দখল করে অস্তিত্ব বজায় রাখবে। তফাত কোথায়?

আমাদের গুণীরা বলেন, হৃদয়-বেদনা ভুলতে হলে কাজের মধ্যে ঝাঁপ দাও। মন তখন কাজে এমনি নিমগ্ন হয়ে যাবে যে অন্য কিছু ভাবতে পারবে না। আমি তাই সেই সময়ে কাজে দিলুম ঝাঁপ। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, আমি হঠাৎ কী রকম আমার এলাকার খুন-খারাবির আদমশুমারি নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিলুম, এলাকার বিরাট ম্যাপ তৈরী করে বদমায়েশির জায়গাগুলোতে চক্কর কেটে কেটে তার কেন্দ্রস্থলের বদমায়েশকে ধরবার চেষ্টা করেছিলুম; দাগী আসামী জেল থেকে খালাস পেলেই তার গ্রামকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকের গ্রামের চুরি-চামারির সংখ্যা বেড়ে যাওয়া থেকে তোমাদের কাছে সপ্রমাণ করলুম, ঘড়েল বদমাইশ আপন গাঁয়ে বদ-কাজ করে না।

তাতে করে শুধু তোমাদের অতিষ্ঠ করে তোলা হয়েছিল। আমার কোনো

লাভ হয় নি।-

কাজের ভিতর সমস্ত দিন তুমি যে বেদনা-বোধকে বাঁধ দিয়ে আটকে রেখে ভাবলে বেঁচে গেছ, সে তখন কাজের অবসানে তোমার সকল বাঁধ ভেঙে লণ্ডভণ্ড করে দেয় তোমার সর্ব অস্তিত্বকে। পলে পলে তিলে তিলে দিনভর তুমি যদি তোমার বেদনা-বোধকে নিয়ে পড়ে থাক, তাতে যদি কাজ কিংবা অন্য কোনো কৃত্রিম উপায়ে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা না কর, তবে তার ইনটেন্‌সিটি অনেকখানি কমে যায়। কিন্তু সলমনের বোতলে ভরা জিন্ যখন সন্ধ্যায় নিষ্কৃতি পায়, তখন তার বেধড়ক মার থেকে আর কোনো নিষ্কৃতি নেই।

সেই মার খেয়ে খেয়ে এ-পাশ ও-পাশ করে করে—যেন এ-গালে চড় খেয়ে ও পাশ হয়ে শুই, যেন ও-গালে চড় খেয়ে এ-পাশ হয়ে শুই—রাত বারোটায় এল ঘুম। কিন্তু শয়তান তোমায় নিষ্কৃতি দেবে কেন? ঘুম ভেঙে যাবে রাত দুটোয়।

পাশের খাটে মেব্‌ল্ শুয়ে। তার সোনালী ঢেউ-খেলানো এলো চুল চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে বালিশের উপর এঁকেছে বিচিত্র নক্সা। তার কপালে ঘামের একটু একটু ভেজার আভাস, চাঁদের আলো তারই উপর সামান্য চিকচিক করছে, বিলের 'ভেট'-ফুলের পাপড়ির উপর এই আলোই আমি অনেকবার দেখেছি, ভাওয়ালির জানলা দিয়ে। মেব্‌লের হাত দুখানি তার শরীরের দুদিকে আলসে লম্বমান হয়ে অর্ধমুষ্টিবদ্ধ যেন দুটি 'ভেট'-ফুলের কুঁড়ি। আর তার সমস্ত কিশোর তনু যেন গাদা করে রাখা শিউলি ফুলের পাপড়ি—হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল শিউলি ছিল মেব্‌লের সবচেয়ে প্রিয় ফুল।

এই গরমের দেশে শীতের দেশের মেয়েকে চাঁদের আলোতে কী রকম অদ্ভুত, রহস্যময় দেখাত। আজ যদি হঠাৎ দেখি, আমার লিচুবনের ঘন সবুজের উপর গাদা গাদা বরফ জমেছে, তাহলে যে রকম সমস্ত বাগানখানা এক অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যে ভরে উঠবে।

মেব্‌লের এই নিশিকান্ত সৌন্দর্য আমার আত্মার ক্ষুধাকে অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে কত শতবার ভরে দিয়েছে। আস্বচ্ছ ফিকে বেগনি রঙের মসলিন নাইট-ড্রেসে জড়ানো মেব্‌লের শরীর আমার কবি-মানসের শুষ্ক মৃৎপাত্রকে অমৃতরসে বার বার ভরে দিয়েছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জ্বালিয়ে দিত আমার সর্ব-ধমনীতে এক অদম্য যৌনক্ষুধা।

মনে আছে, সোম, তুমি আর আমি একদিন মফস্বলের এক গ্রামে নিষ্ক্রিয় ক্রোধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম, সমস্ত গ্রামখানা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল—জল ছিল না বলে আমরা নিষ্ফল আক্রোশে শুধু ছটফট করেছিলুম।

সে আগুন তবু ভালো। নিরন্ন বিধবার শেষ কাঁথাখানা পুড়িয়ে দিয়ে সে আগুন তবু তো তৃপ্ত হল।

আমার এ বহ্নিজ্বালার শেষ নেই। পিরামিডের উপরে দাঁড়িয়ে আমি একদিন গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে সাহারার মরুভূমির দূরদিগন্তের শুষ্ক তৃষ্ণার দিকে তাকিয়েছিলুম, আর তার রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে ভগবানের নাম পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলুম। আহির মন আমার সর্বশরীরে সেই সাহারার জ্বালা জ্বালিয়ে দিল।

শরীরে এ জ্বালা নিয়ে মানুষ সমাজে মিশতে পারে না। আমি ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করে দিলুম, লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কমিয়ে কমিয়ে শেষটায় একেবারে আলেকজাণ্ডার সালকার্ক হয়ে গেলুম। বিষ্ণুছড়া আর মাদামপুরের মেমেদের ফোঁসফোঁসানি আর ছোবলা-ছুবলি থেকে বঞ্চিত হয়ে আমার কোনো কষ্ট হয় নি; কিন্তু পাদ্রী-টিলার মেয়েদের কলকল উচ্চহাস্য, তাদের লাজুক নয়নে আধা-প্রেমের ক্ষীণ আভাস আমার জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে তাকে করে দিল আরো ফাঁকা। কে যেন বলেছে, 'দি মোর লাইফ্ বিকামস্ এম্‌পটি দি হেভিয়ার ইট্ বিকাম্‌স টু ক্যারি ইট'। জীবন যতই ফাঁকা হয়ে যায়, তাকে বহন করা হয়ে যায় ততই শক্ত। বড় খাঁটি কথা বলেছে। তবু আমি জীবনের সেই শূন্য ধামা বইতে পারতুম, কিন্তু সে ধামার সর্বাঙ্গে ছিল বিছুটি।

খুব সম্ভব আমারই দেখাদেখি মেব্‌ল্‌ও বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিল। কী ভেবে বন্ধ করল জানি নে। তার মনের কথা কিন্তু আমি তোমাকে বোঝাতে যাব না। তার প্রতি আমি অবিচার করেছি কি না, তার বিচার একদিন হয় তো হবে, কিন্তু তার মনের কথা বলতে গিয়ে আমি যদি উনিশ-বিশ করে ফেলি তবে সে অবিচার আমাকে কেউ ক্ষমা করবে না।

আমার ভিতরকার ডন কিক্‌সট্ ক্রমে ক্রমে কাতর হতে হতে রোগশয্যায় পড়ল। আর আমি, ও-রেলি, আস্তে আস্তে হ্যামলেটের রূপ নিতে আরম্ভ করলুম। বরঞ্চ হ্যামলেট বক্তৃতা ঝাড়ত প্রচুর—সামান্যতম প্রভোকেশনে সে বর্‌বর্ করে নানা প্রকারের দার্শনিক রায় জাহির করত এন্তার—তোমাদের যাত্রাগানে যে রকম ক্ষীণতম প্রভোকেশনে নায়ক-নায়িকা দূরে থাক, পাইক বরকন্দাজ পর্যন্ত লম্বা লম্বা গান গাইতে আরম্ভ করে। আমার মুখের কথাও শুকিয়ে গেল।

বেচারী মেব্‌ল্! গোড়ার দিকে সে আশ-কথা পাশ-কথা বলে বলে আমাকে আমার কচ্ছপের খোলের ভিতর থেকে বের করবার চেষ্টা করেছিল; শেষটায় সে চেষ্টাও ছেড়ে দিলে।

তখন আমি খেতে আরম্ভ করলুম মদ। মাস তিনেক দিন-রাত্তির আমি

ভাম হয়ে পড়ে থাকতুম। বাটলার জয়সূর্য, যে কি না ধান্যেশ্বরী মালের পাঁট জলের মতো ঢকঢক করে গিলতে পারে, সে পর্যন্ত আমার পানের বহর দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেল। কখনো বলে হুইস্কি ফুরিয়ে গিয়েছে, কখনো বলে সোডা নেই। তারপর একদিন মাতাল হয়ে তার গালে মারলুম ঠাশ ঠাশ করে চড়। সংবিতে ফিরে বড় লজ্জা পেয়েছিলুম, সোম। আমি কি অশিক্ষিত 'বক্সওয়ালা' যে আমি এ রকম অন্যায় আচরণ করব!

মদ খেয়ে লাভ হয় নি। মদ খেলে মানুষের যৌনক্ষুধা উগ্রতর হয়, তৃপ্তির ক্ষমতা কমে যায়। আমার অতৃপ্তির আক্ষোভ তাই মদ খেয়ে কখনো কখনো বিকট রূপ ধরে ছিল। তার কথা বলতে আমার ঘেন্না ধরে।

কিন্তু আসল কথাটা আমি শুধু এড়িয়েই যাচ্ছি। আমি শুধু বোঝাতে চাই, আমি কী কঠোর যন্ত্রণার ভিতর আমার জীবনটা কাটালুম, আর সেইটে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারছি নে! কিন্তু এ দুর্দৈবে আমি একা নই। তোমার মনে আছে—চৌধুরীর কেসটা? ভদ্রলোক কী শান্ত, দয়ালু প্রকৃতির, গরীব-দুঃখীদের ভিতর তাঁর দান-খয়রাতের কথা কে না জানে? আর কী অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন তাঁর স্ত্রী? দেখে মনে হত অনন্তযৌবনা—তাঁর ছেলেমেয়ে হয় নি। তাঁর ঘাড়টির কথা তোমার মনে পড়ে কি? রাজধানীর গর্ব নিয়ে যেন সে ঘাড় তাঁর মাথাটি তুলে ধরত। একদিন তাঁর সে ঘাড় নিচু হয়েছিল—আমি অবশ্য স্বচক্ষে দেখি নি। তাঁর স্বামী যেদিন হোমোসেক্সুয়েল কেসে ধরা পড়লেন।

আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি নি এ রকম সাধুলোক কী করে এ রকম নোংরামি করতে পারে। তিনি নিজে আমার খাশ-কামরায় স্বীকার করেছিলেন বলেই শেষটায় আমার প্রত্যয় হল।

কি বিড়ম্বিত জীবন! ভগবান ভদ্রলোককে স্বাভাবিক যৌনক্ষুধা দেন নি। তাঁর অনৈসর্গিক যৌনক্ষুধাকে তিনি অদ্ভুত বিক্রমে কত বৎসর চেপে রেখে রেখে হঠাৎ একদিন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে কুকর্মটা করে ফেললেন—শুনেছি তোমাদের সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যেও দৈবাৎ কখনো এ রকমধারা হয়েছে। সে ঘটনা বলতে গিয়ে ভদ্রলোকের মুখে যে আত্মাবমাননার প্রকাশ দেখেছিলুম, তার দাগ আমার মন থেকে কখনো উঠবে না। ভদ্রলোক শেষটায় বলেছিলেন, 'আমাকে এখন সমাজ ঘেন্না করবে, কুষ্ঠরোগীকে মানুষ যে রকম বর্জন করে চলে। আমি সমাজের জন্য কী করেছি, সে কথা সমাজ স্মরণ করবে না—আমি তাকে দোষও দিই নে—কিন্তু আমার সতী-সাধ্বী স্ত্রী, যিনি ভাবতেন আমি ধ্যান-ধারণায় আত্মসমর্পণ করেছি বলে তাঁকে অবহেলা করি, যাঁর পুত্রোৎপাদন-ঈপ্সাকে পর্যন্ত আমি সম্মান

দিই নি, তিনি কী ভাববেন ?'

ওঃ ! এ কেসটা ধামা-চাপা দিতে তোমাকে কী বেগই না পেতে হয়েছিল। রায়বাহাদুর কাশীশ্বর যদি অযাচিতভাবে গুহ্য সন্ধিসূড়ক আমাদের বাতলে না দিতেন, তবে আমরা চৌধুরীকে বাঁচাতে পারতুম না। কিন্তু আমার বিস্ময়ের অবধি নেই, হিন্দু সমাজের বিরাট পাণ্ডা রায়বাহাদুর কী করে এতখানি দরাজ-দিল হলেন ! তবে হ্যাঁ শুনেছি, তোমাদের সাধু-সন্ন্যাসীর ভিতরও এ রকম কিছু একটা হলে অন্য সন্ন্যাসীরা তাকে খুন করে না। হিমালয়ের উত্তরপ্রদেশে তাকে পাঠিয়ে দেয়। তোমাদের ধর্ম সত্যই বড় অদ্ভুত ! কত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে তোমাদের সাধুরা কত সত্য আবিষ্কার করেছে, আর তার থেকে পেয়েছে অন্তহীন সহিষ্ণুতা।

তুমি হয়তো জান না, চৌধুরী আমাকে এখনো দক্ষিণের এক আশ্রম থেকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। শুনে খুশি হবে, তার স্ত্রী তার সঙ্গেই আছেন।

দু বৎসর কঠোর সংযমে নিজেকে মেব্‌ল্‌এর কাছ থেকে দূরে রেখে এক গভীর রাত্রে নিজেকে সামলাতে না পেরে আমি তার কাছে যাই। কী হয়েছিল, তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করব না।

সেই রাত্রে ভোরের দিকে মেব্‌ল্ জয়সূর্যের ঘরে যায়।

সেই ভোরেই সে আমার পায়ের উপর তার মাথা রেখে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিল। তার চুল ভিজে গিয়েছিল, আমার পা ভিজে গিয়েছিল। আমাদের দুজনের মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরয় নি।

থাক।

২২শে আগস্ট

মেব্‌ল্ যদি মরে যেত, তবে কি আমার এর চেয়ে বেশী কষ্ট হত ? বলতে পারব না।

হঠাৎ যদি আমি অন্ধ হয়ে যেতুম, তাহলে কি বেশী কষ্ট পেতুম ? বলতে পারব না। তখনো বলতে পারি নি, আজও পারব না।

আমি বিমূঢ়ের মতো বসে কয়েক দিন কাটাই।

আমার মনে হয় বড় শোক যখন আসে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ প্রথম ধাক্কাতেই তার বেদনা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। আস্তে আস্তে যেমন যেমন দিন যায়, সঙ্গে সঙ্গে অসহায় হরিণ-শিশুর শরীরকে ঘিরে যেন পাইথনের পাশ একটার পর একটা করে বাড়তে থাকে। শুনেছি, সে নাকি তখন আর

আর্তস্বরে চিৎকার পর্যন্ত করে না। শেষ পাশ দেওয়ার পর পাইথন লাগায় আস্তে আস্তে চাপ। আমি কখনো দেখি নি। আমার মনে প্রশ্ন জাগে, হরিণ কি আমার চেয়ে বেশী কষ্ট পায়?

ফাঁসির আসামীও ঘুমোয়। ঘুম থেকে ওঠা মাত্রই নাকি তার মনে পড়ে অমুক দিন তার ফাঁসি। নিদ্রার কোল থেকে প্রাণ-রস যুগিয়ে নিয়ে মানব-শিশু যখন জাগল, তখনই তার স্মরণে এল, সেই প্রাণটি তার অমুক দিন যাবে। পড়েছি, কোমর অবধি পুঁতে মানুষকে যখন পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে বধ করা হয়, তখন প্রথম কয়েকটা পাথরের ঘা খেয়েই সে নাকি অজ্ঞান হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। চতুর্দিকের নরদানবরা তখন নাকি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে জল দিয়ে তাকে চৈতন্যে নিয়ে আসে। সংবিতে ফিরে এসে সে নাকি প্রথমটায় বুঝতে পারে না সে কোথায়—ট্রেনে ঘুম ভাঙলে আমরা যে রকম প্রথমটায় বুঝতে পারি নে, আমরা কোথায়। তারপর আবার দুসরা কিস্তির প্রথম পাথরের ঘা খেয়েই নাকি সে সেই নির্মম সত্য বুঝতে পারে, তাকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। বর্ণনায় পড়েছি, তাকে নাকি অন্তত বার পাঁচেক এই রকম সংবিতে ফিরিয়ে এনে এনে মারা হয়।

শুনেছি, যে লোক যতটা খুন করে, চীন দেশে নাকি তার ততবার ফাঁসি হয়। কিন্তু ফাঁসি একবারের বেশী হতে পারে কী করে? তোমরা এই নিয়ে একটা ঠাট্টা করো না, অমুক লোকটার তিন মাসের ফাঁসি? কিন্তু তা-ও হয়। বিদগ্ধ চীনেরা তারও একটা সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছে। আসামীর গলায় ফাঁস দিয়ে আস্তে আস্তে তার দম বন্ধ করে আনতে আনতে তাকে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। অজ্ঞান হওয়া মাত্রই ফাঁস ঢিলে করে দিয়ে জল ঢেলে, হাওয়া করে তাকে ফের সংবিতে আনা হয়। যে যবার খুন করেছে, তার উপর এই প্রক্রিয়া ততবার চলে। প্রতিবার সংবিতে আসামাত্র তার কী মনে হয় ভেবে দেখো।

ধন্য সে-সব লেখক, যাঁরা এসব মর্মান্তিক ব্যাপার রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করেছেন। আমার মনে হয়, হয় তাঁরা স্যাডিস্ট, নয় তাঁরা আপন জীবনে, আমারই মতো কোনো এক কিংবা একাধিক নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গিয়েছেন।

এখনো বলছি, শারীরিক ফাঁসির সংখ্যার একটা সীমানা আছে। পাঁচ-সাত বার করার পর আসামী নিশ্চয়ই আর সংবিতে ফিরে আসে না—অচৈতন্য অবস্থা থেকে মৃত্যুর অতল গহ্বরে ডুবে যায়। কিন্তু মনের ফাঁসি, আত্মার ফাঁসির সীমা-সংখ্যা নেই। বাইরে প্রকৃতিতে যে রকম রেণুতে রেণুতে প্রতিক্ষণ কোটি কোটি

নবজন্মের সৃষ্টি, একই মানুষ সেই রকম ভিতরে ভিতরে মরে কোটি কোটি বার। এবং প্রতি দুই মৃত্যুর ভিতর যে সংবিৎ, তখন সে সংবিৎ শুধু তাকে জানিয়ে দেবার জন্য, এই শেষ নয়, এই মৃত্যুযন্ত্রণাই শেষ মৃত্যুযন্ত্রণা নয়, আরো অনেক-গুলো সম্মুখে রয়েছে।

এ-সব অভিজ্ঞতার সত্যতা সম্বন্ধে তোমার মনে যদি কোনো সন্দেহ থাকে তবে তারই একটা ক্ষুদ্রতম দৃষ্টান্ত আমি তোমাকে দিতে পারি যেখানে তুমি এ-সব অভিজ্ঞতার ক্ষীণতর রূপ খানিকটে যাচাই করে নিতে পারবে।

কোনো কোনো রুগীকে সারাবার জন্য তিন তিন বার অজ্ঞান করে অপারেশন করতে হয়। প্রথমবারে সে অতটা ডরায় না, কিন্তু প্রথম এবং দ্বিতীয়বারের মধ্যে কয়েক দিন এবং দ্বিতীয় তৃতীয় বারের মধ্যে কয়েক সপ্তাহ তার কী করে কেটেছিল, সে কথা তুমি তাদের কাউকে জিজ্ঞেসা করলে অনায়াসেই জেনে যাবে। তিন বারের পরও যদি সে না সারে, তখন, জান সোম, সে আর দ্বিতীয় কিস্তিতে চতুর্থ বারের মতো অপারেশন করাতে সম্মত হয় না। অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে, এদিক ওদিক লুটতে লুটতে খাট থেকে পড়ে গিয়ে যন্ত্রণা এড়াবার জন্য আত্মহত্যা করবে বলে কাকুতি-মিনতি করে বিষের জন্য, কিন্তু তবু আবার অপারেশন করাতে রাজী হয় না। তার সর্বক্ষণ মনে পড়ে, প্রথম অপারেশনের ক্লোরোফর্মের জড় নেশা কেটে যাওয়ার পর সে কী অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেছিল, চিৎকার করার শক্তি পর্যন্ত ছিল না, গোঙরাতে গোঙরাতে মুখ দিয়ে শুধু ফেনা বের করেছিল।

সোম, আমার কিন্তু নিষ্কৃতি ছিল না। চিন্ময় বেদনার জগতে কোনো সরকারী আইন নেই, ডাক্তারী কোড নেই যে রোগীর বিনা অনুমতিতে তার অপারেশন করতে পারবে না। আমার মুখের প্রথম অপারেশনের ফেনা শুকতে না শুকতেই আমাকে সেই দুশমনের মতো যমদূতদর্শন ডোমেরা টেনে নিয়ে যেত অপারেশন ঘরের দিকে। সেখানে আমাকে অপারেশন করা হত অষ্টাদশ শতাব্দীর পদ্ধতিতে—যখন ক্লোরোফর্ম আবিষ্কৃত হয় নি। তারা আমাকে দুপায়ে তুলে ধরে মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে ভিরমি খাইয়ে, কিংবা তাতেও না হলে মাথায় ডাণ্ডা মেরে অজ্ঞান করে অপারেশনের জন্য তৈরী করত। ছুরির ঘা ক্লোরোফর্মের নেশাকে কাটতে পারে না বলে আজকের দিনে অপারেশন চলে রোগীকে যন্ত্রণা না দিয়ে। আমার বেলা কিন্তু ছুরির ঘা আমাকে সংবিতে ফিরে নিয়ে আসত আর আমি সজ্ঞানে দেখতুম, আমার উপর ছুরি চলছে। পাছে আমার বিকৃত চিৎকারে সার্জেনদের অপারেশন করাতে বাধা জন্মায় তাই ডোমরা আমার মুখ চেপে ধরে রাখত। গুঙরে গুঙরে শরীর যে তার টর্‌চার্

থেকে খানিকটে—সে কত অল্প—নিষ্কৃতি পাবে তার সর্ব পন্থা বন্ধ।

চোখের সামনে মেব্‌লকে দেখতে হত প্রতিদিন।

কেন আমি তাকে খুন করলুম না প্রথম দিনই?

কিন্তু তার দোষ কী? সে তো আর আমাকে ত্যাগ করে ঐ বাটলারটাকে গ্রহণ করে নি। বদ্ধ পাগলও আমাদের দুজনকে একাসনে বসিয়ে বিচার করবে না। আমার মনে হয় বহু বাজারের মেয়েও তাকে ঘরে ঢুকতে দেবে না। কোথায় সে আর কোথায় আমি?

ঐখানেই তো ভুল। জয়সূর্যের থাকবার মত কিচ্ছুই নেই, সত্য, কিন্তু তার একটা সম্পদ আছে যেটা আমার নেই। সে সম্পদ কুকুর-বেড়ালেরও থাকে, সে কথা বলে লাভ কী? যে মানুষ দু মিনিট বাদে মরবে তাকে কি এই বলে সান্ত্বনা দেওয়া যায়, তুমি মরে যাবার পরও অনেক কুকুর-বেড়ালও বেঁচে থাকবে, তাই বলে কি তাদের বাঁচাটা তোমার মরার চেয়ে বড়? মেব্‌ল্ তো নিয়েছিল মাত্র এইটুকুই। তাকে ও জিনিস যে কোনো পুরুষই দিতে পারত। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ যে রকম নর্দমা থেকে খুঁটে তুলে তুলে ভাত খায়। তাকে কি আমরা দোষ দিই?

গোড়ার দিকে আচ্ছন্নের মতো বসে এই সব চিন্তা করেছিলুম কিন্তু তখন সব ছিল ছেঁড়াছেঁড়া! কোনো বিশেষ চিন্তা বা যুক্তি নিয়ে সেটাকে যে তার চরম ফৈসালায় ফেলে গ্রহণ বা বর্জন করব সে শক্তি আমার ছিল না। ফড়িঙের মতো আমার মন এ-ঘাস থেকে ও-ঘাসে ক্ষণে ক্ষণে লাফ দিত, কোনো জায়গায় স্থির হয়ে বসে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারত না। আজও যে পারি তা নয়। তবে কয়েক মাসের জন্য একবার পেরেছিলুম, এমন কি সেই অনুযায়ী কাজও করেছিলুম, এবং সেইটে বলবার জন্যই তো এই চিঠি লেখা। সে কথা পরে হবে।

সব জেনে বুঝেও আমার মন অহরহ এক অন্ধ আক্রোশে ভরে থাকত।

তুমি তো জানো আমাদের সিভিল সার্জন আর্মস্ট্রঙের মেম তার ছোকরা আরদালিটাকে মোটর-সাইক্ল কিনে দিয়েছিল। এ শহরে কে না জানত তার রসময় কারণ। ওদিকে আর্মস্ট্রঙ তো আমার মতো মন্দভাগ্য ছিল না? মেম যখন ভারতীয় তাগড়া ছোকরার বাদামী রঙ, কালো চুল আর প্রাচ্যদেশীয় বর্বর চোখের (মাফ করো সোম, আমি তোমাকে অপমান করছি নে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমার দেশে খানদানীরা যে রকম আমাদের তুলনায় ঢের বেশী মার্জিত, ঠিক তেমনি তোমাদের চাষা-ভুষোরা আমাদের মজুরদের চেয়ে অনেক বেশী

প্রিমিটিভ, অনেক বেশী সেক্সি) প্রাণ-মাতানো নেশায় মজে গেল, তখন গোড়ার দিকে আর্মস্ট্রঙ বেশ কিছুটা চোটপাট করেছিল। এমন কি, আমার মনে হয় সে ইচ্ছে করলে আরদালিটাকে তাড়িয়ে দিতে পারত—মেম আর কী করতে পারত—কিন্তু সে করে নি। আমার মনে হয়, প্রাণবন্ত স্বাভাবিক যৌন-শক্তিশালী পুরুষ এসব ব্যাপারে অনেকখানি ক্ষমাশীল হয়. 'টু হেল্, চুলোয় যাকগে,' বলে সে শান্তমনে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ফিরে যায়। ঠিক কথা, কারণ আর্মস্ট্রঙ গিয়েছিল তেরিয়া হয়ে, উইথ ভেন্‌জেন্‌স। ঐ যে, কী সে বক্সওয়ালাটার নাম, যে তার টিলায় কুলী মেয়েদের হারেম পুষত ? আর্মস্ট্রঙ তো প্রায়ই ওদিক পানে না-পাত্তা হয়ে যেত।

আবার দেখো, কিছুদিন পরে সায়েব মেম দুজনাতে ফের বেশ ভাব হয়ে গেল। আরদালি যে বরখাস্ত হল তা নয়, আর্মস্ট্রঙের হারেমগমনও বন্ধ হল না। ক্লাবে যেন তখন কোন্ এক সুরসিক বলেছিল, সিভিল সার্জন পরিবার দিশী-বিদেশী দুই খানাই পছন্দ করেন।

এ হল প্রাণবন্ত নরনারীর স্বাভাবিক সৌভাগ্য—তারা একটা 'মডুস ভিভেণ্ডি' বেঁচে থাকার পন্থা খুঁজে নিতে পারে। পুরুষ কিংবা স্ত্রী সেখানে কেউই পদদলিত কিংবা অপমানিত হয় নি। অপমান, আমার মনে হয়, আত্মার মৃত্যু। আর আত্মা যখন মরে যায় তখন মানুষ হয়ে যায় পশু। নির্মম জিঘাংসু এবং মারাত্মক পশু, কারণ আত্মা মরে গেলেও তার থেকে যায় বুদ্ধিবৃত্তি, যে বুদ্ধিবৃত্তি পশুর নেই। সে তখন হয়ে যায় হাইড্। যত রকম পাশবিক, নারকীয় জঘন্য পাপ তখন সে করতে পারে তার আহির-মনীয় বুদ্ধি, ছলচাতুরী দিয়ে।

আমারও তাই হয়েছিল। কিন্তু তার সব কথা বলার সময় এখনো আসে নি।

ঐ সময়ের অনেক কিছুই আমার মনে পড়ছে। তার একটা তোমাকে বলি।

জানো তো, পাদ্রী জোন্‌স্ গুডি-গুডি লোক, তোমরা যাকে বলো, 'ভালোমানুষ'। ধার্মিক লোক আকসারই তাই হয়। যদিও তাঁর অজানা ছিল না যে আমি তাঁকে পর্যন্ত বর্জন করেছি, তবু ভদ্রলোক রাস্তায় একদিন বেমক্কা দেখা হয়ে যাওয়াতে আমার সঙ্গ নিল—আমি তো তাঁকে গুড ঈভনিং বলে কেটে পড়ার চেষ্টাই করেছিলুম। আমি যে অশান্তিতে আছি সে কথা তো তাঁর অজানা ছিল না, কিন্তু সে অবস্থাতে যে পাদ্রীর উপদেশে কোনো ফললাভ হয় না, সে তত্ত্বও তিনি জানতেন না।

ইতি-উতি করে, ডোণ্ট্‌ পোক্‌ ইয়োর্‌ নোজ্‌ ইন্‌ মাই অ্যাফেয়ার্স (আপন চরকায় তেল দাওগে—এর তুলনায় অনেক মোলায়েম) এটা শোনার জন্য বেশ তৈরি হয়েই ভদ্রলোক আমাকে বললে, যার মর্মার্থ, ইতি-উতিটা বাদ দিয়ে বলছি সাদামাটা ভাষায়ই, তোমার কী বেদনা তা আমি জানি না। কিন্তু জানি, তুমি সুশীল ছেলে, তুমি ধর্মভীরু। তাই বলছি, ভগবান যদি তোমাকে অসুখী করে থাকেন তবে নিশ্চয়ই তার কোনো কারণ আছে। যখন সে যুক্তি আমরা খুঁজে পাচ্ছি নে তখন তুমি এই ভেবে নিজের মনকে সান্ত্বনা দাও না কেন যে, আমার তোমার চেয়েও অসুখী লোক এ সংসারে আছে।

সার্‌মন্‌টার মধ্যে খানিকটে সত্য আছে নিশ্চয়ই। ঐ যে আমাদের বাঁদরটা, হার্ভে, কী কুচ্ছিত তার চেহারা, আর তার বিদ্‌ঘুটে জামাকাপড় আর চলন-বলন। ক্লাবে কোনো মেয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে চায় না, তার গা থেকে যা দুর্গন্ধ বেরোয় তাতে আমরাই নাক চেপে বাপ-বাপ করে পালাই। খাস খানদানী ইংরেজের বাচ্চা, পাদ্রী-টিলার যে কোনো মেয়ে তাকে বিয়ে করে জাতে উঠতে পারে কিন্তু বেচারীর কী দুরবস্থা! সেখানেও ক্রিস্‌মাসের রাত্তিরে গিয়ে পাত্তা পায় নি—কোনো মেয়ে তার সঙ্গে নাচে নি। নেচেছিলেন একমাত্র বুড়ী পাদ্রীমেম। তাঁর কথা আলাদা, অসাধারণ নারী।

আমি সে রাত্রে ক্লাব এড়াবার জন্যে পাদ্রী-টিলায় গিয়েছিলুম্‌। মেয়েরা যা খুশি হয়েছিল তার স্মৃতি চিরকাল আমার মনের মধ্যে রইল। সেই আনন্দ সর্বাঙ্গে আতরের মতো মেখে নিয়ে যখন বাড়ি ফিরছি, তখন দেখি হার্ভে তার মুখে ক্লেদ আর গ্লানি মেখে নিয়ে শ্লথ গতিতে বাড়ি ফিরছে।

আমি বড় কষ্ট পেয়েছিলুম, কিন্তু জান, সান্ত্বনাও পেয়েছিলুম পাদ্রীর সার্‌মনের কথা ভেবে যে, আমার চেয়েও দুঃখী এ সংসারে আছে। বাড়িতে, আমার বুকের ভিতর যে জ্বালা জ্বলে জ্বলুক; কিন্তু সমাজ তো আমাকে ঘেন্না করে না।

এই সান্ত্বনা নিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন দেখি, টেবিলের উপর একটা ক্রিস্‌মাস প্যাকেট। খুলে দেখি, হাউসম্যানের কবিতার বই। আমার বন্ধু আর্নল্ড পাঠিয়েছে। ও বই আমি সে রাত্তিরে পেতুম না, কারণ সেদিন মধুগঞ্জে ডাক বিলি হয় না। কিন্তু পোস্টমাস্টার লাহিড়ী গভীর রাত্রেও ইংরেজদের ক্রিস্‌মাস ডাক বিতরণ করাত।

কবিতার বই। যেখানে খুশি পড়া যায়। খুলতেই চোখে পড়ল,

Little is the luck I've had

And oh, 'its comfort small
To think that many another lad
Has had no luck at all.

যে সান্ত্বনাটুকু নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলুম সেই মুহূর্তেই সেটি অন্তর্ধান করল। আর্নল্ড নয়, পাঠিয়েছিল আহির মন।

সব খবরই ক্রমে ক্রমে ক্লাব-বাড়িতে পৌঁছেছিল সে-কথা আমি জানি, কিন্তু কী চেহারা নিয়ে পৌঁছেছিল সে-কথা বলতে পারব না। একই ঘটনা স্বচক্ষে দেখে দুই সত্যবাদী লোক যে কি রকম ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দিতে পারে সে সত্য, পুলিসের লোক হিসেবে, আমরা বেশ ভালো করেই জানি এবং সেই অমিলের ফাঁক দিয়েই যে আসামী নিষ্কৃতি পায় সে তত্ত্বও আমাদের অজানা নয়।

আণ্ডাঘর আমাকে বেকসুর খালাসি হয়তো দেয় নি, কিন্তু একটা বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হলুম যে, এ ব্যাপার নিয়ে ক্লাবের মুরুব্বিরা বেশী নাড়াচাড়া করতে তো চানই নি, যতদূর সম্ভব ধামা-চাপা দেবার চেষ্টাও করেছিলেন। এ স্থলে যে তাঁরা 'ঘুমন্ত কুকুরটাকে শুধুমাত্র জাগাতে চান নি' তাই নয়, 'বার্কিং ডগটাকে' পর্যন্ত স্ট্রাঙল্ করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং অনেকখানি সক্ষমও হয়েছিলেন।

'বক্সওলাদের' নিয়ে আমিও বেখেয়ালে আর পাঁচজনের মতো ছোটখাটো ঠাট্টা-রসিকতা করেছি, কিন্তু যখনই তলিয়ে দেখছি, তখনি মনের ভিতর লজ্জা পেয়েছি। বক্সওলাদের তুলনায় আমি ভদ্র সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোক, আর এ সংসারের রীতি, দৈবদুর্বিপাকে বড়র যখন মাথা নিচু হয় তখন ছোট তাই দেখে হাসে। 'সার্ভ হিম রাইট', বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, তার মুখে তখন ঐ এক কথা। এই নিয়ে বাঙলায়ও একটা জোরদার প্রবাদ আছে, সেটা নিশ্চয়ই তোমার জানা, কারণ বাঙলা শেখার সময় তুমিই আমাকে এই প্রবাদের বইখানা দিয়েছিলে। বাঙলাটা আমার আর মনে নেই, তাই ইংরিজীটাই দিচ্ছি। 'হুয়েন্ দি এলিফেন্ট সিঙ্কস্ ইনটু দি মায়ার, ঈভন্ দি ফ্রগ্ গিভস্ হিম্ এ কিক্!' আমাদের দেশের তুলনায় তোমাদের দেশে বড়-ছোটর পার্থক্য অনেক বেশী, তাই বোধ করি তোমাদের তুলনাটায় প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিটা ফুটে উঠেছে বেশী।

ক্লাব বাড়ির কোনো কোনো ব্যাঙ নিশ্চয়ই আমাকে লাথি মেরেছে, কিন্তু সেখানকার গণ্ডার, হিপো, অর্থাৎ মাদামপুর বিষ্ণুছড়া তাঁদের জিভের লকলকানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এর জন্য ওঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয় কি?

তবেই দেখ, আছর মজদাও হাত গুটিয়ে বসে থাকেন নি। আহির মনের ক্রুর সর্পদংশনে আমার অন্তরাত্মা যাতে করে জর্জরিত না হয়ে যায় তাই তিনি আমার ধমনীতে ঢেলে দেবার চেষ্টা করলেন ক্লাব বাড়ির অযাচিত সহৃদয়তার সঞ্জীবনী সুধারস।

কিন্তু জান, সোম, শক্ত ব্যামোতে ওষুধ যদি ঠিক মাত্রায় না দেওয়া হয় তবে ফল হয় উলটো। বিষ তখন সেই ওষুধ থেকে নূতন শক্তি সঞ্চয় করে নেয়। বীজাণুকে সিদ্ধ করে মারতে গিয়ে তুমি যদি জল যথেষ্ট না ফোটাও তবে জল আরো বেশী বিষিয়ে ওঠে। আমার বেলা হল তাই, এবং সেই জিনিসটাই আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল। আহির মন আমাকে তার দাসানুদাস করে ফেলল।

আমি ক্লাব বাড়ির সদাশয়তা দেখে, উপলব্ধি করলুম, সংসারে যত বড় অন্যায় অবিচার হোক না কেন, ধর্মের অনাচার অধর্মের যতই প্রসার হোক না কেন, একদল লোক সেটাকে চাপা দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়। এবং আশ্চর্য, তারা যে অসাধু তাও নয়। মাদামপুর বিষ্ণুছড়া এঁরা দুজনাই অতিশয় সহৃদয় ভদ্রলোক। এ পাপ ছড়িয়ে পড়লে অর্থাৎ আমাদের কেলেঙ্কারির কথা রাষ্ট্র হলে, ইউরোপীয় সমাজের অকল্যাণ হবে এই আশঙ্কায় তাঁরা সেটা চেপে রেখেছিলেন।

অর্থাৎ পাপ করলেই পুণ্যাত্মা তোমাকে ধরিয়ে দেবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে—যেমন আমার বেলায়—সজ্জনরা সে পাপ লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেন!

এ-সম্বন্ধে বাকি কথা পরে হবে।

তুমি তখন ছুটি নিয়ে কাশী না গয়ায় কোথায় গিয়েছ।

এদিকে মধুগঞ্জে এল বন্যা।

দিন সাতেক ঝমাঝম বৃষ্টি। তারপর দিন তিনেক পিটির-পিটির। তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই, কারণ আমাদের বছরের বরাদ্দ একশ বিশ ইঞ্চির তখনো একশ ইঞ্চি হয় নি। এমন সময় কোনো রকমের পূর্বাভাস না দিয়ে পাহাড় থেকে হুড়হুড় করে নেমে এল সাত-হাত-উঁচু জলের এক ধাক্কা। সঙ্গে নিয়ে এল বিরাট গাছের গুঁড়ি আর কুঁড়েঘরের আস্ত চাল। তার উপর আঁকড়ে ধরে আছে মৃত্যুভয়ে কম্পমান শত শত নরনারী, পশুপাখী, এমন কি, সাপ-বিচ্ছুও। সকলের সম্মুখেই মৃত্যু যখন সশরীর বর্তমান, মানুষ তখন সাপকে

মারে না, সাপ মানুষকে কামড়ায় না। ক্ষুধার উদ্রেকও নিশ্চয় তখন হয় না—একই বাঁশের উপর আমি তখন সাপের কাছে ইঁদুরকে বসে থাকতে দেখেছি। আর জলের তাড়া খেয়ে সাপ তো আমার ডিঙিতে আশ্রয় নিতে ধেয়ে এসেছে কত গণ্ডা—ওদিকে মাঝিরা লগি দিয়ে জলে ঝপাঝপ মার লাগাচ্ছে তারা যেন না আসে—তবু আসবেই।

মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত নরনারী উদ্ধারের জন্য চিৎকার পর্যন্ত করছে না। গোড়ার দিকে নিশ্চয়ই করেছিল। এখন বোধ হয় গলা ভেঙে গিয়েছে। আর বাঁচাবে কে? যে কখানা নৌকো ভেসে যাচ্ছে, সেগুলো মানুষের ভারে এই ডোবে কি ঐ ডোবে। যে লোকগুলো নৌকোয় আশ্রয় পেয়েছে তারা আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়ে হয়ে গিয়েছে কঠিন। আর একটি মাত্র শিশুকেও তারা নৌকোয় স্থান দিতে নারাজ।

জলের উপর দিবারাত্র ভেসে চলেছে অগুন্তি মড়া। গোরু, বাছুর, শেয়াল, কুকুর, মোষ—হাতি পর্যন্ত। ভেবে আমি কূলকিনারাই পেলুম না, পাহাড়ের উপর কতখানি তোড়ে জলের স্রোত নেমে আসলে একটা হাতি পর্যন্ত বেকাবু হয়ে নদীর জলে ভেসে এসেছে। একটা হাতি কোনোগতিকে সাঁতার কেটে কেটে পাড়ে এসে উঠল আমারই টিলার নিচে। দেখেই বুঝলুম, বুনো। তখন সে নির্জীব, কিন্তু পরে না আশপাশে আতঙ্কের সৃষ্টি করে, সেই আশঙ্কায় ওটাকে গুলি করে মারব কি না যখন ভাবছি, তখন মধুমাধব জমিদারির মাহুত—উঁচু জায়গার সন্ধানে সে তার হাতি নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল আমার পিছনের টিলায়—তাকে দিব্য পোষ মানিয়ে নিয়ে গেল আপন হাতির সঙ্গে বনের ভিতর। যাবার সময় আমাকে সেলাম করে বলল, 'এ হাতি আশ্রয় পেয়ে বেঁচে গেছে হুজুর। এ হাতি আর কখনো বনে ফিরে যাবে না, কারো অনিষ্টও করবে না। হাতি তো নেমক-হারাম জানোয়ার নয়।'

শুধু জল আর জল। বর্ষার প্রথম ধাক্কাতেই কাজলধারার কালো জল ঘোলা হয়ে গিয়েছিল। এখন সে হয়ে গেল সাদা। কিন্তু ধবল-কুষ্ঠের মতো কী রকম যেন এক বীভৎস সাদা। কোনো কোনো সাপের গায়ে আমি এ রঙ দেখে শিউরে উঠেছি এবং বিষাক্ত কি না সে খবর না নিয়েই মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি। এ জলের মাথায় যদি লাঠি মেরে কেউ তাকে মেরে ফেলতে পারত!

প্রথম ধাক্কাতেই বান ভেঙে দিল আমাদের নদীর পাড়। ডুবিয়ে দিল শহরের নীচু জায়গার বাড়িঘর। ভাগ্যিস প্রথম জোর মারটা এসেছিল দিনের বেলায়, না হলে কতো লোক এবং আমাদেরই চেনা লোক যে এক ঘুম থেকে

আয়েক ঘুমে চলে যেত তার সন্ধান পর্যন্ত আমরা পেতুম না। তারা আশ্রয় নিল জাত-বেজাতের নৌকোয়, বাকিরা এসে উঠল টিলা-টালার উপরে। আমাদের মধুগঞ্জে আছে কটাই বা তাঁবু! তারই সব কটা পড়ল এখানে-ওখানে। বাকিরা টিলা থেকে ডাল-পাতা কুড়িয়ে নিয়ে তুললে চালাঘর। মুদীরাও আশ্রয় নিয়েছে সেইখানেই—আর যাবেই বা কোথায়? তোমার পরিবারের আশ্রয়ের জন্যে আমি আমার ভাওয়ালি পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। সে নৌকো এনে বাঁধা হল আমার টিলার নিচের বটগাছের সঙ্গে।

আশ্চর্য, শহরে কোনো কুকীর্তি হলে আমরা যে কটা ভ্যাগাবণ্ড বকাটে ছোঁড়াকে সন্দেহ করে ধরে এনে তাদের ধরে চোটপাট লাগাতুম, তারাই দেখি সকলের পয়লা কোমর বেঁধে লেগে গেল উদ্ধারের কাজে। এক মুহূর্তেই কোথায় গেল তাদের তাস-পাশা, ইয়ার্কি-খিস্তি। আর সবচেয়ে ত্যাঁদোড় ঐ পরেশটা—যে আমার বাগানের লিচু পর্যন্ত চুরি করেছে, রায়বাহাদুর কাশীশ্বরকে পর্যন্ত যে আড়াল থেকে মুখ ভ্যাঙচায়—সে দেখি তার ইয়ারদের নিয়ে কলাগাছের ভেলা বানিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে নদীর উপরে। সেই বানের ভরা গাঙে! কত লোক বাঁচাল তারা! দিনের শেষে, সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখি আর সবাই চলে গিয়েছে, সে একা ভেলার উপরে বসে নদীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। গায়ে ধুতির ভিজে খুঁট। আমার বরষাতিটা আমি তার দিকে ছুঁড়ে দিতে সে সেটা লুফে নিয়ে আমার দিকে ফের ছুঁড়ে ফেরত দিলে। বত্রিশখানা দাঁত বের করে এ-কান ও-কান জুড়ে হাঁ করলে—এই হল আমাদের 'থ্যাঙ্কস্, নো'র বাঙলা অনুবাদ।

তুমি জান সোম, বন্যার পর শহরে কোনো কুকর্মের জন্য ওদের সন্দেহ করলে, ডেকে শুধু 'বাপু, বাছা,' করতুম, দু-একবার জেনে শুনে ছেড়ে দিয়েছি। কড়া কথা বলতে প্রবৃত্তি হয় নি।

আহুর মজদা আর আহির মনে নিরন্তর এ কী দ্বন্দ্ব! আহির মনের যে চেলার জ্বালায় উদয়াস্ত সমস্ত পাড়া অতিষ্ঠ, সঙ্কটের সময় সে দেখি হঠাৎ আহুর মজদার ডাকে 'হা-জি-র' বলে তৈরী, প্রাণটা খোলামকুচির মতো বন্যার জলে ডুবিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত!

তোমার বিশ্বাস, কোনো কোনো মানুষ পাপাত্মা—ক্রিমিনাল মাইণ্ড নিয়ে জন্মায়। শেষবারের মতো বলেছি, তা নয় সোম, এরা সব মিস্‌ফিট্। এরা শুধু সঙ্কটের মাঝখানে জীবসত্তার চৈতন্যবোধে বেঁচে থাকার আনন্দ (জোয়া ছ ভিভ্র্) পায়। দৈনন্দিন জীবন এদের কাছে অসহ্য একঘেয়ে বলে মনে হয়।

আমার দেশে এ রকম ছোঁড়ারা পল্টনে ঢুকে গিয়ে আপন জীবনের সার্থকতা পায়। তাই বাঙালী পল্টন খোলা মাত্রই আমি সর্বপ্রথম এদেরই ডেকে পাঠিয়েছিলুম। এরা যে সেখানে সুনাম করেছে, সে কথা তোমার অজানা নয়।

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম।

সেই সর্বব্যাপী হাহাকারের ভিতর আমি কিন্তু একটি বড় মধুর দৃশ্য দেখেছি। আমার টিলা, পাঁদ্রী-টিলার চতুর্দিকে যখন আশ্রয়ার্থীরা চালা, মাচাঙ বানাতে ব্যস্ত, ভিজে কঞ্চি-বাঁশ দিয়ে আগুন জ্বালাতে গিয়ে মেয়েরা চোখের-জলে নাকের-জলে, তখন দেখি বাচ্চারা মহোল্লাসে শেক্সপীয়ারের 'প্রিম্‌রোজ্ পাথ টু ইটার্নেল বন-ফায়ারের' পিকনিক চড়ুই-ভাত বনের ভিতর সফল করে তুলেছে। এদের একের অন্যের সঙ্গে দেখা হয় ইস্কুল ঘরে, কিংবা খেলার মাঠে তা-ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। আজ যেন তারা সবাই এক বিরাট বাড়ির প্রকাণ্ড পরিবার। সে বাড়ির ছাদ আকাশ, দেয়াল টিলাগুলো, খেলবার জন্য দুনিয়ার গাছপালা; টিপ-টিপা আর নাশ্‌তার জন্য পিষ্টি-বৈচিমন, আনারালি, কালোজাম, বুনো কাঁঠাল। আর সবচেয়ে বড় আনন্দ, বাপ মা শাসন করে না, তারা আশ্রয় নির্মাণে মত্ত। এরা যত বাইরে বাইরে কাটায় ততই মঙ্গল। এই হনুমানের জ্বালায় টিলার হনুমানগুলো তখন বাপ-বাপ করে এ তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছিল।

শেষটায় জল এসে ঢুকল আমার লিচুবাগানে।

আগে ছিল আমার বাড়ির সামনের গাছপালার সবুজ, তারপর কাজলধারায় কালো জল, তারপর ফের ধানক্ষেতের কাঁচা সবুজ এবং সর্বশেষে কালাই পাহাড়ের নীল রঙ। এখন আমার আর পাহাড়ের মাঝখানে শুধু নোংরা খোলা জলের একরঙা উদরী রোগীর ফুলে-উঠা পেটের মতো এক ভয়াবহ সত্তা। তারই মাঝে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে আছে কোনো ঘর, আর কোনো ঘর মাথা অবধি ডুবিয়ে—জলের উপর শুধু টিনের চারখানা চাল বসে আছে, মোষ যে রকম সর্বাঙ্গ জলে ডুবিয়ে দিয়ে শুধু মাথাটা উপরে ভাসিয়ে রাখে। সবকিছু জলে একাকার বলে আসল নদীটি কোথায়, সে শুধু বোঝা যাচ্ছে, তার উপর দিয়ে ভেসে যাওয়া কালো কালো ঢিপি থেকে—মড়া মোষ, শুয়োর, গরু আরো কত কী! আর আমার বারান্দায় লক্ষ লক্ষ কেঁচো—সাপ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

সত্যি বলতে কী, তখন এ-সব দেখেও দেখি নি। আজ দেখছি, আমার অজানতে মন অনেক কিছু স্মরণ রেখেছে। আমি তখন পাঁচশটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত, যে-সব কাজ সম্বন্ধে আমার কণামাত্র অভিজ্ঞতা নেই।

তোমাদের জাতটা এমনিতে বড্ড ইনডিসিপ্লিণ্ড কিন্তু বিপদের সময় আমাদের

তুলনায় তোমরা অনেক বেশী কমন্‌সেনস্ ধর। আপনা থেকে কেমন যেন একটা ডিসিপ্লিন তোমাদের ভিতর এসে যায়। তা না হলে আমার সেই পাগলের মতো ছুটোছুটির ফলে ইষ্ট না হয়ে কী যে অনিষ্ট হত বলতে পারি নে।

সাত দিন ধরে আমি কলের মতো কাজ করে গিয়েছি—আমি সংবিতে ছিলুম না। এমন কি, আমার জীবনের আপন ট্র্যাজেডি সম্বন্ধেও আমি অচেতন হয়ে গিয়েছিলুম।

অষ্টম দিনে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সংবিতে ফিরলুম। ডাঙশ মেরে মানুষ একে অন্যকে অজ্ঞান করে। আমাকে ডাঙশ মেরে আনা হলো সংবিতে।

বাঙলোয় এসে শুনলুম, মেব্‌লের বাচ্চা হয়েছে।

১২ই সেপ্টেম্বর

তোমাদের সকলের মুখে শুনি, কর্ম করে যাবে, ফললাভের আশা ত্যাগ করে। ফল দেওয়া-না-দেওয়া ভগবানের হাতে। এই নাকি তোমাদের সর্ব অভিজ্ঞতা, সর্বশাস্ত্রের মূল কথা।

মা মেরী সাক্ষী, আমি বন্যার সাত দিন কোনো ফললাভের আশা করে কাজ করি নি। আমি আমার আপন প্রাণ বিপন্ন করে যাদের বাঁচিয়েছিলুম, তাদের কেউ কেউ বন্যার পর কলেরায় মারা যায়। তাই নিয়ে আমি শোক করি নি। অন্য ফলের কোনো প্রশ্নই তো আমার মনে ওঠে নি।

কিন্তু কর্মফলের লোভ ত্যাগ করে যে মানুষ কাজ করে গেল, তাকে অর্থাৎ তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্রকে বুঝি তোমাদের ভগবান বকশিশ দেন জারজ সন্তান!

১লা ডিসেম্বর

যতই ভাবি মনকে এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত হতে দেব না, মূল কথা সংক্ষেপে বলে ফেলব, ততই দেখি আস-কথা, পাশ-কথা সব কথাই মনের ভিড় থেকে বাইরের প্রকাশে এসে নিষ্কৃতি পেতে চায়। অথচ মনের গভীর গুহাতে যে সব ভূতের নৃত্য অহরহ চলেছে তাদের একটাকেও তো আমি ভালো করে ধরতে পারছি নে। অজ্ঞানে, সজ্ঞানে, সুষুপ্তিতে, স্বপ্নে এরাই গড়ে তুলছে আমার জীবন-দর্শন—ভেল্ট-আন্‌শাউউং—তারই বুদ্বুদ শুধু চেতন মনে ভিড় করে, আত্মপ্রকাশের জন্য।

সে মনের গুহায় আছে কত প্রাণী,—হ্যামলেট, ডন কিকসট্, ডক্টর জীকল, মিস্টার হাইড এবং তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়ে এদের নাচাচ্ছেন আহুর মজদা, আহ্রি

মন, হয়তো ছেলেবেলাকার আমার আরাধ্য দেবী মা-মেরি তখনো আমাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন করে ফেলেন নি—এখনো আমি মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি, আমার ছেলেবেলাকার শহরের গির্জায় আমি হাঁটু গেড়ে উপাসনা করছি আর তিনি করুণ নয়ানে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন ; এ স্বপ্ন আমি বড় ডরাই।

কখনো দিনের পর দিন বারান্দায় জড়ের মতো বসে রইতুম হ্যামলেট হয়ে, আর তাকে ডক্টর জীকুল্ কানে কানে বলত, 'এই ভালো, চুপ করে বসে থাকো। সংসারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কী করতে পার তুমি ? কোন্ কর্মের কী ফল, তা আগেভাগে, জানবে কী করে !' ভুলে গেছ, অস্কার ওয়াইল্ডের সেই গল্পটা ? প্রভু যীশু এক অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তার পর পথে যেতে যেতে একদিন দেখেন, এই লোকটা এক বারবনিতার দিকে লোলুপ নয়নে তাকিয়ে আছে। প্রভু বিরক্ত হয়ে তাকে শাসন করলেন। উত্তরে সে কাতর-কণ্ঠে বললে, 'আমার দৃষ্টিশক্তি ছিল না, আপনি আমাকে দয়া করে সে শক্তি দিলেন। এখন আমি তা দিয়ে অন্য কী করতুম, বলুন।' তাই দেখো, কোন কর্মের কী ফল তা স্বয়ং প্রভু যীশুই যখন জানেন না, তখন তুমি, কীটস্য কীট, তুমি জানবে কী করে ? কিংবা স্মরণ করো সেই চীনে গল্পটা। এক জমিদারের ছেলে বনে শিকার করতে গিয়ে পথ হারিয়ে গুম্ হয়ে গেল। পাড়া-প্রতিবেশী তার বাড়িতে এসে শোক প্রকাশ করে তাকে সান্ত্বনা জানালে। জমিদার ছিলেন জ্ঞানী লোক, শুধু বললেন, 'এ যে খারাপ হল, জানলে কী করে ?' তার দিনদশেক পরে ছেলেটা বন থেকে ফিরে এল একটা চমৎকার বুনো ঘোড়া সঙ্গে করে। সবাই এসে সানন্দে অভিনন্দন জানালে। জমিদার বললেন, 'এ যে ভালো হল, জানলে কী করে ?' তার কিছুদিন পর ছেলেটা ঐ বুনো ঘোড়া থেকে পড়ে পা-খানা ভেঙে ফেললে। সবাই এসে শোক প্রকাশ করলে। জমিদার বললেন, 'এ যে খারাপ হল, জানলে কী করে ?' তার কিছুদিন পর লাগল লড়াই, সম্রাটের লোক এসে ধরে নিয়ে গেল সব জোয়ানদের ; ছেলেটার পা ভাঙা বলে তাকে যেতে হল না। সবাই এসে আনন্দ জানালে। জমিদার বললেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবেই দেখো, কিসে কী হয়, বলবে কে ?

আর কখনো বা সেই মারমুখো ডন কিক্সট্‌কে আরো ওশকাতে লাগত তার পিছনে দাঁড়িয়ে মিস্টার হাইড। 'কী দেখছ, বসে বসে ? তোমার লজ্জা-শরম নেই, অপমান-বোধ নেই ? তুমি কী একটা পা-পোশ না আস্ত একটা ভেড়ুয়া ? আণ্ডা-ঘর তোমাকে নিয়ে কী ঠাণ্ডা-ব্যঙ্গ করে তার খবর রাখ ? ইস্তেক নেটিভ,

কালা-আদমী খানসামাগুলো ?' 'এদিকে চোরচোট্টার উপর কী রোয়াব! ওঃ যেন কলকাত্তার হাই-কোর্টের বড় জজ সাহেব নেমে এসেছেন মধুগঞ্জের গুনাহ্-হারামি খতম করবার জন্যে, আর ওদিকে নিজের ঘরের বউ যে চুরি হয়ে গেল তার জন্যে কোনো গরমি নেই। সায়েবের গায়ে বুঝি মাছের রক্ত—তাও শিঙি মাছের না, একদম্ পুঁটি।' বুঝলে হে মহামান্যবরেষু, সিন্নোর ডন্ কিথোঠে, ব্যাটারা এই কথা কয় কত রঙে কত ঢঙে! আর তোমার বাটলারটা! তওবা, তওবা—তা তোমাকে বলে আর কী হবে? এইবার লেগে যাও, তোমার—হোঃ, হোঃ, হোঃ, তো-মা-র ছেলের ব্যাপ্‌টিজমের ব্যবস্থা করাতে।'

এই রকমই একদিন ডন কিক্‌সট্, বা আমি, হঠাৎ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে করলুম বাচ্চার বাপ্তিস্মের প্রস্তাব, জয়সূর্যকে গড-ফাদার বানিয়ে। তোমার মনে থাকার কথা, কারণ সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে তুমি।

কাকে অপমান করার জন্য এ প্রস্তাব আমি করেছিলুম? মেব্‌ল্‌কে? নিজেকে? কী বলব? ডন কিক্‌সট্ কি কোনো কিছু ভেবে-চিন্তে করে? তবু লেখক সেরভান্তেসের মানসপুত্র ডন কিক্‌সট্ কখনো কারো কিছু অনিষ্ট করে নি। আমি ডন্ কিক্‌সটের, পিছনে ছিল যে মিস্টার হাইড।

গির্জেঘরের সে দৃশ্য তোমার মনে আছে? মাঝে মাঝে আমার পর্যন্ত মনে হয়েছিল, কাজটা বোধ হয় ঠিক হল না।

তখন মিস্টার হাইড ধমক দিয়ে বলেছে, 'ফের!'

আর আহির মন বলেছে, 'জীতে রহো বেটা!'

আমি যা-কিছু করেছি তার জন্য তোমার কাছ থেকে আমি কোনো করুণা ভিক্ষা করছি নে, কোনো সহানুভূতিও চাইছি না, কিন্তু সোম, আমার ভিতর এই যে গোটা-ছয় ভিন্ন প্রকারের প্রবৃত্তি অষ্টপ্রহর অনবরত লড়াই চালাত আমাকে নির্মমভাবে এদিক-ওদিক টানা-হ্যাঁচড়া করত—একটা মড়াকে যে রকম দশটা শকুন ছেঁড়াছেঁড়ি করে—আমার জাগরণ বিষাক্ত করে রাখত, আমি ঘুমুতে গেলেই খাটটা নাড়াতে থাকত, ঘুমিয়ে পড়লে দুঃস্বপ্নের মতো বুক চেপে বসত, জেগে উঠেই দেখতুম তারা সব লোলুপ নয়নে পহর গুনছে, কখন আমি জাগব, কেউ দেবে চোখ ঠোকরে, কেউ ফুটো করে দেবে তালুটা—এঁরা আমাকে দিয়ে কী করেছিল সেইটে তুমি কিছুটা বুঝতে পারলেই আমি আমার জীবনের এ দিকটার কথা আর তুলব না।

আপিসে কাগজপত্র সই করার সময় তারিখ দিতে হয়, খবরের কাগজও মাঝে মাঝে পড়েছি, কাজেই দিন, মাস, বৎসর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন কখনো

হতে পারি নি। তাই জানি এই করে করে বছর পাঁচেক কেটে গেল।

সত্যি বলছি, সোম, বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমার জীবনে এ পাঁচ বছরে কিছুই ঘটে নি। লড়াই লেগেছিল বলে প্রচুর খেটেছি, হাট লুঠ বন্ধ করে রেখেছি, স্বদেশী আন্দোলনকে ছড়াতে দিই নি। সাধারণ মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে, তার জীবন বিকাশ লাভ করে এই সব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে, বাইরের ঘটনা তার মনকে গড়ে তোলে; আবার সেই মন তার ভবিষ্যৎ কর্মধারাকে নূতনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। আমার জীবনের উপর বাইরের কোনো ঘটনা এ পাঁচ বছর কোনো দাগ কাটতে পারে নি।

আর ভিতরের জীবনের কিছুটা ইঙ্গিত তোমাকে দিয়েছি। আর ভিতরকার জট যদি আমি নিজেই ভালো করে ছাড়াতে পারতুম তা হলে তোমাকে বলতুম—আমি পারি নি।

শুধু মেব্‌ল্ দূর হতে আরো দূরে চলে গেল।

যে মেব্‌ল্ একদিন মার্সেলেসে দাঁড়িয়ে মভ রঙের রুমাল নেড়ে নেড়ে জাহাজে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, পাড়ে নেমে আমি রেখেছিলুম তার কাঁধে আমার হাত দুখানি, সে চেপে ধরেছিল আমার বাহু দুখানি—সেই মেব্‌ল্ই হঠাৎ যেন আমাকে পাড়ে ফেলে উঠে পড়ল জাহাজে আর ধীরে ধীরে সে জাহাজ অদৃশ্য হলো অসীম নীলিমার অন্তহীন শূন্যতায়। কাতর আর্তনাদে, করুণ নিবেদনে আমি তাকে ডাকতে পর্যন্ত পারলুম না।

আর সেই মেব্‌ল্-ই এই বারান্দাতেই বসে, আমার থেকে তিন হাত দূরে।

শুধু বুঝলুম, আমার জীবন থেকে এ দ্বন্দ্ব কখনো যাবে না। শান্তি আমি কখনো পাব না।

৫ই ডিসেম্বর

পেট্রিকের জ্বর হয়েছে। সিভিল সার্জন দেখে গিয়েছে। বলেছে ভয় নেই। মেব্‌ল্ পাংশু মুখে বারান্দায় পায়চারি করছে। একবার হ্যাটটা মাথায় দিয়ে পাদ্রী-টিলার দিকে রওয়ানা হল। বহুকাল হল সে বাড়ি থেকে আদপেই বেরোয় নি। কিন্তু গেল না। ফিরে এল। তারপর বারান্দায় রেলিঙে দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল।

আমি তো অন্ধ নই। দেখলুম, মাতৃত্বের রসে মেব্‌লের দেহখানির প্রতি অঙ্গটি কী অপরূপ পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য পেয়েছে। যেন এদেশের বর্ষায় ভরা পুকুর।

অনেকক্ষণ পরে মেব্‌ল্‌ আমার সামনে এসে মাথা নিচু করে বললে, 'এদেশের আবহাওয়া পেট্রিকের সইছে না। তার পড়াশুনার ব্যবস্থাও এখানে ঠিকমত হবে না। আমরা বিলেত যাই। তুমিও সঙ্গে চলো না? তোমার তো অনেক ছুটি পাওনা আছে।'

বহুকাল পরে মেব্‌ল্‌ কথা বলল।

আমি বললুম, 'সেই ভালো। তবে আমি সঙ্গে আসতে পারব না। তোমরা ইংলণ্ডের কোথাও বাড়ি করে থাকো। আমি পরে সুযোগ পেলে যাব।'

মেব্‌ল্‌ মাথা নেড়ে সায় দিলে। সে কখনো আমার কোনো ইচ্ছায় আপন অনিচ্ছা জানায় নি, নিজের ইচ্ছা তো প্রকাশ করতই না!

এ রকম ধারা কোনো একটা পরিবর্তন আমার জীবন-প্যাটার্নে আসতে পারে সে কথা আমি কখনো ভেবে দেখি নি।

অথচ এ তো কিছু খুদার-খামাখা আজগুবী সমাধান নয়। চার-পাঁচ বছরের লেখাপড়ার সুবিধের জন্যে আমার মতো দু-পয়সাওয়ালা লোকের পরিবার আকছারই তো বিলেত যাচ্ছে।

তবু আমি সমস্ত রাত বিছানায় পড়ে রইলুম অসাড়ের মতো। শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রা এসেছিল। আচমকা ঘুম ভাঙল ভোরের দিকে।

দেখি সমস্যা সমাধান করে ফেলেছি। সব সমস্যার সমাধানই হয় ঘুমে, স্বপ্নে কিংবা অবচেতন মনে।

মাত্র যে তিনটি প্রাণীর সঙ্গে আমার জীবনের যোগসূত্র, বরঞ্চ বলি, যে তিনটি প্রাণী আর আমাকে নিয়ে আমার জীবন, তারাই আমার জীবনকে অসহ্য করে তুলেছে পলে পলে, প্রতি ক্ষণে তারা আমার আয়ু ক্ষীণ করে নিয়ে আসছে, তিন দিক থেকে তিন রাহু আমার জীবনকে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করে, একদিন বিলুপ্ত করে দেবে। এই নিয়ে আমার সিদ্ধান্তের আরম্ভ। পরের সিদ্ধান্তগুলো এক-এক করে এই :

দূরে চলে গিয়ে আমার উপর এদের শক্তি আরো বেড়ে যাবে। এ সংসারে এরা বেঁচে থাকবে, না আমি বেঁচে রইব?

আমি।

এরা পাপী, মরা উচিত এদেরই। মেব্‌ল্‌ পাপী, জয়সূর্য পাপী আর পেট্রিক ওদের পাপ-জাত সন্তান। আমি নির্দোষ, আমি কোনো পাপ করি নি। আমি কস্মিনকালেও কারো হকের ধন থেকে একটি কানাকড়িও কেড়ে নিই নি। এরাই

দিয়েছে আমাকে ফাঁকি, এরা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন আমাকে দেবে শুধু ফাঁকি।

এরা মরে গেলে আমি শান্তি পাব। আমার দ্বন্দ্বের সমাধান হবে।

খুন কী করে করা হয়, তার সব কটা পদ্ধতিই জানি আমরা। তুমি আমি অর্থাৎ পুলিশ। খুনীরা আপন আপন সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি অনুযায়ী পন্থা বেছে নিয়ে করে খুন। সব খুনের ইতিহাস, বিশ্লেষণ জড়ো হয় থানায়। কোন্ পন্থার কী গলদ, সামান্য কী একটা ত্রুটি কিংবা বিচ্যুতি এড়ালে খুনী ধরা পড়ত না, এসব তত্ত্ব আমাদের ভালো করে জানা। আমরা যদি নিখুঁত খুন না করতে পারি, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন কোনো ঢ্যাঙা লোকও সে চাঁদ ধরবার আশা না করে।

এ তো চ্যালেঞ্জ নয়। এ তো অতি সোজা কাজ। কিন্তু অতি সরল কর্মও অবহেলার সঙ্গে করতে নেই।

আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই। আমার মনের গুহার হ্যামলেট, কিক্‌সট্, জীকুল, হাইড, মজদা, মনু সবাই মরে গিয়েছে। এখন যা-সব আমি করতে যাচ্ছি, সে-সব ডেভিড ও-রেলির সম্পূর্ণ নিজস্ব।

নির্দ্বন্দ্ব চিত্তে যে রকম বন্যার কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলুম, পেট্রিকের বাপ্তিস্ম পরব করার সময় আমি যে রকম স্থির নিশ্চয় হয়ে এগিয়ে ছিলুম, এবারেও ঠিকই তাই।

সকালবেলা জয়সূর্যকে ডেকে বললুম, 'তুমি মেব্‌ল্‌দের জাহাজ ধরিয়ে দেবে বোম্বাই, মাদ্রাজ কিংবা অন্য কোনো বন্দরে। সেটা পরে স্থির হবে। তারপর তুমি কিছুদিনের জন্য সেখান থেকে সোজা দেশে যেয়ো। আগে যখন ছুটি চেয়েছিলে, তখন সুবিধে হয় নি, এখন আমার একলার কাজ আরদালিই করতে পারবে।'

জয়সূর্য খুশী না বেজার হল তার মুখ থেকে বোঝা গেল না।

আমি সেদিনই কুকটুক সাব ট্র্যাভেল এজেন্সিকে চিঠি লিখে দিলুম, কবে কোন্ বন্দর থেকে কোন্ জাহাজ ছাড়বে, জায়গা পাওয়া যাবে কিনা, ভাড়া কত—ইত্যাদি জানতে। ফলে যে সাত ডাঁই মালমশলা উপস্থিত হল, সে তো ঐ সময় তুমি এক দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখেছ। আমার কেমন যেন আবছা আবছা মনে পড়ছে, সেদিন তোমার সঙ্গে একটু খিটখিটে ব্যবহার করেছিলুম। তার কারণ যদিও তখন আমি ঐসব কাগজপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলুম, কিন্তু আসলে তারই আড়ালে আমার অন্য প্ল্যানটাকে আমি ফিটফাট ওয়াটার-টাইট করে নিচ্ছিলুম।

বাইরের শোটাকে তার ফিনিশিং টাচ দেওয়ার জন্য আমার দরকার ছিল শুধু কয়েকখানা লাগেজ লেবেলের। কোনো কোনো ট্র্যাভেল এজেন্সি খদ্দেরকে আপন চালাকি দেখাবার জন্য কেবিন বুক হওয়ার পূর্বেই কিছু লাগেজ টিকেট পাঠিয়ে দেয়। যেমন যেমন মেব্‌লের এক-একটা সুটকেস, ওশ্‌ন্‌ ট্রাঙ্ক তৈরী হতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের উপর সেই লেবেল্‌গুলো সেঁটে দিতে লাগলুম।

ওদের দিকটা তৈরী, এখন আমার দিকটা ঠিক করতে হবে।

মানুষ মারা তো অতি সহজ, বিশেষ করে সে মানুষ যখন তোমার অভিসন্ধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন! আসল সমস্যা মড়া নিয়ে। বেশীর ভাগ খুন ধরা পড়ে মড়া থেকে এবং খুনী ধরা পড়ে তার থেকে।

ক্রমে ক্রমে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। বাক্স-প্যাটরা তৈরী, রাস্তার জন্য অল্পস্বল্প খাবার দাবারও প্যাক করা হয়েছে। পরদিন ভোরবেলা আমি মেব্‌ল্‌দের মোটরে প্রায় কুড়ি মাইল দূরের রেল স্টেশনে পৌঁছে দেব।

সন্ধ্যের সময় চাকরবাকরদের ছুটি দিলুম। তারা যেন ভোরবেলা এসে মালপত্র মোটরে তুলে দেওয়াতে সাহায্য করে।

ডিনারের খবর নিয়ে যখন জয়সূর্য এল, তখন আমি হঠাৎ মেব্‌ল্‌কে বললুম, 'আজ এ ডিনারে জয়সূর্য আমাদের সঙ্গে বসে খানা খাক।'

মেব্‌ল্‌ অবাক হয়ে আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ছিল। তার চোখে আপত্তির চিহ্ন ছিল।

আমি বললুম, 'আফটার অল, ও তোমাদেরই একজন। অন্তত এক দিনের জন্য তাকে তার ন্যায্য সম্মান দেখানো উচিত।'

মেব্‌ল্‌ চুপ করে রইল।

খানা টেবিলে জয়সূর্যকে বসতে দেখে পেট্রিক খুশি।

আমি বললুম, 'বাটলার, তুমি সুপটা নিয়ে এসো; মেব্‌ল্‌ তুমি নিয়ে আসবে মাংস; আর আমি নিয়ে আসব পুডিং।'

ব্যবস্থাটা সকলের মনঃপূত হল কি না তা ভাববার ফুরসত নেই। আমাকে আমার প্ল্যান-মাফিক কাজ করে যেতে হবে।

সে এক অদ্ভুত ডিনার। সবাই চুপ করে খেয়ে যাচ্ছে।

পুডিং আনার জন্য আমি গেলুম রান্নাঘরে।

পকেটে আর্সেনিক ছিল। ডাক্তারি শাস্ত্রে যে পরিমাণের প্রয়োজনের কথা বলে তার চেয়ে একটু বেশী করেই জয়সূর্য মেব্‌ল্‌ আর পেট্রিকের পুডিংএ মিশিয়ে দিলুম।

ওদের ছটফটানি, মৃত্যু-যন্ত্রণা আমি দেখি নি। আমি ততক্ষণে বড় লিচু-গাছটার কাছে গোর খুঁড়তে লেগে গিয়েছি। কাজ সহজ করার জন্য দুদিন আগে মালিকে দিয়ে সেখানে মৌসুমী ফুল ফোটাবার ফ্লাওয়ার বেড খুঁড়িয়ে রেখেছিলুম। এক বস্তা চুনও আনিয়ে রেখেছিলুম।

রাত প্রায় চারটের সময় গোর শেষ হল।

তারপর লাগেজগুলো নিজে মোটরে তুললুম চাকরদের আসবার আগেই বেরিয়ে যাব বলে, তাদের বলেছিলুম ছটায় আসতে। স্টেশনের পথে দশ মাইল দূরে বঁড়শীছড়া নদীর উপর যেখানে পোল, তারই ডান দিক দিয়ে যে ছোট্ট রাস্তা তারই উপর দিয়ে মোটর চালিয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে লাগেজগুলোর সঙ্গে ইট বেঁধে ডুবিয়ে দিলুম নদীর গভীরে।

তারপর বাড়ি ফিরে এসে শুয়ে পড়লুম।

আমাদের মহাকবি বলেছেন, ঘুম সঞ্জীবনী রসে প্রাণকে নবজীবন দান করে। সে কথা আমি মানি। কিন্তু তার উল্টোটাও হয়, তুমি লক্ষ্য করেছ কি? নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে গেলে, ভাবলে অন্তত ঘণ্টা দশেক গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকবে। আধঘণ্টা যেতে না যেতেই হঠাৎ পা দুটো হ্যাঁচকা টানে সটান খাড়া হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল!

শুনি আহির মনের অট্টহাসি। যে আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এতদিন প্ল্যানের প্রতিটি খুঁটিনাটি ঠিক ঠিক নিখুঁত-পরিপূর্ণ করে সমস্ত কর্ম সমাধান করলুম, ঘুম ভাঙতেই দেখি পায়ের তলার সে দৃঢ় ভূমি হঠাৎ ভলভলে কাদা হয়ে গিয়েছে আর আমি ক্রমাগত তলার দিকে ডুবে যাচ্ছি। ঘামে আমার সর্ব শরীর ভিজে গিয়েছে, আমি কলাপাতার মতো থরথর করে কাঁপছি। আমার শরীর, আমার মন আমার কব্জার বাইরে চলে গিয়েছে। হঠাৎ হয়তো বা চিৎকার করে ফেলি, 'আমি খুন করেছি। লিচুগাছটার তলা খোঁড়ো, সব কটা মড়া সেখানে পাবে!'

নিজের গলা সবলে নিজের হাতে চেপে ধরে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করি। দেখি, হাত ওঠে না।

এই হল আহির মনের সবচেয়ে বড় শয়তানি। তোমাকে আত্মপ্রত্যয় দেবে, সাহস দেবে, সব বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হবার হাজারো সন্ধিসুলুক বাতলে দেবে, তারপর যে মুহূর্তে তার ইচ্ছামত কর্মটি সমাধান হয়ে গেল, অমনি তোমাকে তোমার বিভীষিকার হাতে সমর্পণ করে চলে যাবে।

আমি মর্মে মর্মে অনুভব করলুম, বিশ্বাসঘাতকতাকে সর্বদেশ সর্বশাস্ত্র কেন

সবচেয়ে বড় পাপ বলে নিন্দে করেছে।

তাই তখনো আমার যেটুকু শক্তি বাকি ছিল, তাই দিয়ে আমি আমার শেষ আশ্রয় আঁকড়ে ধরে রইলুম। সেটা কী?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং এখনো আছে, মেব্‌ল্‌দের খোঁজ কেউ করবে না। আমার কিংবা মেব্‌লের ত্রিসংসারে কেউ নেই যে, আমরা কোথায় তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে। বিলেতে যে দু-একজনের সঙ্গে আমাদের সামান্য পরিচয়, তারা ভাববে, আমরা এদেশে; এদেশের লোক ভাববে মেব্‌ল্‌রা বিলেতে। যদি বা কারো মনে কোনো সন্দেহ হয়, তবে সে বিষ্ণুছড়া মাদামপুরের মুরুব্বীদের মতো ভাববে, কাজ কি এ পাপ ঘেঁটিয়ে। খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে হয়তো বেরিয়ে পড়বে, মেব্‌ল্‌ ঐ নেটিভ বাটলারটার মিস্ট্রেস হয়ে গোপনে দিন কাটাচ্ছে। হয়তো বিলেতে কিংবা মসুরিতে। মসুরির কথা ওঠাতে মনে পড়ল, একবার আণ্ডা-ঘরে গুজোব রটে, মেব্‌ল্‌রা মসুরিতে। তার কারণ, মেব্‌ল্‌দের 'বিলেত যাওয়ার পর' আমি একবার মসুরিতে বেড়াতে গিয়ে হোটেলে উঠি; সেখানে একটি মেম ও তার বাচ্চার সঙ্গে আলাপ হয়। ওদের নিয়ে প্রায়ই বেড়াতে যেতুম বলে কেউ হয়তো আমাদের দেখে মেম এবং বাচ্চাকে ভালো করে সনাক্ত না করতে পেরে খবরটা রটিয়েছিল।

তা সে বিলেতেই হোক আর মসুরিতেই হোক, সে কেলেঙ্কারির হাঁড়ি কালা-আদমিদের হাটের মাঝখানে ভেঙে ইয়োরোপীয় সমাজের ক্ষতি বৈ লাভের সম্ভাবনা কী?

এটা আমি জানলুম সেইদিন, যেদিন আমাদের পারিবারিক কেলেঙ্কারি নিয়ে ক্লাব আলোচনা করে স্থির করল, এ নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো, 'লেট্ দি স্লিপিং ডগ্ লাই।'

তাই তোমাকে এই চিঠিতেই জোর দিয়ে লিখেছি, পাপ করলেই পুণ্যাত্মা তোমাকে ধরিয়ে দেবে না। তার ব্যক্তিগত স্বার্থ না থাকতে পারে, কিন্তু সামাজিক স্বার্থ হয়তো আছে, সে পাপ গোপন করার।

কাজেই আমাকে কেউ ধরিয়ে দেবে না।

১লা জুন

প্রিয় সোম,

প্রায় ছ মাস হল তোমাকে আমার চিঠি লেখা শেষ হয়। এরপর যে আবার কিছু লিখতে হবে সে কথা আমি ভাবি নি।

আজ কিন্তু নূতন করে লিখতে হচ্ছে। তার কারণ আমার হিসেবে একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

ত্রিসংসারে আমার বন্ধু নেই। যারা আছে তারা আমার, না-শত্রু না-মিত্র। এরা যাতে আমার খুন না ধরতে পারে, তার ব্যবস্থা আমি করেছিলুম এবং ধরার কাছাকাছি এলেও কেন যে আমাকে ধরিয়ে দেবে না তার কারণও আমি তোমাকে বলেছি।

কিন্তু অযাচিতভাবে এ সংসারে হঠাৎ যে আমার এক 'মিত্র' দেখা দেবেন এবং আমার 'মঙ্গল' এবং 'উপকার' করতে গিয়ে আমার খুন ধরে ফেলবেন এ কথা আমি কল্পনা করতে পারি নি। তাই হয়েছে।

আমি যুদ্ধের জন্য অনেক কিছু করেছিলুম বলে আই. জি. মুগ্ধ হয়ে আমার সম্বন্ধে যে-সব 'গুজোব' রটেছে সেগুলো খণ্ডন করতে চান। করতে গিয়ে তিনি এবং ডীন সত্যের প্রায় কাছাকাছি এসে গিয়েছেন, এ খবর আমি পেয়েছি।

এর জন্য আমি কোনো ব্যবস্থা করে রাখি নি, এখন আর করবারও উপায় নেই।

তাই যদি ধরা পড়ি তবে আমাকে হয়তো ঝুলতে হবে।

আমার জন্য শেষকৃত্য হয়তো তোমাকেই করতে হবে।

তাই আমার গোরের উপর নিচের দুটোর যে-কোনো একটা খোদাই করে দিতে পার :

(For a Godly Man's Tomb)

Here lies a piece of Christ ; a star in dust
A vein of gold ; a china dish that must
Be used in Heaven, when God shall feast the just.

কিংবা

(For a Wicked Man's Tomb)

Here lies the carcass of a cursed sinner,
Doomed to be roasted for the Devil's dinner.

ডেভিড ও-রেলি।

শব্‌নম

অমরাত্মা রাজশেখরকে

সাহিত্যাচার্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ রাজশেখর বসুকে একখানা পুস্তক উৎসর্গ করিবার বাসনা আমি বহুকাল ধরিয়া মনে মনে পোষণ করিয়াছি, কিন্তু স্বরচনার মূল্য সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দিহান থাকি বলিয়া সাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই। গত পৌষে তাঁহার শরীর অকস্মাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়াতে সর্ব শঙ্কা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া তাঁহার দৌহিত্রের মাধ্যমে আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করি। রাজশেখর সহৃদয় সজ্জন ছিলেন—তাঁহার সদয় অনুমতি লাভ করিয়া অকিঞ্চন কৃতকৃতার্থ হয়।

আজ আমার ক্ষোভ অপরিসীম যে স্বহস্তে তাঁহার চরণকমলে পুস্তিকাখানি নিবেদন করিতে পারিলাম না।

বাদশা আমানুল্লার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ। না হলে আফগানিস্থানের মত বিদকুটে গোঁড়া দেশে বল্-ডান্সের ব্যবস্থা করতে যাবেন কেন? স্বাধীনতা দিবসে পাগমান শহরে আফগানিস্থানের প্রথম বল্-ডান্স হবে।

আমরা যারা বিদেশী তারা এ নিয়ে খুব উত্তেজিত হই নি। উত্তেজনাটা মোল্লাদের এবং তাদের চেলা অর্থাৎ ভিশ্‌তী, দর্জী, মুদী, চাকর-বাকরদের ভিতর।

আমার ভৃত্য আব্দুর রহ্‌মান সকালবেলা চা দেবার সময় বিড়বিড় করে বললে, 'জাত ধম্মো আর কিছু রইল না।'

আব্দুর রহমানের কথায় আমি বড় একটা কান দিই নে। আমি শ্রীকৃষ্ণ নই; 'জাত ধম্মো' বাঁচাবার ভার আমার স্কন্ধে নয়।

'ধেড়ে ধেড়ে হুনোরা ডপ্‌কি ডপ্‌কি মেনীদের গলা জড়িয়ে ধেই ধেই করে নৃত্য করবে।'

আমি শুধালুম, 'কোথায়? সিনেমায়?'

আর আব্দুর রহমানকে পায় কে? সে তখন সেই হবু ডান্সের যা একখানা সরেস রগরগে বয়ান ছাড়লে, তার সামনে রোমান কুকর্ম কুকীর্তি শিশু। শেষটায় বললে, 'রাত বারোটার সময় সমস্ত আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়। আর তারপর কি হয় সে-সব আমি জানি নে হুজুর।'

আমি বললুম, 'তোমার তাতে কি, ভেটকি-লোচন?'

আব্দুর রহমান চুপ করে গেল। 'ভেটকি লোচন,' 'ওরে আমার আহ্লাদের ফুটো ঘটি' এসব বললেই আব্দুর রহমান বুঝতে পারত বাবু বদমেজাজে আছেন। এগুলো আমি মাতৃভাষা বাংলাতেই বলতুম। আব্দুর রহমান ঝাণ্ডু লোক; বাংলা না বুঝেও বুঝত।

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার সময় বেরিয়েছি। পাগমানের ঝোপে ঝাপে হেথা হোথা বিজলি বাতি জ্বলছে। পরিষ্কার তকতকে ঝকঝকে পিচ-ঢালা রাস্তা। আমি আপন মনে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি, এটা হল ভাদ্দোর মাস। কাল জন্মাষ্টমী গেছে। আমার জন্মদিন। মা'র মুখে শোনা। এখন শিলেটে নিশ্চয়ই জোর বৃষ্টি হচ্ছে। মা দক্ষিণের ঘরের উত্তরের বারান্দায় মোড়ার উপর বসে আছে। তার কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে চম্পা তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর হয়তো বা জিজ্ঞেস করছে, 'ছোট মিয়া ফিরবে কবে?'

বিদেশে বর্ষাকাল আমার কাল। কাবুল কান্দাহার জেরুজালেম বার্লিন কোথাও মনস্থন নেই। ভাদ্দোর মাসের পচা বিষ্টিতে মা অস্থির। তাঁর নাইবার শাড়ি শুকোচ্ছে না, ভিজে কাঠের ধুঁয়োয় তিনি পাগল, আর আমি দেখছি হুড়মুড় করে বৃষ্টি নেমে আসছে, খানিকক্ষণ পরে আবার রোদ। আঙ্গিনায় গোলাপ গাছে, রান্নাঘরের কোণে শিউলি গাছে, পিছনের চাউর গাছের পাতায় পাতায় কী খুশির ঝিলিমিলি।

এখানে সে শ্যামল-সুন্দরের দর্শন নেই।

সর্বনাশ! পথ হারিয়ে বসেছি। রাত ন-টা। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। কাকে পথ শুধোই!

ডান দিকে ঢাউস ইমারতে নাচের ব্যাণ্ডো বাজছে।

ওঃ! এটা তা হলে আমার ভৃত্য আব্দুর রহ্‌মান খান বর্ণিত সেই ডান্স-হল। এ বাড়ির খানসামা-বেয়ারা তা হলে আমাকে হোটেলের পথটা বাতলে দিতে পারবে। পিছনের চাকর-বাকরদের দরজার কাছে যাই।

গেলুম।

এমন সময় গটগট করে বেরিয়ে এলেন এক তরুণী।

প্রথম দেখেছিলুম কপালটি। যেন তৃতীয়ার ক্ষীণচন্দ্র। শুধু, চাঁদ হয় চাঁপা বর্ণের, এর কপালটি একদম পাগমান পাহাড়ের বরফের মতই ধবধবে সাদা। সেটি আপনি দেখেন নি? অতএব বলব, নির্জলা দুধের মত। সেও তো আপনি দেখেন নি। তা হলে বলি, বন-মল্লিকার পাপড়ির মত। ওর ভেজাল এখনও হয় নি।

নাকটি যেন ছোট বাঁশী। ওইটুকুন বাঁশীতে কি করে দুটো ফুটো হয় জানি নে। নাকের ডগা আবার অল্প অল্প কাঁপছে। গাল দুটি কাবুলেরই পাকা আপেলের মত লাল টুকটুকে, তবে তাতে এমন একটা শেড রয়েছে যার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এটা রুজ দিয়ে তৈরী নয়। চোখ দুটি নীল না সবুজ বুঝতে পারলুম না। পরনে উত্তম কাটের গাউন। জুতো উঁচু হিলের।

রাজেশ্বরী কণ্ঠে হুকুম ঝাড়লে, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খানের মোটর এদিকে ডাক তো।'

আমি থতমত খেয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলুম।

মেয়েটি ততক্ষণে আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছে আমি হোটেলের চাকর নই। তারপর বুঝেছে, আমি বিদেশী। প্রথমটায় ফরাসীতে

বললে, 'জ্য ভু দমাঁদ্‌ পার্‌দোঁ, মঁসিয়ো—মাপ করবেন—' তারপর বললে ফার্সীতে।

আমি আমার ভাঙা ভাঙা ফার্সীতেই বললুম, 'আমি দেখছি।'

সে বললে, 'চলুন।'

বেশ সপ্রতিভ মেয়ে। বয়স এই আঠারো-উনিশ।

পার্কিঙের জায়গায় পৌঁছনোর পূর্বেই বললে, 'না, আমাদের গাড়ি নেই।'

আমি বললুম, 'দেখি, অন্য কোনও গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারি কি না।'

নাসিকাটি ইঞ্চি খানেক উপরের দিকে তুলে মুখ বেঁকিয়ে অত্যন্ত গাঁইয়া ফার্সীতে বললে, 'সব ব্যাটা আনাচে কানাচে দাঁড়িয়ে বেলাল্লাপনা দেখছে। ড্রাইভার পাবেন কোথায় ?'

আমার মুখ থেকে অজানতে বেরিয়ে গেল 'কিসের বেলাল্লাপনা ?'

মেয়েটি ঘুরে আমার দিকে মুখোমুখি হয়ে এক লহমায় আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেপে নিলে। তারপর বললে, 'আপনার কোনও তাড়া না থাকলে চলুন আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন।'

আমি 'নিশ্চয় নিশ্চয়' বলে সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালুম।

মেয়েটি সত্যি ভারি চটপটে।

চট্‌ করে শুধালে, 'আপনি এদেশে কতদিন আছেন ?—পার্‌দোঁ—আমার ফ্রেঞ্চ প্রফেসর বলেছেন, অজানা লোককে প্রশ্ন শুধাতে নেই ?'

আমি বললুম, 'আমারও তাই। কিন্তু আমি মানি নে।'

বোঁ করে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হয়ে বললে, 'একজাক্‌ৎমাঁ, একদম খাঁটি কথা। আপনার সঙ্গে চলছি, কিংবা মনে করুন আমার আব্বা-জান আপনার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন, আর আপনি আমায় কোন প্রশ্ন শুধালেন না, যেন আমি সাপ-ব্যাঙ কিছুই নই, আমিও শুধালুম না, যেন আপনার বাড়ি নেই, দেশ নেই। আমাদের দেশে তো জিজ্ঞাসাবাদ না করাটাই সখ্‌ৎ বেয়াদবী।'

আমি বললুম, 'আমার দেশেও তাই।'

ঝপ্‌ করে জিজ্ঞেস করে বসল, 'কোন্‌ দেশ ?'

আমি বললুম, 'আমাকে দেখেই তো চেনা যায় আমি হিন্দুস্থানী।'

বললে, 'বা রে। হিন্দুস্থানীরা তো ফ্রেঞ্চ বলতে পারে না।'

আমি বললুম, 'কাবুলীরা বুঝি ফ্রেঞ্চ বলে!'

মেয়েটা খিলখিল করে হাসতে গিয়ে হঠাৎ যেন পা মচকে বসল। বলল,

'আমি আর হাঁটতে পারছি নে। উঁচু-হিল জুতো পরা আমার অভ্যাস নেই। চলুন, ওই পাশের টেনিস কোর্টে যাই। সেখানে বেঞ্চি আছে।'

জমজমাট অন্ধকার। ওই দূরে, সেই দূরে বিজলী-বাতি। সামান্য এক-ফালি পথ দিয়ে টেনিস কোর্টের দিকে এগুতে হল। একটু অসাবধান হওয়ায় তার বাহুতে আমার বাহু ঠেকে যাওয়াতে আমি বললুম, 'পারদোঁ—মাফ করুন।'

মেয়েটির হাসির অন্ত নেই। বললে, 'আপনার ফ্রেঞ্চ অদ্ভুত, আপনার ফার্সীও অদ্ভুত।'

আমার বয়স কম। লাগল। বললুম, 'মাদমোয়াজেল—'

'আমার নাম শব্‌নম।'

তদ্দণ্ডেই আমার দুঃখ কেটে গেল। এ রকম মিষ্টি নামওয়ালী মেয়ে যা-খুশী বলার হক্ক ধরে।

বেঞ্চিতে বসে হেলান দিয়ে পা দুখানা একেবারে হিন্দুকুশ পাহাড় ছাড়িয়ে কাতাখান্‌-বদখশান্‌ অবধি লম্বা করে দিয়ে বাঁ পা দিয়ে হুটুস্‌ করে ডান জুতো এক লাথে তাশকন্দ অবধি ছুঁড়ে মেরে বললে, 'বাঁচলুম।'

আমি বললুম, 'আমার উচ্চারণ খারাপ সে আমি জানি। কিন্তু ওটা বলে মানুষকে দুঃখ দেন কেন?'

চড়াক্‌সে একদম খাড়া হয়ে বসে, মোড় নিয়ে মুখোমুখি হয়ে বললে, 'আশ্চর্য! কে বললে আপনার উচ্চারণ খারাপ! আমি বলেছি 'অদ্ভুত'। অদ্ভুত মানে খারাপ? আপনার ফার্সী উচ্চারণে কেমন যেন পুরনো আতরের গন্ধ। দাঁড়ান, বলছি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঠাকুরমা সিন্দুক খুললে যে রকম পুরনো দিনের জমানো মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ বেরোয়। অন্য হিন্দুস্থানীরা কি রকম যেন ভোঁতা ভোঁতা ফার্সী বলে।'

আমি বললুম, 'ওরা তো সব পাঞ্জাবী। আমি বাঙলাদেশের লোক।'

এবার মেয়েটি প্রথমটায় একেবারে বাক্যহারা। তার পর বললে, 'বা-ঙ্গা-লা মুল্লুক! সেখানে তো শুনেছি পৃথিবীর শেষ। তার পর নাকি এক বিরাট অতল গর্ত। যতদূর দেখা যায়, কিছু নেই, কিছু নেই। সেখানে তাই রেলিং লাগানো আছে। পাছে কেউ পড়ে যায়। বাঙালীরাও নাকি তাই বাড়ি থেকে বেরয় না।'

আমি জানতুম, ভারতবর্ষে যে-সব কাবুলী যায় তারা বাঙলা দেশের পরে বড় কোথাও একটা যায় নি। এ সব গল্প নিশ্চয়ই তারা ছড়িয়েছে। আমি হেসে বললুম, 'কি বললেন? বাঙালীরা তাই বাড়ি থেকে বেরয় না? যেমন আমি? না?'

এই প্রথম মেয়েটি একটু কাতর হল। বললে, 'দেখুন, মঁসিয়ো—?'

আমি বললুম, 'আমার নাম মজনূন।'

'মজনূন !!!'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

'মজনূন মানে তো পাগল। জিন্‌ যখন কারো কাঁধে চাপে তখন "জিন্‌" শব্দের পাস্‌ট্‌ পার্টিসিপ্‌ল্‌ মজনূন দিয়েই তো পাগল বোঝানো হয়। এ নাম আপনাকে দিলে কে?'

আমি বললুম, 'আমার বাবার মুরশীদ। দেখুন শব্‌নম বানু, সকলেরই কি আপনার মত মিষ্টি নাম হয়! শব্‌নম মানে তো শিশিরবিন্দু, হিমকণা?'

'খুব ভোরে আমার জন্ম হয়েছিল।'

আমি গুন গুন করে বললুম,

"আমি তব সাথী
হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশির সিঞ্চিত
প্রভাতের বিচ্ছেদ বেদনা।"

'বুঝিয়ে বলুন।'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশে এক রকম ফুল হয় তার নাম শিউলি। কবি বলছেন, শরৎ-নিশি সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখেছে শিউলি ফোটাবার—আর ভোর হতেই গাছকে বিচ্ছেদ-বেদনা দিয়ে ঝরে পড়ল সেই শিউলি।'

শব্‌নমের কবিত্ব-রস আছে। বললে, 'চমৎকার! একটি ফুল সমস্ত রাতের স্বপ্ন। আচ্ছা, আমার নাম যদি শব্‌নম শিউলি হয় তো কি রকম শোনায়?'

আমি বললুম, 'সে আপনি ধারণাই করতে পারবেন না, বাঙালীর কানে কতখানি মিষ্টি শোনায়।'

হেসে বললে, 'ফুল সম্বন্ধে কবি কিসাঈ কি বলেছেন জানেন?'

'আমি হাফিজ, সাদী আর অল্প রূমী পড়েছি মাত্র।'

'তবে শুনুন, "গুল্‌ নিমতীস্ত্‌ হিদ্‌য়া ফিরিস্তাদে আজ্‌ বেহেশ্‌ৎ,
মরদুম্‌ করীম্‌তর্‌ শওদ্‌ আন্দর্‌ নঈম্‌-ই গুল্‌;
আয় গুল্‌-ফরূশ গুল্‌ চি ফরূশী বরায়ে সীম?
ওয়া আজ্‌ গুল্‌ অজীজ্‌তর চি সিতানী বি-সীম-ই-গুল্‌?"

'অমরাবতীর সওগাত এই ফুল এল ধরাতলে,
ফুলের পুণ্যে পাপী-তাপী লাগি স্বরগের দ্বার খোলে।

'ওগো ফুলওয়ালী, কেন ফুল বেচো তুচ্ছ রূপার দরে ?
প্রিয়তর তুমি কি কিনিবে, বলো, রূপো দিয়ে তার তরে ?'

আমি বললুম, 'অদ্ভুত সুন্দর কবিতা। এটি আমায় বাঙলাতে অনুবাদ করতে হবে।'

'আপনি বুঝি ছন্দ গাঁথতে জানেন ?'

আমি বললুম, 'সর্বনাশ। আমি মাস্টারি করি।'

'সে আমি জানি। এদেশে দু' রকমের ভারতীয় আসে। হয় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে, না হয় পড়াতে। তবে আপনাকে এর পূর্বে আমি কখনও দেখি নি। আচ্ছা, বলুন তো, আমানুউল্লা বাদশার সব রকম সংস্কারকর্ম আপনার কি রকম লাগে ?'

'আমার লাগা না-লাগাতে কি ? আমি তো বিদেশী।'

'বিদেশী হলেও প্রতিবেশী তো। আমি ফ্রান্স থেকে ফেরার সময়—'

আমি অবাক হয়ে শুধালুম, 'ফ্রান্স থেকে—'

'ইংরেজের কল্যাণে বাবাকে নির্বাসনে যেতে হয়। আমার জন্ম প্যারিসে। সেখানে দশ বছর আর এখানে ন' বছর কাটিয়েছি। যাক্‌গে সে-কথা। দেশে ফেরার সময় বোম্বাই পেশোওয়ার হয়ে আসি। দাঁড়ান, ভেবে বলছি। ঠিক এই আগস্টেই আমরা এসেছিলুম। সে কী বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি! বোম্বাই থেকে লাহোর পর্যন্ত। ঝপ্, ঝপ্, ঝুপ্, ঝাপ। গাড়ির শব্দের সঙ্গে মিলে গিয়ে চমৎকার শোনায়। তা সে যাকগে। কিন্তু ওই বোম্বাই থেকে এই পেশোওয়ার—এর সঙ্গে তো ফ্রান্সের কোন মিল নেই। মিল আফগানিস্থানের সঙ্গে। দুটোই সুন্দর দেশ। আর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইরানী কবি কি বলেছেন, জানেন ?'

'হাফিজ যেন কি বলেছেন ?'

'না। আলীকুলী সলীম। বলেছেন:

"নীস্ত্ দর্ ইরান জমীন্ সামান-ই তহসীল কামাল
তা নিয়ামদ্ সু-ই হিন্দুস্তান হিনা রঙ্গীন্ ন্ শুদ্।"

'পরিপূর্ণতা পাবে তুমি কোথা ইরান দেশের ভুঁয়ে,
মেহ্‌দির পাতা কড়া লাল হয় ভারতের মাটি ছুঁয়ে।'

আমি শুধালুম, 'এদেশের হেনাতে কি কড়া রঙ হয় না ?'

'বাজে। ফিকে। হলদে।'

আমি বললুম, 'আপনি কথায় কথায় এত কবিতা বলতে পারেন কি করে ?'

হেসে বললে, 'বাবা আওড়ান। আর ন' দশ বছরেও আমার আত্মসম্মান জ্ঞানটি ছিল অত্যুগ্র। প্যারিসে ক্লাসে ফরাসী কবিতা কেউ আওড়ালে আমি সঙ্গে সঙ্গে ফার্সী শুনিয়ে দিতুম।'

তারপর বললে, 'বড় রাস্তায় তো জন-মানব নেই। শুধু মনে হচ্ছে একখানা মোটর বার বার আসা-যাওয়া করছে। নয় কি ? আপনি লক্ষ্য করেছেন ?'

আমি বললুম, 'বোধ হয় তাই।'

বললে, 'তবে আমাকে বলেন নি কেন ?'

আমি এক-মাথা লজ্জা পেয়ে বললুম, 'আমার ভালো লাগছিল বলে।'

মেয়েটি চুপ করে রইল।

আমি শুধালাম, 'ওটা কি আপনাদের গাড়ি ? আপনাকে খুঁজছে ?'

'উঁ।'

'তবে চলুন।'

'না।'

'আচ্ছা। কিন্তু আপনার বাড়ির লোক আপনার জন্যে দুশ্চিন্তা করবেন না ?'

'তবে চলুন।' উঠে দাঁড়াল।

আমি বললুম, 'শব্‌নম বানু, আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'তওবা! আপনাকে ভুল বুঝব কেন ?'

রাস্তায় যেতে যেতে বেশ কিছু পরে সে-ই কথার খেই ধরে বললে, 'বিদেশীর সঙ্গে আলাপ করতে ওই তো আনন্দ। তার সম্বন্ধে কিছু জানি নে। সেও কিছু জানে না। সেই যে কবিতা আছে,

"মা আজ্‌ আগাজ্‌ ওয়া আন্‌জামে জাহান্‌ বে-খবরীম্‌
আওওল ও আখির-ই ঈন কুহ্‌নে কিতাব ইফ্‌তাদে অস্‌ৎ।"

'গোড়া আর শেষ এই সৃষ্টির জানা আছে, বলো, কার ?
প্রাচীন এ পুঁথি গোড়া আর শেষে পাতা কটি ঝরা তার।'

এমন সময় ওই জলজ্বলে আলোওলা পোড়ারমুখো মোটর এসে সামনে দাঁড়াল। শব্‌নম বানু বললে, 'চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দি।'

এতক্ষণ দুজনাতে বেশ কথাবার্তা হচ্ছিল। এখন ওই ড্রাইভারের সামনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। প্যারিস থেকে এসে থাক্‌, আর খাস

কাবুলওলাই হোক, এরা যে কট্টর গোঁড়া সে কি কারও অজানা? বললুম, 'থাক। আমার হোটেল কাছেই।'

শব্‌নম বানু বুদ্ধিমতী। বললে, 'বেশ। তবে, দেখুন আগা, আপনি কোন কারণে কণামাত্র সঙ্কোচ করবেন না। আমি কাউকে পরোয়া করি না।'

পরোয়া শব্দটি আসলে ফার্সী। শব্‌নম ওই শব্দটিই ব্যবহার করেছিল।

'আদাব আরজ।'

'খুদা হাফিজ।'

হোটেলে ঢোকবার সময় পিছনে শব্দ হওয়াতে তাকিয়ে দেখি, আব্দুর রহ্‌মান। নিজের থেকেই বললে, 'একটু বেড়াতে গিয়েছিলুম।'

আমি তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলুম ইনি একটি হস্তীমূর্খ না মর্কটচূড়ামণি?

সমস্ত রাত ঘুম এল না।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি আদম-সুরৎ—কালপুরুষ। অতি প্রসন্ন বদনে যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আকাশের পরিপূর্ণ শান্তি যেন তার অঙ্গের প্রতিটি তারায় সঞ্চিত করে আমার দিকে বিচ্ছুরিত করে পাঠাচ্ছেন।

একটি ফার্সী-কবিতা মনে পড়ল।

ইরানের এক সভাকবি নাকি চাঁড়ালদের সঙ্গে বসে ভাঁড়ে করে মদ্যপান করেছিলেন। রাজা তাই নিয়ে অনুযোগ করাতে তিনি বলেছিলেন,

'হাজার যোজন নিচেতে নামিয়া আকাশের ওই তারা
গোষ্পদে হ'ল প্রতিবিম্বিত; তাই হ'ল মানহারা?'

শেষরাত্রে কালো মেঘ এসে আকাশের তারা একটি একটি করে নিবিয়ে দিতে লাগল। আমার মন অজানা অস্বস্তিতে ভরে উঠতে লাগল। বিবেকানন্দ ইংরিজী কবিতায় লিখেছিলেন, 'দি স্টার্‌স্ আর্ ব্লটেড্ আউট'। সত্যেন দত্ত অনুবাদ করেছেন 'নিঃশেষে নিবেছে তারাদল'। কেমন যেন, কি-হবে কি-হবে একটা ভাব মনকে আচ্ছন্ন করে দিল।

শেষ রাত্রে নামল খাঁটি সিলেটি বৃষ্টি।

প্রসন্নাস্ত, প্রসন্নাস্ত আমার অস্ত সন্ধ্যার সবিতার!

খুদাতালা বেহদ মেহেরবান। আমার শেষ মনস্কামনা পূর্ণ করে দিলেন। কী মূর্খ আমি! আমার প্রত্যাশা যে করুণাময়ের অফুরন্ত দান ছাড়িয়ে যেতে

পারে, এ দম্ভ আমি করেছিলুম কোন্ গবেটামিতে ?

॥ ২ ॥

ঘুম-ভাঙা-ঘুম-লাগা কল্পনা-স্বপ্নে-জড়ানো রাতের শেষ হল সূর্যোদয়ের অনেক পর। কাল রাত্রে তো পারিইনি, আজ সকালেও বুঝতে পারলুম না, কাল রাত্রে কি হয়ে গেল। এ কি আরম্ভ, না এই শেষ! এ কি অন্ধকার রাত্রে চন্দ্রোদয়ের মত আমার ভুবন প্রসারিত করে দেবে, না এ হঠাৎ চমক-মারা বিদ্যুল্লেখা শুধু ক্ষণেকের তরে সুদূর আকাশপটে আমার ভাগ্যের ব্যঙ্গচিত্র এঁকে লোপ পাবে!

আচ্ছন্নের মত জানলার ধারের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল চেয়ারে ঝোলানো আমার কোটের কাঁধের উপর এক গাছি লম্বা চুল।

কি করে এসে পৌঁছল? কে জানে, এ জগতে অলৌকিক ঘটনা কি করে ঘটে?

কিংবা এ ঘটনা কি অতিশয় দৈনন্দিন নিত্য প্রাচীন? যে বিধাতা প্রতিটি ক্ষুদ্র কীটেরও আহার যুগিয়ে দেন, তিনিই তো তৃষিত হিয়ার অপ্রত্যাশিত মরূদ্যান রচে দেন। কিন্তু তার কাছে তখন সেটা অলৌকিক।

কুবেরের লক্ষ মুদ্রা লাভ অলৌকিক নয়, কিন্তু নিরন্নের অপ্রত্যাশিত মুষ্টি-ভিক্ষা অলৌকিক। কিংবা বলব, সরলা গোপিনীদের কৃষ্ণলাভ অলৌকিক—ইন্দ্রসভায় কৃষ্ণের প্রবেশ দৈনন্দিন ঘটনা।

অথবা কি এই হঠাৎ লটারি-লাভ আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ করে দেবে! অন্ধকার রাতের দুশ্চিন্তা তার কালো চুলকে ভোরের সঙ্গে সঙ্গে সাদা করে দেবে?

কি করি? কি করি?

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি অল্প অল্প বৃষ্টি। এই বৃষ্টিকেই কাল রাত্রে কত সোহাগের সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলুম। এখন কোন-কিছুর সন্ধানে বাইরে যেতে পারব না বলে সেই সোহাগের ধন বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু কোথায় সন্ধান?

সর্দার আওরঙ্গজেবের বাড়ি খুঁজে আমি পাব নিশ্চয়ই। সেই সুদূর বাঙলা-দেশ থেকে যখন কাবুল পৌঁছতে পেরেছি তবে এ আর কতটুকু! কিন্তু পেয়ে লাভ? সেখানে তো আর গট্‌গট্‌ করে ঢুকে গিয়ে বলতে পারব না, 'শব্‌নম বানুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' এ দেশের ছেলেই এটা করতে পারে না,

আমি তো বিদেশী। আমি তো এমন কিছু স্বর্ণভাণ্ড নই যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মাটি চাপা পড়ে গেলেও লোকে জানতে পারলে খুঁড়ে বের করবে? বরঞ্চ শব্‌নমই স্বর্ণ-পাত্র। আমি ভিখারী, তার দিকে নিষ্কাম হৃদয়ে তাকালেও সর্দার আমার গর্দান নেবেন।

তা তিনি নিন। রাজারও একটা গর্দান, আমারও একটা। অথচ আশ্চর্য, রাজার গর্দান গেলে বিশ্বজোড়া হইহই পড়ে যায়—আমার বেলা হবে না। কিন্তু ওই কিশোরীকে জড়ানো?

এ তো বুদ্ধির কথা, যুক্তির কথা, সামান্য কাণ্ডজ্ঞানের কথা, কিন্তু হায়, হৃদয়েরও তো আপন নিজস্ব যুক্তিরাজ্য আছে, সে তো বুদ্ধির কাছে ভিখিরীর মত তার যুক্তি ভিক্ষা চায় না। আকাশের জল আর চোখের জল তো একই যুক্তি-কারণে ঝরে না।

আব্দুর রহ্‌মান এসে খবর দিলে, আজ দুপুরে হোটেলে মাছ। অন্যদিন হলে আনন্দে আমি তাকে বখশিশ দিতুম—এ দেশে এই প্রথম মাছের নাম শুনতে পেলুম। আজ শুধু অলস নয়নে তাকিয়ে রইলুম।

খেতে গিয়েছিলুম। এদিক ওদিক তাকাই নি। কারণ, কাবুল পাগমানে এখনও মেয়েরা রেস্তরাঁতে বেরয় না। অনেক সর্দারই খেতে এসেছিলেন; হয়তো সর্দার আওরঙ্গজেবও ছিলেন।

হঠাৎ মৃদু গুঞ্জরন আরম্ভ হল। তারপর সবাই ধড়মড় করে ছুরি-কাঁটা ফেলে উঠে দাঁড়াল। ব্যাপার কি? 'বাদশা, বাদশা' আসছেন।

আমার বুকের রক্ত হিম। এই সর্বনেশে দেশে কি স্বয়ং বাদশা বেরন মজনূন—অর্থাৎ পাগলদের কিংবা আসামীর সন্ধানে!

না। এটা সরকারী হোটেল। লাভ হচ্ছে না শুনে তিনি স্বয়ং এসেছেন বড় ভাই মুইন-উস্‌-সুল্‌তানের সঙ্গে পেট্রোনাইজ করতে। রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীনও তা হলে তীর্থ দরশনে আসতে পারে। রাজার সঙ্গে গেলে দীনের রাহা-খরচাটা বাদ পড়ে বটে কিন্তু সেও তো পুরুত-পাণ্ডাকে দু পয়সা বিলোয়। পরে দেখা গেল তাঁর হিসেবটা ভুল নয়।

অনেক রকম খাবারই সেদিন ছিল। এমন কি সদ্য ভারতবর্ষ থেকে আগত এক পেশোওয়ারী সদাগর পাতি নেবু পর্যন্ত বিলোলেন। অন্যান্য ঠাণ্ডা দেশের মত কাবুলেও কোন টক জিনিস জন্মায় না। আমারটা আমি গোপনে পকেটে পুরেছিলুম। পরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার গন্ধ শুঁকব বলে। দেশের গন্ধ কত দিন

হল পাই নি। যে মাছটি খেলুম সেটি ভালো হলেও তাতে দেশের গন্ধ ছিল না।

রাজা উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু কাবুলীদের অবশ্য-কর্তব্য ঢেকুরটি তুললেন না। আমরাও উঠলুম। আমার খাওয়া অনেকক্ষণ হল শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাজা না ওঠা পর্যন্ত প্রজাকে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করে ভান করতে হয়, যেন তার খাওয়া তখনও শেষ হয় নি। রাজা তো প্রজার তুলনায় গোগ্রাসে গিলতে পারেন না। গিললে প্রজাকে আরও বেশী গেলবার ভান করতে হয়।

ইরান-তুরানে অতিথি নিমন্ত্রিত-বাড়ি এলে গৃহস্থকে ওই ভান করতে হয়।

এসব আমার চিন্তা-ধারা নয়। আমার সঙ্গে বসেছিলেন তিনজন ভারতীয় ব্যবসায়ী। এঁরাই গুনগুন করে এসব কথা উর্দুতে বলে যাচ্ছিলেন।

বেরিয়ে এসে দেখি বৃষ্টি থেমেছে। রোদ উঠেছে। গাছের ভেজা পাতা রোদের আলোতে ঝলমল করছে।

এখন বেরনো যায়। কিন্তু যাব কোথায়? সে চিন্তা তো আগেই করা হয়ে গিয়েছে! হলে কি হয়! পাগলামির প্রথম চিহ্ন, পাগল একই কথা বার বার বলে, একই গ্রাস বার বার চিবিয়ে চলে, গিলতে পারে না।

আর বেরতে গেলেই এই তিন ব্যবসায়ী তুশ্‌মন্‌ সঙ্গ নেবে। এরা এসেছে মাত্র কয়েকদিনের জন্য। কাবুলের ডাস্ট্‌বিনের ছবি তোলে, হ্যাট-পিনের পাইকারি দর শুধোয়।

আর আমার ঘরে তো রয়েছে আমার সেই অমূল্য নিধি। আজ সকালের সওগাত।

এদেশের সবুজ চা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তিনটের সময় পা টিপে টিপে নিচে নামলুম। সেখানে চা খেয়েই বেরিয়ে যাব। এ সময় আর সবাই আপন আপন ঘরে চা খায়।

টী-রুমে ঢুকেই এক কোণে এক সঙ্গে অনেক কিছু দেখতে এবং শুনতে পেলুম। দেখি, আধ ডজনের বেশী কাবুলী তরুণী মাথার উপরকার হ্যাট থেকে ঝোলানো নেট্‌ বা বোরকার উত্তর-প্রান্ত—যাই বলা যাক না কেন—নামিয়ে, গোল টেবিল ঘিরে বসে কিচির মিচির লাগিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলুম, এ সময় হোটেলের নিচের তলাটা নির্জন থাকে বলে এই সুবাদে বেচারীরা ফুর্তি করতে, নূতন কিছু-একটা করতে এসেছে। এবং এঁদের বুদ্ধিদায়িনীটি কে সেটা বুঝতেও বিলম্ব হল না। শব্‌নম বানু স্বয়ং দাঁড়িয়ে ওয়েটারকে তম্বিতম্বা করছেন ঝড়ের বেগে—'পেস্‌ট্রি নেই! কেন? কেক্‌ আছে। সে তো

বলেছ। অর্ডারও তো দিয়েছি। ডিমের স্যাণ্ডউইচ! কেন? শামী কাবাব দিয়ে স্যাণ্ডউইচ বানাতে পার না? মাথায় খেলে নি? যত সব—'

আমার দিকে পাশ ফিরে কথা বলছিলেন। হঠাৎ কেন জানি নে আমার দিকে তাকাতেই তাঁর মুখের কথা আমাকে দেখার সঙ্গে কলিশন লেগে থেমে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বোঁ করে চক্কর খেয়ে বারান্দায়। রওয়ানা দিলুম গেটের দিকে।

সেখানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই পিছন থেকে কি একটা শব্দ শুনে ফিরে দেখি, সেই ওয়েটার।

'আপনাকে একটি বানু ডাকছেন।'

এসে দেখি, তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

হাসি-মুখে বললে, 'পালাচ্ছিলেন কেন। দাঁড়ান।'

হ্যাণ্ডব্যাগ খুলতে খুলতে বললে, 'আজ সকালে বাবাকে জিজ্ঞেস করলুম, বাঙলাদেশ কোথায়? তিনি বললেন, ওদেশের এক রাজা নাকি আমাদের মহাকবি হাফিজকে তাঁর দেশে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি যেতে না পেরে একটি কবিতা লিখে পাঠান। সেটি আমি টুকে নিয়েছি। এই নিন।'

আমি তখন কিছুটা বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়েছি। ধন্যবাদ জানিয়ে পকেটে রাখতে গিয়ে সেই নেবুটায় হাত ঠেকল।

হঠাৎ আমার কি হল? কোন চিন্তা না করে এই সামান্য-পরিচিতা বিদেশিনীর হাতে কি করে সেটা তুলে ধরলুম?

'এটা কি? ওঃ! নেবু? লীমুন। লীমুন-ই-হিন্দুস্তান!' নাকের কাছে তুলে ধরে শুঁকে বললে, 'পেলেন কোথায়? কী সুন্দর গন্ধ! কিন্তু ভিতরটা টক। না?' বলে আবার হাসল।

ওয়েটার চলে গেছে। চতুর্দিক নির্জন। দূরে দূরে মালীরা কাজ করছে মাত্র।

তবু আমার মুখে কথা নেই।

মেয়েটি একবার আমার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে।

আমি তাকিয়ে মাথা নিচু করলুম।

আস্তে আস্তে ভিতরে চলে গেল।

কী আহাম্মুখ! কী মূর্খ আমি!

প্রথম বারে না হয় বে-আদবী হত, কিন্তু এবারে এরকম অবস্থায়ও আমি শুধোতে পারলুম না, আবার দেখা হবে কি না? এবারে তো সে-ই ডেকেছিল।

কবিতা দিলে। সেই কবিতাটি পড়ার ভান করে, ওই প্রশ্নটা ভালো করে বলার ধরনটা ভেবে নিলেই তো হত। না, না। ভালোই করেছি। যদি সে চুপ করে যেত তা হলেই তো সর্বনাশ। 'না' বললে তো আমি খতম হয়ে যেতুম। কিন্তু তবু কী মূর্খ আমি! এই যে আঠারো ঘণ্টা একই চিন্তায় বার বার ফিরে এসেছি তার ভিতর একবারও ভেবে নিতে পারলুম না, হঠাৎ যদি দৈবযোগে আবার দেখা হয়ে যায় তা হলে কি করতে হয়, কি বলতে হয়, সে-ই সব চেয়ে বড় প্রশ্ন—আবার দেখা হবে কি?—সেইটে কি করে ভদ্রভাবে শুধোতে হয়?

ওরে মূর্খ? দিলি একটা নেবু!

তাও শুনতে হল ভিতরটা টক!

না, সে মীন করে নি।

আলবাৎ করেছে।

না।

৷ ৩ ৷

আমি জানি, কাবুলের শেষ বল-ডান্স কাল রাত্রেই হয়ে গিয়েছে। তবু সন্ধ্যার পর সেই অন্ধকার ভুতুড়ে বাড়ির চতুর্দিকে ঘোরপাক খেলুম। জানি, আজ আর টেনিস কোর্টে কেউ আসবে না। তবু সেখানে গেলুম। শুধু, সেই বেঞ্চিটিতে বসতে পারলুম না। বসলুম, একটা দূরের বেঞ্চিতে ওইদিকে তাকিয়ে। হায় রে, নির্বোধ মন। তোমার কতই না দুরাশা! যদি, যদি কেউ মনের ভুলে সেখানে এসে বসে।

টেনিস খেলার ছলে পৃথিবীর সর্ব টেনিস-কোর্টেই বহু নরনারী আসে প্রিয়জনের সন্ধানে, তার সঙ্গ-সুখ মোহে। এই কোর্টেও আসে দেশী বিদেশী অনেক জন। আমিও আসতে পারি। কিন্তু আমার এসে লাভ? কাবুলী মেয়েরা তো এখনও বাইরে এসে কোন খেলা আরম্ভ করে নি।

আমার বন্ধু আসে যখন সব খেলা সাঙ্গ হয়ে যায়। এ খেলাতে তার শখ নেই। দিনের আলোতে খেলা তো সহজ—সবাই সবাইকে দেখতে পায়। তাতে আর রহস্য কোথায়? অন্ধকারের অজানাতে ঠিক-জনকে চিনে নিতে পারাই তো সব চেয়ে বড় খেলা। শিশু যেমন গভীরতম অন্ধকারে মাতৃস্তন খুঁজে পায়। তাই বুঝি মৃত্যুর ওপারে আমাদের জন্য সব চেয়ে বড় খেলা লীলাময় রেখেছেন।

মিথ্যা, মিথ্যা, সব মিথ্যা। কেউ এল না।

অত্যন্ত শ্লথ গতিতে সে রাত্রি বাড়ি ফিরেছিলুম। তীর্থযাত্রী যে রকম নিষ্ফল তীর্থ সেরে বাড়ি ফেরে।

ডিনার শেষ হয়ে গিয়েছিল। আব্দুর রহমান কিছু স্যাণ্ডউইচ সাজিয়ে রাখছিল। তাড়াতাড়ি বললে, 'এখনও কিচেন বোধহয় বন্ধ হয় নি; আমি গরম স্যুপ নিয়ে আসি।'

আমি বললুম, 'না।'

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ আব্দুর রহমান আমার কোট পাতলুন বুরুশ করতে করতে কথায় কথায় বললে, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খান কাল সন্ধ্যায়ই বিবি বাচ্চা-বাচ্চী সমেত কাবুল চলে গেছেন। তাঁর পিসী গত হয়েছেন।'

অন্য সময় হলে হয়তো শুনেও শুনতুম না, কিংবা হয়তো অলস কণ্ঠে নীরস প্রশ্ন শুধাতুম, 'সর্দারটি কে?'

এখন আমি আব্দুর রহমান কি জানে, কি করে জানে, কতখানি জানে, এ-সবের বাইরে। একদিন হয়তো আরও অনেকে জানবে, তাতেই বা কি? সেই যে ইরানী কবি বলেছেন,

"কত না হস্ত চুমিলাম আমি অক্ষমালার মত,
কেউ খুলিল না কিস্মতে ছিল আমার গ্রন্থি যত!"

'দস্ত-ই হর-কস্‌রা ব্‌সানে সবহৎ বুসীদম্‌ চি সূদ
হীচ্‌ কস্‌ ন্‌ কশওদ আখির অক্‌দয়ে কারে মরা।'

অক্ষমালার মত পূতপবিত্র হয়ে সাধুসজ্জনের মন্ত্রোচ্চারণের পুণ্যকর্মে লেগেও যদি তারা 'গেরো' থেকেই যায়, তবে আব্দুর রহমানের হাতে দু পাক খেতেই বা আপত্তি কি?

প্রথমটা সত্যই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলুম।

অথচ দিনের আলো যতই ম্লান হতে লাগল, ততই মনে হতে লাগল এই জঙ্গলী পাগমান শহরটা বড়ই নোংরা। দুনিয়ার যত বাজে লোক জমায়েৎ হয়ে খামকা হই-হুল্লোড় করে। এর চেয়ে কাবুল ঢের ভালো।

দেখি, আব্দুর রহমানেরও ওই একই মত। অথচ এখানে সাত দিনের ছুটি কাটাবার জন্য সে-ই করেছিল চাপাচাপি। এখনো তার তিন দিন বাকি।

সকালে দেখি, আব্দুর রহ্‌মান বাক্স প্যাঁটরা গোছাতে আরম্ভ করেছে। মনস্থির করাতে সে ভারী ওস্তাদ।

হিন্দুস্থানী সদাগররা দুঃখিত হলেন। বললেন, 'কাবুলে আবার দেখা হবে।'

বাস্ পাগমানে ছাড়তেই মনে হল, সর্বনাশ।

শব্‌নম বানু যদি আবার পাগমানে ফিরে আসে?

আর ভাবতে পারি নে রে, বাবা!

॥ ৪ ॥

পুরাতন ভৃত্যকে ছেড়ে বাড়ি ফেরা পীড়াদায়ক হলেও, সে সঙ্গে থাকলেই যে গৃহ মধুময় হয়ে ওঠে তার কোন প্রমাণ আমি পেলুম না। সেই নিরানন্দ নির্জন গৃহ। খান কয়েক বই। এগুলো প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

আচমকা একটা বুদ্ধি খেলল মাথায়। এক দোর বন্ধ হলে দশ দোর খুলে যায়, বোবার এক মুখ বন্ধ হলে দশ আঙুল তার ভাষা তর্জমা করে দেয়। আমার যদি সব দ্বার বন্ধ হয়ে গিয়ে মাত্র একটি খুলে যায় তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সে দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আমি কোথায় গিয়ে পৌঁছব তার খবরও আমি জানতে চাই নে। দিগন্তের কাবা'র ছবি আমি দেখতে চাই নে, হে প্রভু! তুমি শুধু একটি কদম্ ওঠাবার মত আলো ফেলো।

ফার্সী শিখব—যে ফার্সীকে এত দিন অবহেলা করেছি।

তরুণরা এটা শুনে নিরাশ হবে। তারা ওই সময়ে স্বপ্ন দেখে অসম্ভব অসম্ভব বিষয়ের। প্রিয়ার ঘরে যদি আগুন লাগে, দমকলের লোকও তাকে বাঁচাবার জন্যে সাহসে বুক বেঁধে না এগোয়, সে তখন কি রকম লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাকে বাঁচাবার জন্য। ইংরেজকে খুন করে প্রিয়া ধরা পড়েছে; ফাঁসির জন্য তৈরী হয়ে সে সব দোষ আপন স্কন্ধে তুলে নিল—প্রিয়া জানতে পর্যন্ত পারল না।

প্রবীণরা এসব স্বপ্নের কথায় হাসেন। আমি হাসি নে।

ধন্য হোক তাদের এ সুখ-স্বপ্ন! মৃত্যুঞ্জয় হোক তাদের এ দুরাশা! এ-গুলোই তো তপ্ত ভূতলকে সরস শ্যামল করে রেখেছে। নন্দন-কাননের যে হাসি মুখে নিয়ে শিশু মায়ের কোলে আসে, তরুণের সেই নন্দন-কানন থেকেই আকাশ-কুসুম চয়নে তার শেষ রেশ।

তার তুলনায় ফার্সী শেখা কিছুই নয়। বজ্র-নির্ঘোষে ঝিঁঝির নূপুর-নিক্বণ!

প্রবীণরা অবশ্য এটাকেই প্রশংসা করতেন। আজ যদি আমি শব্‌নম বানুকে চিঠি লিখতে যাই? আমার ফার্সী কাঁচা, ফরাসী দড়কচ্চা।

বেরলুম ফার্সী বইয়ের সন্ধানে, কাবুলী বন্ধুদের বাড়িতে। তারা খুশী হবে। নিরপরাধা অকারণে বর্জিতা প্রথমা প্রিয়ার সন্ধানে নির্গত প্রণয়ীর নব অভিসার প্রিয়জন প্রসন্ন বদনে আশীর্বাদ করে। ফার্সীকে আমি অকারণে বর্জন করেছিলুম।

এই বেরনোর পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, এ কথা বলব না।

আজ কেন, সেদিনও আমার মাতৃভূমিতে ক্লাসিক্‌স্ অনাদৃত। অনুন্নত কাবুলে তা নয়। সেদিনও স্বয়ং মাইকেল যদি কলেজ স্ট্রীটে এসে নিজের বইয়ের সন্ধান করতেন তবে সেগুলো বের করা হত পিছনের গুদোম থেকে। তিনি তখন ইরানী কবির মতই দুঃখ করে বলতে পারতেন,

"রাজসভাতে এসেছিলেম বসতে দিলে পিছে,
সাগর জলে ময়লা ভাসে, মুক্তো থাকে নিচে।"

মাইকেলের দুঃখ বেশী। পুস্তক-সভাতেও তিনি পিছনে।

এখানে হাফিজ সাদী কলীম পয়লা শেল্‌ফে। কিছু বই কিনলুম। ধারের বইয়ে নাকি বিদ্যার্জন হয় না।

ফেরার পথে কলেজের ছেলেদের সঙ্গে দেখা। তারা চেপে ধরলে, কাবুল নদীতে সাঁতারে যেতে। মনে মনে বললুম, ওখানে যা জল তা দিয়ে কাশীরাম-দাসের জলের তিলকও ভালো কাটা যায় না। শেষটায় ঠিক হল তিন দিন পর, ছুটির শেষ দিনে।

তীব্র আবেগে ফল আসন্ন। তিন দিনেও অনেকখানি ফার্সী শেখা যায়।

তিন দিন পরে সাঁতারে এসেছি।

খানিকক্ষণ পরেই ছেলেরা আমার কথা ভুলে গিয়ে আপন আনন্দে মেতে উঠল। আমি আস্তে আস্তে ভাটির দিকে বুকজল ঠেলে ঠেলে, কখনও বা দু দিক থেকে নুয়ে পড়া গাছের পাতা চোখের সামনে থেকে হাত দিয়ে ঠেলে এগুতে লাগলুম। সামনে একটু গভীর জল। সাঁতার কেটে ডান পায়ে উঠে গাছের ঝোপে জিরোতে বসলুম। যত মন্দমন্থরই হোক, স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে সম্মোহন আছে।

পিছন থেকে শুনি, 'এই যে!'

তাকিয়ে দেখি, শব্‌নম।

এক লম্ফে জলে নামলুম। ভেবে নয়, চিন্তা করে নয়—সাপ দেখলে মানুষ যে রকম লাফ দেয়। আমার পরনে সাঁতারের কস্ট্যুম। কত যুগ যুগ সঞ্চিত প্রাচ্যভূমির এ সংস্কার।

'উঠে আসুন, উঠে আসুন, এখ্‌খুনি উঠে আসুন।'

কোন উত্তর নেই।

'উঠবেন না? আচ্ছা, তবে দেখাচ্ছি।' বলেই হ্যাণ্ডব্যাগ হাতড়াতে লাগল।

মেরেছে! না—মারবে—পিস্তল খুঁজছে নাকি?

কাতর কণ্ঠে বললে, 'দেখুন, আপনি মীন্ এডভেন্‌টেজ নেবেন না। আমার পিস্তলে গুলি নেই।' একটু ভেবে বললে, 'ও, বুঝেছি। পরনে কস্ট্যুম। তা, উঠে আসুন। এই নিন আমার গায়ের ওড়না। এইটে জড়িয়ে বসবেন।'

এ তো আরও মারাত্মক। কাবুলিনীবেশে ওড়না শুধু অঙ্গাভরণ নহে, কিছুটা অঙ্গাবরণও বটে।

ততক্ষণে আমার বেশ বিষয়ের সংস্কার কেটে গিয়েছে। তার চেয়েও যে প্রাচীন সংস্কার সেইটে এসে সোনার বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করেছে। সে সংস্কারের সোহাগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নক্ষত্রলোক আপন গতি খুঁজে পায়।

'আপনি আমাকে কি করে খুঁজে পেলেন?'

প্রথমটায় চুপ করে গেলুম। মিথ্যে উত্তর দিতে যে একেবারেই ইচ্ছে যায় নি এ কথা বলব না।

শব্‌নম চুপ করে থাকতে পারে না। উত্তর না দিলে শাসায়। এবারে কিন্তু নীরব প্রতীক্ষায় বসে রইল।

ভালো ভাবেই বুঝে গেলুম এবারে সে উত্তর না নিয়ে ছাড়বে না। বললুম, 'আপনাকে আমি সব খানেই খুঁজছি।'

মুখ খুশিতে ভরে উঠল। হঠাৎ আবার আকাশের এক কোণে মেঘ দেখা দিল। শুধালে, 'আমাদের বাগান-বাড়ি কাছেই, জানতেন?'

কেন জানি নে, বলতে ইচ্ছে হল না যে, তাদের কাবুলের বাড়ি বাইরে থেকে যতটুকু দেখা যায় তার সবটুকু ওর বানানেওলা রাজমিস্ত্রির চেয়েও আমি বেশী জানি। বললুম, 'না।'

এবারে যেন তার কান্না পেল। বললে, 'ওঃ! বুঝেছি। সাঁতার কাটবার স্ফূর্তি করতে এসেছিলেন।'

এই এত দিনে আমার সত্যকার বাজল !

আজ না হয় ঠাট্টা-মস্করা, রঙ্গ-রসিকতা করে মনের গভীর আবেগ, তার গোপন ক্ষুধা, তার অসম্ভব অসম্ভব স্বপন-চয়ন, তার বদ্ধ পাগলামি যতখানি পারি ঢেকে চেপে বলছি কিন্তু তখন, হায়, এ হালকামি ছিল কোথায় ?

বললুম, 'দেখুন, শব্‌নম বানু, আমি বিদেশী। বিদেশে অনেক মনোবেদনা। তার উপর যখন মানুষ ভালবাসে—'

সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে শব্‌নম তার হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরল।

আমি ভয়ে লজ্জায় মারা গেলুম। ছি, ছি! আমি কী করে এ কথাটা বলে ফেললুম ? কোথা থেকে আমার এ সাহস এল ? কিন্তু আমি তো সাহসে বুক বেঁধে এ-কথা বলি নি। এ তো নিজের থেকেই বেরিয়ে গিয়েছে।

তার চেয়েও আশ্চর্য, শব্‌নম আমার মুখের উপর তার হাতের চাপও ছাড়ছে না।

'ব'লো না, ব'লো না। আমি ঠিক করেছিলুম ও কথাটা আমি আগে তোমাকে বলব।'

দু জনাই অনেকক্ষণ চুপ।

শব্‌নমই প্রথম কথা বললে।

বললে, 'আমি ভেবেছিলুম, আমি প্রথম বলব, আর তুমি আমাকে অবহেলা করবে।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি ?'

তাড়াতাড়ি বললে, 'থাক্, থাক্! আজ এসব না। আরেক দিন এসব কথা হবে। আজ শুধু আনন্দের কথা বল। সব প্রথম বল, তুমি কখন আমাকে ভালবাসলে ?'

আমি বললুম, 'সে কি করে বলি ? তুমি কখন বাসলে বল।'

উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'সে অতি সহজ। হোটেলের বারান্দায় যখন তোমাকে ডেকে পাঠালুম। তুমি যখন কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছিলে না, তখন। জান না ইস্‌ফাহানী কবি সাঈব কি বলেছেন,

"খমুশী হুজ্জতে নাতিক্ বুদ্ জুইআই-ই-গওহর্‌হা,
কি আজ গওওয়াস্ দর্ দরিয়া নফ্‌স্ বীরূন নমীআয়দ্।"

'গভীরে ডুবেছে যে জন, জানিবে মুক্তার সন্ধানে,
বুদ্‌বুদ হয়ে তার প্রশ্বাস ওঠে না উপর পানে॥'

আমি বললুম, 'এ কবি সত্যই জীবন দেখেছিলেন ; কাবুলে এ কবি কিন্তু জন্মাতে পারত না।'

'কেন ?'

'ডুব দেবার মত জল এখানে কোথায় ?'

'সে কথা থাক্। আমার কিন্তু ভারী দুঃখ হয়, তুমি আমার বয়েতের পাল্টা বয়েৎ দিতে পার না বলে।'

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, 'সে কি আমার হয় না।'

'চুপ। আবার ভুল করেছি। বলেছিলুম দুঃখের কথা তুলব না।'

'আমি কিন্তু জোর ফার্সী শিখতে আরম্ভ করেছি।'

'কী আনন্দ! বাবার মজলিসে কত বিদেশী আসে, কেউ ভালো ফার্সী বলতে পারে না। তুমি শিখলে আমার গর্ব হবে। তুমি আমারই জন্য শিখছ। সে আমি জানি।'

'তোমার মুখে "তুমি" বড় সুন্দর শোনায়।'

বাধা পড়ল। কার যেন গলার আওয়াজ।

তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে বললে, 'এবার তুমি এস। তোমাকে খুদার আমানতে দিলুম।'

আমি জলে নামতে নামতে বললুম, 'আর কিছু বল।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

॥ ৫ ॥

"ঠেকেছিল মনোতরীখান
প্রাণনাশা সংশয়-চড়ায়,
ভাষাহীন আশা পেয়ে আজ
হর্ষে ভেসে চলে পুনরায়।

ছিল ঠেকে মনোতরীখান—
চলিল সে কাহার ইঙ্গিতে ?
কে গো তুমি দুর্জ্ঞেয় মহান ?
কে দেবতা এলে আজি চিতে ?"

যে চার্বাক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, তিনি নাকি মঞ্জুভাষা'র কাছ থেকে

তাঁর প্রেমের প্রতিদানের আশা পেয়ে একদিনের তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন।

"সেই একদিন শুধু জীবনে চার্বাক
নত হয়েছিল নিজে চরণে ধাতার
প্রেমের কল্যাণে শুধু সেই একদিন—
সে যে আনন্দের দিন—সে যে প্রত্যাশার॥"

(সত্যেন দত্তের কবিতা।)

আমি ছেলেবেলা থেকেই আল্লাকে ভয় করতে শিখেছি, কৈশোরে কাব্য পড়েছি, তাঁকে নাকি ভালবাসাও যায়, আর এই যৌবনপ্রদোষে এক লহমায় তিনি যেন হঠাৎ এক নবরাজ প্রেমরাজ হয়ে আমাকে ডেকে তাঁর সিংহাসনের পাশে বসালেন। শুধু তাই! ক্ষণে ক্ষণে আমার দিকে তাকিয়ে আমার প্রেম নিবেদনেরও প্রতীক্ষা করছেন। তাঁর চোখেও যেন পাব-কি-পাব-না'র ভয়। আশ্চর্য! আশ্চর্য!

"জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমের ভিখারী
দ্বারে দ্বারে মাগো প্রেম নয়নেতে বারি।"

সব দ্বার ছেড়ে তিনি যেন একমাত্র আমারই দ্বারে এসেছেন।

না, না, তিনি দ্বারে আসেন নি। মৌলা—প্রভু—যখন আসেন, তখন তিনি 'ছপ্পর ফোঁড় করকে আতে হ্যাঁয়'—তিনি ছাত ভেঙে আসেন।

একটি কথা, দুটি চাউনি, তাতেই দেহের ক্ষুধা, হৃদয়ের তৃষ্ণা, মনের আকাঙ্ক্ষা সব ঘুচে যায়, সব পরিপূর্ণ হয়ে যায়!

ঘরে ফিরে দেখি সেখানে ভ্রমর গুঞ্জন করছে, পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার রামধনু, তার-ই নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আমার ছেলেবেলাকার নর্মসখী গ্রামের ছোট নদীটি, এবং সমুখে এক গাদা শিউলি ফুল—সেই প্রথম সন্ধ্যার শিউলি ফুল—শব্‌নম শিউলি। আর না, আর না! থামো! থামো! আর আমার সইবে না।

পরদিন সন্ধ্যার সময় যখন আরাম-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে ভানুমতীমন্ত্র দিয়ে সেই স্বপ্নকে সঞ্জীবিত করছি এমন সময় ঘরে ঢুকলেন আপাদমস্তক ভারী কালো বোরকায় ঢাকা এক মহিলা।

আমি ভালো করে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বোরকা এক ঝটকায় সরে গেল।

শব্‌নম!

হাত দু'খানি এগিয়ে দিলে।

আমি ছুটে গিয়ে তার হাত দু'খানি আপন হাতে তুলে নিলুম। তার পর কাবুলী ধরনে রাজা-বাদশা, গুরু-মুর্শীদের হাত দুটি যে ভাবে চুমো খাওয়া হয় সেই ভাবে চুমো খেলুম।

বললে, 'হাঁটু গাড়ো।'

'জো হুকুম!'

'বল, "আমি সর্ব হৃদয় দিয়ে সর্বকাল তোমার সেবা করব"।'

'আমি সর্ব দেহ মন হৃদয় দিয়ে সেবা করব।'

খিলখিল করে হেসে উঠল।

ভানুমতীমন্ত্র নিশ্চয়ই মাত্রাধিক করা হয়ে গিয়েছিল। সে মন্ত্রে ইন্দ্রজাল সৃষ্ট হয়। এ যে সত্যজাল—না, সত্যের দৃঢ় ভুমি।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে আমার মাথার দু'দিক চেপে ধরে হাসতে হাসতে বললে, 'আমি ভেবেছিলুম তুমি বিদ্রোহ ঘোষণা করে চিৎকার করে বলবে, "না, তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার কর"।'

আমি বললুম, 'আমাদের বাউল গেয়েছেন—একটু বদলে বলছি—

"কোথায় আমার ছত্র-দণ্ড কোথায় সিংহাসন?
প্রেমিকার পায়ের তলায় লুটায় জীবন"।'

'বেশ তো। তুমি ফার্সী শিখছ; আমি তা হলে বাঙলা শিখব।'

'সর্বনাশ! অমন কর্মটি করো না।'

'কেন?'

'তিন দিনে ধরে ফেলবে, আমি কত কম বাঙলা জানি।'

যেন আমার কথা শুনতে পায় নি। বললে, 'তুমি মুসাফির; কিন্তু ঘরটি সাজিয়েছ বেশ।' ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বেশ ঘুরে ঘুরে চতুর্দিক দেখলে। তারপর সোফাতে বসে বললে, 'এস।' আমি পাশে বসতে যেতেই বললে, 'না, চেয়ারটা সামনে টেনে এনে বোস।' আমি একটু ক্ষুণ্ণ হলুম। বললে, 'মুখোমুখি হয়ে বোস। তোমার মুখ দেখব।' তদ্দণ্ডেই মনটা খুশী হয়ে গেল—মানুষ কত সহজে ভুল মীমাংসায় পৌঁছয়!

আমি কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বললুম, 'তুমি ওই তাম্বু, মানে বোরকা পর কেন?'

'স্বচ্ছন্দে যেখানে খুশী আসা-যাওয়া করা যায় বলে। আহাম্মুখ ইউরোপীয়ানরা ভাবে, ওটা পুরুষের সৃষ্টি, মেয়েদের লুকিয়ে রাখবার জন্য।

আসলে ওটা মেয়েদেরই আবিষ্কার—আপন সুবিধের জন্য। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে পরি, এ-দেশের পুরুষ এখনও মেয়েদের দিকে তাকাতে শেখে নি বলে—হ্যাটের সামনের পর্দায় আর কতটুকু ঢাকা পড়ে?' তারপর বললে, 'আচ্ছা, বল তো, তুমি পাগমান থেকে পালিয়ে এলে কেন?'

বললুম, 'আমি তো খবর পেলুম, তুমি কাবুল চলে এসেছ।'

'আমি তার পরদিনই পাগমান গিয়ে শুনি, তুমি কাবুলে চলে এসেছ।'

আমি শুধালুম, 'আচ্ছা, বল তো, আমাদের বন্ধুত্ব এত তাড়াতাড়ি হল কি করে?'

'আজব্ বাৎ শুধালে। তবে কি বন্ধুত্ব হবে যখন আমার বয়স ষাট আর তোমার বয়স একশ তিরিশ?'

আমি শুধালুম, 'আমাদের বয়সে কি এতই তফাত?'

'তোমার গম্ভীর গম্ভীর কথা শুনে মনে হয় তারও বেশী। আবার কখনও মনে হয়, তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু সেটা আসল উত্তর নয়। আসল উত্তর আরেক দিন বলব।'

'বলবে তো ঠিক?'

'নিশ্চয়।'

'আচ্ছা, এবারে তোমাকে একটা শেষ প্রশ্ন শুধাই। তুমি এত সাহস কোথায় পেলে? এই যে স্বচ্ছন্দে বল, কোন কিছুর পরোয়া তুমি কর না, সোজা আমার বাড়িতে চলে এলে—?'

'তুমি আমাকে ভালবাস—আমি তোমার বাড়িতে আসব না তা যাব কি গুল্-ই বাকাওলীর পরিস্তানে? জান, আমরা আসলে তুর্কী। আমাদের বাদশা আমানুল্লার গায়েও তুর্কী রক্ত আছে। আর তুর্কী রমণী কি জিনিস সেটা জানতেন আমানুল্লার বাপ শহীদ হবীবুল্লা। আমানুল্লার মায়ের প্যাঁচে তিনি পর্যন্ত হার মেনেছিলেন, জান? আমানুল্লার তো রাজা হওয়ার কথা ছিল না।'

'কিছু কিছু শুনেছি।'

'ভালো। গওহর্ শাদের নাম শুনেছ? ওই সুন্দর হিরাত শহরের চোদ্দ আনা সেই তুর্কী রমণীর তৈরি। তোমার আপন দেশে নূরজাহান বাদশা জাহাঙ্গীরকে চালাত না? মোমতাজ—আরও যেন কে কে? হারেমের ভিতরেই তুর্কী রমণী যে নল চালায় সেটা কতদূর যায় তার খবর রাখে কটা লোক?'

'তুমি অত ইতিহাস পড়লে কোথায়?'

'আমি পড়ি নি। আমি ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল এ-সব পড়ি নে। আমার আনন্দ শুধু কাব্যে। স্কুলে বাধ্য হয়ে "তুর্কী রমণীর ইতিহাস" পড়তে হয়েছিল—তার থেকে বলছি। কিন্তু তাই বলে ভেবো না আমি আমার বে-পরোয়া ভাব ইতিহাস থেকে পেলুম। আর জান না, কবি কামালুদ্দীন কি বলেছেন—

"মরণের তরে দুটি দিন তুমি করো নাকো কোনো ভয়,
যেদিন মরণ আসে না; যেদিন আসিবে সে নিশ্চয়।" '

আমি বললুম, 'মৃত্যু ছাড়া অন্য বিপদও তো আছে।'

'কী আশ্চর্য! মৃত্যুর ওষুধই যখন পাওয়া গেল তখন অন্য ব্যামোর ওষুধ মিলবে না? তোমার বিপদ, আমার বিপদ, আমাদের দুজনের মেলানো বিপদ—তার দাওয়াই আমার কাছে আছে। কিন্তু বলব না।'

'কেন?'

'ওষুধের রসায়ন (প্রেস্‌ক্রিপশন) জানাজানি হয়ে গেলে রোগী সারে না—হেকিমদের বিশ্বাস।' তার পর সোফার কুশনগুলো জড়ো করে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়ে বললে, 'তুমি পাশে এসে বোস।' একপাশে একটু জায়গা করে দিয়ে বললে, 'ওসব কথা কেন তোল? এখন বল, তুমি আমায় কোথায় কোথায় খুঁজলে? আমার শুনতে বড় ভালো লাগে।'

আমি বললুম, 'শব্‌নম বানু—'

'উহুঁ। হল না।'

'কি?'

'শব্‌নম শিউলি।'

এ নামে কত মধু ধরে। তাই বুঝি 'জপিতে জপিতে নাম অবশ হৈল তনু।' কবার জপেছিলুম?

শব্‌নম বললে, 'উত্তর দাও।'

'তোমাকে আমি সবখানে খুঁজেছি।'

এতক্ষণ সে শিলওয়ার পরা ডান পা বাঁ হাঁটুর উপর তুলে দিয়ে মোজা-বিহীন ধবধবে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল আর তার পরের আঙুল নিয়ে খেলা করছিল; কখনও বা ওড়নাখানি বাঁ হাত দিয়ে তুলে ধরে ডান হাত দিয়ে তার খুঁট পাকাচ্ছিল।

ধড়মড় করে সটান উঠে বসে বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। নদী-পাড়ে বলেছিলে। আমি তখন অর্থ বুঝি নি। এখন কবি জামী বুঝিয়ে দিয়েছেন। এক্ষুনি বলছি, কিন্তু তার আগে বল, খোঁজার সময় যে-কোনো মেয়ে আসতে দেখলেই ভাবতে,

আমি আসছি। না? শোন তবে—

"আতুর হিয়ার নিদ্-হারা চোখে
অহরহ তুমি স্বামী,
দূর হতে দেখি যে কেহ আসিছে
তুমি এলে, ভাবি আমি।
মূর্খ দাঁড়ায়ে আছিল সেখানে'
শুধাল, 'রাসভ এলে?'
কহিলেন জামী 'বলিব তো আমি
তুমিই এসেছ'—হেসে।" '

প্রথমটায় আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। ভক্ত সাধকজন হঠাৎ একটা লোককে, আপন গা বাঁচিয়ে গাধা বানিয়ে দেবেন, এতখানি রসবোধ তাঁদের কাছে আশা করে কে?

সে কথা বলাতে শব্‌নম বললে, 'বহু কাবুলীকে আধ ঘণ্টা ধরে বোঝাতে হয়।'

আমি বললুম, 'আমার একটা কথা মনে পড়েছে।'

'শাবাশ্।' বলে জানু পেতে বসে, ডান কনুই হাঁটুর উপর, হাত গালের উপর রেখে, কাত হয়ে, চোখ বন্ধ করে বললে, 'বল।'

'মজনূঁর শেষ প্রাণ-নিশ্বাস করে লীন ধরাতলে
সেই নিশ্বাস ঘূর্ণির রূপে লায়লীকে খুঁজে চলে।'

'বুঝেছি। কিন্তু আরও বুঝিয়ে বল।'

আমি বললুম, 'মজনূ যখনই শুনত, তার প্রিয়া লায়লীকে নজ্‌দ্ মরুভূমির উপর দিয়ে উটে করে সরানো হচ্ছে সে তখন পাগলের মত এ-উট সে-উটের কাছে গিয়ে খুঁজত কোন্ মহ্‌মিলে (উটের হাওদা) লায়লী আছে। মজনূঁ মরে গেছেন কত শতাব্দী হল। কিন্তু এখনও তাঁর জীবিতাবস্থার প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস মরুভূমির ছোট ছোট ঘূর্ণিবায়ু হয়ে লায়লীর মহ্‌মিল্ খুঁজছে। তুমি বুঝি কখনও মরুভূমি দেখ নি? ছোট ছোট ঘূর্ণিবায়ু (বগোলে) অল্প অল্প ধূলি উড়িয়ে এদিকে ধায়, ওদিকে ছোটে, সেদিকে খোঁজে?'

'না। কিন্তু মানুষের কল্পনা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তাই দেখে অবাক মানছি। উর্দুটা বল।'

মজনূঁকে দম্‌কী রওনক্ মুদ্দৎ হুঈ সিধারে
অব্ কোঁ নজ্‌দ্‌কে বগোলে মহ্‌মিলকো ঢুঁঢতে হৈঁ?'

এর ছ'টা শব্দ ফার্সী। শব্‌নম বুঝে গেল। বললে, 'অতি চমৎকার দোহা।'

আমি একটু কিন্তু-কিন্তু করে বললুম, 'বড্ড বেশী ঠাস বুনোট। আমার বুঝতে কষ্ট হয়েছিল।'

বললে, 'তার পর তুমি একে শুধালে, "শব্‌নম বানু কোথায় থাকে?" ওকে শুধালে, "সে কখন বেড়াতে বেরয়?"—ভাবলে কেউই তোমার গোপন খবর জানে না।'

'আমি কি এতই আহাম্মুক!'

আমার ডান হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'শোন দিল-ই-মন, (আমার দিল্)—মূর্খই হও আর সোক্রাৎই (সক্রাটিস্) হও, প্রেম কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না। শোন,

"দিল গুমান দারদ কি পুশীদে অস্ত্ রাই-ই ইশ্‌ক্‌রা
শমরা ফানুস পন্‌দারদ্ কি পিনহান্ করদে অস্ত।

সরল হৃদয় মনে করে প্রেম লুকায়ে রাখিতে পারে,
কাঁচের ফানুস মনে মনে ভাবে লুকায়েছে শিখাটারে।"

কে পারে? কেউ পারে না। আজ না হয় কাল ধরা পড়বেই। আমি পারি? এই তো তুমি যে আমায় নেবুটি দিয়েছিলে—আমি সেটি নখ দিয়ে অল্প অল্প ঠোনা দিয়ে শুঁকছিলুম। হঠাৎ বাবা এসে শুধালেন, "নেবু যে! কোথায় পেলে?" আমি বললুম, "হোটেলে চা খেতে গিয়েছিলুম"—বাবা জানতেন, "সেখানে জুটল।" আমার মুখ যে তখন লাল হয়ে যায় নি, কি করে বলব? আব্বা বললেন যে, তিনিও লাঞ্চে একটা পেয়েছিলেন। কে দিলে, কি করে পেলে কিচ্ছু শুধালেন না। তিনিও একদিন জানবেন।'

'তখন?'

'তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি তো বিদেশী। আমার, শুধু আমার, আপন-দেশী। তোমার ভাবনা ভাববো আমি। বলেছি তো আমার কাছে ওষুধ আছে। ওসব কথা ছাড়। একটা কবিতা বল—আমাদের কথার সঙ্গে থাপ থাক আর নাই থাক।'

আমি বললুম 'থাপ খাইয়েই বলছি। তোমার মুখ লাল হওয়ার সঙ্গে তার মিল আছে, আবার কাঁচের চিমনি যে গর্ব করে সে প্রদীপের আলো লুকিয়েছে

তার সঙ্গেও মিল আছে। তবে এটা সংস্কৃতে এবং শ্লোকটার ভাবার্থ শুধু আমার মনে আছে—

"শুধাইনু 'হে নবীনা,
ভালোবাস মোরে কি না ?'
রাঙা হ'ল তার মুখখানি ;
প্রেম ছিল হৃদে ঢাকা !
তাই যবে হয় আঁকা
আকাশেতে লাল রঙ, জানি—
পাহাড়ের আড়ালেতে
সবিতা নিশ্চয় তাতে
রক্তাকাশ তাই নেই মানি।" '

শব্‌নম বললে, 'আবার বল।'

বললুম।

শব্‌নম বললে, 'এটি অতুলনীয়। বিশেষ করে প্রেমের সঙ্গে সূর্যেরই শুধু তুলনা হয়। আকাশ আর মুখ এক। ঘড়ি ঘড়ি রঙ বদলায়। সূর্য চিরন্তন। প্রেম-সূর্য একবার দেখা দিলে আর কোন ভাবনা নেই।'

আমি বললুম, 'তোমার বেলা একটা নেবুতেই মুখ লাল হয়ে গেল। প্রেম হলে কি হত ?'

বিরক্তির ভান করে বলল, 'কি বললে ? প্রেম নেই ?'

আমিও বেদনার ভান করে বললুম, 'তুমিই তো বললে নেবুর ভিতর টক।'

'ও ! আমি বলেছিলুম, "আঙুরগুলো টক"—সেই অর্থে। তোমাকে পাব না ভয়ে শেয়ালের মত মনকে বোঝাচ্ছিলুম।'

'তোমার সঙ্গে কথায় পারা ভার। তবে আরেকটা ফরিয়াদ জানাই।'

গভীর মনোযোগ সহকারে, অত্যন্ত দোষীর মত চেহারা করে বললে, 'আদেশ কর।'

আমি বললুম, 'আমার উচ্চারণে ঠাকুমার সিন্দুকের গন্ধ।'

খলখল করে হেসে উঠল ; 'আচ্ছা পাগল তো। সার্থক নাম রেখেছিলেন তোমার আব্বা-জানের মুরশীদ। ওরে মজনূন সেই ভাল। জানেমন্ বলছিল—'

বাধা দিয়ে বললুম, 'সে আবার কে ?'

দুষ্টু মেয়ে। বুঝে ফেলেছে। ভুরু কুঁচকে শুধালে, 'হিংসে হচ্ছে ?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

আনন্দে আলিঙ্গন করতে গিয়ে যেন নিজেকে ঠেকালে। হাসিতে খুশিতে কান্নাতে মেশানো গলায় বললে, 'বাঁচালে, আমাকে বাঁচালে।'

অবাক হয়ে শুধালুম, 'মানে ?'

'বাঁচালে, বাঁচালে। গুণী-জ্ঞানীরা বলেন, প্রিয়জনের মঙ্গলের জন্য তাকে যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে তুলে দেবে, আত্মবিসর্জন করে নিজেকে মিলিয়ে দেবে—মানি নে, মানি নে, আমি একদম মানি নে। আজ যদি গওহর্‌শাদ্ কিংবা নূরজাহান তোমাকে ভালবেসে পেতে চান—'

আমি বললুম, 'শাবাশ্।'

'কি বললে ? শাবাশ্ ? দেখাচ্ছি। প্রথম মারব ওদের। তখন যদি "শাবাশ্" বল তবে বেঁচে গেলে। না হলে তোমাকে মেরে থেঁতলে, পিষে শামী-কাবাব বানাব, নিদেন পক্ষে শিক।' হাণ্ডব্যাগ খুলে পিস্তল দেখালে।

আমি বললুম, 'ওতে বুলেট থাকে না।'

'সেদিনও ছিল।'

'জানেমন্ কে ?'

'আমার জিগরের টুকরো, কলিজার আধা, দিলের খুন, চোখের রোশনাই, জানের মালিক—আমার জ্যাঠামণি। তোমার কাছে সিগারেট আছে। দাও তো।'

'শুধোবেন না, কোথায় পেলে ?'

'উনি সব জানেন।'

'তুমি বলেছ ?'

'না।'

'আরও কিছুক্ষণ বসি। সিনেমার লাইট নিবে গিয়েছিল বলে "শো" শেষ হতে দেরি হল। আমাকে বলতে হবে না।'

'জ্যাঠামণি ?'

'তিনি বলেন, "সিনেমায় কেন যাও, বাছা ? সিনেমা তো জীবনই দেখায়। তার চেয়ে জীবনটাকে সিনেমার মত দেখতে শেখ। অনেক হাঙ্গাম-হুজ্জৎ থেকে বেঁচে যাবে।" '

তারপর বললে, 'এবারে তুমি চুপ কর। আমি একটু দেখে নিই, ভেবে নিই।' লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে খানিকক্ষণ বড় চোখ আরও বড় করে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ বন্ধ করল।

একবার শুধু বললে, 'বল তো—। না থাক্।'

তারপর অনেকক্ষণ একেবারে নিশ্চল নিথর।

বললে, 'আমার পেয়ালা একেবারে পরিপূর্ণ করে ভরে দিয়েছেন করুণাময়। এই তোমার ঘর, তুমি পাশে বসে—এর বেশী কি বলব! নিশ্বাসে নিশ্বাসে আমি সব-কিছু শুষে নিয়েছি।'

এই প্রথম দেখলুম, শব্‌নম কোন কবির কবিতা দিয়ে আপন ভাব প্রকাশ করল না। কোন্ কবিতা পারত?

'উঠি।'

আমি বললুম, 'আবার কবে দেখা হবে?' এবারেও ভুলতে বসেছিলুম শুধাতে। আনন্দের সময় মানুষ দুঃখের দিনের সম্বল সঞ্চয় করতে ভুলে যায়। আসলে তা নয়। পরিপূর্ণতা যদি ভবিষ্যৎ দৈন্যের কথা স্মরণ করতে পারে, তবে সে পরিপূর্ণ হল কই?

বললে, 'তুমি শুধু এইটুকু বিশ্বাস কর, তোমাকে দেখবার জন্য আমার যে ব্যাকুলতা, তুমি কখনও সেটা ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'দয়া করে কর। শান্তি পাবার ওই একমাত্র পথ। না হলে পাগলের মত ছুটোছুটি করবে। আর দেখ, তুমি যদি আমার কথাটা বিশ্বাস কর, তবে যদি কখনও আমার শক্তিক্ষয় হয়, তবে তখন আমি বিশ্বাস করব যে আমাকে পাবার জন্য তোমার যে ব্যাকুলতা সেটা আমি ছাড়িয়ে যেতে পারব না। তখন আমি পাব শান্তি।'

দোরের কাছে এসে শেষ কথা বললে, 'আমার বিরহে তুমি অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না—ওইটুকুতেই আমার চলবে।'

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ ১ ॥

সকলেই বলে, পলে পলে তুষানলে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে বহ্নিকুণ্ডে ঝম্প দেওয়া ভাল। আমি জানি, আমার সমুখে কত দীর্ঘ দিনের বিরহ। সেটা যদি আমি প্রথম দিনে জানতে পারতুম তা হলে সেটা কিছুতেই সইতে পারতুম না। আমার প্রার্থনামত আল্লাতালা আমাকে এক সঙ্গে একটি কদমের বেশী ওঠাতে দেন নি।

আলো দিয়েছিলেন, কিংবা বেদনা দিয়েছিলেন এক পা চলার—বিরহদিগন্ত কত দূরে দেখতে দেন নি। তাঁকে দোষ দিই কি করে?

আর শব্‌নম! সে তো শিউলি। শরৎ-নিশির স্বপ্ন—প্রভাতের বিচ্ছেদ-বেদনা। সে যখন ভোরবেলা সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, সে কি স্বেচ্ছায়?

ওই কঠিন কঠোর সময়েও সে একবার ঝড়ের মত আমার ঘরে এসেছিল।

এক নিশ্বাসে কথা শেষ করে কেঁদেছিল। ওই প্রথম আর ওই তার শেষ কান্না। তার বাবাকে আমানুল্লা কান্দাহারের গবর্নর করে পাঠাচ্ছেন। ফ্রান্সের নির্বাসন শেষ হওয়ার পর দেশে ফিরলেন বটে, কিন্তু আমানুল্লা আর সর্দার আওরঙ্গজেব খানেতে বনাবনি হল না; বিশেষত তিনি আমানুল্লার উগ্র ইউরোপীয় সংস্কার পদ্ধতি আদপেই পছন্দ করতেন না। এখন ইউরোপ যাবার মুখে তিনি বিশ্বাসী লোক খুঁজছেন। আওরঙ্গজেব নাকি প্রথমটায় যেতে চান নি। এখন স্থির হয়েছে, তিনি মাত্র তিন মাসের জন্য যাবেন। আওরঙ্গজেবের পিতৃভূমি কান্দাহার তিনি ভাল করে চেনেন—তিন মাস পরে অবস্থা দেখে আমানুল্লাকে জানাবেন, ঠিক কোন্ লোককে তাঁর পরের গবর্নর করে পাঠালে সে কান্দাহারের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে।

এত দুঃখের মাঝখানেও ওইটুকু ছিল আনন্দের বাণী। কাবুলে রাজনৈতিক মরুভূমিতে বাস এক রকম অসম্ভব। হয় তুমি রাজার পক্ষে, রাজার প্রিয়-ভাজন—নয় তুমি কারাগারে কিংবা ওপারে; শব্‌নম যদিও বললে তাঁর আব্বা এ-সব ব্যাপারে ঈষৎ উদাসীন। ফ্রান্সে নির্বাসনকালে তিনি সেখানকার সাঁ্যা সীর মিলিটারি কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে মিলিটারি স্ট্রাটেজি সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন, এখনও করেন—আর তার ফাঁকে ফাঁকে কাব্য-চর্চা।

সেদিন শব্‌নম তেজী তুর্কী রমণীর মত কথা বলে নি, কথায় কথায় কবিতা বলতে পারে নি। শুধু অনুনয় বিনয় করেছিল।

আমি শুধু একটি কথা বলেছিলুম, 'তোমার না গেলে হয় না?'

বেচারী ভেঙে পড়ে তখন।

টসটস করে, কোন আভাস না দিয়ে, ঝরে পড়েছিল অনেক ফোঁটা মোটা মোটা চোখের জল।

আমার দু হাত তুলে ধরে তাদেরই দু পিঠ দিয়ে আপন চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছিল, 'ওইটেই তুমি শুধু শুধিয়ো না লক্ষ্মীটি। এই একটা প্রশ্ন আমার মাথার ভিতর ঢুকে যেন পোকার মত কুরে কুরে খাচ্ছে। না গেলে হয় না?'

না গেলে হয় না ?—অসম্ভব, অসম্ভব। কিস্মৎ কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে, তুমি ওকে রুদ্রতর করো না।'

দরজার কাছে এসে তার কথামত দাঁড়ালুম।—বললে—যেটা সে আগের বারও বলেছিল, 'আমার বিরহে তুমি অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।'

ওর তো কথা বলার অভাব নেই। বুঝলুম, প্রাণের কথা মাত্র একটি।

ভোরবেলা আমি আধো ঘুমে। সমস্ত রাত অনিদ্রায় কেটেছে। আমার শিয়রে বসে শব্‌নম। আমি চোখ মেলতেই সে দু হাত দিয়ে আমার চোখ বন্ধ করে দিল।

যেন শুনলুম, 'ব্ আমানে খুদা'—তোমাকে খুদার আমানতে রাখলুম। 'ব খুদা সপুর্দমৎ'—তোমাকে খুদার হাতে সর্পোদ করলুম।

'আমার বিরহে—'

সমস্ত ব্যাপারটা কয়েক সেকেণ্ডের। দীর্ঘতম স্বপ্নও নাকি মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের।

বলতে পারব না, সত্য না স্বপ্ন। শব্‌নমকে শুধোবার সুযোগ পাই নি। বোধ হয় সত্য-স্বপ্ন। কিংবা স্বপ্ন-সত্য।

প্রথম তিন মাস, তার পর চার মাস, তার পর ছ-মাস। আমানুল্লা বিদেশ থেকে এক এক দু দু মাসের ম্যায়াদ বাড়ান ; আর শব্‌নমরা ফিরতে পারে না।

সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেল।

শব্‌নমদের প্রাচীন ভৃত্য তোপল্ খান দু-তিন মাস অন্তর অন্তর একবার করে কাবুল আসে আর শব্‌নমদের চিঠি দিয়ে যায়—ডাককে অবিশ্বাস করার তার যথেষ্ট ন্যায্য হক্ক ছিল।

সে চিঠিতে কি ছিল আমি বলতে পারব না। ফার্সীতে ফরাসীতে মেশানো চিঠি। যে শব্‌নম কথায় কথায় কবিতা বলতে পারত সে বিদায়ের সময়কার মত একটি কবিতাও উদ্ধৃত করে নি কিংবা করতে পারে নি। মাত্র একবার করেছিল। তাও আমি আমার চিঠিতে সে-কথার উল্লেখ করেছিলুম বলে। তখন লিখেছিল :

"আজ হুনরে হালে খরাব্ মমূন্ শুদ্ ইস্‌লাহ পজীর
হমচু ওয়রানে কি আজ গন্‌জে খুদ্ আবাদ ন্ শুদ্।"

'এত গুণ ধরি কি হইবে বলো দুরবস্থার মাঝে ?
পোড়া বাড়িটাতে লুকনো যে ধন—লাগে তার কোনো কাজে ?'

আর ছিল কান্না আর কান্না।

প্রত্যেকটি শব্দে, প্রত্যেকটি বাক্যে। এমন কি আমাকে খুশী করবার জন্যে যখন জোর করে কোন আনন্দ ঘটনার খবর দিত তখনও সেটি থাকত চোখের জলে ভেজা।

থাক্। আমার এ গুপ্তধনে কী আছে তার সামান্যতম ইঙ্গিত আমি দেব না। এখন এটি আমার চোখের জলে ভেজা।

এক বছর ঘুরে যাওয়ার পর আমি একদিন রোজা করলুম। সন্ধ্যার সময় গোসল করে, সামান্য ইফ্‌তার (পারণা) করে নমাজে বসলুম। দুপুর রাত্রে ঘুমুতে গেলুম। স্বপ্নে সত্যপথ নিরূপণের এই আমাদের একমাত্র পন্থা।

স্বপ্নাদেশ হল, কান্দাহার যেয়ো না। ভোর রাত্রে।

আমার মস্তকে বজ্রাঘাত। আমি ভেবেছিলুম, কোন আদেশই পাব না এবং বিবেককে সেই পন্থায় চালিয়ে দিয়ে আমি কান্দাহারের পথ নেব।

অবশ্য কুরান শরীফে এ প্রক্রিয়ার উল্লেখ নেই। কাজেই না মানলেও কোন পাপ হবে না। কোন কোন মৌলানা এ প্রক্রিয়া অপছন্দও করে থাকেন।

এমন সময় আব্দুর রহ্‌মান এসে ঘরে দাঁড়াল। আমি তার দিকে তাকালুম। বললে, 'কাল আমি কান্দাহার যাবার অনুমতি চাই।'

আব্দুর রহ্‌মান সেই যে পাগমানে গোড়ার দিকে একদিন বলেছিল আওরঙ্গজেব-পরিবার কাবুল চলে গিয়েছেন তারপর সে ওই বিষয়ে একটি কথাও বলে নি।

আমি শুধালুম, 'কেন ?'

'ওখানে আমার এক ভাগ্নে আছে। তোপল্‌থান দু মাস হল আসে নি।'

এ দুটো কথাতে কি সম্পর্ক আছে ঠিক বুঝতে পারলুম না।—একটু চিন্তা করে স্থির করলুম, আব্দুর রহ্‌মানকে দিয়ে চিঠি লিখে কান্দাহার আসবার অনুমতি চাইব, আর আজ রাত্রে যদি কোন প্রত্যাদেশ না আসে তবে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তেও পারি। আব্দুর রহ্‌মান চলে গেল।

আমি নত মস্তকে শ্লথ গতিতে টেবিলের দিকে চললুম, চিঠিখানা তৈরী করে রাখতে। এই এক বৎসর আমি ফার্সী শিখেছি প্রাণপণ—সে-ই ছিল আমার বিরহে সান্ত্বনার তীর্থ—তবু চিঠি লিখতে সময় লাগে।

টেবিলের কাছে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি, শব্‌নম।

॥ ২ ॥

পরে শব্‌নমের কাছ থেকেই শুনেছি, আমি নাকি জাত-ইডিয়টের মত শুধু বিড়বিড় করে কি যেন একটা প্রশ্ন বার বার শুধিয়েছিলুম। 'তুমি কি করে এলে? আমি তো কোন শব্দ শুনি নি। তুমি কি করে এলে? আমি তো কোন শব্দ শুনি নি।' আমার বিস্ময় লাগে, এইটেই কি আমার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল!

অপমানিত, পদদলিত, ব্যঙ্গ-কশাঘাতে জর্জরিত নিরাশ দীনহীন জনকে যদি রাজাধিরাজ ধর্মরাজ সহসা আদর করে ডেকে নিয়ে সিংহাসনের এক পাশে বসান তখন তার কি অবস্থা হয়?

আশৈশব অপমানিত, যৌবনেও আপন নীচ-জন্ম সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন সূতপুত্র কর্ণ যেদিন মহামান্যা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠা কুন্তীর কাছে শুনতে পেলেন তিনি হীনজন্মা নন, তখন তাঁর কি অবস্থা হয়েছিল?

শব্‌নম এতটুকু বদলায় নি। সৌন্দর্যহর কাল যেন তার সম্মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল। গাত্রস্পর্শ করতে পারে নি। যাবার দিন যে রকমটি দেখেছিলুম, ঠিক সেই রকম। আমার বুকের ভিতর যে ছবি আমি এতদিন হিয়ার রক্ত দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলুম সে যেন আজ মুক্তিস্নান সেরে আমার সমুখে দেখা দিল। তার মুখে সব সময়েই শিশির-মধুমাস, আফগানিস্থান-হিন্দুস্থান বিরাজ করত; কপাল আফগানিস্থানের শীতের বরফের মত শুভ্র আর কপোল বোলপুরের বসন্ত-কিংশুকের মত রাঙা। হুবহু সেই রকমই আছে।

শুধু কোথায় যেন তবু পরিবর্তন হয়েছে। চোখে? সেইখানেই তো সর্বপ্রথম পরিবর্তন আসে। না। ঠোঁটের কোণে? না। গালের টোল ভরে গিয়েছে? না সর্বস্মুদ্ধ? তাও না।

অকস্মাৎ বুঝে গেলুম ওর ভিতর আগুন জ্বলছে। সে আগুন সর্বাঙ্গ হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

আমার কাছে এসে, দুহাত আমার কাঁধে রেখে মস্তকাঘ্রাণ করল। বনবাস-মুক্ত রামচন্দ্রকে কৌশল্যা যে-রকম মস্তকাঘ্রাণ করেছিলেন।

বললে, 'ছিঃ! তুমি রোগা হয়ে গিয়েছ।'

বুঝলুম, ওকে পুড়িয়েছে বেশী। এবং সইবার শক্তিও তার অনেক, অনেক

বেশী আমার চেয়ে। হৃদয়ঙ্গম করলুম, ওর কথাই ঠিক। ওর ব্যাকুলতাই বেশী। কিন্তু জীবনে বিশ্বাস ওকেই করতে হবে। মরুভূমিতে মাত্র দুজনার এই কাফেলাতে সে-ই নিশানদার সর্দার!

বড় ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, 'আমাকে একটু ঘুমুতে দেবে?'

ঘুঙুরওয়ালা চরণচক্রপরা বাড়ির নতুন বউ চলাফেরা করার সময় যে রকম দক্ষিণী বীণা বাজে, ওর গলার শব্দ সেই রকম।

শুয়ে পড়ে একটি অতি ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমি কিন্তু কোথাও যেয়ো না।'

আশ্চর্য এ আদেশ! আমি আবার যাব কোথায়? তখন বুঝলুম, যে আদেশ দেবার পূর্বেই প্রতিপালিত হয়ে গেছে সেইটেই সত্যকার আদেশ, যে বাক্য অর্থহীন সেইটেই সব অর্থ ধরে।

তবে শুনেছি, স্বয়ং লক্ষ্মী এলেন ভাগ্যহীন চাষার কপালে ফোঁটা দিতে। সে গেল নদীতে মুখ ধুতে। ফিরে এসে দেখে তিনি অন্তর্ধান করেছেন। ওরে মূর্খ, ঘামে-ভেজা কাদা-মাখা কপালেই তখন ফোঁটা নিয়ে নিতে হয়। এক বছরের অবহেলায় গৃহ শ্রীহীন। তাই বলে আমি কি এখন ছুটব ডেকোরেটরের দোকানে!

শব্‌নমের ঠোঁট অল্প অল্প নড়ছিল। তারপর সত্যই ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি জানি, রোমান্টিকেরা, আমার তরুণ বন্ধুরা, মর্মাহত হবেন। দীর্ঘ অদর্শনের পর এই অপ্রত্যাশিত মিলন; আর একজন গেলেন ঘুমুতে! আর আমি কি করলুম? সত্যি বলছি, একখানা বই নিয়ে পড়তে লাগলুম। এক ঘণ্টা পরে দেখি, এক বর্ণও বুঝতে পারি নি। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান? এক ঘণ্টারও বেশী সে ঘুমিয়েছিল। কতদিনের জমানো ঘুম কে জানে? কত দুশ্চিন্তা, কত দুর্ভাবনা সে ওই ঘুমে চিরকালের তরে গোর দিতে চায় কে জানে? ঘুম থেকে উঠে চুপ করে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি লাজুক ছেলে বিপদে পড়লে যে রকম হয় সেই গলায় বললুম, 'কিছু বলছ না যে?'

বললে—

'ওয়াসিল্ হরফ্-ই চুন্ ও চিরা বস্তে অস্ত্ লব্
চুন রহ্‌তমাম গশ্‌ৎ জর্স বি-জবান শওদ।'

'কাফেলা যখন পৌঁছিল গৃহে মরুভূমি হয়ে পার
সবাই নীরব। উটের গলায়ও ঘণ্টা বাজে না আর।'

বড় স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। যা বললে তার ভিতরই তার প্রতিবাদ রয়ে গিয়েছে। নিজের নীরবতা বোঝাতে গিয়ে শব্‌নম সরব হয়েছে। আর শুধু কি তাই? সেই পুরনো শব্‌নম—যে কবিতা ছাড়া কথা কইতে পারে না। যে পরওয়ানা প্রদীপের পানে ধায় না সে আবার পরওয়ানা! পরক্ষণেই বললুম, হে খুদা এ কি অপয়া চিন্তা এনে দিলে আমার মনে—এই আনন্দের দিনে? মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপলুম।

শুনতে পেয়েছে। শুধালে, 'কি বলছ?'

আমি পাছে ধরা পড়ে যাই তাই বললুম, 'তুমি ঘুমোবার আগে আমাকে কি যেন বলছিলে?'

'ও! বাড়ি ছাড়তে বারণ করেছিলুম, আর বলেছিলুম—

"দীরূনে খানা-ই খুদ্ হর্ গদা শাহানশাহ্-ইস্ত্
কদম্ বারূন মনহ আজ হদ্দ-ই-খওয়িশ ও সুলতান বাশ্।"

'ভিখারী হলেও আপন বাড়িতে তুমি তো রাজার রাজা—
সে রাজ্য ছেড়ে বাহিরিয়া কেন মাত্র শুধু রাজা সাজা!'

'কী রকম?'

'এই মনে কর ইরানের শাহ্-ইন্‌শাহ্—রাজার রাজা, মহারাজা। তিনি যদি আজ এদেশে আসেন তবে আমরা বলব ইরানের শাহ্—রাজামাত্র। কারণ আমাদের তো রাজা রয়েছেন। আমাদের শাহের তিনি তো শাহ্ নন।'

'আর যদি বশ্যতা স্বীকার করেন?'

'কী বোকা!'

'হ্যাঁ! যেমন মনে কর তুমি তোমার আপন বাড়িতে অন্য অনেক জনের ভিতর শাহ্‌জাদা, কিংবা শাহ্‌জাদী, কিংবা ধরলুম শাহ্‌ই। কিন্তু এ বাড়িতে তুমি শাহ্-ইন্ শাহ্—মহারাজা।'

'ওতে আমার লোভ নেই।'

আমি দুঃখ পেলুম।

বললে, 'ওরে বোকা, ওরে হাবা, ওইখানে, ওইখানে'—বলে তার আঙুল দিয়ে আমার বুকের উপর বার বার খোঁচা দিতে লাগল। তারপর বলল, 'এবার তুমি বড় লক্ষ্মী ছেলে হয়ে গিয়েছ। এখনও একটা ফরিয়াদও কর নি।'

'করি নি? তা হলে কি করেছি এতদিন, প্রতি মুহূর্তে? হাফিজ সেটা জানতেন না? আমার হয়ে সেটা করে যান নি?—

"তুমি বলেছিলে 'ভাবনা কিসের ? আমি তোমারেই ভালবাসি ;
আনন্দে থাকো, ধৈর্য-সলিলে ভাবনা যে যাক ভাসি।'
ধৈর্য কোথায় ? কিবা সে হৃদয় ? হৃদয় কাহারে কয় ?
সে তো শুধু এক বিন্দু শোণিত আর ফরিয়াদ-রাশি।" '

বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বললে, '"ফরিয়াদ-রাশি" নয়, আছে "ভাবনার রাশি"।'

আমি বললুম, 'সে কি একই কথা নয় ?'

বললে, 'কথাটা ঠিক। হৃদয় মানেই চিন্তা, ভাবনা, ফরিয়াদ—অতি কালে-ভদ্রে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা—। সেই সান্ত্বনাটুকু না থাকলেই ভালো হত। বেদনা-বোধটা হয়তো আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে যেত। কিস্মতের এ কী বিঘ্নসন্তোষী প্রবৃত্তি! নিরাশায় নুয়ে নুয়ে গাছটা মরে যাচ্ছে। মরতে দে না। তা হলে তো বাঁচি। না ; তখন দেবে সান্ত্বনার এক ফোঁটা জল। আবার বাঁচ, আবার মর। যেন বেলাভূমির সঙ্গে তরঙ্গের প্রেম। দূর থেকে সাদা দাঁত দেখিয়ে হেসে হেসে আসে, আবার চলে যায়, আবার আসে, আবার যায়।' হঠাৎ হেসে উঠে বলল, 'কিন্তু আমি শতবার মরতে রাজী আছি—একবার বাঁচবার তরে।' এটা যেন আপন মনের কথা। তারপর আমাকে শুধালে, 'এখন ফরিয়াদ করছ না কেন ?'

আমি বললুম, 'কাজল যতক্ষণ দূরে থাকে ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ—সে কালো। চোখে যখন মেখে নিই তখন তো তার কালিমা আর দেখতে পাই নে। সে তখন সৌন্দর্য বাড়ায়। এটা আমার নয়—কবি, দার্শনিক, পণ্ডিত তিরুবল্লুবেরের।'

'চমৎকার। আমাদেরও তো সুর্মা আছে, কিন্তু কেউ কিছু লিখেছে বলে তো মনে পড়ছে না। আরও একটা বল।'

'ওঁর কাব্য তো আমি সঙ্গে আনি নি। আচ্ছা দেখি।' একটু ভেবে বললুম, 'নিঠুর প্রিয়ের সম্বন্ধে প্রিয়া বলছেন, "সে আমার হৃদয়-বাড়িতে দিনে ঢোকে অন্তত লক্ষ বার কিন্তু তার বাড়িতে কি আমাকে একবারও ঢুকতে দেয় ? আমিই তাকে স্মরণ করি লক্ষ বার, সে একবারও করে না।" '

হঠাৎ দেখি শব্‌নম গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। কবিতাটি ভাল হোক মন্দ হোক এতে তো গম্ভীর হওয়ার মত কিছু নেই।

কান্নার সুরে বললে, 'আমার বাড়িতে নিয়ে যাই নি—তোমাকে ? কবে যাবে বল।'

আমি প্রথমটায় বুঝতে পারি নি 'বাড়ি' বলতে সে 'হৃদয়' বুঝেও সত্যকার

আপন বাড়ি বুঝেছে।

আমি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তার দু হাত চেপে ধরলুম। মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরল না। কি যেন একটা 'হারাই হারাই' ভাব বুকটাকে ঝাঁঝরা করে দিল। আবার কথা বলতে গেলুম, পারলুম না।

আস্তে আস্তে তার হাত দুটি ছাড়িয়ে নিয়ে আমার হাতের উপর বুলোতে বুলোতে বললে, 'আমি পাগল, না, কি? বন্ধু, তুমি কিছু মনে করো না। এই এক বছর ধরে—'

বাধা দিয়ে অতি কষ্টে বললুম, 'আমার উপর মেহেরবান হও—প্রসন্ন হও। আমি কি জানি নে আমি কত অভাজন। তুমি এ শহরে—'

এবারে হেসে উঠে বাধা দিয়ে বললে, '—সবচেয়ে সুন্দরী (আমি কিন্তু তার কুল-গোষ্ঠীর কথা বলতে যাচ্ছিলুম)। না? আমি কুৎসিত হলে তুমি আমায় ভালবাসতে না—সে তো কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু আমি মাঝারি হলে কি করতে বল তো?'

আমি ঝড় কাটাতে ব্যস্ত। হালের সঙ্গে পাল। বললুম, 'এ রকম প্রশ্ন আমি কোনও বইয়ে পড়ি নি। সাধারণত মেয়ে শুধায়, সে সুন্দরী না হলে ভালবাসা পেত কি না?'

'উত্তর দাও।'

'আমি নিজে তো মাঝারি। তুমি তো বেসেছ। এবং সবচেয়ে বড় কথা, তুমি তুর্কী রমণী। তুমি—'

'ব্যস্, ব্যস্, থাক্ থাক্। এবার এদিকে এস। আমার ব্যাগটা খোল তো। হ্যাঁ ওই রুমালে বাঁধা জিনিস।'

সামনের টেবিলে সেটি রেখে রূপোতে সিল্কেতে কাজ করা কিংখাপের রুমালের গিঁট আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে খুলতে লাগল—যেন তীর্থের প্রসাদী। আমি এক দৃষ্টে দেখছিলুম তার আঙুলের খেলা। প্রত্যেকটি আঙুল যেন এক একটি ব্যালে নর্তকী। হাতের কবজি দুটি একদম নড়ছে না—আঙুলগুলো এখানে যায়, সেখানে যায়, একটা অসম্ভব অ্যাঙ্গল থেকে চট করে আরেক অসম্ভব অ্যাঙ্গেলে চলে যায়। পিয়ানো বাজানো এর কাছে কিছুই নয়; সে তো শুধু ডাইনে বাঁয়ের নড়ন চড়ন।

দুখানা রুমাল খোলার পর বেরোল গাঢ় নীল রঙে চামড়ায় বাঁধানো একখানি ছোট্ট বই। চামড়ার উপর সোনালী কাজ। চার কোণ জুড়ে টায়রা করে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল-লতা-পাতার নক্সার কাজ—তারই মাঝে মাঝে বসে আছে

ক্ষুদে ক্ষুদে পাখি। বইয়ের মাঝখানে একটি জোরালো গোল মেডালিয়ন, নামাঙ্কন-স্বাক্ষরলাঞ্ছন সহ।

বললে, 'আরও কাছে এস।'

আঙুলের ডগা দিয়ে আস্তে আস্তে এক একটি করে পাতার প্রান্ত বুলিয়ে সেটিকে উল্টোয় আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে যেন একটি করে নূতন বাগান। পাতার মাঝখানে কুচকুচে কালো কালিতে হাতের লেখা ফার্সী কবিতা আর তার চতুর্দিকের বর্ডারে আবার সেই লতা আর পাখির ম্বতিক। অতি ছোট্ট ছোট্ট গোলাপী রঙ্গের পাশে ডালের উপর বসে ক্ষুদে ক্ষুদে বুলবুল। কখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে লতার উপর দুলছে, কখনও বা ঘাড় নিচু করে গোলাপ্ কুঁড়ির সঙ্গে কানে কানে কথা কইছে। সখী, জাগো, জাগো। পাঁচ-ছটা রঙের এক সপ্তকেই সংগীত বাঁধা হয়েছে, কিন্তু আসল পকড়্ সোনালী, নীল আর গোলাপীতে।

বললে, 'লেখাটা করে দিয়েছেন আগা-ই-আগা ওস্তাদ শির্-বুলন্দ কিজ্‌ল্‌বাশ। উনিই আমাদের শেষ জরীন্-কলম, সোনার কলমের মালিক। তাঁর ছেলে পর্যন্ত হিন্দুস্থান চলে গিয়েছে ছাপাখানার কাজ শিখতে!' একটি ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

প্রতি দু পাতার মাঝখানে এক একখানি করে অতি পাতলা সাদা কাগজ। আতর মাখানো।

বুঝিয়ে বললে, 'পোকায় কাটবে না আর আতরের তেলের স্নেহ কাগজকে শুকনো হতে দেবে না।' আমার মনে পড়ল সত্যেন দত্তের ফার্সী কবিতার অনুবাদ।

'তবু বসন্ত যৌবন সাথে দু'দিনেই লোপ পায়
কুসুমগন্ধী যৌবন পুঁথি পলে উলটিয়া যায়।'

আবার এ কী অপয়া বচন? না, না। সৃষ্টির প্রথম দিনের প্রথম বুলবুলের সঙ্গে প্রথম গোলাপের মৃদু মর্মর গানে মর্মের বাণীর কানাকানি এখনও আছে, চিরকাল থাকবে।

শব্‌নম কিন্তু-কিন্তু করে কি যেন বলতে চাইছে, বলছে না। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি সে-মুখ একেবারে সিঁদুরের মত টকটকে।

আমি তাকাতেই সেই মুখে যেন ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। শব্‌নমের মুখে শব্‌নম। ঘাড় ফিরিয়ে অপরাধীর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আর বর্ডারগুলো আমার আঁকা!'

বলেই ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে।

আমি হরিণশিশুকে নর্‌গিস বনের ভিতর দিয়ে নাচতে দেখলুম। আমার বুখারা-কার্পেট ছিল নর্‌গিস মতিফ।

সিঁড়ির মুখে গিয়ে হাঁকলে, 'আগা আব্দুর রহ্‌মান। চা খাবে?'

আব্দুর রহ্‌মান হুঙ্কার ছাড়লে, 'চশ্‌ম!'—যেন হুকুমটা কান্দাহার থেকে এসেছে, জবাব সেখানে পৌঁছনো চাই।

কী সৌজন্য! 'চা খাবে?'—'চা আন', নয়। অর্থাৎ তুমি যদি খাও, তবে আমিও যেন এক পেয়ালা পাই।' ভৃত্যকে সহচরের মত মধুর সম্ভাষণ। আর আমার আব্দুর রহ্‌মানও কিছু কম নয়। 'চশ্‌ম্'—অর্থাৎ আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছা আমার 'চশ্‌ম', চোখের মত কিম্মৎবার, মূল্যবান।'

আমার মূল বিস্ময় কিন্তু এতে তো চাপা পড়ে না।

'তুমি এঁকেছ?'

নীরব বীণা।

'তুমি এঁকেছ?'

যেন অতি দূরে সে বীণার প্রথম পিড়িং শোনা গেল 'বড় কাঁচা।'

আমি সপ্তমে বললুম, 'কাঁচা? আশ্চর্য! কাঁচা? তাজ্জব ক-টা ওস্তাদ এ রকম পারে?'

এবারে কাছে এসে হেসে বললে, 'তুমি কিছু জান না। তাই তোমাকে কবিতা শুনিয়ে সুখ, তোমাকে ছবি দেখিয়ে আনন্দ।'

আমি রাগ করে বললুম, 'তুমি কি আমাকে অজ গাঁইয়া পেয়েছ? দিল্লীর মহাফিজখানাতে আমার দোস্ত রায় আমাকে কলমী কিতাব দেখায় নি?'

আমাকে খুশী করার জন্য বললে, 'তাই সই, তাই সই ওগো তাই সই। কিন্তু আমার ওস্তাদ আগা জমশীদ বুখারী বলেন, "রোজ আট ঘণ্টা করে ত্রিশ বছর আঁকার রেওয়াজ করলে তবে ছবি আঁকার কল রপ্ত হয়। এবং তারপর চলে যাবে চোখের জ্যোতি।"'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'বল কি?'

'হ্যাঁ। এবং বলেন, "কিন্তু কোনও দুঃখ নেই। তুমি নিজেই জান না তোমার মূল্য কি?"'

'মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে?'

খুশী হয়ে বললে, 'বিলকুল্! "—প্রকৃত জহুরী সমঝে যাবে তোমার প্রথম ছবিতে কোন্ শেষ কথা লুকনো আছে, আর তোমার শেষ ছবির সব মিলে যাবে

প্রথম ছবির প্রথম ঠেকায়।" তারপর তিনি খুব জোর দিয়ে বলতেন, "হুনরে যখন পরিপূর্ণতাই এসে গেল তখন আর পুনরাবৃত্তি করে লাভ কি? এবং যদিস্যাৎ তার পরও কিছু উদ্বৃত্ত থেকে যায় তবে সেইটে ভাঙিয়ে খাবে তোমার শিষ্যেরা—তাদের জন্যও তো কিছু রাখতে হয়। তখন তোমার পাকা গম-রঙের বেহালার সুর শোনা যাবে তাদের কাঁচা সবুজ বেহালার রেওয়াজে।" '

আমি বললুম, 'চমৎকার।'

'আমি তাঁর প্রত্যেকটি শব্দ কণ্ঠস্থ করে রেখেছি।'

আমি শুধালুম, 'কার কাব্য আছে এতে?'

'অনেকের। তোমাকে যেগুলো শুনিয়েছি আর যেগুলো শোনাব। তুমি যে ক-টি বলেছ তাও আছে। তবে বেশীর ভাগ আবু তালিব কলীম কাশানীর। ইনি আসলে ইরানী কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাদের বাদশা জাহাঙ্গীরের সভাকবি হন। আর আছে সাঈব্ তবরীজীর। ইনিও হিন্দুস্থানে কিছুকাল ছিলেন—কলীমের বন্ধু। তখন ইরানে রব উঠেছে—

"সকল মাথায় তুর্কী নাচন তোমার লাগি, প্রিয়ে,
লক্ষপতি হবে সবাই হিন্দুস্থানে গিয়ে!"

এসব আমি এবারে কান্দাহারে শিখেছি। পরে বলব।'

বললে, 'তুমি কখনও জানবে কি, বুঝবে কি, ছবি আঁকার সময় প্রতিটি মুহূর্তে তুমি আমার সামনে ছিলে? প্রতিটি তুলির টানে আছে তোমার চুল, প্রতিটি বাঁকা রেখায় আছে তোমার ভুরু। তোমার হাসি থেকে নিয়েছি গোলাপী, তোমার স্বর থেকে নিয়েছি রূপালী।'

আমি বললুম, 'দয়া কর।'

'আমায় বলতে দাও। এই একবারের মত।'

'শেষ বুলবুলের চোখ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে জানেমন—বড়চাচা—ঘরে ঢুকে বললেন, "চলো মুসাফির, বাঁধ গাটুরিয়া, বহুদূর জানে হোয়েগা।" কাল সকালেই কাবুল যাত্রা। বাদশা আপন গাড়ি পাঠিয়েছেন। তাঁর সবুর সইছে না। তাই তো তোমাকে খবর দিতে পারি নি।'

আব্দুর রহ্‌মান চা নিয়ে এল। শব্‌নম বললে, 'আগা রহ্‌মান, তুমি তোপল খানকে প্রতিবারে কোর্মা-কালিয়া খাইয়েছ আর সিনেমা দেখিয়েছ। খুদা তোমার মঙ্গল করুন। এদিকে এস। এই নাও। কান্দাহার থেকে এনেছি।'

ব্যাগ খুলে শব্‌নম বের করলে তাবিজের মত ছোট্ট একখানি কুরান্ শরীফ।

সঙ্গে আতশী কাঁচ। তাই দিয়ে পড়তে হয়।

আব্দুর রহ্‌মান নিচু হয়ে হাত ছুঁইয়ে হাতখানি আপন চোখে চেপে ধরল। তারপর কুরান্‌খানি দু-হাতে মাথার উপর তুলে ধরে আস্তে আস্তে চলে গেল। তার মুখের ভাব কি করে বর্ণাই! জোয়ানের ইয়া ব্বড়া মুখখানা যেন কচি শিশুর হাসিমুখে পরিণত হল।

কী অসাধারণ বুদ্ধিমতী এই শব্‌নম। জানত, অন্য কিছু আব্দুর রহ্‌মানকে গছানো যাবে না।

শব্‌নমের আঁকা বর্ডার দেখতে গিয়ে সে শুধালে, 'আচ্ছা বল তো, এই বুলবুলের নাম কি?'

আমি বললুম, 'বুলবুল তো এক রকমেরই হয়।'

'এই বুলবুল, এ বইয়ের সব বুলবুল শব্‌নম। বুলবুল এসেছিল বাগানে, সে-ই প্রথম গোলাপকে প্রেম নিবেদন করবে। এসে দেখে গোলাপ আগের থেকেই বাতাসে বাতাসে তার প্রেমের বারতা বিছিয়ে রেখেছে। গোলাপের কাছে পৌঁছবার বহু পূর্বেই সে সৌরভের ডাক শুনতে পেল, 'এস এস, প্রিয়া। মনে আছে?'

'তুমি কেন দুঃখ কর, বুলবুল? শব্‌নম যদি সমস্ত রাত গোলাপের উপর অশ্রুবর্ষণ না করত তবে কি সে ফুটতে পারত?'

জড়ানো কণ্ঠে বললে, 'সেই ভালো, ওগো শব্‌নমের শরৎ-নিশির স্বপ্ন। এই নাও তোমার বই।'

আমি প্রতিবাদ করেছি।

শান্ত কণ্ঠে বললে, 'এতে আছে আমার চোখের ঝরা জল। সে জল তো আমি চোখে পুরে নিতে পারব না। এই জল দেখে যখন তোমার চোখে জল টলটল করবে তখনই তো এ তার চরম মূল্য পাবে।'

আমি বইখানা দুই হাত দিয়ে তুলে ধরে ঠোঁট চেপে চুমা দিলুম—

কিন্তু আমার চোখ দুটি অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে।

শব্‌নম আস্তে আস্তে, অতি ধীরে ধীরে, ঘাড় ঘোরালে। তার চোখে ছিল স্বচ্ছ জলের অতল রহস্য।

আমি বললুম, 'কিন্তু বন্ধু, তুমি তো এর আগেই আমাকে সওগাত দিয়েছ।'

অবাক হয়ে বললে, 'কখন?'

'প্রথম রাত্রেই।' বলতে বলতে আমি ওয়েস্ট কোটের বুক পকেট থেকে বের করলুম একটি সোনার ভিজিটিং-কার্ড কেস। এটি আমি সওগাত রাখবার জন্য

প্যারিস থেকে আনিয়েছিলুম। শব্‌নমের হাতে দিলুম।

সে খুলে দেখে ভিতরে একখানি ভিজিটিং-কার্ড। সেই কার্ডে অতি সযত্নে জড়ানো একগাছি চুল।

'চোর, চোর' বলে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল। তারপর ওস্তাদ সেতারী বাজনা আরম্ভ করার পূর্বে যে রকম সব কটা ঘাটের উপর টুংটাং করে হাত চালিয়ে নেন, সেইরকম পর্দার পর পর্দা হাসলে। বললে, 'তাই বল। আমি পরদিন সকালবেলা চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখি এক গাছা চুল কম। খোঁজ খোঁজ, ঢোঁড় ঢোঁড় রব পড়ে গেল চতুর্দিকে। শাজাদীর একগাছা চুল চুরি গেছে। বাদশা জানতে পেরে কোটালকে ডেকে কোফতা কাবাব করেন আর কি! আমি স্বয়ং গেলুম টেনিসকোর্টে, তারপর গেলুম হোটেলে, তোমার ঘরে—'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আমার ঘরে?'

'হ্যাঁ রে, জান, হাঁ। আমার জান্ গিয়েছিল। তখন আকাশে আদম স্বরৎ—কালপুরুষ। তারপর মেঘ। তারপর বৃষ্টি। আমার জান ভিজে নেয়ে বাড়ি ফিরল। সেই হৃদয়—যাকে তুমি বল, "সে তো একবিন্দু শোণিত আর ভাবনার রাশি"।'

'তাই বল! আমি ভেবেছিলুম, তোমার চোখ থেকে ভানুমতী বেরিয়ে কালপুরুষের আয়োনোস্ফিয়ারে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে ঢুকল আমার চোখে।'

'ওরে খোদার সিধে, তাহলে যে এ ব্রহ্মাণ্ডে যত লোক তাকিয়েছিল—' হঠাৎ থমকে গিয়ে বললে, 'ওই য্ যা। যে কাজের জন্য এসেছিলুম তার আসলটাই ভুলে গিয়েছিলুম। তুমি বুধবার দিন সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে পারবে? এই ধর, তিনটে নাগাদ।'

আমি বললুম, 'কি যে বল? কিন্তু কেন? আমি যে ভয় পাচ্ছি।'

'এখনও তোমার ভয় গেল না? ওরে ভীরু, আমাকে বিশ্বাস করতে শেখ।'

ব্যাগটা খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলেই বুঝতুম, এবারে তার যাবার সময় এসেছে।

শব্‌নম আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করলে।

আমি কাতর কণ্ঠে বললুম, 'ও-রকম তুমি হঠাৎ যেতে চাইলে আমার বড় বাজে। আমাকে একটু সয়ে নিতে দাও।'

বললে, 'আমি যখন আসি, তখন তো বল না, "বাইরে সিঁড়িতে গিয়ে বস, একটু সয়ে নিতে দাও"।'

তার বিদায়ের বেলা আমার কোন উত্তর যোগায় না।

দেউড়ির কাছে এসে আকাশের দিকে নাকটি তুলে তুবার শ্বাস নিলে। বললে, 'শব্‌নম পড়ছে।'

এবারে কথা বলার শক্তি দয়াময় দিলেন। বললুম, 'আমার শব্‌নম যেন মাত্র একটি গোলাপে বর্ষে।'

'গোলাপে ঢুকে সে মুক্তো হয়ে গিয়েছে।'

॥ ৩ ॥

আমি রোমান্টিক নই। এ-প্রেম আমার সাজে না। এ-প্রেম তারই জন্য, যে বেদনা সইতে জানে, যে সংগ্রামে ভয় পায় না।

আমি ছেলেবেলা থেকেই ভীরু। কৈশোরে সাহস করে কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে পারি নি। অনাদৃতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কোনও কোনও মেয়ের স্বভাব। তারা যেচে কথা কইলে আমি লজ্জায় ঘেমে নেয়ে কি উত্তর দিয়েছি তা আমি চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারব না।

চণ্ডীদাস পড়ে পেয়েছি ভয়। দিনের পর দিন শ্রীরাধার মত সইতে হবে আমাকে বিরহ দহন? দরকার নেই আমার কানুর প্রেম। গোপিনীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হওয়ার আমার কোনও প্রয়োজন নেই। বনস্পতি গৌরব নিয়ে, উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে, বিদ্যুৎপাত ঝঞ্ঝা-বাত সইবার মত শক্তি আর সাহস আমার নেই। আমি মেহদির বেড়া হয়ে থাকতেই রাজী। আর তিনি যদি তার উপর দয়া করে সাদা-মাটা দু-একটি ফুল ফোটান তবে আমি নিজেকে মহা ভাগ্যবান বলে তাঁকে বার বার নমস্কার করব।

আমি চেয়েছি ঘরের প্রেম, বধূর প্রেম,—বঁধুর প্রেম আমি চাই নি। সংসারের অবহেলা অনাদরের মাঝখানে এইটুকু সান্ত্বনা যে, বাড়ি ফিরলে আমি সেখানে সবচেয়ে আদরের ধন। সারা দিনমান সে আমার সঙ্গে থাকবে স্বপ্নের মত—আমি চলাফেরা করব সেই স্বপ্ন-সম্মোহনে, ঘুমে-চলার রোগী যে রকম হাঁটে। আর রাত্রিকালে সে পাশে থাকবে—জানলার কাছে চাঁদ যে রকম অপলক দৃষ্টিতে নিদ্রিতের শিয়রে জাগে।

মণি-ভরা, প্রবাল-হার-পরা নীলাক্ষী নীলাম্বুজের ঝড়-ঝঞ্ঝার অশান্তি-ঐশ্বর্য আমি চাই নি। গ্রামের নদীটি পর্যন্ত আমি হতে চাই নি। আমি হতে চেয়েছিলুম বাড়ির পিছনের ছোট্ট পুকুরটি। যেটি আমার বধূর, আমার নির্জনে প্যাক্তা সংসারের জননীর একান্ত আপন। সেখানে সামান্যতম তরঙ্গ উঠে আমাকে

বিক্ষুব্ধ করে না, আমার বধূকে শীতার্ত করে না।

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।

তবু ভাগ্যের কাছে স্বীকার করব, এই চল্লিশ ঘণ্টা আমার কেটেছে যেন এক অপূর্ব সংগীতের সুরলোকে। চল্লিশ ঘণ্টার দিগন্তে দেখতে পাচ্ছি, আমার তীর্থাবসানের দরগা-চুড়ো। আর যেতে যেতে দেখছি, পথের দুপাশে কত অতিথিশালার বিশ্রান্তি, কত সাধু-সজ্জন-সঙ্গম, শুনছি মন্দিরের ঘণ্টা, দূর হতে ভেসে-আসা ভোরবেলাকার আজান।

এবারে ঘরে ঢুকল ঝড়ের বেগে। যেন আসলে কত দেরি হয়ে গিয়েছে।

আমার সামনে এসে হিন্দুস্থানী কায়দায় নমস্কার-মুদ্রাতে হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'হামি তোকে ব্বালোবাসি।'

প্রথমটায় বুঝি নি। তারপর হো হো করে হেসে উঠেছিলুম।

'বুঝেছ?'

আমি বললুম, 'এ তুমি শিখলে কোথায়?'

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, আমার কথার উত্তর না দিয়ে বললে, 'আমি করলুম প্রেম নিবেদন, আর তুমি হাসলে।' চোখ থেকে আগুন বেরুচ্ছে না বটে, কিন্তু ভেজা দিনের দেশলাইয়ের মত কখন যে জ্বলবে ঠিক নেই।

আমি অতি কষ্টে তাকে শান্ত করলুম।

আমি কি মূর্খ! উচ্চারণ আর ব্যাকরণের দিকে গেল কান?—বক্তব্যটা উপেক্ষা করে গেলুম। ধন্য সেই রাজা যিনি ভিখারিণীর ছেঁড়া কাপড় দেখেন নি—দেখেছিলেন তার মুখ, তার হৃদয়, আর তাকে বসিয়েছিলেন সিংহাসনে। আমি আহাম্মুক, শাহ্‌জাদীকে দেখছি ভিখারিণীর বেশে।

নিজের গালে নিজে চড় মেরেছি বহুবার—এবার মারলুম লাথি!

বললে, 'হিংসে হল না কেন তোমার? কোনও ইয়াংম্যান্ আমাকে শিখিয়েছে সেই সন্দেহে?'

আমি বললুম, 'সে বাঙালী ইয়াংম্যান্ নয়।'

হার মেনে বললে, 'কান্দাহারে আমাদের এক চাপরাসী ছিল—সে যৌবনে কল্‌কাত্তায় নোকরী করত। তার কাছ থেকে শিখেছি।'

শব্‌নম ভালো করে উচ্চারণটা শিখল। কারণ এই কথাগুলো শুদ্ধভাবে বাঙলাতে বলতে বা উচ্চারণ করতে কোনও কাবুলীর অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। শুধু বাধল গিয়ে 'ভ' অক্ষরে। ভারতবর্ষের বাইরে মহাপ্রাণ বর্ণ নেই

বললেও চলে—এমন কি দক্ষিণ ভারতেও নেই।

শেষটায় যখন বললুম 'ঠিক' তখন ভারি খুশী হল। শুধালে, 'আর তো তোমার কোনও ফরিয়াদ নেই?'

আমি চিন্তা করে বললুম, 'আমার আর কোনও ফরিয়াদ নেই। ভবিষ্যতেও থাকবে না।'

সন্দেহ-নয়নে তাকিয়ে শুধালে, 'হঠাৎ?'

'হঠাৎ-ই। কাল রাত্রে মনে পড়ল একটি সংস্কৃত শ্লোক :—

"শত্রুর্দহতি সংযোগে বিয়োগে মিত্রমপ্যহো।
উভয়োর্দুঃখ দায়িত্বং কো ভেদঃ শত্রুমিত্রয়োঃ?"

'শত্রুর মিলনে মনে অতি কষ্ট হয়
বন্ধু বিচ্ছেদে হয় কষ্ট সাতিশয়।
উভয়েই বহু কষ্ট দেয় যদি মনে
শত্রু মিত্রে কিবা ভেদ তবে এ ভুবনে?'

(কবিভূষণ পূর্ণচন্দ্রের অনুবাদ)

শব্‌নম বললে, 'পয়লা নম্বরী প্যারাডক্‌স্‌। এরপর আর কোনও ফরিয়াদ থাকার কথা নয়।' তারপর চিন্তা করতে করতে বলল, 'কিন্তু এর উত্তরটা কি?'

'তুমি বল।'

'দোস্ত মঙ্গল কামনা করে, দুশমন বিনাশ কামনা করে। আমি কামনাটা বড় করে দেখি। ফলটা অত বড় করে না।'

আমি বললুম, 'শাবাশ! দোস্ত্‌-ই-জান্‌-ই-মন্‌—আমার দিলের দোস্ত—শাবাশ। হিন্দুস্থানের ধর্মগুরুও বলেছেন, মা ফলেষু কদাচন।'

আরও কিছু কথা হল।

আজ কিন্তু সমস্তক্ষণ লক্ষ্য করছিলুম, আজ যেন শব্‌নমের মন অন্য কোনোখানে। হয়তো কোনও কথা বলতে চায় কিংবা শুধাতে চায়।

এমন সময় রাস্তায় হঠাৎ চেঁচামেচি আর আর্ত কণ্ঠরব শোনা গেল। এত জোর যে আমরা দুজনেই শুনতে পেলুম। শব্দটা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল দেখে আমি একটু উৎকণ্ঠিত হলুম। এমন সময় দূর হতে এক সঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেল। দুজনাতে নিচে নেমে খবর নিয়ে জানা গেল

ডাকাতের সর্দার বাচ্চায়েসকাও কাবুল আক্রমণ করতে এসেছে। আমানুল্লাকে তাড়াবে।

আফগানিস্থানের এ-অধ্যায় বিস্ময়জনক। যে কোনও প্রামাণিক ইতিহাসে পাওয়া যায়। এক বাঙালী মুসলমানও এ-বিষয়ে লিখেছেন।

শব্‌নম আমাকে হাত ধরে উপরে নিয়ে এল।

ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঘন ঘন পায়চারি করতে লাগল। একবার বললে, 'আমানুল্লাকে বাবা বার বার বলেছেন, তিনি বারুদের পিপের উপর বসে আছেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতে চান নি। যাক্‌গে, আমার তাতে কি ?'

এ রকম আর্তনাদ আর গুলির আওয়াজ মেশানো অট্টরোল আমি জীবনে কখনও শুনি নি। একবার ভাবলুম, শব্‌নমকে বলি, আমি আর আব্দুর রহ্‌মান তাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি কিন্তু সেই সঙ্কটে আমার সত্য কর্তব্য কি, কিছুতেই স্থির করতে পারলুম না। ঘরের চেয়ে রাস্তা যে বেশী বিপজ্জনক। ওদিকে আবার শব্‌নমদের আপন ভদ্রাসন নিশ্চয়ই আমার বাড়ির চেয়ে অনেক বেশী সুরক্ষিত। কি করি ?

শব্‌নম পায়চারি করছে। আপন মনে বললে, 'কেউ জানতো না। বাবাও জানতেন না।'

পায়চারি বন্ধ করে বললে, 'শুনতে পাচ্ছ, বন্দুকের শব্দ এগিয়ে আসছে ?'

বহু দূরের বন্দুকের শব্দ এগিয়ে আসছে না পিছিয়ে যাচ্ছে বোঝবার মত সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তি সৃষ্টিকর্তা নিরীহ বঙ্গ সন্তানকে দেন নি।

শব্‌নম আবার বললে, 'আমার তাতে কি ?'

আমি তার মানে বুঝতে পারলুম না।

আধঘণ্টার উপর হয়ে গিয়েছে—প্রথম বন্দুকের আওয়াজ শোনার পর।

এমন সময় তোপল্‌ খান এসে ঘরে ঢুকল। সেলাম করে শব্‌নমকে শুধালে, 'বাড়ি যাবে না, দিদি ?'

শব্‌নম বললে, 'যাব। পরে। এখন তুমি নিচে গিয়ে আব্দুর রহ্‌মানের সঙ্গে দেউড়ি-দরজার উপর পাথর চাপাও। আর যা-যা সব করতে হয়।'

তোপল্‌ খান যেভাবে ঘাড় নেড়ে চলে গেল তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল শব্‌নমের প্রতি তোপলের নির্ভর মুর্শীদের উপর চেলার বিশ্বাসের মত। ভ্যালে-র কাছে তা হলে হিরোইন হওয়াটা অসম্ভব নয়।

শব্‌নমের মুখে হাসি ফুটেছে। আমার একটু দুঃখ হল। আমার গায়ের

জোর ওর মত হল না কেন।

শব্‌নম আমার সামনে মুখোমুখি হয়ে বললে, 'তুমি বড় সরল। ভাবলে, তোপল্‌কে দেখে আমি ভরসা পেলুম। এই বন্দুক পিস্তলের জমানায়? যাকৃগে।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে, 'শোন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

শান্ত কণ্ঠে, আমার চোখে চোখ রেখে বললে, 'আমি স্থির করেছি আমাদের বিয়ে হবে। তুমি?'

ধাক্কাটা কি রকম লেগেছিল আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব না। আমার মুখে কথা ফোটে নি এবং চেহারায় যদি কোনও ভাব ফুটে থাকে তবে সেটা হতভম্বের।

সেই শান্ত কণ্ঠেই বললে, 'তোমার চোখ আমি চিনি। তোমাকে কিচ্ছু বলতে হবে না। এবারে আমি জিতেছি।'

তারপর চেয়ারটা কাছে টেনে এনে আমার দু জানুর উপর দু হাতে ভর করে সামনের দিকে ঝুঁকে বললে, 'এবারে সব কথা শোন।'

আমার মুখ দিয়ে তখনও কথা ফোটে নি।

বললে, 'আমি জানতুম, এর একটা বোঝা-পড়া একদিন করতেই হবে। তাই আজকের দিনটা ঠিক করেছিলুম, আস্তে ধীরে তোমার মনের গতি দেখে, প্রসন্ন মুহূর্তে আমি যে একান্ত সর্বস্বান্ত তোমার হতে চাই সেইটে জানাব। ইতিমধ্যে ডাকু এসে জিনিসটা যেমন কঠিন করে তুলল, তেমনি সহজও করে দিল। এখন কতদিন এ রকম চলবে, কেউ বলতে পারে না! আর সময় নেই। আজই, এখ্‌খুনি আমাদের বিয়ে।'

'হ্যাঁ, এখ্‌খুনি।'

আমি কিছু বলতে চাই নি।

'হ্যাঁ। এখ্‌খুনি। তুমি ভেবেছিলে, আমি উত্তেজিত হয়েছি, ডাকু এসেছে বলে। তা নয়। আমি খুঁজছিলুম বিয়ের দুজন সাক্ষী। আব্দুর রহ্‌মান তো আছেই কিন্তু ভিড় ঠেলে কাকে ডেকে নিয়ে আসি, রাস্তায় এই ভয়ে-পাগলদের ডাকলেও কেউ আসবে না। তোপল্‌খান আসাতে আমার দুশ্চিন্তার অবসান হল।'

উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তুমি ওজু করে এস।'

মোহগ্রস্তের মত ওজু সেরে বাইরে এসে দেখি তোপল্‌ আর রহ্‌মানে মিলে

ড্রইং রুমের আসবাবপত্র সরিয়ে মাঝখানে আরেকখানা কার্পেট পেতেছে। শুনেছি চাকরবাকরদের বখশিশ দিলে তারা খুশী হয়। এদের মুখে আজ যে বদান্যতা দেখলুম, সে তো লক্ষপতির মুখেও আমি কখনও দেখি নি।

শব্‌নম এক কোণে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে কী যেন পড়ছে। তার মুখচ্ছবি বড়ই শান্ত। আমি কাছে যেতে কী কী করতে হবে বলে দিল।

দুজনাতে মুখোমুখি হয়ে বসলুম। শব্‌নম মুখের উপর ওড়না টেনে দিয়ে মাথা নিচু করলে। আমি বললুম, 'আমি অমুক, অমুকের ছেলে, তুমি অমুক, অমুকের মেয়ে তোমাকে স্ত্রীধন দিয়ে—'

তোপল্‌ খান শুধালে, 'স্ত্রীধন কত?'

আমি বললুম, 'আমার সর্বস্ব।'

তোপল্‌ খান বললে, 'একটা অঙ্ক বললে ভাল হয়।'

আমি জোর দিয়ে আবার বললুম, 'আমার সর্বস্ব।'

'—স্ত্রীধন দিয়ে মুহম্মদী চার শর্তে তোমাকে স্ত্রীরূপে পেতে চাই। তুমি রাজী?'

এ যেন শব্‌নমের গলা নয়। দূর থেকে ভেসে আসছে, অতি মৃদুকণ্ঠে তার সম্মতি।

তিনবার ওই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হল। তিনবার সে সম্মতি জানালে।

আমি সাক্ষীদের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'আপনারা এই বিবাহের শাস্ত্র-সম্মত দুই সাক্ষী। আপনারা আমার প্রস্তাব আর মুসম্মৎ শব্‌নম বানুর সম্মতি তিনবার শুনেছেন?'

দুজনাই বললে, 'শুনেছি।'

শব্‌নমের কথা ঠিক হলে আনুষ্ঠানিক বিবাহ এইখানেই শেষ। তোপল্‌ খান বহু বিয়ে দেখেছে বলে দু হাত তুলে একটা প্রার্থনা করল। আমিও হাত তুললুম। শব্‌নম মাথা নিচু করে একেবারে মাটির কাছে নামিয়ে, দু হাত দিয়ে প্রায় মুখ ঢেকে।

প্রার্থনাতে মাত্র একটি কথা ছিল। 'হে খুদা, আদম এবং হাওয়ার মধ্যে, ইউসুফ ও জোলেখার মধ্যে, হজ্‌রৎ ও খাদিজার মধ্যে যে প্রেম ছিল, এ দুজনার ভিতর সেই রকম প্রেম হোক।'

আব্দুর রহ্‌মান উদ্বাহু হয়ে প্রার্থনার সময় জোর গলায় ঘনঘন বলল, 'আমিন, আমিন—হে আল্লা তাই হোক, তাই হোক।'

আমিন! আমিন!! আমিন!!!

ওরা দুজন চলে যাওয়ার পর আমি যেখানে ছিলুম সেইখানেই বসে রইলুম। কিছুই তো জানি নে তারপর কি করতে হয়। শব্‌নমও কিছু বলে নি।

উঠে গিয়ে সামনে বসে বললুম, 'শব্‌নম।'

তাকিয়ে দেখি ওড়না ভেজা।

কিছু না ভেবেই ওড়না সরালুম। সুস্থ বুদ্ধিতে পারতুম না। দেখি, শব্‌নমের চোখ দিয়ে জল ঝরছে।

শুধালুম, 'এ কী?'

শব্‌নম চোখ মেলে বললে, 'বল।'

তখন দেখি, আমার বলবার কিছুই নেই।

তাকে তুলে ধরে সোফার দিকে নিয়ে যেতে গিয়ে দেখি সেটকে সরানো হয়েছে। আমি সেদিকে যাচ্ছিলুম। বললে, 'না। ওদের ডাক। তোমার ঘর আমি সেই রকমই চাই।' ঘর ঠিক করা হল।

বললে, 'তুমি শোও।'

আমার পাশে আধ-হেলান দিয়ে বসে আমার চুলের ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে বলল, 'ঠিক এ-রকম হবে আমি ভাবি নি। আমি ভেবেছিলুম, হয়ত খানা-পিনা গান-বাজনা বোমা-বারুদ ফাটিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা আমি করতে পারব। আর তা সম্ভব না হলে আমি অন্যটার জন্যও তৈরী ছিলুম।'

আমি বললুম, 'এই তো ভাল।'

'সে কি আমি জানি নে? খানা-পিনা বন্ধু-সমাগম হল না, তার জন্যে আমাদের কি দুঃখ? তবে একটা পদ এত বেশী হচ্ছে যে আর সব পুষিয়ে দিচ্ছে। শুনছ শাদির 'শাদিয়ানা'? বোমা-বারুদ? কী রকম বন্দুক মেশিনগানের শব্দ হচ্ছে? আমানুল্লার শালীর বিয়েতেও এর এক আনা পরিমাণও হয় নি। ডাকাত আমাদের বিয়ের শাদিয়ানার ভার নিয়েছে—না? এও তো ডাকাতির বিয়ে!'

আমি কিচ্ছুটি বলি নি। আমার হিয়া কানায় কানায় ভরা। আমার জাহাজ বন্দরে ভিড়েছে। পাল দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে হাওয়াকে মুক্তি দিয়েছে। হাল-বৈঠা নিস্তব্ধ। উটের ঘণ্টা আর বাজছে না।

বললে, 'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই।'

এবারে আমাকে মুখ খুলতে হল।

ডান হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে বললে, 'আমার শওহর—স্বামী কথা বলে কম। শোন—

'তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি। তুমি আমাকে কতখানি চাও, সে আমি জানতুম। আরও জানতুম, সর্বশেষে চাওয়া, সমাজের সামনে পাওয়া, তুমি সাহস করে নিজের মনের কাছেই চাইতে পার নি। আমার কাছে বলা—সে তো বহু দূরে। আমার কিন্তু তখন বড্ড কষ্ট হয়েছে। যখন নিতান্ত সইতে পারি নি তখন শুধু বলেছি, আমার কাছে ওষুধ আছে। তুমি নিশ্চয়ই আস্‌মান্-জমীন হাতড়েছ, কী ওষুধ? তুমি বিদেশী, তুমি কী করে জানবে যে, যত অসুবিধেই হোক আমি আমার দেশের, সমাজের সম্মতি নিয়েই বিয়ে করতে চাই। আমার জন্য অতখানি নয়, যতখানি তোমার জন্যে। তুমি কেন ডাকাতের বেশে আমাকে ছিনিয়ে নেবে? মায়-মুরুব্বী, ইয়ার-দোস্ত এবং আরও পাঁচজনের প্রসন্ন কল্যাণ আশীর্বাদের মাঝখানে, আমরা একে অন্যকে বরণ করব। গুল বুলবুল এক বাগিচাতেই থাকবে। চতুর্দিকে আরও ফুল আরও বুলবুল। আমি কোন্ দুঃখে আমার শাখা ছেড়ে তোমাকে ঠোঁটে করে নিয়ে মরুভূমির কিনারায় বসব?'

'সমাজ আপত্তি করলে?'

'থোড়াই পরোয়া করতুম। ধর্মমতে তুমি আমি, সমাজ কেন, বাপ-মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও বিয়ে করতে পারি। কিন্তু সমাজ কি শের না বাবুর, বাঘ না সিংহ, যে তাকে হামেহাল পিস্তল দেখাতে হবে? সমাজ তেজী ঘোড়া। দানা-পানি দেবে, তার পিঠে চড়বে। বেয়াড়ামি করলে পায়ের কাঁটা দিয়ে অল্প গুঁতো দেবে, আরও বেশি হলে চাবুক, আর একদম বিগড়ে গেলে পিস্তল। তারপর নূতন ঘোড়া কিনবে—নূতন সমাজ গড়বে।'

'আর এখন?'

'এখন তো সব-কিছু ফৈসালা হয়ে গেল। প্রথম বলি, কাবুলের সমাজ ঠিক আমাদের সমাজ নয়। আমাদের গুটিকয়েক পরিবার নিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সমাজ। সে সমাজ এখন আমাদের আশীর্বাদ করবে। জান, এদেশে এরকম বিশৃঙ্খলা প্রায়ই হয়। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই, শহরে শহরে লড়াই, রাজায় রাজায় লড়াই। রাজায় ডাকুতে অবশ্য এই প্রথম। তখন ভিন্ মহল্লায় গিয়ে কখনও কখনও পনেরো দিন, এক মাস আটকা পড়ে যেতে হয়। সমাজ শুনে [illegible]বে, '[illegible] ভাল। তারা শাস্ত্রানুযায়ী কাজ করেছে।' পরে যখন [illegible] শুনবেন, আগের থেকে মহব্বৎ ছিল, তখন তারা আরও

খুশী হয়ে দাড়ি দুলোতে দুলোতে বলবেন, 'বেহ্‌তর্ শুদ্, খয়্‌লী বেহ্‌তর্ শুদ্— আরও ভাল। লোকলজ্জার ভয়ে বিয়ে করার চেয়ে দিলের টানে বিয়ে করা অনেক ভাল—বহুৎ বেহ্‌তর্।

'তুমি কিন্তু ভেবো না, তোমার বাড়িতে পনেরো দিন থাকতে হবে বলে সেই অছিলা নিয়ে তোমাকে বিয়ে করেছি। তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমি আমার হৃদয়ের হয়ে মনের কাছে প্রস্তাব পেশ করি হোটেলের বারান্দায়। মন বিচক্ষণ জন। সে সায় দিলে, অনেক ভেবে-চিন্তে—নদী তীরে।

'আর এখন? এখন যে ভূতের নৃত্য আরম্ভ হল তার শেষ কবে কোথায় কে জানে? তাই বিয়েটা চুকিয়ে রাখলুম। ফ্যাতাকঁপ্লি। আমার যা করার করা হয়ে গিয়েছে, এখন আর সবাই এর সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াক।'

দুঃখ করে ফের বললে, 'ওরা দেখছে আমানুল্লার রাজমুকুট। ওদিকে তার যে শক্তিক্ষয় হয়ে যাচ্ছে সেটা কেউ লক্ষ্য করছে না। কবি সাঈব বড় বেদনাতেই বলেছিলেন:

"মোমবাতিটির আলোর মুকুট বাখানি কবি কী বলে!
কেউ দেখে না তো ওদিকে বেচারী পলে পলে যায় গলে।" '

তার পর শব্‌নমের মনে কী ভাবোদয় হল জানি নে্। আমার কানের কাছে মুখ এনে সেটাতে দিল কামড়। বললে, 'ভেবো না, তোপল্‌খানের প্রার্থনা তোমার কান কামড়ানোর স্বর্গদ্বার আমার জন্য খুলে দিল। ও জানে না, তুমিও জান না, আমি তার অনেক পূর্বেই স্বর্গের ভিতরে বসে আছি। কিন্তু বন্ধু, আমার মনে সন্দেহ জাগছে, তুমি আমার কথায় কান দিচ্ছ না।'

আমি খোলাখুলি সব কিছু বলব বলে স্থির করেছি।

বললুম, 'দেখ শব্‌নম—'

'শব্‌নম শিউলি—না,—শিউলি শব্‌নম।'

আমি বললুম, 'শিশির-সিঞ্চিত শেফালি—শব্‌নমে ভেজা শিউলি। হিমিকা—'

'এটা কী শব্দ? আগে তো শুনি নি।'

'শব্‌নমের অতি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ। হিমালয় জান তো? তারই হিম। বাঙলায় শুধু হিমি।'

'আমার সব চেয়ে পছন্দ হয়েছে, "হিমিকা"।"

আমি বললুম,

"কানে কানে কহি তোরে
বধূরে যেদিন পাব, ডাকিব ছিমিকা নাম ধরে।"

বললে, 'ভারি মধুর। আমার ইচ্ছা হয়, সমস্ত রাত এই রকম কবিতা শুনি। কিন্তু এখন বল, তুমি কী ভাবছিলে।'

'তোমার বাবা কি তোমার জন্য চিন্তিত হচ্ছেন না?' আমি ভয়ে ভয়ে কথাটা তুলেছিলুম। ও যদি কিছু মনে করে। আমার ভয় ভুল।

নিঃসঙ্কোচে বললে, 'আগে হলে বলতুম, তুমি তোমার বাড়ি থেকে আমাকে তাড়াচ্ছ। এখন এটা তো আমার বাড়ি। এটা আমার আশ্রয়। এক্ষুনি যে মুহম্মদী চার শর্তে আমাকে বিয়ে করলে তার এক শর্ত হচ্ছে স্ত্রীকে আশ্রয় দেওয়া।'

'আপন বাড়িতে আশ্রয় দেব তো বলি নি। সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়।'

চোখ পাকিয়ে বললে, 'এ কী হচ্ছে? চার শর্তের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার পূর্বেই তুমি শর্ত এড়াবার গলি খুঁজছ? তবে শোন, আমার আব্বাজান আমার জন্য এক দানা গম পর্যন্ত ভাববেন না। আমরা দু-দুটো লড়াই ফেসাদ্ দেখেছি। একবার তিনি আটকা পড়েন। আরেকবার আমি। তিনি বয়েৎ-বাজি (কবির লড়াই) করেছিলেন কোন এক আস্তাবলে আর আমি পাশবালিশ জাবড়ে ধরে ভঁস ভঁস করে ঘুমিয়েছিলুম এক বান্ধবীর বাড়িতে। আসলে তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি থাকবে না, যখন শুনবেন, তোপল্ খান বাড়ি ফেরে নি। ষণ্ডা হলে কী হয়, মাথায় যা মগজ তা দিয়ে মাছ ধরার একটা টোপ পর্যন্ত হয় না। এই দেখলে না, আজ সন্ধ্যায় আরেকটু হলে আমাকে কী রকম ডুবিয়েছিল। তুমি বলছিলে, তোমার সর্বস্ব দেবে, স্ত্রীধন হিসেবে, আর ওই অগা তোপল্টা কনেপক্ষের সাক্ষী হয়ে "অঙ্ক" চেয়ে সেটা কমাতে যাচ্ছিল। আব্বা জানতে পেলে ওকে আইসক্রীমফালুদা করে ছাড়বেন।'

আমি শুধালুম, 'তিনি জানবেন নাকি?'

উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'নিশ্চয়ই জানবেন। আজ না হয় না-ই বা জানলেন।'

আমি শুধালুম, 'তখন?'

হেসে উঠে যা বললে সেটি রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দর ছন্দে গেঁথে দিয়ে গিয়েছেন:

"ওরে ভীরু, তোর উপরে নাই ভুবনের ভার।"

বললে, 'জানেমন্ জানে আমি প্রেমে পড়েছি। আর কিছু না। কিন্তু

আমার সম্পর্কে এক দিদিমণি আছেন। ফিরিশ্‌তার মত পবিত্র পুণ্যবতী। তাঁকে সব খুলে বলে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি এক লহমা মাত্র চিন্তা না করেই বললেন, "যাকে তোর হৃদয় চায় তাকে বিয়ে করবার অধিকার তোকে আল্লা দিয়েছে। আর কারও হক্ক নেই তোদের মাঝখানে দাঁড়াবার।" ব্যাস্‌। বুঝলে ? আমার বাবা আমাকে ভালবাসেন।'

'সর্দার আওরঙ্গজেব খানকে আমি চটাতে পারি, দরকার হলে ; কিন্তু আমার শ্বশুর মশাইয়ের বিরাগভাজন হতে চাই নে।'

খুশী হয়ে বললে, 'ঠিক তাই। আমিও তাই চাই বলে এত মারপ্যাচ। কিন্তু এ-বিষয়ে আজ এই শেষ কথা। গ্রামোফোনের এই শেষ রেকর্ড। বুঝলে ?'

আর তার কী তুর্কী নাচ ! কখনও ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে কংগ্রেসী লেকচার দেয়, কখনও ঝুপ করে কার্পেটের উপর বসে দু হাঁটু জড়িয়ে ধরে চিবুক হাঁটুর উপর রেখে, কখনও আর্ম-চেয়ারে বসে আমার কাছের চেয়ারটা টেনে এনে তার পা দুখানা লম্বা করে দিয়ে, কখনও আমার জানু জড়িয়ে ধরে আমার হাঁটুর উপর তার চিবুক রেখে, কখনও আমাকে দাঁড় করিয়ে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর দু হাত রেখে আর কখনও বা আমাকে সোফায় বসিয়ে একান্তে আমার পায়ের কাছে আসন নিয়ে।

আর ঘড়ি ঘড়ি আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, বল তো, তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস ? এক্‌ খরওয়ার ? এক্‌-ও নীম্‌ খরওয়ার ?—এক গাধা-বোঝাই, দেড় গাধা-বোঝাই ? বহ্‌র-ই-হিন্দ্‌—ভারত সাগরের মত ? খাইবার পাসের মত আঁকাবাঁকা না দারুল্‌-আমানের রাস্তার মত নাক-বরাবর সোজা ? তোমার হিমিকার—ঠিক উচ্চারণ করেছি তো—গালের টোলের মত ভয়ঙ্কর গভীর, না হিন্দুকুশ্‌ পাহাড়ের মত উঁচু ?'

কখনও উত্তরের জন্য অপেক্ষাই করে না, আর কখনও বা গ্যাঁট হয়ে বসে গালে হাত দিয়ে অতি ঠাণ্ডাভাবে উত্তরের প্রতীক্ষা করে—যেন আমার উত্তরের উপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

আমি যদি একই প্রশ্ন শুধাই তবে ছোট্ট মেয়েটির মত চেঁচিয়ে বলে, 'না, না, আমি আগে শুধিয়েছি।'

আমি উত্তর দিতে গেলে স্কুল মাস্টারের মত উৎসাহ দিয়ে কথা যুগিয়ে দেয়, তুলনা সাপ্লাই করে, প্যাডিং ট্রিমিং যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে ওটাকে, পুজোর বাজারে প্রিয়জনের হাতে তুলে দেবার মত পোশাকী-দুরুস্ত করে। আর

কখনও বা তীক্ষ্ণ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে, ডান ভুরু ঠিক জায়গায় রেখে বাঁ ভুরুর বাঁ দিকটা ইঞ্চি খানেক উপরের দিকে তুলে আমাকে পইপই করে পাকা উকিলের মত ক্রস্ করে। 'হিমালয়ের মত উঁচু?—সে আমার দরকার নেই। আমার হিন্দুকুশ্ হলেই চলবে। তার হাইট্ কত? জান না? তবে বলছিলে কেন অতখানি উঁচু?'

একবার নিজে দেখালে, সে আমাকে ততখানি ভালবাসে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বাহু প্রসারিত করে পিছনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে ব্যালে-নর্তকীর মত দু হাতে দু পিঠ প্রায় ছুঁইয়ে ফেলে বললে, 'অ্যাত্তো খানি। প্লাস—প্লাস—' বলতে বলতে আমার কাছে এসে, আমার চোখের সামনে তার কড়ে আঙুল তুলে ধরে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে কড়ে আঙুলের ক্ষুদ্রতম কণায় ঠেকিয়ে বললে, 'প্লাস—অ্যাট্টুকুন্।' তার পর শুধালে, 'এর মানে বল তো?'

আমি বললুম, 'বলার একটা সুন্দর ধরন আর কী।'

'না। সবচেয়ে বেশি থেকে সবচেয়ে কম—দুয়ে মিলিয়ে, হল ইন্ফিনিটি।'

'ওই য্যা ভুলে গিয়েছিলুম—', বলে ছুটে জানলার ধারে গিয়ে বললে, 'ওই দেখ আদম-সুরৎ—পাগ্মানের আদম-সুরৎ, কালপুরুষ। আমাদের বিয়ের ভোজে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—বেচারী!' আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি আমাদের প্রেমের সাক্ষী।'

আমি তাকে সপ্তর্ষির অরুন্ধতী বশিষ্ঠের গল্প বললুম। বৈদিক যুগে যে বর-কনেকে অরুন্ধতী দেখিয়ে ওঁরই মত তাকে পাশে পাশে থাকতে বলতে সেটাও বললুম।

শব্নম উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'কোথায়? কোথায় দেখিয়ে দাও তো আমায়।'

আকাশে তখনও সপ্তর্ষির উদয় হয় নি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

॥ ৪ ॥

মাত্র একটি অঙ্গে আমাদের বিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল।

শব্নম এই প্রথম্ খবর দিয়ে আসছিল বলে আব্দুর রহ্মান কাবুল বাজার ঝেঁটিয়ে খানা-পিনার সাজ-সরঞ্জাম কিনে রেখেছিল। রাত বারোটায় দস্তরখান

পাতা হল, পদের পর পদ আসতে লাগল। শব্‌নম ওদের নিমন্ত্রণ করল, আমাদের সঙ্গে বসে খেতে। সিন্ধুর ওপারে সেবকগণ প্রভু পরিবারের সঙ্গে বসে খেতে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত নয়। ওরা কিন্তু রাজি হল না। শোনাবার মতলবে ওদের ফিসফিস থেকে বোঝা গেল, ওরা বাজি ধরেছে, কে বেশী পোলাও খেতে পারে—প্রচুর সময় লাগার কথা।

শব্‌নম মাথা গুঁজে খেল। রুটি দিয়ে জড়িয়ে ধরে মাংস, তরকারি এমন কি ঝোল পর্যন্ত তুলে খেল, অথচ রুটি ছাড়া অন্য কোনও জিনিস হাতের সংস্পর্শে এল না, এ শুধু আমি দুজন লোককে করতে দেখেছি, শব্‌নম আর ভূপালের এক প্রধান মন্ত্রী। এদের খাওয়ার পর হাত ধোবার প্রয়োজন হয় না। রুটির যেটুকু ময়দার গুঁড়ো আঙুল ডগায় লেগেছে সেটুকু ন্যাপকিনে মুছে নিলেই হল। শব্‌নম আমাকে কিছু না বলে হাত ধুয়ে এসে আমার পাশে বসে বলল, 'তুমি কিছু মনে করো না; এসব ব্যাপারে আমার লজ্জা-বোধ একটু বেশী।'

বাইরে ভয়ঙ্কর শীত। চিমনিতে আবার কাঠ দেওয়া হল।

আগুনের সামনে আমরা দুজনা কার্পেটের উপর বসে আছি।

শব্‌নম প্যারিসের গল্প বলছে। মাঝে মাঝে আমার হাতখানা কোলে তুলে নিয়ে আদর করছে। একবার হৃদয় সম্বন্ধে কী একটা বলতে গিয়ে বললে, 'এই তো তোমার হার্ট—' বলে তার ডান হাত আমার বুকের উপর রাখতে গিয়ে তার হাত সেই ভিজিটিং-কার্ড কেসটায় ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল।

আমি শুধালুম, 'কী হল?'

'তোমার ঘরে কাঁচি আছে?'

'বোস! শোবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলুম—এনে দিচ্ছি।'

বললে, 'বা রে। এখন আমি সর্বত্র যেতে পারি।' বলেই, পাখি যে রকম বসা অবস্থাতেই ওড়া আরম্ভ করতে পারে সেই রকম ফুড়ুত করে উড়ে গিয়ে কাঁচিখানি নিয়ে এল।

আমাকে মুখোমুখি বসিয়ে আমার হাতে কাঁচি দিয়ে বললে, 'আমার জুল্‌ফ্‌ কাটো।'

বাঙলা জুল্‌ফি কথাটা 'জুল্‌ফ্‌' থেকে এসেছে। ইরান তুরানের কুমারীদের অনেকেই দু গুচ্ছ অলক রগ থেকে কানের ডগা অবধি ঝুলিয়ে রাখে। শব্‌নমের চুল ঢেউ-খেলানো বলে তার জুল্‌ফ্‌ দুটির সৌন্দর্য ছিল অসাধারণ।

আমি ঠিক জানি নে, একদা বোধহয় ইরান তুরানের বর বাসর ঘরে নব-

বধুর জুল্‌ফ্ দুটি পুরোপুরিই কেটে দিত। এর পর যে-নূতন চুল গজাত নববধূর সে চুল কানের পিছনে অন্য চুলের সঙ্গে মিলিয়ে দিত। জুল্‌ফে হক্ক কুমারীদের— ইরানে বলা হয় 'দুখ্‌তর্', সংস্কৃতে 'দুহিতৃ' স্পষ্ট বোঝা যায়, একই শব্দ। আজকাল এই জুল্‌ফ্ কাটার রেওয়াজ যে-সব জায়গায় আছে সেখানেও বোধ হয় জুল্‌ফের শুধু ডগাগুলোই কেটে দেওয়া হয়।

আমি বললুম, 'আমার হাত কেটে ফেললেও তোমার জুল্‌ফ্ কাটতে পারব না।'

অনুনয় করলে, 'তা হলে ডগাগুলো কেটে দাও।'

আমি বললুম, 'আমায় মাফ কর।'

'আমি চিরকালই কুমারী থাকব?'

'তুমি চিরকালই আমার সামনে পাগমানের সেই ডান্‌স্-হল থেকে নামছ, তুমি চিরকালই আমার প্রথম সন্ধ্যার হিমিকা। কিন্তু বল তো, তুমি এই জুল্‌ফ্ কাটা নিয়ে এত চাপ দিচ্ছ কেন?'

'তবে কাছে এস।'

আমি আমার দুই তর্জনী দিয়ে তার দুটি জুল্‌ফ্ আঙুল দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে তার মুখ তুলে ধরে বললুম, 'বল।'

'দেখ, চারদিকে এই অশান্তি এই অনিশ্চয়তা, এর মাঝখানে তোমাকে নিঃশেষে পাবার জন্য আমার হৃদয় আমাকে ভরসা দিচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'আমি তো চাই।'

আমার দু হাতে ধরা জুল্‌ফি-বন্ধনের মাঝখানে যতটা পারে মাথা দুলিয়ে বললে, 'না, না, না। তুমি আমাকে এত বেশি ভালবাস যে তোমার চাওয়া-না-চাওয়া সব লোপ পেয়েছে। আমার ভালবাসা তার কাছে দাঁড়াতেই পারে না।'

'এবারে ভাল করে শোন। বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে আমি এমন কোনও আচরণ করি নি যার জন্যে আল্লার সামনে আমাকে লজ্জা পেতে হবে। কিন্তু তোমার অসাক্ষাতে, এখানে, কান্দাহারে, দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, দুপুর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে সন্ধ্যাপ্রদীপ না জেলে গৃহকোণে কতবার আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব সমর্পণ করেছি, তুমি জান না। চতুর্দিকের বিশ্বসংসার তখন প্রতিবার লোপ পেয়ে গিয়েছে একেবারে নিঃশেষে। আমি যেন বেলা-ভূমিতে দাঁড়িয়ে, আর তুমি মহাসিন্ধু, দূর থেকে তরঙ্গে তরঙ্গে ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছ। আমি দম নিয়ে নাকমুখ বন্ধ করার আগেই তুমি

আমাকে তরঙ্গের আলিঙ্গনে আমার সর্বসত্তা লোপ করে দিলে। আর, কখনও তুমি এসেছ ঝড়ের মত। আমার ওড়না তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, আমার জুল্‌ফ্‌-গুচ্ছের ভিতর ঢুকে গিয়ে তার প্রত্যেকটি চুল আলাদা আলাদা করে এদিকে ওদিকে উড়িয়ে দিয়ে, আমার চোখের প্রতিটি কাজলের গুঁড়ো কেড়ে নিয়ে, আর সর্বশেষে আমার প্রতিটি লোমকূপে শিহরণ জাগিয়ে আমাকে যেন তোমার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে কোথায় কোথায় উধাও হয়ে গেলে—কালপুরুষের পাশ দিয়ে কৃত্তিকা, সাত-ভাই-চম্পার ঝাঁকের মাঝখান দিয়ে।

'জ্ঞান ফিরতে দেখি, আমি মাথা ঝুঁকে বর্ডারের উপর বুল্‌বুলির চোখে তুলি লাগিয়ে বসে আছি।'

আমি চুপ করে শুনে গেলুম।

নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমি পুরুষ, তুমি কী করে বুঝবে কুমারীর প্রেম। তুমি তো সমুদ্র তরঙ্গ, ঝড়ের ঘূর্ণি। আর আমার প্রেম?—স্বপ্নে স্বপ্ন বোনা শুক্তির মুক্তো। কত ছোট আর কত অজানার নিভৃত কোণে তার নীড়। কত আঁখি-পল্লব থেকে নিংড়ে নিংড়ে বের-করা এক ফোঁটা আঁখি-জল। আর তার প্রতিটি ক্ষুদ্রতম কণাতে আছে কুমারীর লজ্জা, ভয়, সংকোচ।'

চুপ করে গেল।

আমি কাঁচি হাতে নিয়ে জুল্‌ফ্‌ থেকে তিন গোছা চুল কেটে নিয়ে বললুম, 'এই মুক্ত করলুম আমি তোমার লজ্জা, সংকোচ, ভয়।'

আগুনের সামনে বসেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল বাইরে শীত কী রকম ঘনিয়ে আসছে। সে শীত যখন তার চরমে পৌঁছেছে তখনও শব্‌নম তার জুল্‌ফ্‌ কানের পিছনে ঠেলে দিতে দিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'এ কি নেমকহারামির চূড়ান্ত নয়—যে-বাড়িতে কুড়িটি বছর কাটিয়েছি সেটা আর নিজের আপন বাড়ি বলে মনে হচ্ছে না? আর এ বাড়ি? এ বাড়ি আসলে তোমার আপন বাড়িও নয়—এ বাড়িতে তো আমার শাশুড়ী-মা তোমাকে জন্ম দেন নি। তবু মনে হচ্ছে, এ বাড়িতেই যেন শিশুকাল থেকে আমরা খেলাধুলো ঝগড়াঝাঁটি মান-অভিমান করে করে আজ আমাদের চরম মিলনে পৌঁছুলুম।'

একটুখানি ভাবলে। তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'উহুঁ, এটাও যেন সম্পূর্ণ সত্য নয়। কেমন যেন মনে হচ্ছে, আমরা দুটি শিশু এ বাড়ির আঙিনাতে খেলা করছি, আর ও বাড়ির ছাদে বসে আব্বাজান, জানেমন্‌ একে অন্যের সঙ্গে গল্প করতে করতে আমাদের দিকে স্নেহ-দৃষ্টি রেখে সকল বিপদ আপদ ঠেকিয়ে

রাখছেন। খেলা ছেড়ে ছুটে গিয়ে একবার জানেমনের কোলে বসে জিরিয়ে আসি।'

আমার মোজাটা খুলতে খুলতে বলল, 'এই যে লাগল গোলমাল, এর শেষ কবে, আর কোথায়, কেউ বলতে পারে না। তোমাকে আবার কখন দেখতে পাব তাও জানি নে। তবে এখন আমার বুকভরা সান্ত্বনা। ওই বাচ্চা যদি কাল এসে যেত তা হলে আমাকে মহাবিপদে ফেলত। পাগলা-ভিড় ঠেলে এসে তোমাকে বিয়ে করতে হত। এখন আমি নিশ্চিন্ত মনে যাচ্ছি।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'এই শীতে? এত রাত্তিরে?'

'এই সময়টাই সব চেয়ে ভাল। ডাকুদের দামী দামী ওভারকোট নেই যে এই শীতে বেরুবে। কাল সকালে দেখবে কাবুলে মেলার ভিড়। চোর ডাকাত বেবাক মৌজুদ। প্রথম লুট আরম্ভ হলেই ওরা সব ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাচ্চা তো উপলক্ষ্য মাত্র। তুমি এ দেশের হালহকীকৎ জান অতি অল্প। আমাকে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত হও।'

আমি সেদিন তাকে বিশ্বাস করেছি। আজও করি।

খুশী হয়ে বললে, 'এই তো চাই। আমি তোপল্‌খানকে ডাকি। তুমি যাও, শুয়ে পড়। কতক্ষণ ধরে স্যুট পরে আছ।'

শীতের দেশ বলে আমি শিলওয়ার, চুড়িদার পাঞ্জাবি পরে শুই।

শোবার ঘরে ঢুকেই বলে, 'বাঃ! কী চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে! কিন্তু এ আবার কী রকমের কুর্তা? দু দিকে চেরা কেন? দেখি?' হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, 'ও! পকেট! ভারী অরিজিনাল্ আইডিয়া তো! হাতে আবার পট্টি মেরে বোতাম! ও, বুঝেছি, খাবার সময় আস্তিন যাতে ঝোলে ডুবে না যায়। আমিও এরকম একটা করাব। সবাই বলবে, 'আমি কী অরিজিনাল্! এবারে তুমি শোও দিকি নি।'

তিন দিকে লেপ গুঁজতে গুঁজতে বললে, 'তুমি কণামাত্র দুশ্চিন্তা করো না: তোপল্‌খান একটা সার্ভে করে এসেছে। আমার কথাই ঠিক। রাস্তায় কাক-কোকিল নেই। আচ্ছা, তুমি আমাকে স্বপ্নে দেখবে তো?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই।'

মাথা, জুল্‌ফ্, কানের দুল দোলাতে দোলাতে বললে, 'না, তা করতে পারবে না। আমার কড়া মানা। আমি খাটে শুয়ে ড্যাব ড্যাব করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকব আর তুমি প্রেমসে তোমার স্বপন-চারিণীর সঙ্গে লীলা-খেলা করবে—সেটি হচ্ছে না। ও আমার সতীন—দজ্জাল বেটী ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।'

আমি বললুম, 'তুমিও আমাকে স্বপ্নে দেখলে পার।'

আশ্চর্য হয়ে বললে, 'বল কী তুমি? তুমি পুরুষমানুষ। চারটে প্রিয়েকে বিয়ে করতে পার, স্বপ্নে জাগরণে যে রকম খুশি ভাগাভাগি করতে পার। কিন্তু আমি মেয়েছেলে। আমার কেবল তুমি।'

আমি বললুম :

'স্বপন হইতে শতশত গুণে
প্রিয়তর বলে গুণি!'

অর্থ আর সুর দুইই তার মন পেল।

বললে, 'কান্দাহারে তোমাকে প্রতি রাত্রে স্বপ্নে আহ্বান জানাতুম। তখন তোমাকে বিয়ে করি নি, তাই। আচ্ছা, এবারে তুমি চুপ কর, আর চোখ বন্ধ কর।'

উঠে গিয়ে আলো নেবাল। ড্রইংরুম থেকে এ ঘরে সামান্য আলো আসে।

আমার ছোট্ট চারপাঈটির কাঠের বাজুতে হাল্কাভাবে বসে সেই আধো-আলো-অন্ধকারে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল—আমি বন্ধ চোখে সেটা চোখের তারাতে দেখতে পেলুম।

এবারে তার নিশ্বাস আমার ঠোঁটে এসে লাগছে।

ভীরু পাখির মত একবার তার ঠোঁট আমার ঠোঁট স্পর্শ করল—দুবার—শেষবারে একটু অতি ক্ষীণ চাপ।

এ অভিজ্ঞতা আমার জীবনে প্রথম নয়।

কৈশোরে যখন ওষ্ঠাধরের গোপন রহস্য আধা আধা কল্পনায় বুঝতে শিখছি তখন আমি আকাশের তারার সঙ্গে মিতালী পাতাবার জন্য রাত্রিযাপন করতুম খোলা বারান্দায়। শরতের ভোরবেলা দেখতুম পাশের শিউলি গাছের বিরহবেদনা—ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলের শিউলি আমার চতুর্দিকে ছড়ানো।

এক ভোরে অনুভব করলুম ঠোঁটের উপর তারই একটি।

এ সেই হিমিকা-মাখা, শব্‌নম-ভেজা শিউলি!

॥ ৫ ॥

শব্‌নমের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফললো। পরদিন সকাল থেকেই কাবুল শহরের আশপাশের চোর ডাকু এসে 'রাজধানী' ভর্তি করে দিলে। দাগী খুনীরাও নাকি

গা-ঢাকা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে ; কারণ পুলিস হাওয়া, সান্ত্রী গায়েব।

এতে করে আর পাঁচজন কাবুলী যতখানি ভয় পেয়েছে, আমিও পেয়েছি ততটুকু। আসলে আমার বেদনা অন্যখানে। দেউড়িতে দাঁড়িয়ে দেখি, রাস্তা থেকে মেয়েরা সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গিয়েছে। বে-বোরকার তো কথাই হচ্ছে না, ফ্যাশনেব্‌ল্‌ বোরকাও দূরে থাক, দাদী-মা নানী-মার তাম্বুপানা বেঢপ বোরকার ছায়া পর্যন্ত রাস্তায় নেই।

শব্‌নম আসবে কি করে ?

দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই মারাত্মক শীতে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ ফাটিয়ে ফেলেছি—কখন প্রথম বোরকা বেরুবে, কখন প্রথম বোরকা দেখতে পাব ? ব্যর্থ, ব্যর্থ, আর একটা দিন ব্যর্থ !

'জাগিনু যখন ঊষা হাসে নাই,
শুধানু "সে আসিবে কি ?"
চলে যায় সাঁঝ, আর আশা নাই,
সে ত' আসিল না, হায়, সখি !
নিশীথ রাতে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে,
জাগিয়া লুটাই বিছানায় ;
আপন রচন ব্যর্থ স্বপন
দুখ ভারে নুয়ে ডুবে যায়।'

—(সত্যেন দত্তের অনুবাদ)

জর্মন কবি হাইনে আসলে ইহুদী—অর্থাৎ প্রাচ্য দেশীয়। অসহায় বিরহ বেদনার কাতরতা ইয়োরোপীয়রা বোঝে না। তাদের কাব্য সঞ্চয়নে এ-কবিতা ঠাঁই পায় না। অথচ এই কবিতাটিই ত্রিপদীতে গেঁথে দিলে কোন্ গোঁসাই বলতে পারবেন, এটি পদাবলী কীর্তন নয় ? এ তো সেই কথাই বলেছে—'মরমে ঝুরিয়া মরি।'

এক মাস হতে চলল। তোপল্‌ খানই বা কোথায় ?

আবার দাঁড়িয়েছি দেউড়িতে দুপুরবেলা।

ওই দূরের দক্ষিণ মহল্লার সদর দেউড়ি থেকে বেরল এই প্রথম বোরকা ! ধোপানীর কালো-বোরকা-সাদা-হয়ে-যাওয়া পুরনো ছাতা রঙের। আমার ধোপানীও এই রকম বোরকা পরে আসে। দুঃখিনী বেরিয়েছে পেটের ধান্দায়। কতদিন আর বাড়ি বসে বসে কাটাবে ? বেচারী আবার অল্প অল্প খুঁড়িয়ে

খুঁড়িয়ে হাঁটছে। আমার দেউড়ি পেরিয়ে উত্তর দিকে কাবুল নদীর পানে চলে গেল। শব্‌নমদের বাড়ি দক্ষিণ মহল্লারও দক্ষিণে। আমি আবার সেদিকে মুখ ফেরালুম। এবারে মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়েছে। প্রথম বোরকা তো বেরিয়েছে।

দু মিনিট হয় কি না হয়, এমন সময় কানের কাছে গলা শুনতে পেলুম, 'মিনিট দশেক এখানে দাঁড়িয়ে থেকে উপরে এস।'

আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ। আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে। আমার দাঁড়ানো যে শেষ হয়ে গিয়েছে।

ঘরে ঢুকে দেখি শব্‌নম কোথাও নেই। কম্পিত কণ্ঠে ডাকলুম, 'শব্‌নম! হিমিকা!' উত্তর নেই। আবার ডাকলুম, 'হিমি!'

চারপাঈর তলা থেকে উত্তর এল, 'কু।'

আমি এক লম্ফে কাছে গিয়ে লেপ বালিশসুদ্ধ খাট কাত করে দিয়ে দেখি, শব্‌নম খাটের তলায় কার্পেটের উপর দিব্য শুয়ে আছে। আমার চুড়িদার পাঞ্জাবিটি পরে। একটু ঢিলে-ঢালা হয়েছে বটে কিন্তু একটা জায়গায় ফিট হয়েছে চমৎকার—যেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা কারিগর বিশ্বকর্মাকে দিয়ে সৃষ্টির সময়ই ফিট করিয়ে দিয়েছিলেন।

আশ্চর্য এই বিরহ বেদনার অন্ধকার। মিলনের প্রথম মুহূর্তেই সর্ব দুঃখ দূর হয়ে যায়—সে বিরহ এক দিনের হোক্ আর এক মাসেরই হোক্। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বাললে যে রকম সে আলো তন্মুহূর্তেই অন্ধকারকে তাড়িয়ে দেয়—সে অন্ধকার এক মুহূর্তেরই হোক্ আর ফারাওয়ের কবরের পাঁচ হাজার বছরের পুরনো জমানো অন্ধকারই হোক্।

অভিমানের সুরে বললে, 'দশ মিনিট, আর এলে দশ ঘণ্টা পরে।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি? আমি তো ঘড়ি ধরে আট মিনিট পরে এসেছি।'

বললে, 'তোমার ঘড়ি পুরনো। কাবুল মিউজিয়ামের গান্ধার সেক্‌শন থেকে কিনেছ বুঝি?'

'আমি বললুম, 'পুরনো ঘড়ি হলেই বুঝি খারাপ টাইম দেয়?'

আশ্চর্য হয়ে বললে, 'দেবে না? পুরনো খবরের কাগজ আজকের খবর দেয় নাকি?' খবরের কাগজের আসল নাম ক্রনিক্‌ল্, আর ঘড়ির আসল নাম ক্রনোমিটার। দুটোই ক্রনস্, সময়ের খবর দেয়। এতটুকু শব্দতত্ত্ব জানো না— প্যারিসের ক্লাস লিক্‌সে যা শেখানো হয়?'

আমি বললুম, 'তুমি বুঝি রোজ সকালে খবরের কাগজের সঙ্গে একটা নূতন ঘড়িও কেনো ?'

'তা কেন ? আমার ঘড়ি তো এইখানে।' বলে নিজের বুকে হাত দিলে। 'প্রথম দিনের ঘড়ি, নিত্য নবীন হয়ে চলেছে। দেখি, তোমার ঘড়িটা কি রকমের।' আমার বুকে কান পেতে বললে, 'জান, কি বলছে ?'

আমি বললুম, 'এক জাপানী শ্রমণ জীবনের দ্বন্দ্ব-ধ্বনি শুনতে পেয়ে বলেছেন, 'ভুল্'-'ঠিক', 'ভুল্'-'ঠিক্', 'ভুল্'-'ঠিক' ?'

'বাজে। বলছে, 'শব্'-'নম্', 'শব্'-'নম্', 'শব্'-'নম্' ! এইবারে আমারটা শোন।'

আমি তার এত কাছে আর কখনও আসি নি। আমার বুক তখন ধপধপ করছে।

'বুঝতে পেরেছ নাকি ?' নিজেই কথা যুগিয়ে দিচ্ছে। 'বুল্'-'বুল্', 'বুল্',-'বুল্', 'বুল্'-'বুল্' বলছে—না ?'

আমি অতি কষ্টে বললুম, 'হ্যাঁ।'

বললে, 'কলটা কিন্তু খুব ভাল না। মা মরেছে ওতে, নানী-মাও। কিন্তু ওকথা কক্ষনো তুলো না।'

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালে।

ডান পা একটু এগিয়ে দিয়ে, বাঁ হাতের মণিবন্ধ কোমরের উপর রেখে, ডান হাত আকাশের দিকে তুলে, অপেরার 'প্রিমা দন্না' ভঙ্গীতে মুচকি হেসে বললে, 'মেদাম্ এ মেসিয়ো! এই মুহূর্তে কাবুলের রাজা হতে চায় দুজন লোক। আমানুল্লা খান আর বাচ্চা-ই-সকাও। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি দুজনাতে মিলে আপোসে মিটমাট করে আমাকে বলে, "কাবুল শহর তোমাকে দিলুম"—তা হলে আমি কি করি ?' নাটকীয় ভঙ্গীতে আবার মৃদু হাস্য করলে। কী সুন্দর সে হাসি। গালের টোল দুটি আমার গাঁয়ের ছোট্ট মহু-গাঙের ক্ষুদে ক্ষুদে দ'য়ের মত পাক খেতে লাগল, অথবা কি বলব, নজ্‌দের মরুভূমিতে মজনূঁর দীর্ঘনিশ্বাস-ঘূর্ণিচক্রের ছোট ছোট 'বগোলে' ?

আমি চারআনী টিকিট-দারের মত চেঁচিয়ে বললুম, 'সি'ল্ ভু প্লে, সি'ল্ ভু প্লে—মেহেরবানী করুন, মেহেরবানী করুন, বলুন, কি করবেন।'

একেবারে হুবহু 'প্রিমা দন্নার' ভঙ্গীতে গান গেয়ে উঠল,

Si le roi m'avait donne

Paris, sa grand 'ville,

Et qu'il me fallut quitter
L'amour de ma mie,
Je dirais au roi Henri
'Reprenez votre Paris.
J'aime mieux ma mie, o gai!
J'aime mieux ma mie!'

'এবারে তার ফার্সীটা শুনুন, মেদাম্ এ মেসিয়ো!

'গর ব্-এক্ মোই, তুর্ক-ই-শীরাজী,
ব্দহদ্ পাদ্শাহ্ ব্-মন্ শীরাজ্,
গোইম্ 'আয় পাদ্শাহ্ গরচি বোওাদ্
শহ্র্-ই-শীরাজ শহ্র্-ই-বিআনবার,
তুর্ক্-ই-শীরাজী কাফী অস্ত্ মরা—
শহ্র্ ই-শীরাজ খইশ বসতান বাজ্।'

'রাজা যদি, দেয় মোরে ওই, আজব শহর পারি (Paris)
কিন্তু যদি, শর্ত করে, ছাড়তে তোমায়, প্যারী,
বলবো, 'ওগো, রাজা আঁরি (Henri),
এই ফিরে নাও তোমার পারি (Paris)
প্যারীর প্রেম যে অনেক ভারি,
তারে আমি ছাড়তে নারি!
ওগো, আমার প্যারী।'

ফার্সী অনুবাদটা গাইলে একদম 'ফতুজান' স্টাইলের কাবুলী লোকসঙ্গীতে।

প্যারিসে চারআনী টিকিটের জায়গা হলের সক্কলের পিছনে, উপরে, প্রায় ছাত ছুঁয়ে। তাই সেটাকে বলা হয় 'পারাদি'—প্যারাডাইস্—স্বর্গপুরী। খাঁটি জউরী, আসল সমাজদার, খানদানী কদরদানরা বসেন সেখানে। ঘন ঘন সাধুরব, বিকল্পে পচা ডিম হাজা টমাটো, শিটিফিটির খয়রাতি হাসপাতাল ওই স্বর্গপুরীতেই। স্টেজের ফাড়া-গর্দিশে বুদ্ধি বাতলে দেন ওনারাই। ভিরমি-খাওয়া ধুম্সী নায়িকাকে কাঁধে করে বয়ে নিতে গিয়ে যদি টিঙটিঙে নায়ক হিমশিম খায় তবে এই সব দরদী জউরীরাই চিৎকার করে দাওয়াই বাতলান—'তুই কিস্তিতে নিয়ে যা—ফ্যাৎ ত্য ভাইয়াজ—মেক্ টু ট্রিপ্স্!'

আমি এদের অনুকরণে একাই এক শ হয়ে বিস্তর 'সাধু! সাধু, ব্রাভো,

ব্রাভো' বললুম।

সদয় হাসি হেসে থাজেস্তেবান্থ শব্‌নম বীবী ডাইনে বাঁয়ে সামনের দিকে বাও করে শোকরিয়া জানালেন, চম্পক করাঙ্গুলির প্রান্তদেশে মৃদুচুম্বন খেয়ে আঙুলটি উপরের দিকে তুলে ফুঁ দিয়ে চুম্বনটি 'পায়াদি'—স্বর্গপুরীর—দিকে উড্ডীয়মান করে দিলেন।

আমি স্টেজের দিকে ডাঁই ডাঁই রজনীগন্ধার গুচ্ছ ছুঁড়ে পেলা দেবার মুদ্রা মারলুম।

দেবী প্রসন্নবয়ানে 'স্টেজ' থেকে অবতীর্ণা হয়ে সর্বজন সমক্ষে আমার বিরহ-তপ্ত আপাণ্ডুর ক্লান্ত ভালে তাঁর ঈষতার্দ্র মল্লিকাধর স্পর্শ করে নিশ্বাসসৌরভঘন অগুরু-কস্তুরী-চন্দন-মিশ্রিত ভ্রমর-গুঞ্জরিত প্রজাপতি-প্রকম্পিত চুম্বন প্রসাদ সিঞ্চন করলেন।

প্রসন্নোদয়, প্রসন্নোদয় আমার অদ্য উষার সবিতৃ উদয় প্রসন্নোদয়!

আমার জন্মজন্ম সঞ্চিত পুণ্য কর্মফল আজ উপারূঢ়!

আমি তার পদচুম্বন করতে যাচ্ছিলুম। 'কর কি?' 'কর কি?' বলে ব্যাকুল হয়ে সে আমায় ঠেকিয়ে দিয়ে দুখানি আপন গোলাপ-পাপড়ি এগিয়ে দিলে!

•

আশ্চর্য এ মেয়ে! দেখি, আর বিস্ময় মানি। ভয়ে আতঙ্কে তামাম কাবুল শহরের গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে—এই পাথর-ফাটা শীতে শহরের রাস্তার মুখ পর্যন্ত পরিশুষ্ক হয়ে গিয়েছে, আর এ মেয়ে তারই মাঝখানে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে কলকল খলখল করে হাসছে। প্রেমসাগরের কতখানি অতলে ডুব দিলে উপরের ঝড়ঝঞ্ঝা সম্বন্ধে এ রকম সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত উদাসীন হওয়া যায়?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার সব-কিছুর খবর রাখে।

বললে, 'এই যে ফ্রান্সের গাঁইয়া গান, এটার মর্মও আমান্থল্লা বুঝলেন না।

'বিদ্রোহীরা বলছে, তোমার বউ সুরাইয়া বিদেশে গিয়ে স্বৈরিণী হয়ে গিয়েছে—দ্বিচারিণী নয়, স্বৈরিণী। একে তুমি তালাক দাও, আমরা বিদ্রোহ বন্ধ করে দেব।

আমান্থল্লা নারাজ।'

আমি বললুম, 'তোমাদের কবিই তো বলেছেন,

কি বলিব, ভাই মূর্খের কিছু অভাব কি দুনিয়ায়,
পাগড়ি বাঁচাতে হরবকতই মাথাটারে বলি দ্যায়।'

মাথা নেড়ে বললে, 'না। এখানে পাগড়ি অর্থ প্রিয়া, মাথাটা কাবুল শহর।

'আমি বলি, "দিয়ে দে না, বাপু, কাবুল শহর, চলে যা না, বাপু, প্রিয়াকে নিয়ে প্যারিস্—যে প্যারিসের ঢঙে কাবুলের চেহারা বদলাতে গিয়ে আজ তুই এ-বিপদে পড়েছিস। নকল প্যারিস নিয়ে তোর কি হবে, আসল যখন হাতের কাছে? একটা কপিরই যখন দরকার তখন আসলটা নিয়ে কার্বন্-কপিটা ফেলে দে না। কাশ্মীরী-শালের উপরের দিকটাই গায়ে জড়িয়ে নে, উল্টো দিকটা দেখিয়ে তোর কি লাভ?" আশ্চর্য! তাঁর এখন ডান হাতে তলোয়ার, বাঁয়া বগলমে প্রিয়া—ডাকু পাকড়াবেন কৈসে?'

মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'আমার বয়ে গেছে।

কাজী নই আমি, মোল্লাও নই, আমার কি দায় বল।
শীরাজী খাইব, প্রিয়ার চুমিব ওই মুখ ঢলঢল।'

এর প্রথম ছত্র হাফিজের, দ্বিতীয়টি আমার।

আমি বললুম, 'শাবাশ! লাল শীরাজী খেতে হলে তোমার ওই গোলাপী ঠোঁটেই মানাবে ভালো। আমার কিন্তু দুটো মিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।'

'কি রকম?'

'তুমি পাশ ফিরে শুয়ে মৃদু হাস্য করবে। তখন তোমার গালের টোল হবে গভীরতম—আমি সেটিকে ভর্তি করব শীরাজী দিয়ে। তারপর আস্তে আস্তে—অতি ধীরে ধীরে সেই শীরাজী চুমোয় চুমোয় তুলে নেব।'

বললে, 'বাপ্‌স্! কী লয়ে কল্পনা, লম্বা রসনা, করিছে দৌড়াদৌড়ি। তা কল্পনা কর, কিন্তু ব্যস্ত হয়ো না। খৃষ্টানদের বঁ দিয়ো—ভগবান—তো এক মুহূর্তেই সৃষ্টি সম্পূর্ণ করে দিতে পারতেন; তবে তিনি ছ-দিন লাগালেন কেন?'

আমি বললুম, 'এবারে তুমি আমার কথার উত্তর দাও!'

সুশীলা বালিকার মত মাথা নীচু করে বললে, 'বল।'

'আব্বাজান কোথায়?'

'দুর্গে। আমানুল্লাকে মন্ত্রণা দিচ্ছেন। ট্যুব থেকে বেরিয়ে আসা ফালতো টুথপেস্ট ফের ভিতরে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন।'

'তোপল্ খান?'

'লড়াইয়ে।'

'তুমি কি করে এলে?'

'রেওয়াজ করে করে। ধোপানীর তাম্বুটা যোগাড় করে প্রথম প্রথম কাছে-পিঠে বান্ধবীদের বাড়িতে ওদের তত্ত্ব-তাবাশ করতে গেলুম।'

একটু থেমে বললে, 'আচ্ছা বল তো, তোমাকে ভালোবাসার পর থেকে আমি ওদের কথা একদম ভুলে গিয়েছি। আমার যে সব সখীদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে তারাও আমাকে স্মরণ করে না। অথচ শুনেছি, পুরুষ-মানুষরা নাকি বিয়ের পর সখাদের অত সহজে ভোলে না? মেয়েরা তা হলে বেইমান নেমকহারাম?'

আমি বললুম, 'গুণীরা বলেন, প্রেম মেয়েদের সর্বস্ব, পুরুষের জীবনের মাত্র একটি অংশ। তাই বোধ হয় মেয়েরা ওই রকম করে। কিন্তু আমার মনে হয়, তা নয়। আমি বিদেশী, আমি অসহায়, আমি নিজের থেকে কোন কিছু করতে গেলেই হয়তো তোমাকে বিপদে ফেলা হবে মাত্র, এই ভেবে আমি হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় কিস্মতের কিল খাচ্ছি। তুমি সেটা জান বলে, সর্বক্ষণ তোমার চিন্তা, কি করে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা, আমার বিরহ-বেদনা তোমাকে কাছে পাওয়ার কামনা আপন কাঁধে নিয়ে আমাকে আর্ত শিশুর মত আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পার। তোমার সখীরা, আব্বা, জানেমন কেউই তো তোমার উপর কোন কিছুর জন্য এতটুকু নির্ভর করছেন না। আর আমি করছি সম্পূর্ণ নির্ভর তোমার উপর। তোমার জিম্মাদারী এখন বেড়ে গিয়েছে। জিম্মাদারী-বোধ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একাগ্রতা-বোধও বেড়ে যায়।'

বললে, 'সে না হয় তোমার আমার বেলা হয়—তুমি বিদেশী বলে।'

'অন্যদের বেলাও তাই। অধিকাংশ দেশেই মেয়ের জন্ম তো পরিবারের আপদ। সেই 'আপদ' যেদিন একটি লোককে পায়, যাকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বাকী জীবন তার উপর নির্ভর করতে হবে, তখন তার অবস্থা তোমারই মত হয়। কিন্তু আরেকটা কথা। এই একাগ্রতাটা মেয়েদের কিছু একচেটে নয়। লায়লীর জন্য মজনূঁর একাগ্রতাই তো তাকে পাগল বানিয়ে দিলে?'

শুধালে, 'কোন্ মজনূঁ?'

আমি বললুম, 'তার পর তুমি কি করলে বলছিলে?'

'ওঃ! পাড়ার সখীদের বাড়ি গিয়ে প্র্যাকটিস্ করলুম।'

আমি বললুম, 'শ্রীরাধা যে রকম আঙিনায় কলসী কলসী জল ঢেলে সেটাকে পিছল করে তুলে, বর্ষার রাতে পিছল অভিসার যাওয়ার প্র্যাকটিস করে নিতেন?'

ইরান তুরান আরবভূমির তাবৎ প্রেমের কাহিনী শব্‌নমের হৃদয়স্থ। তাই আমি তাকে শোনাতুম হিন্দুস্থানী রমণীর বেদনাবাণী। সে সব কাহিনীর রাজ-মুকুট সুচির অভাগিনী অভিমানিনী শ্রীরাধার চোখের জলের মুক্তো দিয়ে সাজাতে আমার বড় ভালো লাগে। কিন্তু একাধিকবার লক্ষ করেছি শব্‌নম যেন

শ্রীরাধাকে ঈষৎ ঈর্ষা করে।

বললে, 'হুঁ! তোমার শুধু শ্রীরাধা শ্রীরাধা! তা সে যাকগে। তার পর ধোপানীর তাম্বু পরে বেরিয়ে পড়লুম তোমার উদ্দেশে। আমার ভাবনা ছিল শুধু আমার পা দুখানা নিয়ে। ও দুটো বোরকা দিয়ে সব সময় ভালো করে ঢাকা যায় না।'

আমি বললুম, 'রজকিনী চরণ বাংলা সাহিত্যের বুকের উপর।'

'মানে?'

আমি চোখ বন্ধ করে হিমির পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে মুদ্রিত নয়নে গান ধরলুম,

'শুন রজকিনী রামী
শীতল জানিয়া ও-দুটি চরণ
শরণ লইনু আমি!'

বললে, 'এ সুরটা সত্যি আমার প্রিয়। এর ভিতর কত মধুর আকূতি আর করুণ আত্মনিবেদন আছে।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা, "শীতল চরণ" কেন বললে, বল তো?'

নাক তুলে বললে, 'বাঃ! সে তো সোজা। ধোপানী জলে দাঁড়িয়ে কাপড় আছড়ায় তাই।'

জাহাঁবাজ মেয়ে!

বললে, 'জান বঁধু, আজ ভোরবেলার আজান শুনে যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন বুকের ভিতরটা যেন একেবারে ঝাঁঝরা ফাঁকা বলে মনে হল। কিছু নেই, কিছু নেই, যেন কিছু নেই। পেটটাও যেন একেবারে ফাঁপা, যেন দাঁড়াতে পারব না। বুকের ভিতর কি যেন একটা শূন্যতা শুধু ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে। সব যেন নিঙড়ে নিঙড়ে নিচ্ছে। ওঠবার চেষ্টা করলুম, উঠতে পারলুম না। কোমরের সঙ্গে আমার বাকি শরীরের যেন কোন যোগ নেই।

'মোয়াজ্জিন তখন বলছে, "অস্-সালাতু খৈরুন্ মিন্ অন্-নওম্—" নিদ্রার চেয়ে উপাসনা ভালো।

'আমি কাতর নিবেদনে আল্লাকে বললুম, হে খুদাতালা, তোমার দুনিয়ায় তো কোনও কিছুরই অভাব নেই। আমাকে একটুখানি শক্তি দাও।'

আমি অনুনয় করে বললুম, 'থাক্ না।'

বললে, 'কাকে তা হলে বলি, বল। জানি, তুমি এ-সব শুনে কষ্ট পাও। কিন্তু তোমাকে কষ্ট দেবার জন্য তো আমি আমার দুঃখের কথা বলছি নে।

আবার না বলেও থাকতে পারছি নে। এ কী দ্বন্দ্ব, বল তো?'

আমি বললুম, 'তুমি বলে যাও। আমার শুনতেও ভাল লাগে যে সর্বক্ষণ আমি তোমার মনের ভিতর আছি। এও তো দ্বন্দ্ব।'

'তবে শোন, আর শুনেই ভুলে যেয়ো। না হলে আমার বিরহে তোমার বেদনার ভার সেই স্মৃতি আরও ভারী করে তুলবে। নিজে কষ্ট তো পাবেই, তার উপর আমার কষ্টের স্মরণে বেদনা পাবে বেশী।'

'এই যে ফাঁকা ভাব ভোরবেলাকার, এইটে বওয়াই সব চেয়ে বেশী শক্ত।'

'কে বল সহজ, ফাঁকা যাহা তারে, কাঁধেতে বহিতে সওয়া?
জীবন যতই ফাঁকা হয়ে যায় ততই কঠিন বওয়া।'

'ফাঁকা জিনিস ভারি হয়ে যায়, এর কল্পনা কি আমি কখনও করতে পেরেছি?

'কোন গতিকে এই দেহটাকে টেনে টেনে বাইরে এনে নমাজ পড়লুম। হায় রে নমাজ! চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেওয়াকে যদি নমাজ বলে তবে আমার মত নমাজ কেউ কখনও পড়ে নি।'

আমি অতি কষ্টে চোখের জল থামিয়ে বলেছিলুম, 'সেই তো সব চেয়ে পাক্ নমাজ।'

যেন শুনতে পায় নি। বললে, 'ইহ্‌দিনাস্ সীরাতা-ল্ মুস্তকীমে' এলুম—"আমাকে সরল পথে চালাও"—তখন মন সেই সোজা পথ ছেড়ে চলে গেল নূতন অজানা দুর্ভাবনায়। তবে কি আমি ভুল পথে চলেছি বলে তাতে এত কাঁটা, বিভীষিকার বিকৃত ভান?'

আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'বল তো গো তুমি, তোমাকে বিয়ে করার আগে যে আমি তোমার গা দু'তিনবার ছুঁয়েছি, তোমাকে হৃদয়-বেদনা বলেছি, তোমাকে স্বপ্নে কল্পনায় জড়িয়ে হৃদয়ে টেনে নিয়েছি, সেই কি আমার পাপ? আমি তো অন্য কোন পাপ করি নি।' এবারে উত্তরের জন্য চুপ করে গেল।

আমি বললুম, 'হিম্মি—'

'আঃ'! বলে গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমার কোলে মাথা গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর বাঁ হাত দিয়ে তার মাথার চেয়ে বড় খোঁপাটা আস্তে আস্তে আলগা করে দিল। সমস্ত পিঠ ছেয়ে ফেলে তার চুল লম্বা কুর্তার অঞ্চল-প্রান্ত অবধি পৌঁছল। আমি আঙুল দিয়ে তার গ্রীবা ছুঁয়ে ছুঁয়ে উপরের দিকে তুলে বিলি দিতে দিতে অলকস্তবক অতৃপ্ত নিশ্বাসে শুষে বললুম, 'হিম্মিকা, আমি তো বেশী ধর্মগ্রন্থ পড়ি নি, আমি কি বলব?'

বললে, 'না, গো, না। আমি মোল্লার ফৎওয়া চাইছি নে। তোমার কথা বল।'

'আমিও শুধাই, সবই শাস্ত্র, হৃদয় বলে কিছু নেই?'

স্পষ্ট অনুভব করলুম, তার চোখের জলে আমার কোল ভিজে গেছে।

বললুম, 'কেঁদো না, লক্ষ্মীটি।'

বললে, 'তুমি মেহেরবানী করে আজকের মত শুধু আমাকে কাঁদতে দাও। আজ আমার শেষ সম্বল উজাড় করে দিয়ে আর কখনও কাঁদবো না।'

উঠে বসল। চোখ তখন ভেজা। শব্‌নমের আঁখিপল্লব বড় বেশী লম্বা। জোড়া লাগার পর উপরের সারি উপরের দিকে আর নিচের সারি নিচের দিকে অনেকখানি চলে গিয়েছে।

'জান তুমি, যখন সব সান্ত্বনার পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন হৃদয় হঠাৎ এক আনন্দলোকের সন্ধান পায়? আছে তোমার অভিজ্ঞতা? আমার আজ ভোরে হল?

'আমি নিজেকে বললুম, আমি যাচ্ছি আমার দয়িতের মিলনে, আমার স্বামী সঙ্গমে। আল্লা আমাকে এ হক্ক দিয়েছেন। আমাদের মাঝখানে কেউ যদি এসে দাঁড়ায় তবে সে শয়তান। আমি তাকে গুলি করে মারবো—পাগলা কুকুরকে মানুষ যে রকম মারে, সাপের ফণা যে রকম রাইডিং বুট দিয়ে থেঁতলে দেয়।

'এই দেখ।'

পাশের স্তূপীকৃত বোরকার ভিতর থেকে বের করল এক বিরাট রিভলবার। তার হ্যাণ্ড-ব্যাগের সেই ছোট্ট পিস্তলের তুলনায় এটা ভয়াবহ দানব।

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরালুম। চোখ দুটো দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। কাঠের মত শুকনো প্রত্যেক চোখের প্রত্যেক পল্লব—আলগা আলগা হয়ে দাঁড়িয়ে।

'প্রত্যেক শয়তানকে মারবো গুলি করে। অগুণতি, বেহিসাব—দরকার হলে। বোরকার ভিতরে রিভলবার উঁচু করে তাদের জন্য তৈরী ছিলুম সমস্ত সময়। কেউ সামনে দাঁড়ালেই গুলি। প্রশ্নটি শুধাবো না। বোরকার ভিতর থেকেই।

'তাদের মরা লাশের উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে আসতুম, তোমার কাছে।

'কী? আমার ছেলে হবে শুধু শান্তির সুখময় নীড়ে? বক্‌রীর কলিজা নিয়ে জন্ম নেবে তারা তা হলে। আমার নাতি কিংবা তার ছেলে হয়তো কোন কলিজা নিয়েই জন্মাবে না। শুধু রক্ত পাম্প করার জন্য এতখানি জায়গা জুড়ে

এই বিরাট হৃদয়। আর আজ যদি আমি বিঘ্ন-বিপদ তুচ্ছ করে শয়তানকে জাহান্নমে পাঠিয়ে তোমার কাছে পৌঁছই তবে আমার ছেলে হবে বাঘের গুর্দা, সীনা, কলিজা নিয়ে।'

আমি শব্‌নমকে কখনও এরকম উত্তেজিত হতে দেখি নি। কি করে হল? এ তো মাত্র এক মাস। কান্দাহারে এক বছর কাটিয়ে আসার পরও তো এরকম ধারা দেখি নি। তবে কি সে কোনও দুর্ঘটনার আশঙ্কা করে বনদেবতার শান্তিকামী অগ্রদূত বিহঙ্গের মত কলরবস্বরে সবাইকে সাবধান করে দিতে চায়? না, কোনও কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করেছে, এই এক মাস ধরে?

বললুম, 'তোমার রুদ্ররূপকে আমি ভয় করি, শব্‌নম। তুমি তোমার প্রসন্ন কল্যাণ মুখ আমাকে দেখাও।'

'আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বজনের শুভ আশীর্বাদ আমাদের মিলনের উপর আছে।'

কবিতা শুনতে পেলে সে ভারী খুশী হয় বলে আমি বললুম,

'দাবানল যবে বনস্পতিরে দগ্ধ দাহনে দহে
শুষ্কপত্র আর্দ্র পত্রে কোন না প্রভেদ সহে।'

শান্ত হয়ে গেল। বললে, 'কিস্মৎ!'

আমি তাকে আরও শান্ত হবার জন্যে চুপ করে রইলুম।

বললে, 'তুমি কিছু মনে করো না। ভেবেছিলুম বলব না, কিন্তু আমি পর পর তিনদিন উপোস করে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলুম, তাই এ-উত্তেজনা। উপোসের পরে মনে হল, তুমি যে সেই পাতিনেবুটি দিয়েছিলে সেইটে যদি তাজা থাকতো তবে শরবত বানিয়ে খেতুম।'

আমি বললুম, 'হা অদৃষ্ট! আমার গাল টোল খায় না। তুমি কিসে ঢেলে খাবে? তা তুমি যত খুশী নেবু পাবে, আমাদের বাড়ির গাছে। আমরা যখন একসঙ্গে হিন্দুস্থান যাব—'

দেখি সে তার বড় বড় চোখ আরও বড় করে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

আমি ভয় পেয়ে বললুম, 'কি হল?'

বললে, 'তাজ্জব! তাজ্জব! আমার দিবাস্বপ্নে তো এ-আইটেমটা বিলকুল স্থান পায় নি। দাঁড়াও, আমাকে বলতে দাও। ট্রেনে একটা কুপেতে শুধু তুমি আর আমি। না। তারই বা কি দরকার? তোমাকে তো কখনও ভিড়ের মাঝখানে আমি পাই নি। সে আনন্দ আমি পুরোপুরি রসিয়ে রসিয়ে চাখবো।

ভিড়ের ধাক্কায় তুমি ছিটকে পড়েছ এক কোণে, দরজার কাছে, আর আমি আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তোমার পানে পিছন ফিরে। আয়নাতে দেখছি তোমার মুখের কাতর ভাব, আমার জন্য বার্থ পাও নি বলে। একটুখানি ঘাড় ফিরিয়ে তোমাকে হানবো মধুরতম কটাক্ষ—একগাড়ি লোকের কৌতূহল নয়নে তাকানোকে একদম পরোয়া না করে। আমার তখন কী গর্ব, তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার জন্য কত ভাবছ।'

আমি বললুম, 'শোন শব্‌নম, তোমাকে একটা সত্য কথা আজ বলে রাখি। আমার মত লক্ষ লক্ষ হিন্দুস্থানী আল্লার দুনিয়ায় রয়েছে। এমন কি এখানে যে কজন হিন্দুস্থানী আছে তার ভিতরও আমি অ্যাডোনিস্ বা রুডল্ফ্ ভালেন্টিনো নই। তোমার সৌন্দর্যের খ্যাতি ওদিকে আমু দরিয়া, পুবে পেশোওয়ার, পশ্চিমে কান্দাহার, দক্ষিণে দক্ষিণ-পাহাড় ছাড়িয়ে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে গেছে, কেউ জানে না। আমি শুনেছি ভারতীয় শিক্ষকদের কাছে, তাঁরা শুনেছেন তাঁদের স্ত্রীদের কাছ থেকে। তাঁরা বলেন, বাদশা আমানুল্লা নিতান্ত একদারনিষ্ঠ বলে তুমি অবিবাহিতা—একই দেশে তো দুটো রাজা থাকতে পারে না, যদিও একই গাছ-তলায় একশ'টা দরবেশ্ রাত্রি কাটায়। গর্ব যদি কারও হয় সে হবে আমার। তামাম হিন্দুস্থান তোমার দিকে তাকাবে আর ভাববে কোন্ পুণ্যের ফলে আমি তোমাকে পেয়েছি।'

বললে, 'শুনতে কী যে ভাল লাগে, কি বলব তোমায়। আমি জানি, আমার লজ্জা পাওয়া উচিত, মাথা নিচু করা উচিত কিন্তু আমি এমনি বে-আব্রু বেহায়া যে এসব কথা আমার আরও শুনতে ইচ্ছে করছে। যদি কুপে পেয়ে যাই তবে আমি খোলা জানালার উপর মুখ রেখে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকব, আর তুমি পিছনে বসে আমার পিঠের উপর খোলা চুলে মুখ গুঁজে এই সব কথা বলবে।'

তার পর আমার দিকে স্থির কিন্তু স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'শুনে রাখ, আমি আমার ভালবাসা দিয়ে দেহের সৌন্দর্যকে হার মানাবো। সে হবে পরিপূর্ণ একটি হিমকণিকার মত—যার প্রেমের ডাকে আকাশের শত লক্ষ তারা হবে প্রতিবিম্বিত, আর দিনের বেলা গভীর নীলাম্বুজের মত নীলাকাশ—তার অন্তহীন রহস্য নিয়ে।'

তারপর শব্‌নম পড়লো তার সফর্-ই-হিন্দুস্থান অর্থাৎ ভারত ভ্রমণ নিয়ে।

হিন্দুস্থানের রেল লাইনের দুপাশে অক্লেশে সে গজালে আঙুর বন, দিল্লীর কাছে এসে ব্লিজার্ডের বরফে ট্রেন আটকা পড়লো দুদিন, ডাইনিং কারে অর্ডার

দেওয়া মাত্র পেয়ে গেল কচি তুম্বার শিকুকবাব, ট্রেন পুরো পাক্কা একটা দিন ছুটলো ঘন চিনার বনের মাঝখান দিয়ে, আগ্রা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সে কিনলে নরগিস্‌ ফুল আর হলদে গুল্‌-ই-দায়ুদী, মোমতাজের গোরে দেবার জন্য। আর সর্বক্ষণ পাশের গাড়িতে বসে আছে তোপল্‌ খান, উরুর উপর তুখানি রাইফেল পাতা, পকেটে টোটা ভরা রিভলভার, বেল্টে দমস্কসের তলোয়ার—পাছে চার মুহম্মদী শর্তে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলার কেনা টিকিট স্বামীটিকে কেউ কেড়ে নেয়!

আমার তো ভয় হচ্ছিল, আবার বুঝি শব্‌নম বোরকার ভিতর থেকেই পিস্তল মারতে আরম্ভ করে—মার্কিন গ্যাংস্টাররা যে রকম পকেটের ভিতর থেকেই তাগ করে তুশমন ঘায়েল করতে পারে।

নানাবিধ মুশকিল যাবতীয় ফাঁড়া-গর্দিশ এবং তার চেয়ে প্রচুরতর আনন্দের ভিতর দিয়ে শব্‌নম বীবী তো শেষটায় পৌঁছলেন পূর্ব বাংলায় তাঁর শ্বশুরের ভিটায়।

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, 'বাঁচালে।'

'দাঁড়াও না, তোমার খালি তাড়া। হাফিজ বাঙলাদেশে না আসতে পেরে বাঙলার রাজদূতকে তার বাদশার জন্য কি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন? সেই যেটা তোমাকে হোটেলের বারান্দায় দিয়েছিলুম?'

আমি বললুম,

'হেরো, হেরো, বিস্ময়!
দেশ কাল হয় লয়!
সবে কাল রাতে জনম লইয়া এই শিশু কবিতাটি।
রওয়ানা হইল পাড়ি দেবে বলে এক বছরের ঘাটি।'

'তুমিও এক মাসের বধূ, এক বছরের পথ পাঁচ দিনে পৌঁছলে।'

'চুপ, চুপ, ওই বৈঠকখানায় মুরুব্বীরা বসে আছেন। ওঁদের গিয়ে প্রথমে সালাম করতে হবে, না সোজা অন্দর মহলে যেতে হবে? কী মুশকিল, কিচ্ছু যে জানি নে।'

আমি বললুম, 'এইবারে পথে এস—আমাকে যে কথা কইতে দাও না।'

'তোমার পায়ে পড়ি, বলে দাও না। এই কি দাদ নেবার সময়?'

আমি বললুম, 'প্রথম অন্দরে। মা বরবধূ বরণ করবেন যে।'

'সে আবার কি?'

'মা মোড়ায় বসবেন, আমি তাঁর ডান উরুতে বসব, তুমি বাঁ উরুতে বসবে—'

'সর্বনাশ! আমার ওজন তো কম নয়। তোমার কত?'

'একশ দশ পৌণ্ড।'

'কিলোগ্রামে বল।'

'সে হিসেব জানি নে।'

'দাঁড়াও, কাগজ পেন্সিল নিয়ে আসি।'

ওর আঁক কষার মাঝখানে আমি দরদ ভরা সুরে বললুম, 'হ্যাগা, তোমার হিসেবে তো দেখছি তোমার চারশ পৌণ্ড। আমার চেয়ে চারগুণ ভারি। তা হতেও পারে।'

'ইয়ার্কি ছাড়। ওটা—ওটা—ওটা হল গিয়ে আউন্স।'

'তা হলে তোমার ওজন আমার চার ভাগের এক ভাগ, হবেও বা।'

'সর্বনাশ! তাও তো হয় না। এখন কি করা যায়?'

আমি বললুম, 'আলতো আলতো বসলেই হবে।'

মা বরণ করলেন। কলাপাতা দিয়ে তেকোণা করে বানানো সমোসার মত পত্রপুটের ভিতর ধান—তিন কোণ দিয়ে বেরিয়ে আছে দূর্বা। আমাদের মাথার উপর অনেকগুলো রাখলেন। শব্‌নমের ওড়না তার হাঁটু পর্যন্ত নামানো।

আমার দুই ভাইঝি জাহানারা আর রাণী—'কুটিমুটি'—প্রায় মাটিতে শুয়ে পড়েছে নূতন চাচীর মুখ সক্কলের পয়লা দেখবে বলে।

শব্‌নম স্বপ্ন দেখছে। আমি কথা বলে এক স্বপ্ন উড়িয়ে দিলে সে সঙ্গে সঙ্গে আরেক স্বপ্নে ঢুকে যায়। কিন্তু সব চেয়ে তার ভাল লাগে মায়ের কোলে ওই বসাটা।

একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'আমার রইল এ-জীবনে একটি মাত্র আশঙ্কা। মা যদি আমাকে ভালো না বাসে।'

আমি ব্যাকুল হয়ে বললুম, 'তুমি ওই ভয়টি করো না শব্‌নম—প্লীজ—লক্ষ্মীটি। তোমাকে ভালবাসবেন মা সবচেয়ে বেশী। তুমি কত দূরদেশ থেকে এসেছ, সব আপন জন ছেড়ে, শুধু আমাকে ভালবাস বলে। একথা মা এক মুহূর্তের তরেও ভুলতে পারবেন না। মাকে যদি কেউ ভালবাসে এক তিল, মা তাকে বাসেন একতাল। আমাকে যদি কেউ ভালবাসে এক কণা, মা তাকে বাসবেন দুই দুনিয়া—ইহলোক, পরলোক।'

'বাঁচালে। তুমি তো জান, আমার মা নেই।'

যাবার সময় শব্‌নম বললে, 'বিপদ ঘনিয়ে আসছে। শিগ্‌গিরই তার চরমে পৌঁছবে।'

আমি চিন্তিত হয়ে শুধালুম, 'তুমি কিছু জান ?'

বললে, 'না। আমি শুধু আমার হাড়ের ভিতর অনুভব করছি।'

'আবার কবে দেখা হবে ?'

'এরকম থাকলে রোজই আসতে পারব।'

তারপর দুজনাই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম, মুখোমুখি হয়ে। বলার কথার অভাব আমাদের কারোরই হয় না, কিন্তু বিদায়ের সময় যতই ঘনিয়ে আসে ততই আমরা শুধু একে অন্যের দিকে তাকাই আর আপন মনে অজুহাত খুঁজি কি করে বিচ্ছেদ-মুহূর্ত আরও পিছিয়ে দেওয়া যায়। শব্‌নম আমার মনের কথা আমার বেদনাতুর চোখ দেখেই বুঝতে পারে আর নিজের চোখ দুটি নিচের দিকে নামায়। হয়তো তার চোখে জল এসেছে। কখনও বা জড়িয়ে-যাওয়া গলায় কি একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়।

এবারে বললে, 'তুমি প্রতিবারে আমাকে দাও আগের বারের চেয়েও বেশী। যত বেদনা নিয়েই বিদায়ের সময়টা আসুক না কেন, পথে যেতে যেতে ভাবি তুমি যে আনন্দ দিয়েছ এর বেশী আর আসছে বার কি দেবে ? তবু তুমি দাও, প্রতিবারেই দাও, বেশী করে দাও, উজাড় করে দাও। কি দাও তুমি ? আমি অনেক বার ভেবেছি। উত্তর পাই নি। এই যে তুমি আমার সামনে বসে আছ, আমার রাজার রাজা, গোলামের গোলাম এই তো আমার আনন্দের পরিপূর্ণতার চরম সীমা। এর বেশী আমি কীই বা চাইতে পারি, তুমি কীই বা দিতে পার ? তবু পাই, প্রতি বারেই অদ্ভুত অনির্বচনীয় রসঘন আনন্দ। আর যখন তুমি আমাকে বল, "আমি তোমাকে ভালবাসি" তখন আমার দু'চোখ ফেটে বেরয় অশ্রু। আমার কাণায় কাণায় ভরা হৃদয়-পাত্র তখন যেন আর বেদনার কূল না মেনে উপচে পড়তে চায়। বল, তুমি আমায় কক্‌খনও ত্যাগ করবে না ?'

আমি থতমত খেয়ে গেলুম। এত কথা বলার পর এই অর্থহীন প্রশ্ন ? যেখানে আমরা পৌঁছেছি সেখানে এ-প্রশ্ন যে একেবারে অসম্ভব—পাগলেরও কল্পনার বাইরে।

বললে, 'তুমি আমাকে মার, সাজা দাও, ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দাও, কিন্তু আমাকে ত্যাগ করো না।'

আমি কিছু বলি নি। শুধু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলুম।

বললে, 'বড় দুঃখে আজ সকালে একটি কবিতা লিখেছি। নিজে কখনও এ জিনিস লিখি নি বলে প্রথম দু লাইন এক বিদেশী কবির কাছ থেকে নিয়েছি।

কিন্তু আজ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে কবিতাটা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে। তোমার কলমটা দাও। এটা কিন্তু গদ্যে লিখবো। এখন পড়ো না—আমি চলে যাওয়ার পরে পড়ো।'

দেউড়িতে এসে অবাক হয়ে শুধোলে, 'তুমি আবার চললে কোথায়?'

আমি বললুম, 'তোমাকে পৌঁছে দিতে।'

দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'অসম্ভব।'

আমি তর্ক করি নি।

ওই একটি দিন, একটি বার, আমি আমার জীবনে তার আদেশ লঙ্ঘন করেছি। তর্ক না করে, আপত্তি না তুলে। শেষটায় সে হার মানল। আমি বেশ কিছুটা পিছনে তার উপর নজর রেখে রেখে চললুম। বাড়ির দেউড়িতে পৌঁছে একবার ঘুরে দাঁড়াল।

সে একটি শব্দও উচ্চারণ করে নি, কিন্তু আমি শুনেছি সে বলেছিল, 'তোমাকে খুদার হাতে সমর্পণ করলুম।'

বাড়ি ফিরে এসে কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরলুম।'

'তোমার আমার মাঝখানে বঁধু অশ্রুর পারাবার
কেমনে হইব পার?
দুখ-রজনীর প্রেমের প্রদীপ ভাসায়ে দিলেম আমি
দীরঘ নিশ্বাস পালেতে দিলেম জানে অন্তরযামী।
শেষ দীপ-শিখা দিলেম তোমারে মোর কিছু নাহি আর
ত্বরা এস বঁধু, বেগে এস প্রভু, নামাও বেদনাভার।'

এর পর গদ্যে লেখা: 'এর আর প্রয়োজন নেই
তুমি যে অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়েছ—'

বাকিটা শেষ করে নি।

পুরুষ মানুষ হয়েও সে রাত্রে আমি কেঁদেছিলুম। 'হে পরমেশ্বর',—চোখের জলে বলেছিলুম, 'হে দয়াময়, আমাকে কেন পুরুষ করে জন্ম দিলে? এই বলহীনা সব বিপদ তুলে নেবে আপন মাথায়, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখব? আমি কোনদিন তার কোনও কাজে লাগব না?'

॥ ৬ ॥

পরদিন সকালবেলাই খবর পেলুম, আমানুল্লার সৈন্যদল রাত্রিবেলা হেরে যাওয়াতে তিনি তাঁর বড় ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে কান্দাহার পালিয়ে গিয়েছেন।

রাস্তার অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। বোরকা তো অন্তর্ধান করেছেই, তাগড়া জোয়ানরাও একলা একলি বেরয় না—এক একটা দলে অন্তত পাঁচ-সাতজন না থাকলে মানুষ নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। বাচ্চার ডাকু সৈন্যদল রাস্তা ছেয়ে ফেলেছে।

তিন দিন পর আমানুল্লার দাদাও সিংহাসন ত্যাগ করে চলে গেলেন। বাচ্চা সাড়ম্বরে সিংহাসনে বসল।

এসব খবর যে কোনও প্রামাণিক আফগান ইতিহাসে সবিস্তার পাওয়া যায় —একথা পূর্বেই বলেছি। আমি ইতিহাস লিখতে বসি নি; বাচ্চার আপন হাতে জ্বালানো দাবানল শব্‌নম ও আমার মত নিরীহ শুষ্ক পত্রের দিকে কি ভাবে এগিয়ে এল সেইটে বোঝাবার জন্য হ্রস্বতম খেইগুলো ধরিয়ে দিচ্ছি মাত্র।

দু হাতে মাথা চেপে ধরে ভাবছি, কি করি, কি করি? কোন্ দিকে পথ, কোথায় আলো—আর কোনটাই বা আলেয়া?

সুখ চাই নে, আনন্দ চাই নে, এমন কি প্রিয়মিলনও চাই নে—কি করে এই দাবানল থেকে শব্‌নমকে রক্ষা করি?

আমি রক্ষা করবার কে?

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়িতে বুটের ধপাধপ শব্দ করে আব্দুর রহ্‌মান ঘরে ঢুকে প্রায় অস্ফুট স্বরে বললে, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খান এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।' আব্দুর রহ্‌মানের গলা শুকিয়ে গিয়েছে।

আমি দুবার শুনেও প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারি নি।

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেলুম।

মাথা নীচু করে কিচ্ছু না বলে নীরব অভ্যর্থনা জানালুম।

তিনি গম্ভীরে—এবং সেই অর্ধসম্বিতেও আমার মনে হল—প্রসন্ন অভিবাদন জানালেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'আপনার পরে'—অর্থাৎ 'আপনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।' তিনি কেন এসেছেন, এই ভাবনার ভিতরও আমি আশ্চর্য হয়ে

লক্ষ্য করলুম, শব্‌নমের গলা মধুর, এঁর গলা গম্ভীর, অথচ দু-গলারই আদল এক, ঝংকারসম ধ্বনি। যেন শব্‌নম বাপের পাগড়ি জোব্বা গোঁফদাড়ি পরে এসেছে।

আমি আপত্তি না জানিয়ে শুধু 'খানা-ই শুমা অস্ত্'—'এটা আপনার বাড়ি' বলে আগে আগে পথ দেখিয়ে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ইরানী কায়দায় একবার 'এটা আপনার বাড়ি' বলার পর অভ্যাগতজন আদেশ করবেন, গৃহস্থ তাঁর কথা মত চলবে।

আমাকে আসন দেখিয়ে নিজে সোফায় বসলেন।

আমি কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইরান আফগানের মুরুব্বীরা এতে খুশী হয়ে বলেন, 'বাচ্চা খিজালৎ মী কশদ্‌—ছেলেটার আব্রু শরম-বোধ আছে।'

শুধালেন, 'আপনি আমার পরিচয় জানেন?'

আমি মৃদু কণ্ঠে বললুম, 'কিছু কিছু জানি।'

বললেন, 'তাই যথেষ্ট। আমিও আপনাকে কিছু কিছু চিনি। এদেশে এখন অল্প-বিস্তর বিদেশী আসতে আরম্ভ করেছেন কিন্তু আমি সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার সুযোগ এখনও পাই নি। তবে গেল বছর আপনাদের কলেজের বাৎসরিক পরবে আপনি এদেশে শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেইটে শোনবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আপনি বড় একাগ্র মনে অত্যন্ত দরদ দিয়ে আপনার বক্তব্য পেশ করেছিলেন, সেটা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আমার মনে হয়েছিল, আপনি এই পরদেশকে অনেকখানি ভালবেসে ফেলেছেন। নয় কি?'

আমি মাথা নীচু রেখেই বললুম, 'এদেশ আমাকে অবহেলা করে নি। এদেশে আমি আশাতীত ভালবাসা পেয়েছি। প্রতিদানের চেয়েও বেশি দেবার চেষ্টা করেছি।'

'এই তো ভদ্রজনের আচরণ।'

আমি তখন শুধু ভাবছি, তাঁর এখানে আসার রহস্য কি? তবে কি শব্‌নম তাঁকে কিছু বলেছে? তাই বা কি করে হয়?

নিজের থেকেই তিনি কাবুলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অতি সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় আমাকে বোঝালেন। তাঁর যুক্তিধারা থেকে পদে পদে প্রমাণ হল তিনি সাধারণ সৈন্যদেরও কঠিন জিনিস বোঝাতে অভ্যস্ত।

সর্বশেষ বললেন, 'আমি সোজা কথা বলাটাই পছন্দ করি। আমার মনে হচ্ছে, আপনিও সরল লোক। তাই আপনার কাছে অন্য লোক না পাঠিয়ে আমি নিজেই এসেছি। যদিও এ অবস্থায় নিজে আসাটার রেওয়াজ এদেশে নেই।

'আমি আমার নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি নি। আমি সিপাই। প্রাণের প্রতি যাদের অত্যধিক মায়া তারা ফৌজে বেশী দিন থাকে না—অন্তত শুদ্ধমাত্র দু'পয়সা কামাবার জন্য আমার ফৌজে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না।

'এবারে আপনাকে যা বলছি তা গোপনে।'

'আমার একটি কিশোরী কন্যা আছে। লোকে বলে অসাধারণ সুন্দরী। অন্তত তার সে খ্যাতি অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। আমি আজ বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি বাচ্চা-ই-সকাওয়ের দ্বিতীয় সেনাপতি—প্রথম সেনাপতির ছোট ভাই—বছর দুই পূর্বে কাঠ বেচতে এসে তাকে কাবুলে দেখতে পেয়েছিল—আমার মেয়ে সচরাচর পর্দা মানতো না। যে জিনিস তখন তার বন্ধ উন্মাদাবস্থায় ও উৎকট কল্পনার বাইরে ছিল আজ সৈন্যদল প্রয়োগে সেটা অসম্ভব নাও হতে পারে।

'আপনি হিন্দুস্তানী। আপনি যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করেন তবে সে হিন্দুস্তানী ন্যাশনালিটি পেয়ে যাবে। আমি আপনাদের রাজ-দূতাবাসে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি; ভারতীয় এক বড় রাজকর্মচারী বললেন, "আইনত আমার মেয়ের যে অধিকার জন্মাবে সেটা তিনি রক্ষা করার সর্ব চেষ্টা করবেন।" যদিও প্রয়োজন ছিল না, তবুও কথা উঠেছিল, এখানে শিক্ষিত অবিবাহিত কে কে আছেন। সেই প্রসঙ্গে আপনার নাম যখন উঠল, মাত্র তখনই তিনি সন্তর্পণে তাঁর উৎসাহ দেখিয়েছেন।'

এই অভাবনীয় পরিস্থিতির সামনে পড়ে আমি বিস্ময়েই হোক, আনন্দেই হোক, কিছু না বুঝতে পেরেই হোক হয়তো একটা অস্ফুট শব্দ করেছিলুম।

তিনি বললেন, 'আপনি একটু চিন্তা করুন এবং তার পূর্বে বাকি কথা শুনে নিন।

'বাচ্চা-ই-সকাও এখন মোল্লাদের কথা মত চলে। অন্তত তারা বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়াটাতে সম্মতি দিতে পারবে না।

'ব্রিটিশ এ্যারোপ্লেন ভারতীয় নারীদের আপন দেশে নিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের ভারতীয় কর্মচারী আমাকে সদয় আশ্বাস দিয়েছেন, প্রথম সুযোগেই তিনি আমার মেয়েকে হিন্দুস্তান পাঠিয়ে দেবেন।

'এদেশে ফরাসী জর্মন—বিদেশী প্রায় সবাই অবিবাহিত। কিন্তু আমার মেয়ে কিছুতেই ইউরোপীয় বিয়ে করবে না। প্রথমত তারা খৃষ্টান, দ্বিতীয় তাদের সাম্রাজ্যবাদ প্রবৃত্তি এবং তৃতীয়—বোধহয় এইটেই সর্বপ্রথম বলা উচিত ছিল—

তাদের শারীরিক অশুচিতা সে অত্যন্ত ঘৃণা করে। যদিও তার তমদ্দুন্-ফরহঙ্গের, তার বৈদগ্ধ্যের অর্ধেকেরও বেশী ফরাসী।

'এ কথাটা তুললুম, আপনি হয়তো শুধাবেন, আমার মেয়ের মত আছে কি না। আপনি মত দিলে তাকে আমি জিজ্ঞেস করব, কারণ ধর্মত আইনত সে প্রাপ্তবয়স্কা। যদি সে অমত করে, আশা করি আপনার অভিমানে লাগবে না। যে রকম আমি আপনাকে সরল মনে বলেছি, আপনি অমত করলে আমি কণামাত্র অপমানিত বোধ করব না।

'কারণ, হয়তো আপনারা আপনাদের গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করেন না, আমরাও আমাদের গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করি নে—যদিও ইসলাম এরকম গোষ্ঠী পাকানো নিন্দার চোখে দেখে। আপনি রাজী না হলে আমি কখনও ভাববো না, আপনি আমার মেয়েকে কিংবা আমাকে এবং আমার গোষ্ঠীকে খাটো করে দেখলেন।

'আমার মেয়ে সম্বন্ধে বাপ হয়ে আমি কি বলব। আমি প্রশংসা করতে চাই নে। সে আমার একমাত্র মেয়ে, ছেলেও নেই, তার গর্ভধারিণী—'

এই প্রথম তাঁর সরল দৃঢ় কথাতেও যেন একটু অতি ক্ষীণ কাঁপন শুনতে পেলুম।

'—অল্প বয়সে মারা মান। বাপ হয়ে তাই ইংরেজের মত ম্যাটার অব্ ফ্যাক্ট্ বা সাদামাটা ভাবে বলি, তার চারটে 'বি'-ই আছে। বিউটি, ব্রেন্, বার্থ, ব্যাঙ্ক—অবশ্য চতুর্থটা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সর্বশেষে আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই, আপনি রাজী হলে ফলস্বরূপ বাচ্চার সেনাপতির বিরাগভাজন হবেন।'

এতক্ষণ তিনি আমার দিকে ঝুঁকে, উরুতে দুই কনুই রেখে, চিবুক দুই হাতের উপর রেখে কথা বলছিলেন। এবারে শিরদাঁড়া খাড়া করে ফৌজী কায়দায় সোজা হয়ে বসে বললেন, 'এবারে আপনি চিন্তা করে বলুন।'

তিনি যে ভাবে শান্ত হয়ে আসনে বসলেন তার থেকে বোঝা গেল, প্রিয় অপ্রিয় নানারকম সংবাদ শুনে তিনি অভ্যস্ত। আমার 'না' তাকে বিচলিত করবে না, আমার 'হাঁ' তাঁকে প্রসন্ন করবে।

আমার 'হাঁ', 'না' ভাববার কি আছে! তবু আমি এতই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম যে প্রথমটায় আমি কিছুই বলতে পারি নি। তারপর মাথা নিচু রেখেই নববরের কণ্ঠে বলেছিলুম, 'আপনার কন্যাকে আমি আল্লাতালার মেহেরবানীর মত পেতে চাই।' আমি ইচ্ছে করেই আমার সম্মতি প্রস্তাবের রূপ

দিয়ে প্রকাশ করেছিলুম—কিন্তু আপন অজানতে। আমি বিশ্বাস করি, করুণাময় তাঁর অসীম দয়ায় মূককে যে শুধু ভাষাই দেন তা নয়, সৌজন্যের ভাষাও বলতে শেখান।

আওরঙ্গজেব খান দাঁড়িয়ে উঠে আমায় আলিঙ্গন করলেন।

আসন গ্রহণ করে বললেন, 'আমার কন্যার কিস্মৎ যদি ভালো থাকে তবে আপনি অসুখী হবেন না। আর আপনি আমার উপকার করলেন। জামাতার কাছে উপকৃত হওয়া বড় আনন্দের বিষয়।'

আমি বললুম, 'আপনি গুরুজন। যদি অনুমতি করেন তবে একটি নিবেদন আছে।' আমি আমার গলা ফিরে পেয়েছি।

প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'আপনি দয়া করে উপকারের কথা তুলবেন না। আমি আপনার কন্যার পাণি-প্রার্থনা করছি, শিষ্য যে রকম মুর্শীদের কাছে গুরু-কন্যা কামনা করে।'

এবারে তিনি বিচলিত হলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘন ঘন আমার মস্তক চুম্বন করতে করতে বললেন, 'বাচ্চা—বৎস—তুমি ভদ্র ঘরের ছেলে, তুমি ভদ্র ঘরের ছেলে। তোমার পিতামাতার আশীর্বাদ তোমার উপর আছে।'

আমি তাঁর হস্তচুম্বন করলুম।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'পাপাচার শুভবুদ্ধির চেয়ে দ্রুত গতিতে চলে। তাই শুভকর্ম শীঘ্র করতে হয়। বাচ্চার সেনাপতি জাফর খানের পাপবুদ্ধিকে হারাবার জন্য তোমাদের বিবাহ যতশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করা উচিত। তুমি কি বল?'

আমি বললুম, 'আপনার কাছ থেকে আমার পরিচিত "শুভস্য শীঘ্রম্" বাক্যের প্রকৃত নিগূঢ় অর্থ বুঝলুম। এখন থেকে আমার আর কোন মতামত নেই।'

'আজ সন্ধ্যায়?'

'আজ সন্ধ্যায়।'

উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'সময় কম। ব্যবস্থা করতে হবে। কীই বা ব্যবস্থা করব? এই দুর্দিনে?'

আমি জানি শবনম রাজী, কিন্তু ইনি কোন্ সাহসে সব ব্যবস্থা করার চিন্তাতে লেগে গেলেন। বোধহয় কন্যার জনকানুরাগে অখণ্ড বিশ্বাস ধরেন।

আমাকে কোনও কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে এক মুহূর্তেই অন্তর্ধান করলেন।

মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি! আমি মুক্তি পেয়েছি।

আর আমাকে হাত-পা-বাঁধা অসহায়ের মত মার খেতে হবে না। ওই আমলেই বাংলাদেশে আমাদের মধ্যে রটেছিল যে টেগার্টের পুলিস বিপ্লবীদের হাত পা বেঁধে সর্বাঙ্গে মধু মাখিয়ে ডাঁশ পিঁপড়ের মাঝখানে ফেলে রাখে। আমাকে আর সে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না।

আমি এখন শব্‌নমের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারব।

তার মিলনের জন্য এখন আমাকে আর প্রহরের পর প্রহর গুনতে হবে না। আমি যে কোন মুহূর্তে তার সম্মুখে উপস্থিত হতে পারি। আমার দশদিন এখন সত্যিই নিরদ্বন্দ্বা হয়ে গেল।

পরিপূর্ণ আনন্দের সময় মানুষের মন ভিন্ন ভিন্ন দিকে ধায় না। একটা আনন্দ নিয়ে সে পড়ে থাকতে ভালবাসে। শিশুর মত একটি পুতুলই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুতে যায়। আমি আমার মুক্তির আনন্দ নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়ে রইলুম, আমার অন্য সৌভাগ্যের কথা ভাববারই প্রয়োজন হল না, ফুরসত হল না।

এক ঘণ্টা হয় কি না হয়, এমন সময় আব্দুর রহ্‌মান সৌম্যদর্শন এক অতি বৃদ্ধকে আমার ঘরে নিয়ে এল। ধবধবে সাদা চাপ দাড়ি, সাদা গোঁফ—মোল্লাদের মত ছোট করে ছাঁটা নয়, সাদা বাবরী চুল, তার উপর সাদা পাগড়ি, চোখের পাতা এমন কি ভুরু পর্যন্ত বরফের মত সাদা। এবং সে সাদা বেয়ে যেন তেল ঝরে পড়ছে। এঁর বয়স কম হলে আমি বলতুম, এটা সাদা নয়, সত্যিকারের প্ল্যাটিনাম ব্লণ্ড।

আমি তাঁকে যত্ন করে বসালুম।

অতি সুন্দর ফার্সী উচ্চারণে বললেন, 'আমি আওরঙ্গজেব খানের গুরু। তার মেয়েরও গুরু। দুজনাকেই ফার্সী পড়িয়েছি। এখনও আমাদের তিন জনাতে মুশাইরা হয়।

'এই খানিকক্ষণ আগে আওরঙ্গজেব খান এসে আমায় সুখবর শোনালে, আপনার সঙ্গে শব্‌নমের শাদি আজ সন্ধ্যাবেলাই হবে। আমি বড় খুশী হয়েছি। আমি বড়ই খুশী হয়েছি।'

এইটুকু বলে তিনি দুখানা হাত তুলে আল্লার কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রার্থনা করলেন। আমিও হাত তুলে আস্তে 'আমিন' 'আমিন' বললুম।

বললেন, 'যেই শুনতে পেলুম, আপনার মুরুব্বী এখানে কেউ নেই, অমনি

আমি বললুম আমার উপর এর ভার রইল। আওরঙ্গজেব চায় নি যে এই খুন-রাহাজানির মাঝখানে আমি রাস্তায় বেরই। আমি তাকে স্পষ্ট বলে দিলুম, এ সংসারে আমি এমনিতেই আর বেশী দিন থাকব না—না হয় দুদিন আগেই গেলুম।'

আমি বললুম, 'আপনি শতায়ু হন।'

বৃদ্ধের রসবোধ আছে। বললেন, 'আমার বয়স আশী হয়েছে। আরও কুড়ি বছর বাঁচতে চাই নে। বরঞ্চ ওই কুড়িটি বছর আপনি আপনার আয়ুতে জুড়ে দিন কিংবা শব্‌নম বানু আর আপনাতে ভাগ করে। কোন জিনিস বরবাদ করাটা আমি আদপেই পছন্দ করি নে। এখন, প্রথম কথা: আওরঙ্গজেব খান আপনাকে জানাতে বলেছেন, "আজ সন্ধ্যায় আপনাদের বিবাহ।" আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

'দ্বিতীয় কথা: আপনার বন্ধুবান্ধব কে কে এখানে আছেন তাঁদের নাম-ঠিকানা বলুন। আমি কিংবা আমার বাড়ির লোক তাঁদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে আসবে উভয় পক্ষ থেকে। দুজন করে লোক যাবে।'

আমি বললুম, 'এই দুর্দিনে নিমন্ত্রণ করে কাকে আমি বিপদে ফেলি? তাদের কারোর যদি ভালমন্দ কিছু একটা হয় তবে তার বাল-বাচ্চার সামনে আমি আমার মুখ দেখাতে পারব না। আর আমার সেরকম মিত্র বা সখাও কেউ নেই। এঁদের সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে এখানে—তাও সহকর্মীরূপে। কিন্তু তার পূর্বে আমার উচিত আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করা।'

বৃদ্ধ ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'না, না, না। আপনি বিদেশী—এদেশের অবস্থা জানেন না। এখন শুদ্ধমাত্র লৌকিকতা করার জন্য রাস্তায় বেরনো উচিত নয়। আমি আপনার হয়ে তাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ জানাব। তারা সবাই বরপক্ষের হয়ে যাবে।

'এবারে আপনার খিদমতগার আব্দুর রহ্‌মানকে দাওয়াৎ করতে হবে।'

আমি বললুম, 'তাকে ডাকি।'

আবার ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'না, না, না। আমি তাকে হিন্দুস্তানী কায়দায় কনে পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ জানাব তার কাছে গিয়ে।

'তৃতীয় কথা: আপনার জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা আমি করব। আমার মেয়ে আপনার মোটামুটি উচ্চতা আওরঙ্গজেব খানের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে এবং সেলাইয়ের কলে বসে গিয়েছে। এ-তো জোব্বার ব্যাপার, হাঙ্গামা কম।

এবার আপনি আমার বুকে বুক লাগিয়ে দাঁড়ান। আমি ঠিক ঠাহর করে নি।'

মোকা পেয়ে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা আলিঙ্গনও দিলেন।

আমি তাঁর হস্তচুম্বন করে বললুম, 'আমার বলতে সাহস হচ্ছে না, কিন্তু কাপড়-চোপড়ের খরচটা ?'

বৃদ্ধ সপ্রতিভ। বললে, 'নিশ্চয়! খয়রাতী বা ধারের জামাজোড়ায় বিয়ে করাটা মনহুসী—অপয়া।'

আমি বললুম, 'এদেশে ভারতীয় কারেন্‌সির কদর আছে বলে শুনেছি।'

তাঁকে আমার মনিব্যাগটা দিলুম।

তিনি দু-একখানা নোট তুলে নিয়ে বললেন, 'বিয়ের পর শব্‌নম আর আমার মেয়েতে বোঝাপড়া করে নেবে।'

বৃদ্ধ উঠলেন।

এঁর কথা বলার ধরন শোনবার মত। শব্‌নম বয়েৎ ছাড়ে মাঝে-মধ্যে, ইনি প্রায় প্রত্যেকটি কথা বললেন বয়েতের মারফতে। ঠিক বলতে পারব না, বোধ হয় তাঁর মেয়ে যে সেলাইয়ের কলে বসে গেছেন সেটাও বয়েতেই বলেছিলেন। কিন্তু শব্‌নমের বেলা যেরকম তাকে থামিয়ে টুকে নিতে পারি, এর বেলা সেটা পারলুম না বলে দুঃখ রয়ে গেল।

আব্দুর রহ্‌মানকে দাওয়াৎ জানিয়ে বিদায় নেবার সময় আমাকে বললেন, 'আপনাকে কয়েকটি বয়েৎ শোনালুম, আপনি তো আমাকে একটিও শোনালেন না। আপনার বুঝি ওতে মহব্বৎ নেই!'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'আপনাকে শোনাব আ-মি? আপনার তো সব বয়েৎ জানা।'

তিনি বললেন, 'সে কি কথা? চেনা গান লোকে শোনে না? নূতন লাইব্রেরিতে গেলে আমরা সর্বপ্রথম চেনা বইয়ের সন্ধান করি নে? জলসা-ঘরে গিয়েও প্রথম খুঁজি চেনা মুখ এবং বলতে নেই, গোরস্তানে গিয়েও প্রস্তরফলকে চেনা জনেরই নাম খুঁজি।'

বাপ্‌স্‌! চার চারটে তুলনা—এক নিশ্বাসে।

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'আমার এক বন্ধু একটি কবিতা লিখেছেন। শুনবেন?' বলে নরগিসের···

তোমার আমার মাঝখানে বঁধু অশ্রুর পারাবার
কেমনে হইব পার—?

কবিতাটি শোনালুম। বুড়ো একেবারে থ' মেরে গেলেন। 'কাবুলের লোক

এরকম লিখেছে ? অসম্ভব ! ওর সঙ্গে আমার আলাপ করতেই হবে। বয়সে নিশ্চয়ই কাঁচা। চিন্তাশীল এবং স্পর্শকাতর। ছন্দে মিলে সবুজ রঙের কাঁচা ভাব একটু রয়েছে। যদি লেগে থাকে তবে ইরান হিন্দুস্তানে একদিন নাম করবে। ইন্ শা আল্লা, ইন্ শা আল্লা—আল্লা যদি দেন, আল্লা যদি করান।'

দেউড়িতে বললুম, 'আমাকে দয়া করে আপনি বলবেন না।'

হেসে বললেন, 'নওশাহ্, নূতন রাজা, নববর, তাই বলেছি। কাল থেকে তুমি বলব। আওরঙ্গজেবও বলেছিলেন, "বাচ্চা খিজালৎ মী কশদ্"—"ছেলেটির আব্রু-শরম-বোধ আছে।" আমি বড় খুশী হয়েছি, আগাজান। আর কানে কানে বলি, শব্‌নমের মত মেয়ে আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে দুটি দেখি নি। নাম সার্থক করে শব্‌নমের মত পবিত্র।'

অতি সত্য কথা। তবু আমার অভিমান হল। সবই শব্‌নম, শব্‌নম—আমি যেন কিচ্ছুই না।

॥ ৭ ॥

আমার প্রিয়া, আমার বউ, আমার বিবাহিত স্ত্রীকে আবার বিয়ে করতে চলেছি !

এ যেন একই দিনে দুবার সূর্যোদয়। কিন্তু তাও হয়। সূর্যোদয়ের একটু পরে ঘন মেঘে সূর্য পড়ল সম্পূর্ণ ঢাকা। সব কিছু ভাসা-ভাসা অন্ধকার—সূর্যোদয়ের পূর্বে যে রকম। মেঘ কেটে পরিষ্কার আকাশে আবার পূর্ণ সূর্যোদয় হল।

কিংবা বলব, ভারতবর্ষে মানুষ যেমন একই দেহ নিয়ে দুই জন্ম লাভ করে 'দ্বিজ' হয়। প্রথম জন্ম তার ব্যক্তিগত, দ্বিতীয়বারে লাভ করে গুরুর আশীর্বাদ, সমাজের সম্মতি। আমাদের এই দ্বিতীয় বিয়েতে আমরা পাব পিতার আশীর্বাদ, সমাজের মঙ্গল কামনা।

সুস্থ বর স্বাভাবিক অবস্থায়ও পরের দিন ঠিক ঠিক বলতে পারে না কি কি হয়েছিল, কোন্‌টার পর কি ঘটেছিল। আমার অবস্থা আরও খারাপ।

কিংখাপের জামা-জোব্বা পরে মাথা নিচু করে বসে আছি শাদির মজলিসের মাঝখানে। একবার মাথাটা অল্প উঁচু করে চারদিকে তাকালুম। মাত্র একটি পরিচিত মুখ দেখতে পেলুম। আমার কলেজের আমারই ছাত্র। তারই কচি মুখটি শুধু হাস্যোজ্জ্বল। আর সকলের মুখে আনন্দ আতঙ্কে মেশানো কেমন যেন এক আবছায়া-আবছায়া ভাব। আবার মাথা নিচু করলুম।

এবারের বিয়েতে শব্‌নম সভাতে এসে আমার মুখোমুখি হয়ে বসল না। আমার মুখপাত্র হয়ে একজন 'উকীল' দুজন সাক্ষীসহ অন্দরমহলে গিয়ে বিবাহে শব্‌নমের সম্মতি নিয়ে এসে মজলিসে আমার সামনে মুখোমুখি হয়ে বসে বললেন, 'অমুকের কন্যা অমুক, আপনি, অমুকের পুত্র অমুককে এত স্ত্রীধনে মুহম্মদী চার শর্তে বিবাহ করতে রাজী আছেন—আপনি কবুল আছেন?' বাকিটা প্রথম বারেরই মত।

হ্যাঁ, মনে পড়ল। এর আগে একটা দ্বন্দ্ব হয়ে গিয়েছে স্ত্রীধন কত হবে তাই নিয়ে। সাধারণত বর পক্ষ সেটা কমাতে চায়, কন্যা পক্ষ সেটা বাড়াতে চায়। এখানে হল উল্টো। পরিবারের ঐতিহ্য ও সম্মান বজায় রেখে আওরঙ্গজেব খান কমিয়ে কমিয়ে যে অঙ্ক বললেন, আমি তাঁর গুরুর মারফতে ঢের বেশী অঙ্ক জানিয়ে দিলুম। গুরুই শেষটায় রফারফি করে দিলেন।

বড় দুঃখে তোপল্ খানের কথা মনে পড়ল!

বর-বধুর মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করেছিলেন গুরু। সমস্তটা কবিতা কবিতায়। এবং সব কবিতা মাত্র একজন কবি মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী-র থেকে নিয়ে। আশ্চর্য, কি করে জানলেন উনিই আমার সব চেয়ে প্রিয় কবি!

তারপর সব ঝাপসা।

আমার অপরিচিত এক ভারতীয় বোধহয় আমাকে মুরুব্বীদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাঁদের সম্মান জানাতে তাঁরা আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। সকলের পয়লা কার কাছে গিয়েছিলুম মনে নেই। শ্বশুরমশাই কিংবা জ্যাঠ-শ্বশুরমশাই—অর্থাৎ জানেমন্—আমি কারও মুখের দিকে তাকাই নি।

এসব কায়দা খাস আফগানী কি না আমি জানি নে। পরে শব্‌নমের কাছে শুনেছিলুম ওই অপরিচিত ভারতীয় মিত্রটি সব-কিছু আধা-আফগান আধা-হিন্দুস্তানী কায়দায় করিয়েছিলেন।

জিরোবার জন্য আমাকে ছুটি দেওয়া হল। বেরুতেই দেখি আমার ছাত্রটি। সে আনন্দে, উৎসাহে সেখানে চেঁচামেচি লাগিয়েছে। আমার সম্বন্ধে তার গুণকীর্তনের যেটুকু কানে এসেছিল তার সিকি ভাগ সত্য হলে তুর্কীর খলিফার সিংহাসন ইস্তাম্বুল জাদুঘর থেকে বের করে এনে তার উপর আমাকে বসাতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নোবেল প্রাইজের সব কটা পুরস্কার নাগাড়ে এক শ বছর ধরে আমাকে দিয়ে যেতে হয়।

আমাকে দেখতে পেয়ে লাফ দিয়ে এসে আমার হাত দুখানার উপর তার দু চোখ চেপে ধরে বার বার বলে, 'হুজুর, এ কী আনন্দ, আপনি আমাদের দেশে

বিয়ে করলেন! হুজুর, ইত্যাদি।' শেষটায় বললে, 'কলেজের সবাই বড় পরিতৃপ্ত হবে, হুজুর, এ আমি বলে রাখছি ?'

হায় রে কলেজ! আমরা তখনও জানতুম না বাচ্চা তিন দিন পরে কাবুলের তাবৎ ইস্কুল-কলেজ নস্তাৎ করে দেবে।

একটা ঘরে বসিয়ে তামাক সিগারেট সামনে রাখা হল। শব্‌নমের সমবয়সী আত্মীয়-স্বজনরা প্রথমটায় কিন্তু-কিন্তু করে পরে বাঁধন-ছাড়া বাছুরের মত লাফালাফি দাপাদাপি ঠাট্টা-রসিকতা করলে। আমার কবিতার শখ জেনে শেষটায় লেগে গেল বয়েতবাজি, কবিতার লড়াই এবং মুশাইরা। শুধু ফার্সী না—দুনিয়ার যত সব ভাষায়। তবে মোলায়েম প্রেমের কবিতার অধিকাংশই ছিল ফার্সীতে।

খবর এল, জানেমন্ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমাকে সামনে বসিয়ে আমার সর্বাঙ্গে হাত বুললেন। এমন কি চোখে, নাকে, গালে, কপালে, ঠোঁটে পর্যন্ত। তখন দেখলুম, তিনি অন্ধ।

অতি মৃদু কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন, 'শোন বাচ্চা, তোমাকে সব-কথা বলার মত লোক এ বাড়িতে আর কেউ নেই আমি ছাড়া। জন্মের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত শব্‌নম একদিনের তরেও আমার চোখের আড়াল হয় নি। আমি জন্মান্ধ নই, যৌবনে চোখের জ্যোতি হারাই। শব্‌নম সে জ্যোতি ফিরিয়ে এনেছে। আজ যদি কেউ বলে, শব্‌নমের ভালবাসার পথে আমি একটিমাত্র কাঁটা পুঁতলে আমার চোখের জ্যোতি ফিরে পাব তা হলে আমি সে প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দেব।

'প্রথম দিনই আমি বুঝতে পেরেছিলুম, সে ভালবেসে ফিরেছে। যখন ফিরে এল, তখনই শুনি তার গলা বদলে গিয়েছে, তার হাসি বদলে গিয়েছে, আমাকে আদর করার ধরন বদলে গিয়েছে। যেন এতদিন ছিল পাতার আড়ালে লুকানো ফুল—এখন তার উপর পড়েছে প্রভাত বেলার স্নিগ্ধ আলো। ঘরের কোণের প্রদীপ হঠাৎ যেন আকাশের বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে যেন নবীন মাধুরী এসে ধরা দিয়েছে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নূতন ছন্দে নূতন তালে নেচে উঠেছে।

'আমার থেকে দূরে চলে গেল? না, বাচ্চা, না। সেই তো প্রেমের রহস্য।

'এতদিনে বুঝতে পারল, আমি তাকে কতখানি ভালবেসেছি—তোমাকে ভালবাসার পর। আগে আমার কাছে আসত ঝড়ের মত, বেরিয়ে যেত

তীরের মত। এখন আমার সঙ্গে কাটায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তোমার বিরহ থেকে বুঝেছে, সে আড়ালে গেলে আমার কী দুশ্চিন্তা হয়। যে-বেদনা সে পেয়েছে, সেটা সে আমাকে দিতে চায় না। অথচ দুই ভালবাসার কত তফাত! আমার ভালবাসা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকের মত, তোমার ভালবাসা মরুভূমিতে মরণাপন্ন তৃষ্ণার্তকে সঞ্জীবনী অমৃতবারি দেওয়ার মত।

'আমাকে কিছু বলে নি। আমিও জিজ্ঞেস করি নি। প্রেম গোপন রাখাতে যে গভীর আনন্দ আছে তার থেকে আমি তাকে বঞ্চিত করতে যাব কেন? শুনেছি প্রথম গর্ভধারণ করে বহু মাতা সেটা যত দিন পারে গোপন রাখে। নিভৃতে আপন মনে সেই ক্ষুদ্র শিশুটির কথা ধ্যান করতে করতে সে চলে যায় সেই স্বর্গলোকপানে, যেখান থেকে মুখে হাসি নিয়ে নেমে আসবে এই শিশুটি।

আমিও নিভৃতে অনেক চিন্তা করেছি, কে সে বীর যে শব্‌নমের চিত্তজয় করতে সক্ষম হয়েছে। তার সঙ্গে যাদের বিয়ে হতে পারে তাদের সবাইকে তো আমি চিনি। এদের কেউই নয়, সে-কথা নিশ্চয়।

বুঝলুম, কোন জায়গায় কোন বিপত্তি বাধা আছে তাই সে তোমাকে পুরোপুরি পাচ্ছে না। আমার বেদনার অন্ত রইল না। ওই একবার আমার নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মাল, কেন আমি জ্যোতিহীন হলুম। না হলে আমি তোমাদের বাধাবিঘ্ন সরিয়ে দিতুম না, যার সামনে দুজন দুদিক থেকে এসে থমকে দাঁড়িয়েছ?'

সে বেদনা আজ কেটে গিয়েছে বলে স্মরণে জানেমনের মুখ পরিতৃপ্তির স্মিত-হাস্যে কানায় কানায় ভরে উঠল।

আমি বললুম, 'আমি বিদেশী। আপনারা আমাকে হিমি—শব্‌নমের উপযুক্ত মনে করেন কি না সেই ভয়ে আমিও অসহায়ের মত মার খেয়েছি। আমি বুঝি।'

'তোমার গলাটি আমার ভারী পছন্দ হয়েছে। এখন তো ওই দিয়েই আমি মানুষকে চিনি। আরও কাছে এস বাচ্চা। আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দাও। শব্‌নম যে রকম দেয়। এ কি, তোমার হাত অত নরম কেন? প্রায় শব্‌নমের মত!'

আমি হেসে বললুম, 'বাঙলাদেশের লোক আপনাদের মত শক্তিশালী হয় না।'

'বাঙলাদেশ? তাই বল। অই শব্‌নমের এত প্রশ্ন, হাফিজ বাঙলাদেশে

গেলেন না কেন, হাফিজের অর্থকষ্ট বাঙলার রাজা তো দূর করে দিতে পারতেন, আরও কত কি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল, একদিন সে যখন এক অজানা কবির কবিতা পড়ে আমায় শোনাতে গেল। ভারী মধুর আর করুণ। ঠিক ফার্সী নয়, আবার ইউরোপীয় কবির ফার্সী অনুবাদ নয়। কেমন যেন চেনা চেনা অথচ অচেনা। আবার কেমন যেন এটা-ওটায় মেশানো। যেন গন্ধ গোলাপের, চেহারা কিন্তু নরগিসের, এ আবার বসন্তে না ফুটে ফুটেছে যেন শীতকালে। একটি কবিতা আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে—"খুদ্‌-কুশী-ই-সিতারা"।' বৃদ্ধ থামলেন। যেন মনে মনে কবিতাটির চোখে-মুখে হাত বুলিয়ে নিলেন।

বুঝলুম, এটা 'তারকার আত্মহত্যা'।

আমি বললুম, 'এ কবির পিতা সূফী সাধক ছিলেন এবং অতি উত্তম ফার্সী জানতেন। কবি বাল্যবয়সে পিতার কোলে বসে বিস্তর ফার্সী গজল-কসীদা শুনেছেন। আসছে গ্রীষ্মে এখানে তাঁর আসবার কথা ছিল; বোধহয় আপনাদের কবি হাফিজ বাঙলাদেশে যেতে পারেন নি বলে বাংলার কবি তার প্রতিশোধ নিতে আসছিলেন। এখন তো সব-কিছু উলোট-পালোট হয়ে গেল।'

জানেমন্‌ বললেন, 'হাফিজের পাঁচ শ বছর পরে যোগাযোগ এসেছিল তোমাদের কবির মাধ্যমে। আরও ক'শ বছর লাগবে ফের এই যোগাযোগ হতে কে জানে? 'কে যেন এক বিদেশী জ্ঞানী দুঃখ করে বলেছেন, মানুষ একে অন্যকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে বেশী—দুজনের মাঝখানে সেতু বাঁধার চেষ্টা করে তার চেয়ে ঢের ঢের কম;—

হায় রে মানুষ
বাতুলতা তব
পাতাল চুমি;—
প্রাচীর যত না
গড়েছ, সেতু তো
গড়ো নি তুমি।

'তাই প্রার্থনা করি শব্‌নমে তোমাতে আজ যে সেতু গড়লে সেটি অক্ষয় হোক।'

আমি বললুম, 'আমেন—তাই হোক।'

এমন সময় খবর এল, ভোজে বরকে ডাকা হচ্ছে।

উঠবার সময় জানেমন্‌ আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার যদি

একটা কথা বিশ্বাস কর, তবে বলি, শব্‌নমের মধ্যে এতটুকু খাদ নেই। ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলে তোমার কক্‌খনো কোনও ক্ষতি হবে না। মিথ্যা কখনও তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। শিশিরবিন্দুর মত সত্যই সে পবিত্র, স্বর্গ হতে সে এসেছে সম্পূর্ণ কলুষ-কালিমা মুক্ত হয়ে। আমি বুঝেছি, তুমিও বড় সরল প্রকৃতি ধর। তোমাদের মিলনে স্বর্গের আশীর্বাদ থাকবে।'

আমাকে উপহার দিলেন এক বিরাট বদখ্‌শানী রুবি। তার উপরে খোদাই সম্পূর্ণ কাবা শরীফের ছবি। এত বড় রুবি আর এ রকম সূক্ষ্ম খোদাই আমি কাবুল জাদুঘরেও দেখি নি অথচ আমি জানতুম, বদখ্‌শান আফগানিস্থানের প্রদেশ বলে কাবুলের জাদুঘরে রুবির যে সঞ্চয় আছে সেটি পৃথিবীতে অতুলনীয়।

বললেন, 'মনে যদি কখনও অশান্তি আসে তবে এটি আতশী কাচ দিয়ে দেখো। শুনেছি, জমজমের কুয়ো পর্যন্ত দেখা যায়। মাইক্রোস্কোপ দিয়ে নাকি জল ওঠাবার সাজসরঞ্জাম পর্যন্ত পরিষ্কার ফুটে ওঠে। এটি আমাদের পরিবারে ছ'শ বছর ধরে আছে। প্রার্থনা করি, কাবা যতদিন থাকবে, তোমাদের ভালবাসা ততদিন অক্ষয় থাকবে।'

'আমেন!'

তারপর আবার সব ঝাপসা। আবছায়া-আবছায়া মনে পড়ছে, ভোজে পাশে বসেছিল আমার ছাত্রটি। সে আমাকে এটা ওটা খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল আর তার উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত আনন্দ সে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছিল না। আমি নিজের অপ্রতিভ ভাব ঢাকার জন্য তাকে সংস্কৃতের 'হাঁহাং দদ্যাৎ, হুঁহুং দদ্যাৎ' এবং 'পরান্নং প্রাপ্য দুর্বুদ্ধে—' ফার্সীতে অনুবাদ করে মৃদু কণ্ঠে শুনিয়েছিলুম।

রাত প্রায় বারোটার সময় এক অপরিচিত নওজোয়ান আমাকে হাত ধরে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তেতলার মুখে এক দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে বললে, 'বড়ই আফসোস, কি করে হৃদয়-দুয়ার ভেঙে নববরের—নওশাহের—নবীন বাদশার সিংহাসন লাভ করে অভিষিক্ত হতে হয় তার খবর আমি জানি নে। আমার সে সৌভাগ্য এখনও হয় নি। আপনাকে তাই কোন সদুপদেশ দিতে পারলুম না। তবে এটুকু জানি, শব্‌নম বানুর প্রসন্ন, অতিশয় সুপ্রসন্ন সম্মতি নিয়েই এই শুভ মুহূর্ত এসেছে। আজ পর্যন্ত কাবুল-কান্দাহার, জালালাবাদ-গজনীর কোন তরুণই সাহস করে শব্‌নম বানুর পাণি কামনা করতে পারে নি।

আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই আপনি তরুণ সমাজের স্মিত অভিনন্দনসহ তাদের গর্বের ধনের সঙ্গে চারিচক্ষু মিলনে যাচ্ছেন। সুদিন এলে আমরা আপনাদের নিয়ে যে নয়া পরব করব তখন দেখতে পাবেন আপনি কারও দিলে এতখানি চোট না দিয়ে শব্‌নম বানুর দিল জয় করেছেন। এ রকম সচরাচর হয় না। শব্‌নম বানু অসাধারণ বলেই এই অসম্ভবটা সম্ভব হল। আবার অভিনন্দন জানাই।'

দরজা খুলে আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

সে ছবি আমি জীবনে কখনও ভুলব না।

যবে থেকে আমাদের এ-বিয়ে ঠিক হয়েছে তখন থেকে এ ছবিটি কি রকম হতে পারে তার নানা স্বপ্ন আমি সমস্ত দিন ধরে দেখেছি। বরযাত্রায় আসার সময়, বিয়েবাড়ির চাপা কলরব মৃদু গুঞ্জরণ, শাদি-মজলিসের গম্ভীর নৈস্তব্ধ্যে, এমন কি চাচা-জান যখন তাঁর স্নেহপ্লাবন দিয়ে আমার হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন তখনও—তখনও আমি একটার পর একটা ছবি মনে মনে এঁকেছি আর মুছেছি, মুছেছি আর এঁকেছি। কখনও দেখেছি সখীজন পরিবৃতা শব্‌নম বাসরঘরের কলগুঞ্জরণ মুখরিত উজ্জ্বলালোকে নববধূর অতিভূষণে জর্জরিতা, আভূমি বিনতা। আর কখনও দেখেছি সূচীভেদ্য অন্ধকার ঘরের একপ্রান্তে আমি জাত-মূর্খের মত দাঁড়িয়ে ভাবছি—কিংবা বলব, ভাবতেই পারছি নে, কি করা উচিত। হয়তো অনেক কষ্টে এদিক ওদিক হাতড়ে হাতড়ে আসবাবপত্রের ধারাল খোঁচা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে কোনও গতিকে শব্‌নমের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, এমন সময়, এমন সময় হঠাৎ ঘরের চারিদিকে জ্বলে উঠল পঞ্চাশটা জোরাল টর্চ। সঙ্গে সঙ্গে অট্টরোল অট্টহাস্য। শব্‌নমের সখীরা চতুর্দিকের দেওয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিলেন এই শুভ মুহূর্তের জন্য। আলো জ্বালিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গাঁইয়া গান ধরলে,

'রুটি খায় নি, দাল খায় নি, খায় নি কভু দই,
হাড়-হাভাতে ওই এল রে—খাবে তোরে সই!
মরি, হায় হায় রে!'

কাবুলের বজ্র-বিগলন শীতে আমার মন ঘেমে ঢোল—না, না, ঢোল নয়, জগঝম্প।

সব ছবি ভুল, কুল্লে তসবির তালগোল পাকিয়ে প্রথমটায় পিকাস্‌সোতে পরিবর্তিত হয়ে অন্তর্ধান করল।

বিরাট ঘর। কাবুলের গৃহস্থ বাড়ির চারখানা বৈঠকখানা নিয়ে এই একটা ঘর।

তার সুদূরতম কোণে একটি গোল টেবিল। টেবিলক্লথ ভারী মখমলের—জমে-যাওয়া রক্তের কালচে লাল রঙের। তার উপরে সেই প্রাচীন যুগের গ্লোবওলা এক বিরাট রীডিং-ল্যাম্প। সমস্ত ঘর প্রায়ান্ধকার রেখে তার গোল আলো পড়েছে শব্‌নমের মাথার উপর, হাঁটুর উপর, পাদপীঠে রাখা তার ছোট্ট দুটি পায়ের উপর। ঠাণ্ডা মোলায়েম আলো—আর সেই আলোতে শব্‌নম বাঁ হাতে তুলে ধরে একখানা চটি বই পড়ছে।

শান্ত, নিস্তব্ধ, নির্দ্বন্দ্ব, গ্রন্থিমুক্ত বিশ্রান্তি।

ত্রিভুবনে আর যেন কোনও জনপ্রাণী কীটপতঙ্গ নেই শুধু একা শব্‌নম। সে প্রশান্ত চিত্তে অপেক্ষা করছে তার দয়িতের জন্য। সে আসছে দূর-দুরান্ত থেকে—যেখানে তৃতীয়ার ক্ষীণচন্দ্র গোধূলি লগনের তারাকে পাণ্ডু চুম্বন দিয়ে বাঁশবনের সবুজ নীড়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

আশ্চর্য! সে আমি। কে বিশ্বাস করবে সে আমি!

পা টিপে টিপে কিছুটা এগুতে না এগুতেই শব্‌নম মাথা তুলে আমার দিকে তাকালে। যত নিঃশব্দেই আমি এগুই না কেন, তার কান শুনতে পাক আর না-ই পাক, তার সদাজাগ্রত কোটিকর্ণ হৃদয় তো শুনতে পাবেই পাবে।

আমি দ্রুততর গতিতে এগুলুম। আমার হিয়ার বেগের সঙ্গে আমি পেরে উঠি কি করে?

শব্‌নম সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সিংহাসনই বটে। সেই কালচে লালের মখমলে মোড়া, সোনালী কাঁধ হাতলওলা, তার মাঝে মাঝে রয়েল ব্লুর মীনা দিয়ে আঙুরগুচ্ছ আঙুরপাতার নকৃশা কাটা সুউচ্চ সিংহাসন। বসবার সীট মাটি থেকে আট দশ ইঞ্চি উঁচু হয় কি না হয়, কিন্তু পিছনের হেলানো মানুষের মাথা ছাড়িয়ে আরও দু-মাথা উঁচু।

এই প্রথম শব্‌নম আমার সঙ্গে লৌকিকতা করে উঠে দাঁড়ালে।

আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মুখ ঠোঁট গাল চিবুক নাসারন্ধ্র কানায় কানায় ভরে তুলে আমার দিকে তৃপ্তি দাক্ষিণ্য আর নর্মসম্ভাষণের মৃদু হাসি হাসলে।

গালের টোল কোন্ অতল গভীরে লীন হয়ে গিয়েছে। সেখানে অন্ধকার। আলো ঢুকতে পারে নি বলে? না, সেখানে কেউ এক ফোঁটা কাজল ঢেলে দিয়েছে বলে?

আজ শব্‌নম সেজেছে।

নববধূকে জবড়জঙ্গ করে সাজানোতে একটা গভীর তত্ত্ব রয়েছে। রূপহীনার দৈন্য তখন এমনই চাপা পড়ে যায় যে সহৃদয় লোক ভাবে, 'আহা, একে যদি সরল সহজভাবে সাজানো হত তবে মিষ্টি দেখাতো ; আর সুরূপার বেলাও ভাবে ওই একই কথা—না সাজালে তাকে আরও অনেক বেশী সুন্দর দেখাতো !'

শব্‌নমকে সেভাবে সাজানো হয় নি, কিংবা সেভাবে সে নিজেকে সাজাতে দেয় নি।

এ যেন পূর্ণচন্দ্রের দূরে দূরে কয়েকটি তারা ফোটানো হয়েছে—চন্দ্রের গরিমা বাড়ানোর জন্য। এ যেন উৎসব-গৃহের সৌন্দর্যের মাঝখানে ধূপকাঠি জ্বালানো হয়েছে। শব্‌নমের ভাষায় বলি, বাতাসে বাতাসে পাতা গোলাপ-সৌগন্ধ্যের মাঝখানে বুলবুলের বীথি-বৈতালিক।

তার চুলের বিচ্ছুরিত আলোর মাঝখানে থাকে থাকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ রূপালী শামা-প্রজাপতি। মাথায় অভ্র-আবীর ছড়ানো হয়েছে অশেষ সযত্নে, এক একটি কণা করে—তিন সখী বাসর গোধূলিতে আরম্ভ করে এইমাত্র বোধহয় কুন্তল প্রসাধন সমাপন করেছেন।

চোখের কোল, আঁখিপল্লব, ধনু-ভুরু এত উজ্জ্বল নীল কেন ? এ তো কাজল কিংবা সুর্মার রঙ নয়। এ যে এক নবীন জলুস। তবে কি নীলকান্তমণি চূর্ণ করে কাজলের কাজ করা হয়েছে ! তারই শেষ কয়টি কণা টোলের অতলে ছেড়ে দিয়েছে !

এঁকে বেঁকে নেমে-আসা দুই জুলফের ডগায় আবার সেই নীলমণি-চূর্ণ। একদিকে তুষারঅভ্র কর্ণশঙ্খ, অন্যদিকে রক্তকপোল।

সে কপোল এতই লাল যে আজ যেন কোনও প্রসাধন-প্রক্রিয়া দ্বারা সেটাকে ফিকে করা হয়েছে। বদখ্‌শানের রুবি-চূর্ণ দিয়ে ? তা হলে ঠোঁট দুটিকে টসটসে রসাল ফেটে-যায়-যায় আঙুরের মত নধর মধুর করে লালের এ-আভা আনা হল কিসের চূর্ণ দিয়ে ? এ রঙ তো আমি আমার দেশের বিম্ববিটপীর উচ্চতম শাখাতে পল্লববিতানের অন্তরালে দেখেছি—সেখানে মানুষের কলুষদৃষ্টি, দুষ্ট বালকের স্থূল হস্ত পৌঁছয় না।

ওষ্ঠ পূর্বভাগে, স্ফুরিত নাসারন্ধ্রের নিচে সামান্য, অতি সামান্য একটি নীলাঞ্জন রেখা। ভরা ভাদ্রের গোধূলি বেলা আকাশের বায়ু কোণে পুঞ্জে পুঞ্জে জমে ওঠা শ্যামাম্বুদে আমি দেখেছি এই রঙ। গভীর রহস্যে ভরা এই রঙ। তারই উপরে স্ফুরিত হচ্ছে শব্‌নমের দুটি ক্ষুদ্র নাসারন্ধ্র। নিচে অতি ক্ষীণ কম্প্রমান স্ফুরণ লেগেছে তার ওষ্ঠাধরে।

এই প্রথম দেখলুম তার চোখ দুটি। এ দুটি থেকে আগুনের ফুলকি বেরুতে দেখেছি, এ আঁখি দুটিতে আচম্বিতে জল ভরে ফেটে পড়তে দেখেছি, কিন্তু এ চোখ দুটিকে আমি কখনও দেখি নি। আজ এই প্রাচীন দিনের ল্যাম্প আমাদের মিলনের শুভলগ্নে ঠিক সেই আলোটি ফেললে যার দাক্ষিণ্যে আমি শব্‌নমের চোখ দুটি দেখতে পেলুম।

সবুজ না নীল? নীল না সবুজ? অতৃপ্ত নয়নে আমি সে দুটি আঁখির গভীরতম অতলে অনেকক্ষণ ধরে তাকালুম তবু বুঝতে পারলুম না সবুজ না নীল। হাঁ, হাঁ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, হাঁ, দেখেছি বটে এই রঙ আসামের হাফ্‌লঙের কাছে। বড় বড় পাথরের মাঝখানে গিরিপ্রস্রবণ কুণ্ডের স্থির নীলজলের অতলে সবুজ শ্যাওলা। সেদিন ঠিক করতে পারি নি, কি রঙ দেখলুম, নীল না সবুজ—আজ বুঝলুম দুয়ের সংমিশ্রণে এমন এক কল্পলোকের রঙ প্রভাসিত হয় যে, সে রঙ ইহভুমের আর্টিস্টের পেলেটে তো নেই-ই, সৃষ্টিকর্তা যে আকাশে রঙ-বেরঙের তুলি বোলান তাতেও নেই।

শব্‌নমের স্মিত হাস্য ফুরোতে চায় না। কী মধুর হাসি!

কাবুলের মেয়েরা কি বিয়ের রাতে গয়না পরে না! শব্‌নম পরেছে সামান্য দু-তিনটি। তার সেই বিরাট খোঁপা জড়িয়ে একটি মোতির জাল। ঘনকৃষ্ণ কুন্তলদামের উপর স্তরে স্তরে, পাকে পাকে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিমানীকণা ঝিলিমিলি মেলা লাগিয়েছে।

দু-কানে দুটি মুক্তোলতা ঝুলছে আর তার শেষপ্রান্তে একটি করে রক্তমণি রুবি। শুভ্র মরাল কণ্ঠের বরফের উপর যেন দু'ফোঁটা সদ্যঝরা তাজা রক্ত পড়েছে। এই, এখ্‌খুনি বুঝি রক্তের ফোঁটা দুটি ছড়াতে চুবসাতে আরম্ভ করবে।

কাবুলী কুর্তা গলা-বন্ধ হয়—বিশেষ করে মেয়েদের। আজ দেখি, গলা অনেকখানি নিচে ঘুরিয়ে কাটা হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে একটি মোতির মালা। তার শেষপ্রান্তে কি, দেখতে পেলুম না। সেটি জামার ভিতরে। সে কী সৌভাগ্যবান! এই এতদিনে বুঝতে পারলুম কালিদাস কোন্ দুঃখে বলেছিলেন, 'হে সৌভাগ্যবান মুক্তা, তুমি একবার মাত্র লৌহশলাকায় বিদ্ধ হয়ে তার পর থেকেই প্রিয়ার বক্ষ-দেশে বিরাজ করছ; আমি মন্দভাগ্য শতবার বিরহশলাকায় সছিদ্র হয়েও সেখানে স্থান পাই নে।'

শব্‌নমের পরনে সাটিনের শিলওয়ার, কুর্তার রঙ ফিকে লাইলেক, ওড়না কচি কলাপাতা রঙের, এবং দুধে-আলতা সংমিশ্রণের মত সেই কচি কলাপাতা রঙের সঙ্গে দুধ মেশানো। ইতস্তত রূপালী জরির চুমকি। কলাবনে জোনাকির

দেয়ালি।

শব্‌নমের স্মিত হাস্য অন্তহীন। আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছি। হাসতে হাসতে আমাকে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটের উপর তার স্ফুরিতাধরোষ্ঠ চেপে ধরে যেন অতৃপ্ত আবেগে আমার পাণ্ডুর অধরের শেষ রক্তবিন্দু শুষে নিতে লাগল।

আমি মোহমান, কম্প্রবক্ষ, বেপথুমান। আমার দৈহিক স্পর্শকাতরতা অস্তমিত। আমার সর্বসত্তা শব্‌নমে বিলীন।

কোন্ দিগন্তে সে আমায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কোন্ তারা নির্ঝরের ছায়াপথে সে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে, কোন্ সপ্তর্ষির তারাজাল ছিন্ন করে কোন্ কোন্ লোকে নিয়ে গিয়েছিল জানি নে। অচৈতন্য অবস্থায় দেখি, আমি শব্‌নমের সিংহাসনে বসে আছি, সে আমার কোলে আড়াআড়ি হয়ে বসে, তার বুক আমার বুকের উপর রেখে, ডান হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে, বাঁ হাত দিয়ে আমার গাল বুলোতে বুলোতে, তার মুখ আমার কানের উপর চেপে ধরে শুধোচ্ছে, 'খুশী? খুশী? খুশী? খু…???'

আমি আলিঙ্গন ঘনতর করে বলেছিলুম, 'আমি তোমার গোলাম। আমাকে তোমার সেবার কাজ দাও।'

শুধিয়ে চলেছে, 'খুশী? খুশী? খুশী—'

আমি বললুম, 'আল্লা সাক্ষী, আমি প্রথম যেদিন তোমাকে ভালবেসেছি সে দিন থেকে শত বিরহ-বেদনার পিছনেও খুশী। তুমি জান না, তুমি আছ, এতেই আমি খুশী। প্রথম দিনের প্রথম খুশীর প্রথম নবীনতা বারে বারে ফিরে আসছে।'

শব্‌নম গুনগুন করে ফরাসীতে গাইলে,

> 'করেছি আবিষ্কার
> তোমারে ভালবাসিবার
> প্রথম যেমন বেসেছিনু ভালো, সেই বাসি প্রতিবার।'

'নয় কি?'

আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই বললে, 'দাঁড়াও! আলো জ্বালি।'

আমার কথায় কান না দিয়ে ঘরের প্রায়ান্ধকার কোণ থেকে নিয়ে এল আঁকশি। তার ডগার ন্যাকড়ায় কি মাখানো জানি নে। শব্‌নম আনাড়ী হাতে দেশলাই জ্বালিয়ে সেটার কাছে নিতেই দপ্ করে জ্বলে উঠল। সেই জ্বলন্ত আঁকশি দিয়ে সে ঝাড়বাতির অগুনতি মোমবাতি জ্বালালে। ঘরের দেয়ালে দামী ফরাসী সিল্কের ওয়াল-পেপারে সে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখ

ধাঁধিয়ে দিলে।

আমার পায়ের কাছে পাদপীঠে বসে বললে, 'তুমি নূতন রাজা এসেছ, তোমাকে বরণ করার জন্য সব কটা আলো জ্বালতে হয়। যে বেশ পরেছ, তার জন্য এ আলোর প্রয়োজন। কী সুন্দরই না তোমাকে—'

'থাক্।'

'চুপ!—দেখাচ্ছে। আমার ওস্তাদের মেয়ের রুচি আছে।'

আমি বললুম, 'তোমাদের কবি হাফিজই তো বলেছেন।—

"বলে দাও বাতি না জ্বালায় আজি, আমোদের নাহি সীমা,
আজ প্রেয়সীর মুখ চন্দ্রের আনন্দ-পূর্ণিমা" '

(সত্যেন দত্ত)'

শব্‌নম বললে, 'ও:, হাফিজ! তিনি তো বলেছেন "আজ বাতি জ্বালিয়ো না—" অর্থাৎ তার পরব মাত্র দিনের তরে। আমাদের পরব হবে প্রতি রাত্রি। তাই আজ রাত্রের আনুষ্ঠানিক আলো মাত্র একবারের তরে জ্বালিয়ে দিলুম। ভয় করো না, তাও নিভিয়ে দিচ্ছি এখ্‌খুনি।'

আমি খুশী হয়ে বললুম, 'টেবিল ল্যাম্পের ওই ঠাণ্ডা আলোতে তোমাকে কী অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল কি বলব? মাথার চুল থেকে খালি পায়ের নখের ডগাটি পর্যন্ত কী এক অদ্ভুত রহস্যময় অথচ কী এক অনাবিল শান্তিতে ভরপুর হয়ে বিভাসিত হচ্ছিল, কি করে বোঝাই? আচ্ছা, মোজা-ছাড়া পায়ে তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না—বাইরে যা শীত!'

অবাক হয়ে বললে, 'বা রে! তুমি যে বলেছ আমার খালি পা দেখতে তোমার ভালো লাগে।'

আমি আপসোস করে বললুম, 'তোমার কতটুকু দেখতে পাই?'

চোখ পাকিয়ে বললে, 'চোপ! দুষ্টুমি করো না। চোখ ঝলসে যাবে। সেমেলে যখন জুপিটারের দেবরূপ দেখতে চেয়েছিলেন তখন তাঁর কি হয়েছিল জান না?'

আমি শুধালুম, 'কি হয়েছিল?'

'আলোতে পোকা পড়লে যেরকম ফট্ করে ফেটে যায়—তাই হয়েছিল। প্রত্যেক মানুষই জুপিটার। তার দেবরূপ উন্মোচন করা বিপজ্জনক। জান, তাকাতে গিয়ে আমারই মাঝে মাঝে ভয় হয়।'

ফুরুৎ করে উড়ে গিয়ে কোথা থেকে সিগারেট এনে ঠোঁটে চেপে, আনাড়ী ধরনে দেশলাই ধরিয়ে কাশতে কাশতে আমায় দিয়ে বললে, 'ভালো না লাগলে

ফেলে দিয়ো।'

এ দুর্দিনে এরকম সোনামুখী খুশবোদার মিশরী সিগারেট পেল কোথায়?

বললে, 'জানেমন্ তিন মাস অন্তর অন্তর তিন তিন হাজার করে মিশর থেকে আনায়। আমাকে ধরাবার চেষ্টা করেছিল—পারে নি। কিন্তু কেউ খেলে সিগারেটের গন্ধ আমার ভালোই লাগে। ন্যাকরা করে ওয়াক্, থুঃ বলতে পারি নে।'

আমি বললুম, 'সর্বনাশ। এই সুপার স্পেশাল সিগারেট যিনি খান তাঁর জন্যে তুমি এনেছিলে আমার সেই ওঁচা সিগারেট!'

বললে, 'আমার বন্ধুর সিগারেট। জানেমন্ দুটো ধরিয়ে একটা আমাকে দিয়ে বললে, "এ সিগারেট খেতে তো তোর আপত্তি হবে না"।'

আমি শঙ্কিত হয়ে শুধালুম, 'তুমি কি বলেছিলে?'

'নির্ভয়ে বলেছিলুম, "লব-সুখ্‌তে!"—পোড়ার ঠোঁটো, পোড়ার মুখো, যা খুশী বলতে পার। ওই পোড়ার সিগারেট খেয়ে খেয়ে জানেমন্ তার ঠোঁট মভ্ করে ফেলেছে, দেখ নি?'

আমি শুধালুম, 'তন্ময় হয়ে কি পড়ছিলে? "গুড্ বাই টু ফ্রীড্‌ম্" ?'

বললে, 'সে কি? বরঞ্চ তোমার লীলা খেলা বন্ধ হল। কিন্তু আগে বলি, তোমার নিশ্চয়ই হাসি পাচ্ছে, একই কনেকে দু-দুবার বিয়ে করছ বলে? আমারও পাচ্ছিল।—হঠাৎ মনে পড়ল, তোমাকে বলেছিলুম, তুমি দ্বিচারী—তুমি বাস্তবে আমাকে আদর কর, আর স্বপ্নে আরেক জনকে। আল্লাতালা তাই একই শব্‌নমের সঙ্গে তোমার দু-দুবার বিয়ে দিয়ে তোমাকে দ্বিচারী বদনাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। স্বপ্নের শব্‌নম আর বাস্তবের হিমিকা এক হয়ে গেল। না?'

আমি বললুল, 'অতি সূক্ষ্ম যুক্তিজাল। কিংবা বলব হৃদয়ের ন্যায়-শাস্ত্র—নব্য "নব্য-ন্যায়"। তোমাকে তো বলেছি, হৃদয়ের যুক্তি তর্কশাস্ত্রের বিধিবিধানের অনুশাসন মানে না। আকাশের জল আর চোখের জল একই যুক্তিকারণে ঝরে না।'

আশ্চর্য হয়ে বললে, 'এ কথাটা তুমি আমাকে কক্‌খনো বল নি। এ ভারী নূতন কথা।'

আমি বললুম, 'হবেও বা, কারণ কোন্‌টা আমি তোমাকে বলি আর কোন্‌টা নিজেকে বলি এ দুটোতে আমার আকছারই ঘুলিয়ে যায়।'

আমার হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে শব্‌নম অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে

তাকিয়ে রইল।

আমি আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করতে লাগলুম, শব্‌নম কি গিরগিটি? সে যেমন দেহের রঙ বদলায় সেই রকম শব্‌নম চোখের রঙ ঘড়ি ঘড়ি বদলাতে পারে। আলোর ফেরফারে তো এত বেশী অদলবদল হওয়ার কথা নয়। এখন তো দেখছি শ্যাওলার ঘন সবুজ, অথচ এই অল্প কিছুক্ষণ হল দেখেছি একেবারে স্বচ্ছ নীল। তবে কি ওর হৃদয়াবেগ, চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের রঙও বদলায়! স্থির করলুম লক্ষ্য করে দেখতে হবে।

আমি মাথা নিচু করে, দুহাত দিয়ে তার মাথা তুলে, তার ঠোঁটের উপর ঠোঁট রাখলুম। আমার চোখ দুটি তার চোখের অতি কাছে এসে নিবিড় দৃষ্টিতে তার চোখের অতলে পৌঁছে গিয়েছে। শব্‌নম অজানা আবেশে চোখ দুটি বন্ধ করলে।

কতক্ষণ চলে গেল কে জানে? বুকের ঘড়ি যেন প্রতি মুহূর্তে প্রহরের ঘণ্টা বাজাচ্ছে। হিমিকাকে এই আমার প্রথম চুম্বন।

অনেকক্ষণ পরে, বোধহয় একশ বছর পরে, শব্‌নম তার ঠোঁট যতখানি সামান্যতম সরালে কথা বলা যায় সেটুকু সরিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'চুমো খাওয়া তোমাকেই সাজে। সেই নদীপাড়ে প্রথম হার মানার পর আমি মনস্থির করেছিলুম, সব জিনিস আমি দেব, আর তুমি নেবে। চুমো খাব আমি, আলিঙ্গন করব আমি, আর তোমাকে যে তোমার ছেলেমেয়ে দেব আমি,' সে তো জানা কথা। এখন দেখছি, তা হয় না। চুমো খাওয়া পুরুষেই সাজে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমি যদি বলি, তুমি যখন আমাকে চুমো খাও তখন আমার কাছে সেটা অনন্তগুণ মধুময় বলে মনে হয়?'

'বাঁচালে—' বলে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চাপ দিলে নিবিড় আবেশে।

জানি নে, কতক্ষণ, বহুক্ষণ পরে দেখি, শব্‌নম আমার কোলে মাথা রেখে যেন ঘুমুচ্ছে। বললে, 'আমার খোঁপাটা খুলে দাও।'

তারপর হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে আবার উড়ে গিয়ে ফিরে এল ফিরোজা রঙের চীনা কাচের একটি ডিকেণ্টার হাতে করে। কাচের ফিকে রঙের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কড়া লালের বেগনী আভা।

বললে, 'পার্দনে মোয়া মঁশের্—মাপ কর দোস্ত্—একদম ভুলে গিয়েছিলুম, তুমি আমার গালের টোল ভরে শীরাজী খেতে চেয়েছিলে।'

আমি রীতিমত ভয় পেয়ে বললুম, 'করেছ কি? এটা যোগাড় করতে গিয়ে জানাজানি হয় নি?'

শব্‌নম হেসে ফেটে আটখানা। বললে, 'তুমি কি ভেবেছ, তুমি মোল্লা-বাড়িতে বিয়ে করেছ? রাজা তিমুর থেকে আরম্ভ করে বাবুর হুমায়ুন—কে শরাব খেয়ে টং হয় নি বল তো? এ বাড়িতে আমার ঠাকুর্দা পর্যন্ত। তাঁর জমানো মাল এখনও নিচে যা আছে তা দিয়ে তিন পুরুষ চলবে।'

আমি বললুম, 'আমার দরকার নেই। আমি হাফিজের চেলা। তিনি বলেছেন,

"শর্করা মিঠা, আমারে বল না, হিমি! আমি তাহা জানি"—'

সঙ্গে সঙ্গে শব্‌নম গেয়ে উঠল,

'তবু সবচেয়ে, ভালবাসি ওই, মধুর অধরখানি!'

আমি বললুম, 'তুমি যে এত আলো জ্বালিয়েছ—তারও দরকার নেই—

"বলে দাও, বাতি না জ্বালায় আজি, আমোদের নাহি সীমা"—'

সেই আঁকশির উল্টো দিক দিয়ে আলো নেবাতে নেবাতে গুনগুন করে বার বার শব্‌নম গাইলে,

'আজ প্রেয়সীর মুখচন্দ্রের আনন্দ-পূর্ণিমা।'

তারপর ঘরের কোণ থেকে সেতার এনে আমার কোলের উপর বসে তার খোলা চুল আমার বুকের উপর ছেয়ে দিয়ে সমস্ত গজলটি বার বার অনেকবার গাইলে। তন্ময় হয়ে শেষের দুটি ছত্র অনেকক্ষণ ধরে, কখনও গুনগুন করে, কখনও বেশ একটু গলা চড়িয়ে গাইলে,

'প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেকো না হাফিজ! ছেড় না অধর লাল
এ যে গোলাপের চামেলির দিন—এ যে উৎসব-কাল!'

আমি একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'তোমার এত গুণ! তোমাকে আমি কোথায় রাখি। সুন্দর ইউসুফ শুধু যে সে-যুগের সব চেয়ে সুপুরুষ ছিলেন তাই নয়, তাঁর মত দূরদৃষ্টি নিয়ে জন্মেছিল অল্প লোকই, এবং সব চেয়ে বড় ছিল তাঁর চরিত্রবল। তাই তাঁর মা'র কোল থেকে কেড়ে নিয়ে তাঁকে বসিয়ে দিলে, সেই সুদূর মিশরের রাজ-সিংহাসনে।'

শব্‌নম বললে, 'হ্যাঁ। আর তাই মাতৃভূমি কিনানের স্মরণে,

"মিশর দেশের সিংহাসনেতে বসিয়া ইয়ুফ্ রাজা
কহিত, হায়রে! এর চেয়ে ভাল কিনানে ভিখারী সাজা!"'

দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে হাতে ধরে নিয়ে গেল দক্ষিণের দেয়ালের দিকে। থিয়েটারের পরদার মত একখানা মখমলের পরদা ছিল ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি ঝোলানো। একটানে সেটা সরাতেই সামনের খোলা পৃথিবী

তার অসীম সৌন্দর্য নিয়ে আমাকে একেবারে বাক্যহারা করে দিল।

দুখানা চেয়ার পাশাপাশি রেখে আমায় শুধালে, 'শীত করছে ?'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই পুস্তিনের একখানা ফারকোট দুজনার জানু থেকে পা অবধি জড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

এ সৌন্দর্য শুধু শীতের দেশেই সম্ভবে।

সমুদ্রের জল আর বেলাভূমির বালির উপরে পূর্ণিমার আলো প্রতিফলিত হয়ে যে জ্যোৎস্না চোখ ধাঁধিয়ে দেয় এখানে যেন তারই পৌনঃপুনিক দশমিক—এখানে শত শত যোজন-জোড়া নিরন্ধ্র সর্বব্যাপী ধবলতম ধবল বরফের উপর প্রতিফলিত হয়ে এক পক্ষের পূর্ণচন্দ্র যেন শত পক্ষের জ্যোতি আহরণ করেছেন, হিমানী-যোগিনী উমারানীর এক বদন-ইন্দু চৌষট্টি যোগিনীর মুখেন্দীবর দীপান্বিতায় রূপান্তরিত হচ্ছেন।

দূরে পাগমান পর্বতের সানুদেশ, চূড়া—তারও দূর দিগন্তে হিন্দুকুশের অর্ধ-গগনচুম্বী শিখর, কাছে শিশির ঋতুর নিদ্রাবিজড়িত বিসর্পিল কাবুল নদী, আরও কাছের সুপ্তিময় নিষ্প্রদীপ গৃহ-গবাক্ষ চন্দ্রশালা-হর্ম্যমালা, পল্লবহীন নগ্ন বৃক্ষ, হৃত-পত্র শাখা-প্রশাখা, উদ্বাহু মিনার-মিনারিকা, বিপরীতার্ধডিম্ব গম্বুজ, গোরস্তানের শায়িত সারি সারি কবরের নামলাঞ্ছন-প্রস্তর-ফলক—সর্ব সৌন্দর্য সর্ব বিভীষিকা, সর্ব সর্বাধিকারীর অলঙ্কার, সর্ব সর্বহারার দৈন্য, ভদ্রাভদ্র সকলের উপর নির্বিচারে প্রসারিত হয়েছে তুষারের আস্তরণ। আকাশের মা-জননী যেন এক বিরাট শুভ্র কম্বল দিয়ে তাঁর একান্নপরিবারের ধনীদরিদ্র রাজা-প্রজা তাঁর সর্বসন্তান-সন্ততিকে আবরিত করে তাদের পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়েছেন।

কী নৈঃশব্দ্য, নৈস্তব্ধ্য! রাজপথের দ্বিতীয়যামের মগ্নানুরাগী, সখা, কদ্রূপ সঙ্গীতস্তনিত গণিকাবল্লভ সকলেই একই প্রিয়ার গভীর আলিঙ্গন-সোহাগে সুষুপ্ত—সে প্রিয়া গৃহকোণের তপ্ত শয্যা। রাজপ্রাসাদের দুর্গপ্রাকারের প্রহর ডিণ্ডিম নিস্তব্ধ। কল্য উষার মধুর-কণ্ঠ মুআজ্জিন অদ্য নিশার নিদ্রাস্তরণে আকণ্ঠ বিলীন।

গম্ভীর প্রহেলিকাময় এ দৃশ্য। কে বলে একা, একটিমাত্র রঙ দিয়ে ছবি আঁকা যায় না? কে বলে একা একমাত্র, সা স্বর দিয়ে গান গাওয়া যায় না? কে বলে একা, একটি ফুল ভুবন পুলকিত করতে পারে না? এই সর্বব্যাপী শুভ্রতা-সৌরভে যে সঙ্গীত মধুরিমা আছে সে তো মানুষের সর্ব-চৈতন্যে প্রবেশ করে তাকেও বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে একাত্মদেহ করে দেয়। সৃষ্টিরহস্য তখন তার কাছে আর প্রহেলিকা থাকে না—সে তখন তারই

অংশাবতার। আমার হৃদয় তখন সে সৌন্দর্যে অবগাহন করতে করতে হিন্দুকুশ পেরিয়ে আমুদরিয়া তাশকন্দ ছাড়িয়ে বৈকালী হ্রদের কূলে কূলে সন্তরণ করছে।

আমাদের মাথার উপর পূর্ণচন্দ্র। এতক্ষণে আমার চোখ থেকে টেবিল ল্যাম্পের শেষ জ্যোতিঃকণার রেশ কেটে গিয়েছে। দেখি, প্রখর চন্দ্রালোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে শবনমের সিত ভালে, স্ফুরিত নাসিকারন্ধ্রে, ঈষতার্দ্র ওষ্ঠাধরে, সমুন্নত কঞ্চুলিকা শিখরাগ্রে। বেলাতটের নীলাভ কৃষ্ণাম্বুর মত তার চোখের তারায় গভীর নৈস্তব্ধ্য। গিরিকুমারীর মরালগ্রীবা, হিন্দুকুশ গিরির মতই ধবল-শুভ্র। এতদিনে বুঝতে পারলুম অক্ষতযোনি গৌরীকে কেন গিরিরাজতনয়া বলে কল্পনা করা হয়েছে।

পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললুম, 'হে কম্‌রুল কওকাব্। এই কম্‌রুন্নিসাকে আশীর্বাদ কর। হে ইন্দুবর—না, না,—হে ইন্দুমৌলি, তুমি একদা গিরিকুমারীর শুভ্রশুচিতার চরম মূল্য দিয়েছিলে। আজ এই কাবুলগিরিকন্যাকে তুমি তোমার প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ দেখাও। আমাদের বাতায়নপ্রান্তে এসে তোমার ইন্দীবর নয়ন উন্মীলন করে দেখ, এই কুমারীর কটিতট তোমারই মত, হে নটরাজ, তোমারই ডমরুকটির মত ক্ষীণচক্র—

"হেন ক্ষীণ কটি এ তিন ভুবনে নটরাজে শুধু রাজে
এ হিমা প্রতিমা আমারে বরিয়া নাহি যেন মরে লাজে।"

শবনম আবার সেই প্রথম দর্শনের দীর্ঘ স্মিতহাস্য দিয়ে ঘরের ভিতর চন্দ্রালোক এনে শুধালে, 'আমার নূর-ই-চশম্—আঁখির আভা,—কি ভাবছ?'

আমি বললুম, 'গিরিরাজ হিন্দুকুশকে বলেছিলুম, তোমার মঙ্গল কামনা করতে।'

'সে কি বুৎ-পরস্তী—প্রতিমাপূজার শামিল নয়?'

'আলবত নয়। আমি যখন আমার বন্ধুকে বলি, আমার মঙ্গল কামনা কর, তখন কি আমি তার পুজো করি? আমি যখন গিয়াস-উদ্-দীন চিরাগ-দিল্লির কবরে গিয়ে বলি, "হে খাজা, তুমি আমার মঙ্গল কামনা কর", তখন কি আমি তাকে খুদা বানাই? অজ্ঞজন যখন মনে করে ওই গোরের কোন অলৌকিক শক্তি আছে, অর্থাৎ গোরেই আল্লার অংশ বিরাজ করছে তখনই হয় বুৎ-পরস্তী।'

আপন মনে একটু হেসে নিয়ে বললুম, 'আর এই বুৎ-পরস্তী আরম্ভ হয় তোমাদের দেশেই প্রথম। আজ যে অঞ্চলের নাম জালালাবাদ তারই নাম সংস্কৃতে গান্ধার—'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। মনে পড়েছে। এখনও জালালাবাদের বকরী-ছাগলকে

কাবুল-বাজারে বলে বুজ্-ই গান্ধারী। তার পর বল।'

'আলেকজাণ্ডারের গ্রীক সৈন্যরা যখন সেখানে থাকার ফলে বৌদ্ধ হয়ে গেল তখন তারাই সর্বপ্রথম গ্রীক দেব-দেবীর অনুকরণে বুদ্ধের মূর্তি গড়ে তাঁর পুজো করতে লাগল—ভারতবর্ষের আর সর্বত্র তখনও বুদ্ধের মূর্তি গড়া কড়া মানা, এমন কি বুদ্ধকে অলৌকিক শক্তির আধার রূপে ধারণা করে তাঁকে আল্লার আসনে বসানো বৌদ্ধদের কল্পনার বাইরে। সেই গ্রীক বৌদ্ধমূর্তি হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে পড়বার পর, পরবর্তী যুগে সেই আর্টের নাম হল গান্ধার আর্ট।'

ভারি খুশি হয়ে বললে, 'ওঃ! আমরা মহাজন।'

আমি আরও খুশি হয়ে বললুম, 'বলে! এখনও কাবুলীরা আমাদের টাকা ধার দেয়।'

গম্ভীর হয়ে বললে, 'সে কথা থাক।' আরেকদিন এ কথা উঠলে পর শব্‌নম বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'ভারত আফগান উভয় সরকারে মিলে এ বদামি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

'আর তোমাদের মেয়ে গান্ধারী আমাদের ছেলে ধৃতরাষ্ট্রকে বিয়ে করেছিল। তাদের হয়েছিল একশটা ছেলে আর একটি মেয়ে।'

'ক'টি বললে?'

'একশ এক।'

আমার হাঁটুতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বললে, 'হায়, হায়! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমি স্থির করেছিলুম, আমিই তোমাকে একশটা আণ্ডা-বাচ্চা দেব। এখন কি হবে?'

আমি আনমনে বাঁ হাত তার গ্রীবার উপর রেখে চুলে পাক মেরে ডান হাতে ডগাগুলো পাকের ভিতর ঢুকিয়ে চাপ দিতেই খাসা এলো-খোঁপা হয়ে গেল।

শব্‌নম আপন জীবন মরণ সমস্যার কথা ভুলে গিয়ে, ফার্ কোটের ঢাকনা ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে শুধালে, 'তিনসত্যি করে বল, তুমি ক-জন মেয়ের খোঁপা বেঁধে দিয়ে দিয়ে এ রকম হাত পাকিয়েছ?'

আমি অপাপবিদ্ধ স্বরে বললুম, 'মায়ের হাত জোড়া থাকলে আমাকে খোঁপাটা শক্ত করে দিতে বলতেন।'

আস্তে আস্তে ফের পাশে বসে বললে, 'যাক্! তোমার উপস্থিত বুদ্ধি আছে।'

অর্থাৎ বিশ্বাস করল কি না তার ইস্‌পার-উস্‌পার হল না।

আমি বললুম, 'তুমি সেদিন আমার হাত টিপতে টিপতে বললে, আমার হাত

বড্ড নরম। আমি সরল ইমানদার মানুষ—কই আমি তো শুধাই নি, তুমি ক-জন পুরুষের হাত টিপে টিপে এ তত্ত্বটা আবিষ্কার করলে?'

'বিস্তর। আব্বা, জানেমন্—এ যাবৎ। টিপে দেব আরও বিস্তর। তোমার আব্বা—বল তো ভাই, তোমার জানেমন্ কজন?'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললে, 'ছিঃ! শওহরের সঙ্গে প্রথম রাত্রে তর্ক করতে নেই। তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে না, কি বই পড়ছি, যখন ঘরে ঢুকলে? আমার এক সখী বইখানা টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিলেন। 'শব্-ই-জুফ্‌ফাফ্'—'বাসররাত্রি'। আল্লা-রসুলের দোহাই দিয়ে বিস্তর ভালো কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এ বইয়ের লেখক একটা উপদেশ দিয়েছে পঞ্চাশ বার—"শওহরের ভালো মন্দ বিচার করতে যেয়ো না। তিনি আল্লার দেওয়া উপহার।" '

আমি পরম পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললুম, 'এ লেখক শতায়ু হন, সহস্রায়ু হন। আমি নিশ্চিন্ত হলুম—কারণ আমি—'

বাধা দিয়ে বললে, 'তুমি একটু চুপ কর তো। আমি তোমাকে যে-কথা বলবার জন্য জানলার কাছে নিয়ে এসেছিলুম সেইটের আখেরী সমাধান করতে চাই—এ নিয়ে যেন আর কোনদিন কোনও বাক্-বিতণ্ডা না হয়।'

আমি সত্যই ভয় পেয়ে বললুম, 'আমি যে ভয় পাচ্ছি, হিমিকা।'

'আবার! শোন।

'ওই যে পূর্ণচন্দ্র তাকে সাক্ষী রেখে বলছি—'

আমি জুলিয়েটের মত তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললুম, 'না, না, ওকে না। বরঞ্চ তুমি ফজরের আজানের পূর্বেকার শব্‌নম হিমিকার নাম করে—'

'তা হলে তোমার প্রিয় গিরিরাজ হিন্দুকুশের উপর যে চির হিমিকা বিরাজ করছে, প্রচণ্ডতম নিদাঘেও যার ক্ষয়ক্ষতি হয় না—তাকে সামনে রেখে বলছি, তার দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আত্মাবমাননা করো না, নিজেকে লঘু করে দেখো না। কুমারী কন্যা যে রকম প্রহরের পর প্রহর ধরে বছরের পর বছর আপন দয়িতের স্বপ্ন দেখে, মাতা যে রকম প্রথম গর্ভের কণিকাটিকে সোহাগ-কল্পনায় প্রতিদিন রক্তমাংস দিয়ে গড়ে তোলে, ঠিক তেমনি আমি তোমাকে তৈরি করেছি, সেই যে-দিন আমি প্রথম বুঝলুম, আমি অসম্পূর্ণ, আমি নিদ্রিতা শাহজাদী, আমি অন্ধ প্রদীপ, আমার দয়িত রাজপুত্র দূরদুরান্ত আমার প্রতীক্ষা-দিনান্তের ওপার থেকে এসে আমাকে সঞ্জীবিত করবে, অশ্রুজল সিঞ্চন করে করে আমি যে প্রেমের বল্লরী বাড়িয়ে তুলেছি, তারই করুণ করস্পর্শে পুষ্পে পুষ্পে

মঞ্জরিত হবে সে একদিন—আকাশ-কুসুম চয়ন করে করে রচেছি তার জন্য আমার শব্-ই-জুফ্‌ফাফের ফুলশয্যা, প্রার্থনা করেছি, সে রাত্রে যেন পূর্ণচন্দ্র গিরিশিখরের মুকুটরূপে আকাশে উদয় হয়। সূর্যের প্রেম পেয়ে সে হয় ভাস্বর, আমার অন্ধবদনও তেমনি জ্যোতির্ময় হবে আমার বঁধুর ওষ্ঠাধরের সামান্যতম ছোঁয়াচ লেগে।

'তাই যখন তোমাকে প্রথম দেখলুম তখন আপন চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি।

'আমি আমার হৃদয়ে ঝাপসা ঝাপসা যে স্কেচ এতদিন ধরে এঁকেছিলুম এ যেন হঠাৎ ভাস্করের হাতে পরিপূর্ণ নির্মিত মূর্তি হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। চিন্ময় মৃদু সৌরভ যেন মৃন্ময় নিকুঞ্জবনের কুসুমদামে রূপান্তরিত হল।

'টেনিস কোর্টে তাই তত সহজে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছিলুম কিন্তু সমস্তক্ষণই ভাবছিলুম অন্য কথা—

'মৃন্ময় চিন্ময় হয় সে আমি জানি। কি যেন এক ফলের কয়েক ফোঁটা রসকে শুকিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে করা হল ধুঁয়ো। তারই আড়াই পাক মগজের সেল্‌কে আলতো আলতো ছুঁতে না ছুঁতেই পথের অন্ধ ভিখারী দেখে, সে রাজ-বেশ পরে শুয়ে আছে বেহেশ্‌তের হুরীর কোলে মাথা দিয়ে। প্রণয়পীড়ায় ব্যথিত আতুর ক্রন্দন-প্রেয়সী হুরীরানী তারই দিকে তাকিয়ে আছে, করুণ নয়নে পথের ভিখারীর মত, যেন অভাগিনীর প্রেম-নিবেদন পদদলিত না হয়!

'অতদূর যাই কেন, আর এ তো নেশার কথা।

'একটি অতি তুচ্ছ কালো তিল। শীরজবাসিনী তুর্কী রমণী সাকীর গালে সেইটি দেখে হাফিজ তন্মুহূর্তেই তার বদলে সমরকন্দ্ আর বুখারা দিয়ে ফকীর হয়ে গোরস্তানে গিয়ে বসে রইলেন।

'কিন্তু চিন্ময় মৃন্ময় হয় কি করে?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি। পরে বুঝেছি, আরোও ভাল করে, মর্মান্তিক-রূপে—কান্দাহারে। আমার হৃদয়-বেদনা তো সম্পূর্ণ চিন্ময়। তারই পেয়ালা যখন ভরে যায় তখন সে উপচে পড়ে আঁখি-বারি রূপে। তুমি সুন্দর বলেছ, "আকাশের জল আর চোখের জল একই কারণে ঝরে না"—আমি তাতে যোগ দিলুম—তাদের উপাদানও সম্পূর্ণ আলাদা, একটা মৃন্ময় আরেকটা চিন্ময়, একটা বাঙ্ময়—সারা আকাশ মুখর করে তোলে, আরেকটা নৈঃশব্দ্যে বিরাজ করে সর্ব মনময়।'

আমি স্থির করেছিলুম, কিছু বলব না! শব্‌নমের আত্মপ্রকাশের আকুবাকু

আমার স্পর্শকাতরাকে অভিভূত করে দিলে। আস্তে আস্তে বললুম, 'আমাদের এক কবি বলেছেন, তুমি আমার প্রিয়, কারণ "আমার হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির"।'

বললে, 'সুন্দর বলেছেন। কিন্তু আজ আমি কবিতার ওপারে।

'বিশ্বাস করবে না, ডান্‌স্ হলের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় তোমাকে ভাল করে না দেখে হোটেলের বেয়ারা ভেবে যখন হুকুম দিয়েছিলুম, গাড়ি আনতে, তখনও ভেবেছিলুম এ কি রকম বেয়ারা—এর তো বেয়ারার বেয়ারিঙ নয়—ভালো করে তাকিয়ে দেখি, আজ পর্যন্ত যত মানুষ দেখেছি, যত বর্ণনা পড়েছি, যত ছবি দেখেছি এর বেয়ারিঙ তো তাদের একটার সঙ্গেও মিলছে না। তারপর কে যেন আমার বুকের ভিতরে ছবির খাতা মোচড় মেরে মেরে পাতার পর পাতা খুলে যেতে লাগল—তাতে ব্যথা—কিন্তু কী আনন্দ—এক এক বার তোমার দিকে তাকিয়ে দেখি আর ছবির দিকে তাকাই—কী অদ্ভুত—হুবহু মিলে যাচ্ছে। পথে যেতে যেতে, তোমার বাহুতে যখন আমার বাহু ঠেকল, খেলার জায়গায়, নদীর পাড়ে, তোমার ঘরে—এখনও দেখেই যাচ্ছি, দেখেই যাচ্ছি, এ দেখা আমার কখনও ফুরবে না। যেমন যেমন পাতা মিলিয়ে দেখছি, সঙ্গে সঙ্গে আরও নয়া নয়া তসবীর হয়ে যাচ্ছে।'

হঠাৎ সে হাঁটু গেড়ে আমার দুই জানু আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে বললে, 'ওগো, তুমি কেন ভাব, তুমি অতি সাধারণ জন? তোমার এই একটিমাত্র জিনিসই আমার বুকের ভিতর যেন ঝড় এনে আমার বুকের বরফ ধুনরীর মত তুলো-পেঁজা করে দেয়। আমার অসহ্য কষ্ট হয়। তুমি কেন আমার দিকে আতুরের মত তাকাও, তুমি কেন তোমার যা হক্ক তার কণাটুকু পেয়েও ভিখারীর মত গদ্‌গদ হও? তুমি কেন বিয়ের মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হতে না হতেই সদম্ভে কাঁচি এনে আমার জুল্‌ফ কেটে দাও না, তুমি কেন আমার মুখের বসন দু হাত দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেল না—সিংহ যে রকম হরিণীর মাংস টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়?'

আমি নির্বাক।

চাঁদ বহুক্ষণ হল বাড়ির পিছনে আড়াল পড়েছে। আবছায়াতেও শব্‌নমের চোখ জলজল করছে।

হঠাৎ মধুর হেসে সুধীরে তার মাথাটি আমার জানুর উপর রেখে বললে, 'না, গো, না। সেইখানেই তো তুমি। তোমার অজানতে তোমার ভিতর একজন আছে যাকে আমি চিনি। সে বলে, "আমার যা হক্কের মাল আমার কাছে

তাই এসেছে—আমার তাড়া কিসের।” আর জান, তুমিই একমাত্র লোক যে আমার প্রতি মুহূর্তে কবিতা উদ্ধৃতি শুনে কখনও শুধায় নি, তুমি বাস্তবে বাস কর, না, কাব্যলোকে? তুমিই একমাত্র যে বুঝেছে যে কাব্যলোকে বাস না করলে বাস কি করব ইতিহাস-লোকে, না দর্শনলোক না ডাক্তারদের ছেঁড়া-খোঁড়ার শবলোকে? আর এ সব কোনও লোকেই যদি বাস না করি তবে তো নেমে আসবও সেই লোকে—গাধা গরু যেখানে ঘাস চিবোয় আর জাবর কাটে।

‘কিন্তু এসব কিছু নয়, কিছু নয়। আসল কথা, সে তোমার মৃত্যুঞ্জয় প্রেম। আমি সুজাতা, সুচরিতা, সুস্মিতা আর আমার প্রেম যেন নববসন্তের মধু নরগিস—তোমার প্রেম ভরা-নিদাঘের বিরহরসঘন দ্রাক্ষাকুঞ্জ। তারই ছায়ায় আমি জিরবো, তারই দেহে হেলান দিয়ে আমি বসব, সেই আঙুর আমি জিভ আর তালুর মাঝখানে আস্তে আস্তে নিষ্পেষিত করে শুষে নেব। এই যে রকম এখন করছি।’

আমার মুখ কাছে টেনে নিল।

তারপর হঠাৎ হেসে উঠে শুধালে, ‘বল দেখি মেয়েরা অনেকক্ষণ ধরে চুমো খেতে পারে না কেন?’

‘কি করে বলব বল।’

দু-মিনিট মুখ বন্ধ করে থাকতে পারে না বলে। কথা কইতে ইচ্ছে যায়। আর শোন, জানেমন্ আমাকে ডেকে কি বললে, জান? ‘বললে, তুমি নাকি আমার আঁধার ঘরের অনির্বাণ বিজলি। তোমার বুকের ভিতর নাকি বিদ্যুৎ-বহ্নি। আমরা একশ বছর বাঁচলেও নাকি তোমার প্রেম ক্ষণে ক্ষণে চমক দিয়ে আমাকে নিত্য নবীন করে রাখবে। আর সবচেয়ে মারাত্মক কথা কি বলেছে, জান? বলেছে, আমি যেন তোমার কাছ থেকে ভালবাসতে শিখি।’

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ‘তার মানে তুমি আমাকে বেশী ভালবাস। তাঁকে অবিশ্বাস করি কি করে? চোখের রোশনী নেই বলে তিনি হৃদয় দেখতে পান।’

আমার আহ্লাদের দুকূল প্লাবিত হয়ে গেল। শব্‌নমকে বুকে ধরে বললুম, ‘বন্ধু তোমার ক্ষুদ্রতম দীর্ঘনিশ্বাস আমাকে কাতর করে। কিন্তু এখন যে দুশ্চিন্তায় তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সেটা দীর্ঘতর হোক।’

কান্না হাসিতে মিশিয়ে বললে, ‘আমি স্বামী-সোহাগিনী।’

কাবুল নদীর ওপারে সার-বাঁধা পল্লবহীন দীর্ঘ তন্বঙ্গী চিনার গাছের দল দাঁড়িয়ে

আছে বরফে পা ডুবিয়ে। যেন নগ্না গোপিনীর দল হর্ম্যসারির পশ্চাতে লুক্কায়িত রাধামাধব চন্দ্রের কাছ থেকে বস্ত্র ভিক্ষা করছে। তাদের ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে লাগল। চন্দ্রাভা পাণ্ডুর।

'এ কি ?' বলে উঠল হঠাৎ হিমিকা। 'এ কি ? এদিকে বলছি স্বামী-সোহাগিনী ওদিকে তার আরাম সুখের খেয়ালই নেই আমার মনে। তোমার ঘুম পায় নি ?'

আমি বললুম, 'না তো। তোমার ?'

'আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন সমস্ত জীবন ঘুমিয়ে এইমাত্র জেগে উঠলুম।'

উঠে গিয়ে আলমারি খুলে আমার জন্য পাজামা কুর্তা নিয়ে এল। বললে, 'দেখ দিকি মোটামুটি ফিট হয় কি না। আমি আন্দাজে সেলাই করেছি।'

গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে গেল, 'আমি তাকে নিয়ে যাব, আমার মায়ের বাড়িতে। মা আমায় শিখিয়ে দেবে। আমি তাকে পান করতে দেব সুগন্ধি মদিরা—আমারই ডালিম নিংড়ে বের করা রসের সুরভি মদিরা। তার বাম হাত রইবে আমার মাথার নিচে আর তার ডান হাত দিয়ে সে আমায় আলিঙ্গন করবে। আমার অনুরোধ, আমার আদেশ, অয়ি জেরুজালেম-বালা-দল আমার প্রেমকে চঞ্চলিত করো না, তাকে জাগ্রত করো না, যতক্ষণ সে না পরিতৃপ্ত হয়।...আমি তাকে নিয়ে যাব আমার মায়ের ঘরে—যে ঘরে আমার মা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। আমি তাকে পান করতে দেব আমারই ডালিম নিংড়ে—'

চার হাজার বৎসরের পুরাতন বাসর রাতি গীতি।

পুরাতন !

॥ ৮ ॥

তপ্ত শয্যায় শব্‌নমের গায়ে ঈষৎ শিহরণ। অচ্ছোদ সরসী নীরে রমণীর কম্পন ?

মোতির মালাটি গলাতেই আছে। আমি সেটি দানা দানায় অল্প অল্প ঘোরাতে ঘোরাতে একটা লকেটে হাত ঠেকল। বললুম, 'এর ভিতরে কিছু আছে ?'

চুপ।

আমি মালা ঘোরানো বন্ধ করে তার বুকের উপর হাত রেখে চুপ করে রইলুম।

হঠাৎ লেপ সরিয়ে উঠে উড়ল ঘরের কোণের অতিশয় ক্ষীণ শিখাটির দিকে। আমি দেখতে পেলুম, যেন ঝড়ে উড়ে গেল একটি গোলাপ ফুল, তার দীর্ঘ ডাঁটাটির চতুর্দিকে আলুলায়িত, হিল্লোলিত অতি সূক্ষ্ম, অতি ফিকে গোলাপী মসলিন। ক্ষীণালোকে তার প্রতিটি অঙ্গ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছেও না।

আলো জোর করে দিয়েছে। এখন প্রতি অঙ্গ—। আমি চোখ বন্ধ করলুম।

আমার পাশে শুয়ে লকেটটি খুলে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে, 'এই আমার শেষ গোপন ধন। এবারে আমি নিশ্চিন্ত হব।'

খুলে দেখি আমারই একটি ছোট্ট ফটো! অবাক হয়ে শুধালুম, 'এ তুমি কোথায় পেলে?'

বললে, 'চোখের জলে নাকের জলে।'

'সে কি?'—এত দিনে বুঝলুম, শব্‌নম কেন কখনও আমার ছবি চায় নি।

'আব্বা ইংরিজী কাগজ নেন—হিন্দুস্থানী। জশ্‌নের কয়েকদিন পরে তারই একটাতে দেখি পরবের সময় ব্রিটিশ লিগেশনে আর কাবুল টিমে যে ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছিল তারই খান তিন ফটো। কান্দাহার থেকে লিখলুম ওই কাগজকে ছবিটার কণ্টাক্ট্ প্রিণ্ট পাঠাবার জন্য। মূল্যস্বরূপ পাঠালুম, এ দেশের কয়েক-খানা বিরল স্ট্যাম্প—বিদেশে পয়সা পাঠানো যে কী কঠিন সেই জ্ঞান হল চোখের জলে নাকের জলে। সান্ত্বনা এই, যে লোকটার হাতে চিঠিখানা পড়েছিল সে নিশ্চয়ই স্ট্যাম্প বোঝে। আমাকে অনেক আবোলতাবোল ছবির মাঝখানে ওই ছবিও পাঠালে খান তিনেক। তোমার ছবি তুলে নিয়ে লকেটে পুরে দিলুম। হল?'

আমি কি বলব? আমি তার মুক্তামালারুদ্রাক্ষের শেষ প্রান্তের ইষ্টমন্ত্র!

দিনযামিনী সায়ম্প্রাতে শিশিরবসন্তে বক্ষলগ্ন হয়ে এ শুনেছে শব্‌নমের আকুলতা ব্যাকুলতা—প্রতি হৃদয়স্পন্দনে। একে সিক্ত করে রেখেছে শব্‌নমের অসহ্য বিরহশর্বরীর তপ্ত আঁখিবারি।

আমি কল্পনা করে মনে মনে সে ছবি দেখছি, না শব্‌নম কথা বলছে? দুটোর মাঝখানে আজ আর কোনও পার্থক্য নেই। কিংবা তার না-বলা-ব্যথা যেন কোন্ মন্ত্রবলে শব্দতরঙ্গ উপেক্ষা করে তার হৃদ্‌স্পন্দন থেকে আমার হৃদ্‌স্পন্দনে অব্যবহিত সঞ্চারিত হচ্ছে। কণ্ঠাশ্লেষে বক্ষালিঙ্গনে চেতনা চেতনায় এই বিজড়ন অন্ত রজনীর তৃতীয় যামে আমা দোঁহাকার জ্যোতির্ময় অভিজ্ঞান, অপূর্বলব্ধ বৈভব।

কত না সোহাগে কত না গান গুনগুন করে শব্নম সে রাত্রে আমাকে কানে কানে শুনিয়েছিল। লায়লী মজনূঁর কাহিনী।

বাঙালী কীর্তনিয়া যে রকম রাধামাধবের কাহিনী নিবেদন করার সময় কখনও চণ্ডীদাস, কখনও জগদানন্দ, কখনও জ্ঞানদাস, কখনও বলরাম দাস, বহু পুষ্প থেকে মধু সঞ্চয় করে অমৃতভাণ্ড পরিপূর্ণ করে, শব্নম ঠিক তেমনি নিজামী, কখনও ফিরদৌসী, কখনও জামী, কখনও ফিগানী থেকে বাছাই বাছাই গান বের করে তাতে হিয়ার সমস্ত সোহাগ ঢেলে দিয়ে আমাকে সেই সুরলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল যেখানে সে আর আমি দুজনা, যেখানে কপোতী কপোতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় উধ্বর্তর প্রেম গগনাঙ্গনে।

কপোত-কপোতী দিয়েই সে তার কীর্তন আরম্ভ করেছিল। বয়ঃসন্ধিক্ষণে মুকুলিকা লায়লী পুষেছিল কপোত-কপোতী। যৌবন দেহলি-প্রান্তে সে কপোত-কপোতীকে দেখে আধো আধো বুঝতে শিখলে প্রেমের রহস্য।

দেহ তখন আর লায়লীর সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারছে না। ওষ্ঠাধর বিকশিত হয়ে ডেকে এনেছে প্রথম উষার নীরব পদক্ষেপে গোলাপী আলোর অবতরণ। তারই দুপাশে শুভ্র শর্করার মত তার বদন-ইন্দুর বর্ণচ্ছটা, কিন্তু কপোল দুটির লালিমা হার মানিয়েছে বর্ষণ শেষের রক্তাক্ত সূর্যাস্তকে। রক্ত কপোল আর শুভ্র বদনপ্রান্তের মাঝখানে একটি কজ্জল-কৃষ্ণ তিল, যেন হাবশী বালক লাল গালের গোলাপ বাগানের প্রান্তদেশে খুলেছে শুভ্র শর্করার হাট। সে বালক তৃষিত। তারই পাশে লায়লীর গালের টোলটি। সে যেন আব্-ই-হায়াৎ, অমৃতবারির কূপ—অতল গভীর হতে উৎসারিত হচ্ছে অমৃতসুধা। স্মিত হাস্যের সামান্যতম নিপীড়নে উৎসমূলে যে আলোড়ন সৃষ্ট হয় তারই সৌন্দর্য প্লাবিত করে দেয় তার গুল্-বদন, ফুল্ল বল্লরী। সমুদ্র-কুমারীর চোখের জল জমে গিয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নেয় যে মুক্তা সে-ই এসে আলোর সন্ধান পেয়েছে লায়লীর ওষ্ঠাধরের মাঝখানে। সে ওষ্ঠে আমন্ত্রণ, অধরের প্রত্যাখ্যান—মজনূঁর ওষ্ঠাধর যেদিন এদের সঙ্গে সম্মিলিত হবে সেদিন হবে এ-রহস্যের চূড়ান্ত সমাধান।

তরুণ রাজপুত্র কয়েস দূর হতে প্রথম দর্শনেই অভিভূত হয়ে আকুলি-বিকুলি করে কি ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিল সে তার বাল্যসখাও বুঝতে পারে নি। সর্পদষ্টাতুরকে আত্মজন যে রকম স্বগৃহে নিয়ে আসে, সখা সেইরকম কয়েসকে নিয়ে গেল আপন দেশে।

অন্তঃপুরবাসিনী অসূর্যম্পশ্যা লায়লীকে প্রেমের পুকার, হৃদয়ের আহ্বান

পাঠাবে কয়েস কি করে?

এখানে এসে শব্‌নম যে কাহিনী বর্ণনা করল তার সঙ্গে আমাদের নল-দময়ন্তী কাহিনীর প্রচুর সাদৃশ্য আছে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে হৃদয়ের কন্দর্পভার ধারণে অসমর্থ নলরাজ কুসুমায়ুধের অগ্রদূত রূপে পাঠিয়েছিলেন বন্ধ-হংসকে, আর শব্‌নমের কাহিনীতে কয়েস লায়লীর নবশ্যামদূর্বাদল-বক্ষতলে পালিত কপোতকে বন্দী করে তার ক্ষীণপদে বিজড়িত করে পাঠিয়েছিল প্রেমের লিখন।

কি উত্তর দিয়েছিল লায়লী? কে জানে? কিন্তু আরব ভূমিতে আজও তাবৎ দরদী-হিয়া, শুষ্ক হৃদয়, সবাই জানে, সেই-দিন থেকে লায়লীর চোখে দেখা দিল এক অদ্ভুত জ্যোতি—ক্ষণে ক্ষণে কারণে অকারণে তার চোখে হিল্লোলিত হতে লাগল এক অদৃষ্ট-পূর্ব বিদ্যুৎল্লেখা।

রাজপ্রাসাদ থেকে যে দেওদার সারি চলে গেছে মরুভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত তারই শেষে ছিল ঝরনা-ধারা। এ দেওদার সুদূর হিমালয় থেকে আনিয়েছিলেন লায়লীর এক পূর্বপুরুষ। কিংবদন্তী বলে, শস্যশ্যামল-সজল বনভূমির শিশু দেবদারু একমাত্র তাঁরই সোহাগ-মাতৃস্তন্য পেয়েছিল বলে এই অস্থিশুষ্ক খরভূমিতে পল্লবঘন বীথিকা নির্মাণ করতে পেরেছিল।

আর সেই ঝরনায় জল আনতে যেত নগরিকার কুমারীগণ।

যুগ যুগ ধরে তরুণ প্রেমিক দেওদার গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বেণুরবে, কখনও বা গানে গানে প্রেমের আহ্বান পাঠিয়েছে প্রেমিকাকে।

দেবদারু অন্তরালে মরুভূমির সুদূর প্রান্তে ধীরে ধীরে উঠছে পূর্ণচন্দ্র। দীর্ঘ দেবদারুর ছায়ায় ছায়ায় যেখানে আলোছায়ার কম্প্রমান বেপথু আলিঙ্গন তারই পাশে গা মিশিয়ে দিয়ে মজনূঁ উদ্বাহু হয়ে ধীর স্থির কণ্ঠে লায়লীকে আহ্বান জানাচ্ছে অদৃশ্য গীতাঞ্জলি স্তবকে স্তবকে নিবেদন করে।

এ আহ্বান জনগণের সুপরিচিত কিন্তু আজ সন্ধ্যার এ আহ্বান যে রহস্যময় মন্ত্রশক্তি নিয়ে বসন্ত সমীরণের চঞ্চলমুখরতা মৌন করে দিল, দেবদারুপল্লবদলকে স্তম্ভিত করে দিল সে যেন ইহলোকবাসী মর মানবের ক্ষণমুখর হৃৎপিণ্ড স্পন্দনজাত নয়। গৃহে গৃহে বাতায়ন বন্ধ হল। হর্ম্যশিখর থেকে নাগর নাগরী দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল। বৃদ্ধেরা মক্কার উদ্দেশে মুখ করে আকাশের দিকে দু হাত তুলে প্রার্থনায় রত হলেন।

কার ওই ছায়াময়ী অশরীরী দেহ? কার হৃদয় ছুটে চলেছে দেহের আগে আগে—ওইখানে, যেখানে ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত উৎসধারা বিগলিত আলিঙ্গনে সিক্ত করে দিচ্ছে দেবদারুকুঞ্জকে?

চৈতন্যের পরপারে অজরামর অন্তহীন আলিঙ্গন।

বেহেশ্‌ত্‌ ত্যাগ করে ফিরিশতাগণ তাঁদের চুম্বনের মাঝখানে এসে আপন চিন্ময়রূপ বিগলিত করে দিলেন।

সংস্কারমুক্ত-জনও প্রিয়াসহ তাজমহল দর্শনে যায় না। যমুনা পুলিনের কিংবদন্তী বলে, হংস-মিথুন পর্যন্ত বৃন্দাবন বর্জন করে—তাজমহলের উৎসজল এক সঙ্গে পান করে না। যমুনা বিরহের প্রতীক। অপিচ বাসরঘর প্রথম মিলনকে চিরজীবী করে রাখতে চায়। সেখানে বিরহ-গাথার ঠাঁই নেই। শব্‌নম অতি সংক্ষেপে ক্ষীণ কাকলিতে লায়লী মজনূঁর সে কাহিনী ছুঁয়ে গেল—কনিষ্ঠা যে রকম ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিনে তার কনিষ্ঠতম ভীরু অঙ্গুলি দিয়ে গ্রামভারি সর্বাগ্রজের কপালে তিলক দেয়।

বর্ষাভোরের ঘন মেঘ হঠাৎ কেটে গেলে যে রকম শত শত বিহঙ্গ বনস্পতিকে মুখরিত করে তোলে ঠিক সেই রকম অকস্মাৎ বিচ্ছুরিত হল শব্‌নমের আনন্দ গান।

মর্ত্যের ধূলার শরীর আর মৃত্যুঞ্জয় প্রেমকে ধরে রাখতে পারল না। দিগ্বলয়-প্রান্ত থেকে যে রামধনু উঠেছে মধ্য-গগনের স্বর্গদ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত তারই উপর দিয়ে হাত ধরাধরি করে লায়লী মজনূঁ চলেছে অমর্ত্যলোকে। কখনও গহন মেঘমায়া, কখনও তরল আলোছায়ার মাঝে মাঝে, কখনও চূর্ণ স্বর্ণরেণু সূর্যরশ্মি কণা আলোড়িত করে, কখনও ইন্দ্রধনুর ইন্দুনিভ বর্ণবন্যায় প্রবহমাণ হয়ে তারা পৌঁছল স্বর্গদ্বারে। জয়ধ্বনি বেজে উঠেছে বেহেশ্‌তের আনন্দাঙ্গনে। পরিপূর্ণ প্রণয়-প্রতীক স্বর্গ হতে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সেখানে প্রত্যাবর্তন করছে অনিন্দ্য নবজন্ম নিয়ে, মরজীবনের জীর্ণ বাস ত্যাগ করে, সুরলোকের অসম্পূর্ণতা সর্বশ্রীময় করে দিতে।

সে কী ছবি! চতুর্দিকের হুরী ফিরিশতাগণের চোখে পলক পড়ছে না। দিব্যজ্যোতি ধারণ করে লায়লী মজনূঁ বসে আছেন মুখোমুখি হয়ে। ফিরিশতা-প্রবীণ জিব্‌রইল তাঁদের সম্মুখে ধরেছেন পানপাত্র—আল্লাতালা কুরান শরীফে যে শরাবুনতহুরা দেবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছেন তাই জিব্‌রইলের হাত থেকে তুলে নিয়ে লায়লী এগিয়ে ধরেছেন মজনূ্‌র সামনে। দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই সুধাপাত্র হতে।

চতুর্দিকে মধুর হতে মধুরতর সঙ্গীত :

হে প্রেম, তুমি ধন্য হলে লায়লী মজনূঁর বক্ষমাঝে স্থান পেয়ে।

হে প্রেম, তুমি অমরত্ব পেলে লায়লী মজনূঁর মৃত্যুর ভিতর দিয়ে!

খুদাতালার সিংহাসন থেকে ঐশীবাণী উচ্চারিত হল:

হে স্বরলোকবাসীগণ! প্রেমের দহন দাহে দগ্ধ হয়ে অর্জন করেছ তোমরা স্বরলোকের অক্ষয় আসন।

হে মর্ত্যবাসীগণ! সর্বচৈতন্য সর্বকল্পনার অতীত যে মহান সত্তা তিনি তাঁর বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপের একটি মাত্র রূপ স্বপ্রকাশ করেছেন মর্ত্যলোকে—তাঁর প্রেমরূপ।

তৃতীয় খণ্ড

॥ ১ ॥

যে মানুষ ছেলে-বয়স থেকে অন্ধের সেবা করেছে তার সেবা হয় নিখুঁত। এতখানি পাওয়ার পরও যে আমি শব্‌নমের সেবার দিকে খুঁতখুঁতে চোখে তাকিয়েছিলুম একথা বললে নিজের প্রতি অপরাধ করা হয়। আমি দেখেছিলুম, অনুভব করেছিলুম তার সেবানৈপুণ্য, আর্টিস্টের মডেল যে রকম ছবিটি যেমন যেমন এগোয় তাকে মাঝে মধ্যে সন্তুষ্ট নয়নে দেখা যায়।

ভোরবেলা অনুভব করলুম, চতুর্দিকে লেপ গুঁজে দেওয়ার সময় তার হাতের ভীরুস্পর্শ।

সকালবেলা সামনে যে ভাবে চায়ের সরঞ্জাম সাজালে তার থেকে বুঝলুম, কান্দাহারে যে হাত বুলবুল-গুলের মাঝখানে বিচরণ করেছে সে মাটিতেও নামতে জানে!

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, শব্‌নমের চোখ দুটি লাল। আমার হাতের পেয়ালা ঠোঁটে যাবার মাঝপথে থমকে দাঁড়াল।

শব্‌নম বুঝেছে। বললে, 'আজ অতি ভোরে বাবা কান্দাহারে চলে গিয়েছেন। তোপল্ খান এসে খবর দিলে, আমান উল্লা তাঁকে তাঁর শেষ ভরসার মালিকরূপে চিনতে পেরেছেন। বাবা জানেন, আমান উল্লার সর্ব আমির-ওমরাহ তাকে বর্জন করেছেন, কুরবানীর ছাগলকেও মানুষ জল দেয়, তারা—থাক্‌গে।

'যাবার সময় বলে গেছেন, তুমি যেন সকালবেলাই ব্রিটিশ লিগেশনে নিজে গিয়ে আমাদের বিয়ের দলিল জিম্মা করে আসো।'

'আর কি বলেছেন?'

'বলেছেন, সুযোগ পেলে তুমি একাই হিন্দুস্থানে চলে যেয়ো।'

'তুমি? সেই তো ভালো।'

'না। তুমি।' তার মুখ খুশীতে ভরে গিয়েছে। বললে, 'জান, আব্বা এখন তোমাকে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসেন। বললেনও, "কেন বেচারীকে আমাদের ঘরোয়া বিপদের ভিতর জড়ালুম!" এই প্রথম দেখলুম, বাবা কোনও কাজের জন্য অনুশোচনা করলেন। তখন আমি তাঁকে বললুম—অবশ্য আমি আগেই স্থির করে রেখেছিলুম, এক দিন না এক দিন জানেমন্‌কে দিয়ে বলাব—যে তোমাকে আমি আগের থেকেই ভালবাসতুম। আমাদের প্রথম শাদির কথাটা কিন্তু বলি নি। সেটা বলব, যেদিন তাঁর কোলে তাঁর প্রথম নাতি দেব। বাবা ভারী খুশী হয়ে নিশ্চিন্ত মনে কান্দাহার গেছেন।'

'আমি ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলুম। শেষটায় বললুম, তোপলের সঙ্গে একবার দেখা হল না।'

বললে, 'সে আস্তে আস্তে তোমাকে দেখে গেছে। তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে। আর তোমাকে বলতে বলে গেছে, সব-কিছু চুকেবুকে গেলে তার আপন দেশ মজার-ই-শরীফে আমাকে নিয়ে যেতে।'

ছোট্ট বাচ্চাকে মা যে রকম জামা-কাপড় পরাতে ইচ্ছে করে দেরি করে, প্রতিপদ চড়াবার পর বাচ্চাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, শব্‌নম ঠিক সেই রকম আমাকে জামা-কাপড় পরালে। যখন আমার জুতোর ফিতে বাঁধতে গেল মাত্র তখনই বাধা দিয়েছিলুম।

শব্‌নমের মুখ হাসি-কান্না মাখানো। তার পিছনে গাম্ভীর্য। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না।

দেউড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললে, 'বেশি দেরি করো না।'

তার পর কানে কানে বললে, 'তুমি আমার মিলনে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।'

বয়স্করা বেরুচ্ছে না—বাচ্চারা রাস্তায় খেলা করছে ঠিকই।

ইংরিজীতে প্রবাদ আছে, 'দেবদূত যেখানে যেতে ভয় পান, মূর্খেরা সেখানে চিন্তা না করে ঢোকে।' এর উল্টোটাও ঠিক। মৃত্যুভয় শুধু মূর্খের, তাই বয়স্করা রাস্তায় বেরুচ্ছে না। বাচ্চারা দেব-শিশু, তারা নির্ভয়ে খেলছে। যেটা খেলছে সেটা শুধু এই সময়েই এবং শীতের দেশেই সম্ভব। কাবুলের অষ্টাবক্রপৃষ্ঠ রাস্তায় জায়গায় জায়গায় জল জমে যায়—সে কিছু নূতন কারবার নয়—সেই জমা জল ফের জমে গিয়ে বরফ হয়ে দিব্য স্কেটিং-রিঙ্ক হয়ে দাঁড়ায়। সাবধানী পথিকও সেখানে পা হড়কে দড়াম করে আছাড় খায়। বাচ্চাদের সেইটেই স্বর্গপুরী।

অন্যত্র বলেছি, কাবুলীরা পয়জারে শত শত লোহার পেরেক ঠুকে নেয় বলে তার তলাটা সবসুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে হয়ে যায় পিছল। বাচ্চারা শুকনো মাটিতে একটুখানি দৌড়ে এসে সেই বরফের উপর নিজেকে ব্যালান্স্ করে সামনের দিকে একটু ভর দেয় এবং সাঁই করে বরফের অপর প্রান্তে পৌঁছে যায়। আমরা দেশে যে রকম নদীর ঢালু পাড়েতে জল ঢেলে সেটাকে পিছল করে সুপুরির খোল দিয়ে আসন বানিয়ে হড়হড় করে নিচে নেমে যাই।

মাঝে মাঝে দেউড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কোনও কোনও মা ছেলেকে গালিগালাজ দিয়ে বাড়ির ভিতরে ডাকে—'আয় পিদর-সুখ্‌তে—ওরে পিতৃদেহ (বাপকে পুড়িয়ে মারে), তোর বাপ নির্বংশ হোক—তোর যম বাড়ির ভিতরে না বাইরে? এখখুনি ভিতরে আয় বলছি।'

'মাদর-সুখ্‌তে' বা 'মাতৃদেহ' কখনও শুনি নি। বোধহয় উড়ো খইয়ের মত নরকাগ্নিকুণ্ডও 'জনকায় নমঃ'।

ব্রিটিশ লিগেশনের যে কর্মচারীর সঙ্গে আমার শ্বশুর মশায়ের কথাবার্তা হয়েছিল তিনি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আমি কিছু বলার পূর্বেই আমাকে অভিনন্দন জানালেন, মিষ্টিমুখ করালেন। ইনি পেশাওয়ারের লোক। তবে কি কৌটিল্য ওই অঞ্চলের লোক? গুপ্তচর বিদ্যা উত্তরাধিকারসূত্রে দাক্ষিণ্য পেয়েছেন? কিন্তু লোকটি চমৎকার। বিয়ের দলিলখানা লোহার সিন্দুকে তুলতে তুলতে বললেন, 'অনবদ্য হাতের লেখা। মনে হয়, দলিল নয়, ছন্দে গাঁথা অভিনন্দন পত্র। আমি যত শীঘ্র পারি বাচ্চাই সকাওকে কথাচ্ছলে জানিয়ে দেব যে হিন্দুস্থানে আফগানিস্থানে যুগ যুগ ধরে যে 'আঁতাঁৎ কর্দিয়াল'—'হার্দিক রাখী-বন্ধন'—গড়ে উঠেছে, এই বিয়ের মারফতে তারই এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হল।'

যিনি এতখানি সহৃদয় তাঁকে ওকীব-হাল করতে হয়। তবু একটু চিন্তা করে বললুম, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খান আজ ভোরে কান্দাহার চলে গেছেন।'

চমকে উঠে বললেন, 'সে কি!' একটু ভেবে বললেন, 'নিশ্চয়ই ছদ্মবেশে।'

আরও কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'এটা কি ভালো করলেন? আমি অবশ্য তাঁর রাজনৈতিক চালের কথা ভাবছি নে, আমি ভাবছি, তিনি এই দুর্দিনে সবাইকে কার হাতে ছেড়ে দিয়ে গেলেন?'

আমি কিছু বলবার পূর্বেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অবশ্য তেমন কিছু দুশ্চিন্তা করার নেই।'

এই ভদ্রলোক আমাকে সাধারণত সহজে ছাড়তে চান না। আজ অবশ্য

দেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে।

আমাদের দেশেই যখন বহু পাখি শীতকালে হাওয়া বদল করতে যায় তখন এই শীতের দেশে লতাপাতা কীটপতঙ্গহীন ঋতুতে থাকবে কে? তবু হঠাৎ দেখি, একজোড়া ক্ষুদে পাখি একে অন্যকে তাড়া করছে, বরফে লুটোপুটি খাচ্ছে, ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে পালক থেকে বরফের গুঁড়ো ঝাড়ছে। আমাকে দেখে উড়ে গিয়ে গাছের একটা ন্যাড়া ডালে বসল।

আমি জানি এসব পাখি মানুষের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে, এবং শুধু জৈনরাই পিঁপড়েকে চিনি খাওয়ায় তাই নয়, কঠোর-দর্শন কাবুলী খানসাহেবকে আমি জোব্বার জেব থেকে শুকনো রুটি বের করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দিতে দেখেছি।

আমি গাছটার কাছে আসতে আবার উড়ে গিয়ে রাস্তার পাশের আরেকটা গাছে বসল। আমার পকেটে কিছু ছিল না বলে বড় দুঃখ হল। কাবুল শহরে না পৌঁছনো পর্যন্ত এরা উড়ে উড়ে আমাকে সঙ্গ দিল।

শব্‌নমের যত কাছে আসছি আমার হৃদয়ের ক্ষুধা ততই বেড়ে যাচ্ছে। কাল রাতে তাকে পেয়েছি পাওয়ার সীমা ছাড়িয়ে। আর আজ এই ঘণ্টা দুইয়ের বিচ্ছেদে প্রাণ এত ব্যাকুল হয়ে উঠল? এতদিন পরে বুঝতে পারলুম, লাখ লাখ যুগ ধরে হিয়ায় চেপে রাখলেও হিয়া জুড়োয় না।

এ কি? বাড়ির সদর দরজা খোলা কেন? কাবুলে তো এরকম হয় না—শান্তির সময়ে, দিন দুপুরেও।

একটু ইতস্তত করে বাড়িতে ঢুকলাম। এ কি! এত যে চাকর দাস-দাসী আঙ্গিনা ভর্তি করে থাকে, আজও সকালে বিয়ের পরের দিনের কি এক পরব তৈরি করতে লেগে গিয়েছিল, তারা সব গেল কোথায়? জিনিসপত্র তেমনি ছড়ানো। সিঁড়ির মুখে একটা কলসী কাত হয়ে পড়ে আছে; তার জল জমা হয়ে খানিকটা বরফ হয়ে গিয়েছে। কাবুলীরা কি অমঙ্গল চিহ্ন চেনে না?

আমার বুকের ভিতর কি রকম করতে লাগল। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে!

কাকে ডাকি? আমি তো কারোরই নাম জানি নে।

হঠাৎ কি অজানা অমঙ্গল আশঙ্কা মনে জেগে উঠল। ছুটে গেলুম আমাদের বাসরঘরের দিকে। খোলা দরজা খাঁ খাঁ করছে।

'শব্‌নম', 'শব্‌নম'—চেঁচিয়ে উঠলুম। কোনও উত্তর নেই।

সব-কিছু সাজানো গোছানো। এক ট্রে চা পর্যন্ত। শুধু একদিকে একটি ছোট পেয়ালা চা—তার আধ পেয়ালা খাওয়া হয়েছে।

এঘর ওঘর সব ঘর খাঁখাঁ করছে। সেই পাগলের মত ছুটোছুটির ভিতর একই ঘরে ক-বার এসেছি বলতে পারব না। এমন কি জানেমনের ঘরেও গেলুম। সেখানে কেউ নেই।

আমার জ্ঞান বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। আঙ্গিনায় নেমে শুষ্ককণ্ঠে চেঁচাতে লাগলুম, 'কে আছ, কোথায় আছ?' 'কে আছ, কোথায় আছ?'

কতক্ষণ কেটে গেল কে বলতে পারে।

আমার পিছন থেকে কে এসে আমার দু-পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। এ বাড়ির চাকর। আমি ভাঙা গলায় যতই তাকে প্রশ্ন করি সে আরও চিৎকার করে কাঁদে। সে বরফের উপর শুয়ে পড়ে গোঙরাতে আরম্ভ করেছে।

দেউড়ি দিয়ে আরও লোক ঢুকছে। বাড়ির দাসদাসী। আমাকে ঘিরে তারা চিৎকার করে সবাই কাঁদছে। বুক-ফাটা কান্না—জিগরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। সবাই আমার পা, হাঁটু, জানু জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে।

এই অর্ধচেতন অবস্থায় বুঝতে পেরেছি, নিদারুণ অমঙ্গল না হলে এতগুলো মানুষ এরকম মাথা খুঁড়তে পারে না।

এরই মাঝখানে ভিড় ঠেলে সেই কলেজের ছোকরাটি আমার কাছে এগিয়ে এল। সেও পাগড়ির লেজ দিয়ে মুখ নাক ঢেকে সেটা বাঁ হাত দিয়ে ধরে আত্মগোপন করছে। প্রথমটায় আমিও তাকে চিনতে পারি নি। তার চোখে আতঙ্ক, ঘৃণা আর কান্না। পাড়া-প্রতিবেশীর ভিতর একমাত্র সে-ই সাহস করে দুঃসংবাদ দিতে এসেছে। যত বড় দুঃসংবাদই হোক আমি সেটা শুনব। অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা থেকে হোক সেটা দুঃসহতর অসহ্য। কানের কাছে মুখ রেখে চেঁচিয়ে বললে, 'শব্‌নম বীবীকে বাচ্চার সেনাপতি জাফর খানের লোক নিয়ে গিয়েছে—।' আমার পায়ের তলায় যেন কিছু নেই। ছেলেটি আমার কোমর দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আকুল কণ্ঠে বললে, 'হুজুর, এ-সময়ে আপনি অবশ হবেন না। আপনার জ্যাঠা শ্বশুরমশাই তাঁর সন্ধানে আর্ক দুর্গে গিয়েছেন। আপনাকে বাড়িতে থাকতে বলে গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন, আপনি যেন কিছুতেই না বেরোন।'

আমাকে ধরাধরি করে জানেমনের ঘরে পৌঁছে দিয়ে বললে, 'আমি আর্কে চললুম খবর নিতে।'

কতক্ষণ কি ভাবে কেটেছিল বলতে পারব না। দাসদাসীরা কাঁদছে। দু-একজন যেন কথাও বলছে, কান্নার সঙ্গে সঙ্গে। কেন সর্দার আওরঙ্গজেব চলে গেলেন? তিনি থাকলে তো এরকম হত না! কেন তিনি কড়া মানা করে গেলেন, কেউ যেন ডাকুদের সঙ্গে লড়তে না যায়? তোপল্ থাকলে, হুকুম পেলে একাই তো বিশজনকে শেষ করতে পারতো। ওরা—নিজেরাও তো কিছু কাপুরুষ নয়। আরও অনেক ফরিয়াদ তারা করেছিল।

এদের ভিতর যে সবচেয়ে বৃদ্ধ সে আমাকে বিছানা থেকে তুলে একটা চেয়ারে বসালে। তার চোখ শুকনো। মনে হল সে কাঁদে নি, কথাও বলে নি। আমি কোন কথা বুঝতে পারছি না দেখে আমাকে ধীর কণ্ঠে বললে, ছোট সাহেব, আপনি শক্ত হন। আপনি এ বাড়ির জোয়ান মালিক। আপনি ভেঙে পড়লে এই এতগুলো লোক পাগল হয়ে কি যে করবে ঠিক নেই। এরা প্রথমটায় প্রাণের ভয়ে প্রতিবেশীদের বাড়িতে লুকিয়েছিল। এখন আবার ক্ষেপে গিয়ে কি যে করবে বলা যায় না। বাচ্চার ডাকুরা লুটপাট করে নি কিন্তু এখন আর সবাই আসবে বাড়ি লুট করতে। আমি কিছুই বলি নি। এ বাড়িটা রক্ষা করাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।'

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললে, 'দেখুন হুজুর, এ বাড়ির কত সম্মান, কত বড় ইজ্জত। সর্দার আওরঙ্গজেব পরিবারের বাস্তুভিটে না হয়ে আর কারও হলে এতক্ষণে পাড়া-প্রতিবেশীরাই এ বাড়ির দোর জানালা পর্যন্ত লুট করে নিয়ে যেত।'

আমি তখনও কোন সাড়া দিচ্ছি নে দেখে হতাশ কণ্ঠে বললে, 'এই যে এতগুলো লোক, এদের জীবন-মরণ আপনার হাতে। সর্দার হুকুম দিয়েছিলেন, বাচ্চার লোককে যেন কোনও বাধা না দেওয়া হয়। এখন অন্য লোক লুট করতে এসে এদের মেরে ফেলতে পারে—আপনি হুকুম না দিলে এরা পাগলের মত কি করে ফেলবে তার কোনই ঠিক নেই।'

ওই একই কথা বার বার বলে।

'আপনার শ্বশুরমশাই, জ্যাঠশ্বশুর মশাই আপনার প্রতি যে আদেশ রেখে গেছেন সেটা পালন করুন। শব্‌নম বীবীর জন্য যা করার সে তাঁর জানেমন্ করবেন।'

এবারে শেষ অস্ত্র ছাড়লে—'তিনি ফিরে এসে যদি শোনেন আপনি ভেঙে পড়েছিলেন তখন তিনি কি ভাববেন!'

আমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আদেশ করলুম, ব্রিটিশ লিগেশনের লেই

ভারতীয় কর্মচারীকে সব খবর দিয়ে আসতে। কি ভাবে কি হয়েছিল আমি এখনও জানি নে—লিখে জানাব কী?

এইবারে তার চোখে জল এল। অস্ফুট কণ্ঠে আল্লার বিরুদ্ধে কি এক ফরিয়াদ জানালে। রওয়ানা হওয়ার সময় তবু তার মুখের উপর কি রকম যেন একটা প্রসন্নতা দেখা গেল। বোধ হয় ভেবেছে, তবু শেষটায় বাড়ির কর্ণধার পাওয়া গেল।

হায় রে কর্ণধার!

একজনকে আদেশ দিতে বাকীরা কি জানি কি ভেবে, অন্ধভাবে কি যেন অনুভব করে চলে গেল।

আমি শব্‌নমের—আমার—আমাদের, আমাদের মিলন রাত্রির ঘরে আর যাই নি।

শব্‌নম নাকি দাস-দাসীদের হাতিয়ার নিয়ে বাড়ি রক্ষা করতে দেয় নি। বোরকাটা পরে নিয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়েছিল। জানেমন্ ডাকাতদের বলেছিলেন, শব্‌নম বিবাহিতা রমণী। তাঁর কথায় কেউ কান দেয় নি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হন। দুজন লোক তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

আমাকে কি এঁরা বাড়ির তদারকির জন্যই রেখে গেলেন? আমি কি অন্য কোনও কাজের উপযুক্ত নই?

আমি যাব আর্কে? এ বাড়িতে আমার কি মোহ

এই সময়ে লোকে চা খায়। দেখি, শব্‌নমের বুড়ী সেবাদাসী চা নিয়ে এসেছে।

আমাকে একটি চিরকুট এগিয়ে দিলে। বোধহয় ভেবেছে, আমি কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়েছি।

দুটি মাত্র কথা। 'বাড়িতে থেকো। আমি ফিরব।'

আমি কাপুরুষ নই, আমি বীরও নই। এরকম অবস্থায় মানুষ ভানভণিতাও করতে পারে না। আমার ভিতরে যা আছে, তা ধরা পড়বেই।

বৃদ্ধকে বাড়িতে বসিয়ে যেতে পারতুম। অন্য কাউকে লিগেশনে পাঠালেই তো হত।

না, সর্দার হওয়ার মত ধাত দিয়ে বিধাতা আমাকে গড়েন নি।

কিন্তু লিগেশনে খবর পাঠাবার মত সম্বিতমান লোক ও-ই তো একমাত্র ছিল। অন্য কাউকে পাঠালে যে দুশ্চিন্তা থাকত সে লোকটা খবর ঠিক জায়গায় মত পৌঁছিয়েছে কি না।

না, সর্দার হওয়ার মত ধাত দিয়ে বিধাতা আমাকে গড়েন নি।

শব্‌নমের কোনও কথা তো আমি কখনও অমান্য করি নি। অনেকে অনেক কথা বলবে, অনেকে অনেক উপদেশ দেবে, তাই সে যাবার সময় স্থির বুদ্ধিতে পাকা আদেশ দিয়ে গিয়েছে।

এখন না হয় সবাই আমাকে বাড়িতে থাকতে বলছে, কিন্তু যদি বিপদ কেটে যায়, হাঁ, যদি বিপদ কেটে যায়, তবে একদিন সবাই ভাববে না যে আমি ভীরুর মত বাড়িতে হাত পা গুটিয়ে বসে রয়েছিলুম, সবাই যখন আর্কে!

হায় রে আত্মাভিমান! সবাই যেন বোঝে আমি বীরপুরুষ!

কার কাছে আত্মাভিমান? শব্‌নম কি এতদিনে জানে না, আমি বীর না কাপুরুষ! সে তো প্রথম দিনে—না, প্রথম মুহূর্তেই—আমাকে চিনে নিতে পারে নি?

লোকজনদের সবাই এখন আমার বাড়ি চেনে। একজনকে ডেকে বললুম, 'যাও তো, আব্দুর রহ্‌মানকে ডেকে নিয়ে এস।'

হে খুদাতালা, তুমি আমাকে পথ দেখাও। আমার আনন্দের দিনে তুমি আমাকে শিখিয়েছিলে তোমাকে স্মরণ রাখতে—আজ এই চরম সঙ্কটের দিনে সেই অনুগ্রহ কর, মহারাজ। আমি তোমাকেই স্মরণ করছি।

খবর এল, আব্দুর রহ্‌মান আমার ছাত্রের কাছ থেকে খবর পেয়ে প্রতিবেশী কর্নেলের ছেলেকে বাড়িতে বসিয়ে আর্কে চলে গেছে।

তারপর আমার মতিভ্রম আরম্ভ হল।

স্বপ্ন দেখি নি, সে আমি ঠিক ঠিক জানি। যেন স্পষ্ট, স্পষ্ট কেন স্পষ্ট হতেও স্পষ্টতর দেখতে পাচ্ছি, আমি মায়ের এক জানুতে, শব্‌নম অন্য জানুতে বসে আছে আর মা কলাপাতার সামোসাতে মোড়া ধান-দূর্বা আমাদের মাথার উপরে রেখে আশীর্বাদ করছেন। জাহানারা আর কুটি মুটি মাটিতে শুয়ে সক্কলের আগে নূতন চাচীর মুখ দেখবার চেষ্টা করছে।

সম্বিতে ফিরেছিলুম বোধ হয় মায়েরই পুণ্যবলে, তাঁরই আশীর্বাদের ফলে।

মনস্থর সামনে দাঁড়িয়ে। সেই কলেজের সহৃদয়, বীর ছেলে।

নতমস্তকে বললে, 'আপনার জ্যাঠশ্বশুর সোজা নূতন-বাদশা বাচ্চা-ই-সকাওয়ের দরবারে চলে যান। সে আর্কে ছিল না। তিনি মোল্লাদের উদ্দেশ করে জাফর খান এবং তার দলবলকে চিৎকার করে অভিসম্পাত দিতে থাকেন। তাঁকে একটা ছোট কুঠরিতে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বললুম, 'তুমি আমার অনেক

উপকার করলে। এর চেয়ে মহত্তর কোনও গুরুদক্ষিণা নেই।'

রাস্তায় নেমে বললুম, 'এবারে তুমি বাড়ি যাও।'

বাড়ির লোক আবার অট্টরোল করে উঠেছে। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে আমাকে বার বার যেতে মানা করছে, আর বলছে সেখানে গিয়ে কোনও লাভ নেই।

আশ্চর্য! ওদের কথা, ওদের অনুনয় আমি ঠিক মত শুনি নি কিন্তু নেড়া চিনার গাছের ডগায় যে ষোড়শীর চাঁদ উঠেছে সেটা ঠিক লক্ষ্য করেছি। বুকে যেটুকু রক্ত ছিল সেও যেন জমে গেল। কাল রাত্রে শব্‌নম এই চাঁদের—

রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। আর্কে ঢোকে কার সাধ্য। ঘোড়সওয়ার অনেক। তারা বেপরোয়া মানুষের ভিতর দিয়ে, উপর দিয়ে, তাদের জখম করে চলেছে আরও বেপরোয়া হয়ে আর্কের দিকে, আর আর্কের ভিতর থেকে আরেক বিরাট জনধারা বেরিয়ে আসতে চাইছে শহরের দিকে। দু-দিক থেকেই জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই এবং দুই জনোচ্ছ্বাস মিলে গিয়ে যে খণ্ড খণ্ড আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে কোনও দিকেই কেউ এগুতে পিছোতে পারছে না। অথচ চাপ দুদিক থেকে বেড়েই যাচ্ছে ক্রমাগত। কেউ যেন আপন সম্বিতে নেই।

এই প্রথম আমি আমার আপন সম্বিতে ফিরে এলুম।

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, এ জনতা ভেদ করে মনসূরের আসতে সময় লেগেছিল কেন?

হঠাৎ দেখি, দূরে তিন জন ঘোড়সওয়ার জনতার উপর মাথা তুলে আর্ক থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে আসছে। তাদের গতি অতি মন্থর, কিন্তু দৃঢ়। মাঝখানের সওয়ার নিষ্ক্রিয়, নিরুদ্বেগে বসে আছে। দু-পাশের দুই সওয়ার বল্লম না কি দিয়ে যেন নির্মমভাবে উন্মত্ত জনতাকে খোঁচা দিচ্ছে, পথ করে দেবার জন্য।

চাঁদের আলো মুখে পড়েছে। এ কি? এ তো জানেমন্‌!

চিৎকার করে উঠেছিলুম, 'জানেমন্‌, জানেমন্‌, জা—।'

কে শোনে?

আমার শরীরে হাতির বল থাকলেও আমি তাঁর দিকে এগুতে পারতুম না। জনতরঙ্গের যে সামান্যতম গতিবেগ সে আমাকে নিয়ে চলেছে বড় রাস্তার দিকে।

নিরঙ্কুশ দুর্ভাগ্য সারি বেঁধে আসছে দেখে নিপীড়িত জন পাচ্ছে অজ্ঞান

হয়ে সর্ব যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পায় তাই ব্যঙ্গরাজ কিস্মতধিপতি মাঝে মাঝে অভাগার কপালেও লক্ষ্মীর অঞ্চল বুলিয়ে দেন। আমি জনপীড়ায় অনিচ্ছায় সরছি শহরের দিকে, জানেমনের গতিও সেদিকে—যদিও তিনি অনেক দূরে। একটুখানি কম ভিড়ে পৌঁছতেই আমি নেমে গেলুম রাস্তার পাশের বরফ-জমা নয়ানজুলিতে। সেখানে তাঁর পৌঁছতে লাগল যেন অনন্তকাল। চার-পাঁচ জন লোক তাঁর ও অন্য দুই ঘোড়সওয়ারের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলেছে—এদের দলেরই হবে। এদেরই একজন আমাকে চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে জানেমন্‌কে ডেকেছিলুম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় নি।

জানেমনের মুখের দিকে আমি এক লহমার তরে তাকিয়েছিলুম।

বিকৃত, বিকট, বীভৎস—যেন এর কোনটাই নয়—কিংবা সব কটাই—তিনি কিন্তু সেগুলো যেন সংহরণ করে নিয়েছেন রুদ্ররাজ পূষনের মত। এক চোখ দিয়ে রক্ত ঝরে বাম গালে জমে আছে।

তিনি নেমে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর হৃদ্‌স্পন্দন আমি অনুভব করতে পারি নি। শুনেছি, যোগীরা নাকি স্বেচ্ছায় সেটা বন্ধ করে দিতে পারেন। মনে হল, তিনি স্বেচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে!

ঘোড়সওয়াররা আর্কের দিকে ফিরে গেল। সঙ্গীরা পিছনে পিছনে এল। তাদেরই একজন শুধু বার বার বিড়বিড় করে বলছে, 'আমার কোনও দোষ নেই।'

জানেমন্ আমাকে হাতে ধরে নিয়ে যে ভাবে দৃঢ়পদে চলেছেন তাতে আমাকেই জ্যোতিহীন বলে মনে হবে। তিনি কোনও কথা বলছিলেন না। তবু বুঝলুম, তিনি আমাদের কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন। মাঝে মাঝে শুধু আমার ডান হাতখানা তাঁর বুকের উপর চেপে ধরছিলেন। আমার অশান্ত ভাব দেখে শেষটায় বললেন, 'শব্‌নম আর্কে নেই। তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।'

বাড়িতে ঢুকলে আবার কান্নার রোল পড়ল। শব্‌নমের বাড়ি ফেরার ক্ষীণতম আশাটুকুও আমাদের গেল।

॥ ২ ॥

জানেমন্ বললেন, 'বাছা, এবার নমাজের সময় হয়েছে। তুমি ইমাম হও।'

বয়োজ্যেষ্ঠ সচরাচর নমাজের ইমাম—অধিপতি—হন। বিকলাঙ্গ হন না। আমি আপত্তি জানাতে তিনি উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন, 'আর, নমাজের শেষে দোওয়া মাঙ্‌বার সময় কোনও কিছু চেয়ো না। ওঁর যা প্রাপ্য তাঁকে তাই দেব।'

আল্লার উপর অভিমান!

মনস্থরের কাছে সব শুনলুম।

বাচ্চা-ই-সকাও আর্কে ছিল না—জানেমন্ যখন সেখানে পৌঁছন। বাচ্চার খাস কামরার দিকে তিনি রওয়ানা হলে কেউ বাধা দেয় নি।

মনস্থর বললে, 'আপনি জানেন না, হুজুর, এদেশের লোক বড় সাহেবকে কি সম্মানের চোখে দেখে। শুধু কি বাচ্চার জন্মভূমি?—ময়মনা হিরাত, মজার বদখ্‌শান সর্বত্রই লোকে জানে তিনি স্থফী, তিনি আল্লার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। ডাকাতদের ভিতরও জাফর খান কি সহজে অত ঘোরতর পাষণ্ড খুঁজে পেয়েছিল যারা শব্‌নম বীবীকে ধরে—' ঢোক গিলে বললে, 'আমি বলছি, নিয়ে যেতে! এবং তারাও কি শেষ পর্যন্ত বাঁচবে?'

'বড় সায়েব বাচ্চার খাসকামরায় শব্দ শুনে বুঝলেন, মোল্লারা সেখানে জমাঅৎ। এরা কাবুল শহরের সব চেযে অপদার্থ। আমান উল্লার আমলে এরা প্রায় ভিক্ষা করে জিন্দেগী চালাচ্ছিল। এদের কোন গোসাঁই বড় সায়েবের মুন-নেমক খায় নি—তিনি তো দানের সময় পাত্রাপাত্র বিচার করেন না।

'বড় সায়েব সেখানে দাঁড়িয়ে বাচ্চাকে অভিসম্পাত করতে লাগলেন।

'সে আমি আপনাকে বলতে পারব না, হুজুর; এ তো গালগালাজ, চিৎকার চেঁচামেচি নয়। তিনি শান্ত, দৃঢ়, উচ্চকণ্ঠে যেন আল্লার হয়ে পৃথিবীর সর্ব নরাধম পশুকে তাদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করে যাচ্ছিলেন।

'হঠাৎ তাঁর বন্ধ চোখ ফেটে রক্ত বেরল। আমার শোনা কথা, যৌবনে চোখের অপারেশন প্রায় শুকিয়ে গিয়ে জ্যোতি ফিরে পাবার মুখে তাঁর গলায় কি আটকে গিয়ে তিনি বিষম খান। তখন ব্যাণ্ডেজের উপর দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। সেই হয় সর্বনাশ। আজ আমি দেখি, কোনও কিছু না, হঠাৎ বন্ধ

চোখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

'পাপ-পুণ্যের কি জানি, হুজুর? আপনার কাছেই তো শিখছি। জানি কুমারী, বিধবা কোনও অবলাকে ধরে নিয়ে যাওয়া পাপ—আর ইনি তো বিবাহিতা রমণী। মোল্লারা, ওই অপদার্থ মোল্লারা—'

আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, 'সব মোল্লাই কি—?'

বললে, 'সে আমি জানি, হুজুর। আপনিও তো একদিন ক্লাসে নিজেকে মোল্লা বংশের ছেলে বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। আমিও মোল্লা, মোল্লার বেশে ওইখানে গিয়েছিলুম বলে।

'সেই মোল্লাদের প্রবীণ যিনি, তাঁর আদেশে বড় সাহেবকে একটা কুঠরিতে নিয়ে বন্ধ করে রাখা হল। তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর সে বললে, "কি বলতে কি বলে ফেলবেন ইনি। হাজার হোক নূতন বাদশাকে চটিয়ে লাভ কি?" হয়তো এরা সত্যিই আমাদের সাহায্য করতে চেয়েছিল।

'ফরসা লোকও ভয়ে পাংশু হয়—নির্লজ্জও লজ্জা পায়।

'সে সব কথা থাক।

'সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ খবর এল—কি করে, কোথা থেকে জানি নে, শব্‌নম বীবী জাফর খানকে গুলি করে মেরে ফেলেছেন।

'হুজুর, আপনি শক্ত হন।

'আর জাফরের যে দেহরক্ষী শব্‌নম বীবীকে বন্দী-খানায় নিয়ে যাচ্ছিল সে ও শব্‌নম বীবী দুজনেই অন্তর্ধান করেছেন।'

আমি বেরুবার জন্য তৈরী ছিলুম। বললুম, 'বৎস, তুমি আমার অনেক উপকার করেছ। এখন তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি সন্ধানে বেরই।'

সে বললে, 'আপনি সব কথা শুনে নিন। বড় সায়েব সেই হুকুম করেছেন।

'যে রক্ষী শব্‌নম বীবীকে নিয়ে যাচ্ছিল সে এখন বড় সায়েবের পা ধরে কাঁদছে। তাকে ডাকব, না আমি বলব? আদেশ করুন।'

আমি কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না।

বললে, 'ওর বাপদাদা সায়েবের নুন খেয়েছে কান্দাহারে। সে ডাকাত হয়ে বাচ্চার দলে ভিড়েছে। সে যা বলেছে তার মূল কথা শব্‌নম বীবীকে প্রথমটায় একটা কুঠরিতে বন্ধ করে রাখা হয়। সন্ধ্যার দিকে জাফর তাকে ডেকে পাঠায়। জাফর সে ঘরে একা ছিল। ভিতরে কি হয়েছিল কেউ বলতে পারবে না একমাত্র শব্‌নম বীবী ছাড়া। হঠাৎ একটি মাত্র গুলি ছোঁড়ার শব্দ

হল। দেহরক্ষীর দল যা দেখবে ভেবেছিল, তার উল্টোটা। জাফর খান ভুঁয়ে লুটিয়ে আর শব্‌নম বীবীর হাতে পিস্তল। হাসান আলী—আমাদের এই রক্ষী—বললে, সে কিছুই জানত না। আর পাঁচজন রক্ষীর সঙ্গে ছুটে গিয়ে সে এই প্রথম দেখলে তার মনিবদের ঘরের মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে।

'হাসান আলী ডাকাত—আহাম্মুখ নয়। সে তখন নাকি শব্‌নম বীবীকে বন্দীখানায় নিয়ে যাওয়ার ভান করে আর্কের দেউড়ির দিকে রওয়ানা দেয়।'

মনে পড়লো, শাস্তির সময়ও জানতুম না, শব্‌নমকে কোথায় খুঁজতে হবে।

'ইতিমধ্যে বাচ্চা-ই-সকাও আর্কে ফিরেছেন এবং তার কিছুক্ষণ পর হাজার হাজার লোক, এবং শত শত ঘোড়া-গাধা-খচ্চর চড়ে গাঁয়ের লোক এসেছে নূতন বাদশাকে অভিনন্দন জানাতে—সোজা ফার্সীতে বলে, ইনাম, বখশিশ, লুটেরা হিস্তা কুড়োতে। এরা একবার আর্কে ঢুকতে পারলে বেশ কিছুটা খণ্ড-যুদ্ধ লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়। জাফর খান তাই আগেই হুকুম দিয়ে রেখেছিল, জনতা দুর্গে ঢোকবার চেষ্টা করলে তাদের যেন ঠেকানো হয়। লেগে গেল ধুন্ধুমার। আপনি তার শেষটুকু দেখেছেন, হুজুর—বুঝুন তখন কি হয়েছিল।

'বাচ্চা ফিরতেই মোল্লারা তাকে সব-কিছু বলে শব্‌নম বীবীকে ছেড়ে দিতে বলে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাকি খবর আসে জাফর খান খুন হয়েছে। এবং আশ্চর্য, শব্‌নম বীবীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাচ্চার হুকুমে সমস্ত আর্ক তন্ন তন্ন করে তালাশ করা হয়েছে।'

আমি শুধালুম, 'হাসান আলী কি বলে?'

'ওই এক কথা—"আমার কোনও দোষ নেই, আমার কোনও কসুর নেই।" ভিড়ের চাপে নাকি একে অন্যের কাছ থেকে ছিটকে পড়ে।'

'সে কতক্ষণ হল?'

'ঘণ্টা দুই হবে। আপনি তো সে ভিড়ের এক আনা পরিমাণ দেখলেন।'

'হাসান আলীকে ডাক।'

এল। আমার যা জানার সব চেয়ে প্রয়োজন সে কি আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুধিয়ে জিজ্ঞেস করি নি! ওই এক কথা। হাসান আলী হঠাৎ দেখে, শব্‌নম বানু তার কাছে নেই—ওই এক কথা।

আমি মনস্থরকে বললুম, 'চল।'

দেউড়িতে এসে মনস্থর শুধালে, 'কোথায় যাবেন, হুজুর ?'

তাই তো। কোথায় যাব ? 'চল, আর্কে। না। চল, আব্দুর রহ্‌মান কোথায় দেখি।'

কর্নেলের বাড়ি পৌঁছতে মনস্থর সেখানে খবর নিলে। যখন ফিরলো তখন তার মুখ থেকেই আমি বুঝতে পারলুম, কোনও খবর নেই। মনস্থর কিছুক্ষণ পরে বললে, 'কর্নেলের বীবী আপনাকে বলতে বললেন, শব্‌নম বীবীকে লুকোবার প্রয়োজন হলে তিনি প্রস্তুত আছেন। তাঁদের গাঁয়ের বাড়ি সম্পূর্ণ নিরাপদ।' তার পর মনস্থর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'কর্নেলের মত সজ্জন লোক মারা গেলেন যুদ্ধে—আর বেঁচে রইল এই ডাকাতরা।' তারপর বিড়বিড় করে স্কুলপাঠ্য বই থেকে বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করল, "তন্বঙ্গী কুমারী লজ্জা নিবারণের ট্যানা নেই বলে বাড়ি থেকে বেরতে পারছে না, আর ওদিকে বড় লোকের কুকুর মখমলের বিছানায় শুয়ে আছে। হে সংসার, আমি তোমার মুখের উপর থুথু ফেলি।"

আমি কি বলব, কি ভাবব। মনস্থরের দার্শনিক কাব্যবৃত্তি আমার ভালোও লাগে নি মন্দও লাগে নি।

মনস্থর শেষ কথা বললে, 'কিন্তু দেখুন হুজুর কর্নেলের স্ত্রী ভেঙে পড়েন নি।'

আমি গুরু সে শিষ্য।

মনে নেই, হয়তো কোনও দিন ক্লাসে চরিত্রবল সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলুম।

আব্দুর রহ্‌মান বাড়ি ফেরে নি।

কাবুল নদীর পোলের উপর তার সঙ্গে দেখা। গায়ে ওভারকোট নেই। বাকি জামা-কাপড় টুকরো টুকরো। মনস্থর তার সঙ্গে কথা বললে। বলার শোনার কিছু নেই। আব্দুর রহ্‌মান ঘণ্টা তিনেক ওই জনসমুদ্র মন্থন করেছে। গালে, বাহুতে, হাতের কাছে জখমও তার দেখতে পেলুম। কোনও গতিকে পা টেনে টেনে চলে আসছিল। কিছুতেই বাড়ি যেতে রাজী হল না।

আর্কের সামনে দুটি-একটি লোক। সেখানে মার্শল ল। পাঁচজনের বেশী একত্র দেখলে সান্ত্রীদের গুলি চালানোর হুকুম। জায়গাটা এখন প্রায় ফাঁকা।

আব্দুর রহ্‌মান মনস্থরকে বললে, 'হুজুরকে বলুন, এ জায়গায় সব তন্ন তন্ন করে দেখেছি। এই পেয়েছি।'

তাকিয়ে দেখি আমার পাঞ্জাবির—আমারই হবে—এক পাশের ছেঁড়া কাপড়ের সঙ্গে একটি পকেট। এদেশে এরকম সাইড পকেটওয়ালা পাঞ্জাবি হয়

না। এটা শব্‌নম আমার কাছ থেকে নমুনা হিসেবে নিয়ে গিয়েছিল, একদিন ওইটে আমার ঘরে পরেছিল।

এইটে পরেই কি সে আর্কে এসেছিল?

দয়াময়, দয়া কর।

অনেকক্ষণ পর মনস্থর মৃদুস্বরে ফের শুধালে, 'কোথায় যাবেন, হুজুর?'

'তোমার বাড়ি।'

ভারি খুশী হয়ে বললে, 'তাই চলুন হুজুর।' আমি তাকে খুশী করার জন্য প্রস্তাবটি করি নি। তার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য। নেমক-হারামী? হ্যাঁ। কিন্তু আমি একা, একবার নিজের সঙ্গে একা হতে চাই।

আব্দুর রহ্‌মানকে নিয়েও বিপদ। শেষটায় যখন বললুম, কর্নেলের ছেলেকে বসিয়ে রাখার হক্ক আমাদের নেই—তার মা ওদিকে হয়তো ব্যাকুল হচ্ছেন তখন সে রাজী হল। বাড়িতে ঢোকবার সময় হঠাৎ তার মুখে হাসি ফুটল। কেন? হায় রে! যদি বীবী সায়েবা ওই বাড়িতে ওঠেন।

মনস্থর আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, সে জানে, আমি সমস্ত দিন কিছু খাই নি। আগের রাত্রে কতখানি খেয়েছিলুম, সে পাশে বসে দেখেছে—সে তো বরের খাওয়া!

তার প্রত্যেকটি কথা আমার বুকে বিঁধছিল। কেন সে কাল রাত্রের কথা আমাকে স্মরণ করায়? আমি বললুম, 'বাবা, আমি এখন কিছু খেতে গেলে বমি হবে।'

কোথায় যাই? কোথায় সন্ধান করি? কোথায় গেল সে? একটা মানুষ কি করে হঠাৎ অদৃশ্য হতে পারে? কেন দেখা দিচ্ছে না? জাফরকে খুন করল কাদের ভয়ে? খবর পাঠাচ্ছে না কেন? আমাকে জড়াতে চায় না বলে? কিংবা—কিংবা—না, না, আমি অমঙ্গল চিন্তা করব না।

এই দুপুর রাত্রে কার কাছে গিয়ে আমি সন্ধান নিই? কড়া নাড়লে তো কেউ দরজা খুলবে না। নিশ্চয়ই ডাকাত—বাচ্চার ডাকাত। গৃহস্থ গুলি ছুঁড়তে পারে। তা ছুঁড়ুক।

মাত্র একটি প্রাণীর কথা মনে পড়ল। শব্‌নম বিয়ের রাতে বলেছিল—না পরে? আমার যে সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে—যে তার সখীদের সে ভুলে গিয়েছে। তখন একজনের নাম ও করেছিল। সে-ই তা হলে সব 'চেয়ে তার প্রিয় সখী। বাড়িটা আবছা-আবছা চিনি—স্বামীর নাম থেকে। তখন শুনেছিলুম কান না

দিয়ে। সেখানেই যাই। আর্কের অতি কাছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ আশ্রয় নিতে হলে সেই তো সব চেয়ে কাছে।

আর্কের কাছে এসেছি। ক্লান্তিতে পা দু-খানা অবশ হয়ে এসেছে—না শীতে। হঠাৎ মনে হল, শব্‌নম যদি ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরে থাকে? হে খুদা! পাগলের মত ছুটলুম বাড়ির দিকে।

বাড়ি থেকে আবার বেরিয়েছি। কেউ ছাড়তে চায় নি। জানেমন্ শুধু বলেছিলেন,—'বে-ফায়দা, বে-ফায়দা।' কিন্তু ঠেকাবার চেষ্টা করেন নি।

বাঁচালে। চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে। রাত কটা হল? ঘড়িতে দম দেওয়া হয় নি। চাঁদটা কাল রাতের কথা বড্ড বেশী স্মরণ করিয়ে দেয়। যেন আমার আপন মন নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে কিছু কসুর করছে!

কাবুলে দিনদুপুরেও অপরিচিত জনকে কেউ কোনও বাড়ি বাতলে দেয় না। কে জানে তুমি কে? হয়তো রাজার গুপ্তচর। তার বিপদ ঘটাতে এসেছ। বন্ধুজন যদি হবে তবে তো বাড়ি তোমার চেনা থাকার কথা।

এ-রাজা আবার ডাকু। বেধড়ক লুটপাট হচ্ছে। তাব উপর রাত দুপুর। তিনটেও হতে পারে।

তবু বাড়ি খুঁজে পেয়েছিলুম। দরজাও খুলেছিল।

শব্‌নমের নব বর গভীর রাতে নিজের থেকে এসেছে—যার সঙ্গে কোনও চেনা-শোনা নেই। আনন্দোল্লাস হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এরা আর সব খবর ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছে। শোকে আনন্দে মিশিয়ে তারা আমাকে যা অভ্যর্থনা জানিয়েছিল সে-রকমধারা অপরিচিতের বাড়িতে কেউ কখনও পায় আমি কল্পনাই করতে পারি নি। মুরুব্বীরা কেমন যেন অপরাধীর মত ম্লান হাসি হেসে আমাদের একা রেখে চলে গেলেন। সখীর স্বামী বয়সে কম হলেও বিচক্ষণই লোক। আমাকে সখী—গুল্-বদন বানুর কাছে বসিয়ে কি একটা অছিলা করে উঠে গেলেন।

সম্পূর্ণ অপরিচিত আমি—শাস্ত্রে নিশ্চয়ই বারণ—তবু সে আমাকে একা পাওয়া মাত্রই আমার হাত দু-খানা নিজের হাতে তুলে চোখে ঠেকিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছিল। আমাদের নিয়ে সে কত সুখস্বপ্ন দেখেছিল সে-কথা বলতে বলতে বার বার তার গলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আর কখনও বা হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিল।

'কোথায় যেতে পারে? তাকে কে না স্থান দেবে? কিন্তু আমার বাড়িতে না এসে সে অন্য কার বাড়িতে যাবে? আমার শশুর তার জ্যেঠার

বিশেষ বন্ধু।'

হঠাৎ তার কি খেয়াল গেল জানি না। বলে উঠল, 'তাই হয়তো হবে, হ্যাঁ, তাই!' যেন আপন মনে চিন্তা করছে। আমি কোনও কথায় বাধা দিই নি। পাছে সামান্যতম কোনও দিক্‌নির্দেশ তারই ফলে কাটা পড়ে যায়, এবং পরে সেটা তার স্মরণে না আসে।

বললে, 'তাই বোধহয় সে তার অতি অল্প চেনা কোনও লোকের বাড়িতে গিয়েছে।' একসঙ্গে দু-জনাতে বলে উঠলুম, 'তাহলে খোঁজ নেব কোথায়?'

গুল্‌-বদন বানুর শোক, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগের গভীরতা আমার ভাগ্য নিপীড়নের কাছে এসে দাঁড়াল যেন একাত্মদেহ সখার মত। এ তো সান্ত্বনা নয়, প্রবোধ-বাণী নয়, এ যেন আমার হয়ে আরেকজন আমার সমস্ত দুর্ভাবনা আপন কাঁধে তুলে নিয়ে দুর-দুরান্তে তাকিয়ে দেখছে, কোথায় গিয়ে সে ভার নামানো যায়।

'কিন্তু খবর পাঠাচ্ছে না কেন? ধরা পডার ভয়ে, সুযোগ পায় নি বলে? কেউ তাকে আটকে রেখে সুযোগ দিচ্ছে না বলে?'—আপন মনে গুল্‌-বদন বানু কথা বলে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে আমার হাত দুখানা আপন হাতে তুলে নিচ্ছে।

'এই আমাদের প্রথম দর্শন—আর শব্‌নম কাছে নেই।'

এবার সে কেঁদে ফেললে।

তার স্বামী আপন হাতে খুঞ্চায় করে রুটি-গোস্ত নিয়ে এসেছেন। চাকরের মত হাত ধোবার জাম-বাটি ধারাযন্ত্র নিয়ে এলেন তারপর। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি ওঁকে শান্ত করবে, না, তুমিই ভেঙে পডছ।' অতি শান্তকণ্ঠে, কোনও অনুযোগ না করে।

আমি বললুম, 'আমার বমি হয়ে যাবে।'

সেই কণ্ঠেই বললেন, 'তা যাক্। যেটুকু পেটে রইবে সেইটুকুই কাজে লাগবে।'

পাশে বসে বাঁ হাত দিয়ে পিঠে হাত বুলতে বুলতে ডান হাত দিয়ে খাবার মুখে তুলে দিয়েছিলেন। গুল্‌-বদন সামনে এসে হাঁটু গেড়ে খাড়া গোড়ালির উপর বসে সামনে তোয়ালে ধরে দাসীর মত সেবার অপেক্ষা করছিল।

এরা বড়লোক। সেবা করার সুযোগ পেলে এরা জন্মদাসকে হার মানায়।

আমি বললুম, 'এবার উঠি।' আমার সব শোনা হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে গুল্‌-বদন বানু জানুর উপরে কাগজ রেখে পরিষ্কার গোটা-গোটা অক্ষরে শব্‌নমের সম্ভব-অসম্ভব সব পরিচিতদের ফিরিস্তি তৈরী করেছেন। স্বামী

মাঝে মাঝে তাকে সাহায্য করলেন। গুল্‌-বদন বার বার আমাকে বললে, 'তোমাকে কিছু করতে হবে না। এসব জায়গায় আমার শওহর—স্বামী—যাবেন।' তার স্বামী স্বল্পভাষী। বললেন, 'এ বাড়িতে আমার কোনও কাজ নেই। আমি ছোট ছেলে। আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার কোনও ক্রটি হবে না। আমানুল্লার পরিত্যক্ত যেসব সত্যকার ভালো গোয়েন্দা ছিল তারাই আমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু কঠিন কাজ। আমি শব্‌নম বীবীকে চিনি। তিনি যদি মনস্থির করে থাকেন কেউ যেন তাঁর খবর না পায়, তবে তিনি এমনই পরিপাটিরূপে সেটা করবেন যে সে গিঁঠ খোলা বড় কঠিন হবে।'

আমি ধন্যবাদ জানাই নি। উঠে দাঁড়ালুম। গুল্‌-বদন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ রাতে আপনি কোথায় যাবেন? ঝড় উঠেছে।'

তার স্বামী বললেন, 'চলুন।' চকমেলানো বাড়ির চত্বরে নামতে দেখি, উপরের বহু ঘরে আলো জ্বলছে। মুরুব্বীরা জেগে আছেন।

চত্বরেই বুঝলুম ঝড় কত বেগে চলেছে। যদিও চতুর্দিক তিনতলা ইমারতে ইমারতে নিরন্ধ্র বন্ধ।

দেউড়ি খুলতেই আমরা ব্লিজার্ডের ধাক্কায় পিছিয়ে গেলুম। বরফের সাইক্লোন। সামনে এক বিঘতও দেখা যায় না।

স্বামী বললেন, 'আপনি না দেখলে বিশ্বাস না করে ঘরের ভিতর শুধু ছট্‌ফট করতেন। এবারে চলুন। ঘরে গিয়ে আলো নেবাই। না হলে মুরুব্বীরা জেগে রইবেন।'

প্রথম আঘাতে মানুষ বিমূঢ় হয়ে যায়। তারপর আসে ভাগ্যবিধাতার উপর দিগ্বিদিকশূন্য অন্ধ ক্রোধ। তারপর নির্জীব অসাড়তা।

কিন্তু সে জাড্যে নিদ্রা আসে না।

দেশের মেঘলা ভোর তবু বোঝা যায়। এ দেশে বরফের ঝড়ের পিছনে সূর্যোদয় পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত ষড়যন্ত্রযোগে অনুভব করতে হয়।

ওরা বাধা দেয় নি। ঝড় থেমেছে কিন্তু যেভাবে একটানা বরফ পড়ছে তার ভিতর আমি কিছুতেই বাড়ির পথ খুঁজে পেতুম না। আমার বার বার মনে হচ্ছিল, পথপ্রদর্শক আমাকে ঠিক উল্টো পথে নিয়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্য! এমন জিনিসও মানুষ এসময় ভোলে! গুল্‌-বদনের ফিরিস্তি সঙ্গে আনি নি!

আমি কোথায় পৌঁছলুম?

॥ ৩ ॥

বিরহের দিনে শব্‌নম বলেছিল, 'তুমি আমার বিরহে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।' আমি তার সে আদেশ পালন করেছি। বিধাতা ঘাড় ধরে করিয়েছিলেন।

যখন চিরন্তন মিলনের সুখস্বপ্ন সে দেখেছিল তখন সে বলেছিল—ওই—তার শেষ কথা এখনও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি—'তুমি আমার মিলনে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।' এ কথা স্মরণ হলে ভাগ্য-বিধাতার মুখ-ভেংচানি দেখতে পাই।

কিন্তু শব্‌নম তার কথা রাখে নি। সে তার শেষ আদেশ দিয়ে গিয়েছিল, আমি যেন বাড়িতে থাকি, সে ফিরে আসবে। সে আসে নি।

ক' বছর হল, আব্দুর রহ্‌মান?

কাবুল শহর আর তার আশ-পাশের গ্রামে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। লিগেশনের ভারতীয় কর্মচারী আমাকে বার বার পরিষ্কার বললেন, সে আর্কের ভিতর নেই। আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর গুপ্তচর তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। আমার সামনেই তাকে তিনি ক্রস্ করলেন। এমন সব অসম্ভব অসম্ভব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন যেগুলো কখনও আমার মাথায় আসত না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, অনুসন্ধানে কণামাত্র ত্রুটি হয় নি।

তার কিছুদিন পর তিনি একজন একজন করে তিনজন চর পাঠালেন। এরা কাবুল শহর ও উপত্যকার সব কটা গ্রাম ভালো করে দেখে নিয়েছে। ওগুলো আমি নিজে অনুসন্ধান করেছি বহুবার। কোনও কোনও গ্রামে আমার আপন ছাত্র আছে। মনস্থরের কাছ থেকে খবর পেয়ে তারা সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খানা-তালাশী হাট-মাঠ তালাশী সব-কিছু করেছে, কিন্তু আমার সামনে আসে নি—মনস্থরকে নিষ্ফলতা জানিয়ে গিয়েছে। আমাকে তাদের গ্রামে, তাদের গৃহে অপ্রত্যাশিতভাবে আসতে দেখে তারা আমাকে কোথায় বসাবে, কি সেবা করবে ভেবে না পেয়ে অভিভূত হয়েছে। তিন শ' বছর আগে ভারতবর্ষে গুরু তার শিষ্যগৃহে অযাচিত আগমন করলে যা হত এখানে তাই হল। তারও বেশী। গুরুপত্নীর অনুসন্ধানে গাফিলি করবে এমন পাষণ্ড আফগানিস্থানে এখনও জন্মায় নি। লিগেশনের সব ক'জন চরই একবাক্যে স্বীকার করলে, তারা এমন কোনও জায়গায় যেতে পারে নি যেখানে আমি এবং আমার চেলারা তাদের পূর্বেই যায় নি।

এত দুঃখের ভিতরও মনস্থর একদিন একটি হাসির কথা বলেছিল। তার ক্লাসের সব চেয়ে দুর্দান্ত ছেলে ছিল ইউসুফ। মনস্থর বললে, 'এই কাবুল

উপত্যকার প্রথম চেরি, প্রথম নাসপাতি—তা সে যেখানেই থাকুক না কেন—খায় ইউসুফ। শব্‌নম বীবী ইউসুফের চোখের আড়ালে বেশীদিন থাকতে পারবেন না। এ শহরের সব দুঁদে ছেলের সর্দার সে-ই। ওদের নিয়ে সে লেগেছে। কোন বাড়িতে কে বীবীকে লুকিয়ে রাখতে পারবে আর ক-দিন?'

আমি শুধালুম, 'আর সবাই আমাকে দেখতে এল সে এল না?'

'সে বলেছে খবর না নিয়ে সে আপনার সঙ্গে দেখা করবে না।'

আমি যে অবস্থায়, তখন আমার কাছে সম্ভব অসম্ভব কোনও পার্থক্য নেই। তবু জানি উপত্যকার বাইরে এখন কেউ যেতে পারে না, এবং বাইরের লোক আসতে পারছে না বলেই খাওয়াদাওয়ার অভাবে গরীব-দুঃখীদের ভিতর দুর্ভিক্ষ লেগে গিয়েছে। সিগারেট তো কবে শেষ হয়েছে ঠিক নেই—চালান আসে হিন্দুস্থান থেকে—এ-বাড়ি ও-বাড়িতে তামাকের জন্য হাত পাতা-পাতি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাবুলের পূর্বদিকের গিরিপথ বরফে সম্পূর্ণ বন্ধ। পশ্চিমের পথে গজনীর ডাকাতরা বসে আছে, বাচ্চা একটু বেখেয়াল হলেই উপত্যকায় ঢুকে লুটপাট আরম্ভ করবে এবং তার পর শহরের পালা। এই পশ্চিমের পথ দিয়েই আব্দুর রহ্‌মান গিয়েছে আওরঙ্গজেব খানকে খবর দিতে। যাবার সময় সে দরবেশের পোশাক পরে নিয়েছিল, এ ছাড়া আর কোনও মানুষ ডাকাতদের হাতে থেকে নিষ্কৃতি পায় না।

উত্তরের পথে বাচ্চা-ই-সকাওর গ্রাম। সে পথে তারই লোকজন ছাড়া কেউ আসা-যাওয়া করে না। দক্ষিণ দিকে পথ নেই, যেটুকু আছে তার উপর কত ফুট বরফ কে জানে!

পুরুষের পক্ষে বেরনো অসম্ভব, দরবেশবেশী আব্দুর রহ্‌মানও শেষ পর্যন্ত কান্দাহার পৌঁছবে কি না সে নিয়ে সকলেরই গভীর দুশ্চিন্তা, মেয়েছেলের তো কথাই ওঠে না। এই কাবুল উপত্যকাতেই শব্‌নম আছে, কিংবা—?

রাস্তায় যেতে যেতে একদিন দুই সম্পূর্ণ অজানা লোককে কথা বলাবলি করতে শুনেছিলাম। একজন বললে, 'আওরঙ্গজেব খানের মেয়ে বোধহয় কোনও বাড়িতে—গ্রামেই হওয়ার সম্ভাবনা বেশী—আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি সেখানে বোধহয় খুন হয়েছেন।'

অন্যজন শুধালে, 'তাঁকে খুন করবে কেন?'

সে বললে, 'বাচ্চার ভয়ে, জাফরের সঙ্গী-সাথী আত্মীয়স্বজনের ভয়ে। ধরা তো পড়বেই একদিন। তখন তার উপায় কী?'

আমি জানতুম বাচ্চা শব্‌নম বীবীর সন্ধানের জন্যে কোনও হুকুম দেয় নি।

জাফরের আত্মীয়স্বজনের তার জন্য রক্তের সন্ধানে বেরবার কথা ; তারাও বেরোয় নি।

কোন্ ভরসায় তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলুম সে কথা বলতে পারব না। আপন পরিচয় দিয়ে তাদের করজোড়ে শুধিয়েছিলুম, তারা আমাকে কোনও নির্দেশ দিতে পারে কি না ? দুজনাই অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বার বার মাফ চেয়ে বললে, তারা সত্যই কোনও খবর জানে না—চা-খানায় আলোচনার খেই ধরে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল মাত্র। দ্বিতীয় লোকটি দৃঢ়কণ্ঠে একাধিকবার বললে, 'আমার বাড়িতে যদি কোনও মেয়েছেলে একবার ঢুকে আশ্রয় নিতে পারে, তবে আমি খুন না হওয়া পর্যন্ত তার দেখ-ভাল করব।'

কোনও খবরের সন্ধানে মানুষ এ-দেশে যায় সরাইয়ে কিংবা বড়বাজারে। বাজার বন্ধ। সরাইয়ে নূতন লোক তিন মাস ধরে আসে নি। পুরনোরা আটকা পড়ে কষ্টেশ্রেষ্টে দিন কাটাচ্ছে। সরাইয়ের মালিক আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আমাকে প্রচুর খাতির-যত্ন করলে। বললে, 'ইউসুফ প্রায়ই এসে খবর নেয়, নূতন কোনও মুসাফির কোনও দিক দিয়ে শহরে ঢুকতে পেরেছে কি না! ওকে আমরা সবাই খুব ভালো করে চিনি। আগে এলে আমাদের ভিতর সামাল সামাল রব পড়ে যেত। এখন এসে একবার সকলের দিকে তাকায়, নূতন কেউ এসেছে কি না, আমাকে দু-একটি প্রশ্ন শুধায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে যায়। এই যে আমার চত্বরে বরফজল জমেছে, আগে হলে ইউসুফ স্কেটিং করে করে এখানে পুরো দিনটা কাটিয়ে দিত।'

আমি তাকে শুধালুম, তার কি মনে হয়, শব্‌নম কোথায় ?

অনেক চিন্তা করে বললে, 'দেখুন, আমি সরাই চালাই! তার পূর্বে আমার বাবা সরাই-ই চালাতেন। আমার জন্ম ওই উপরের তলার ছোট্ট কুঠরিতে। চোর-ডাকু, পীর-দরবেশ, ধনী-গরীব দূর-দরাজের মুসাফিরদের উপর কড়া নজর রেখে তাদের দেখ-ভাল করে আমার দাড়ি পাকল। আমাকে সব খবরই রাখতে হয়। আমি অনেক ভেবেছি। এই সরাইয়ে শীতের রাতে আগুনের চতুর্দিকে বসে দুনিয়ার যত গুণী-জ্ঞানী ঘড়েল-বদমাশরা এই নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে, কিন্তু সবাই হার মেনেছে।'

তারপর অনেকক্ষণ ভেবে বললে, 'একমাত্র জায়গা কোনও দরবেশের আস্তানা। সেখানে অনেক গোপন কুঠরি গুহা থাকে। রাজনীতির খেলায় কেউ সম্পূর্ণ হার মানলে হয় পালায় মক্কা-শরীফে—সময় পেলে,—না হয় আশ্রয় নেয় দরগা-আস্তানায়।'

আমি প্রত্যেক আস্তানায় একাধিকবার গিয়েছি।

আবার ভেবে বললে, 'তা-ই বা কি করে হয়? বয়স্ক লোকদের ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু বাচ্চাদের কাছ থেকে কোনও জিনিস গোপন রাখা অসম্ভব। ইউসুফ যখন লেগেছে তখন—? না, সে হয় না। আপনিও তো প্রত্যক দরগায় গিয়েছেন। পীর দরবেশরা অন্তত আপনাকে তো গোপন খবরটা দিয়ে আপনার এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতেন। দরবেশও তো মানুষ। দরবেশ হলেই তো হৃদয়টা আর খুইয়ে বসে না।'

বিদায় দেবার সময় সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বার বার সহৃদয় নিশ্চয়তা দিলে, যে-কোনও সময়ে কোনও দিকে যদি সে খবর পায় তবে নিজে এসে আমায় খবর দিয়ে যাবে।

জীবনই অভিজ্ঞতা, আর অভিজ্ঞতাই জীবন। অভিজ্ঞতাসমষ্টির নাম জীবন আর জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে দেখলে এক-একটি অভিজ্ঞতা। এক-একটি অভিজ্ঞতা যেন এক ফোঁটা চোখের জলের রুদ্রাক্ষ। সব কটা গাঁথা হয়ে যে তসবী-মালা হয় তারই নাম জীবন।

একটি অক্ষ দিয়েই আমার সম্পূর্ণ মালা।

সেই অক্ষবিন্দুতে দেখলুম প্রতিবিম্বিত হচ্ছে বহুজনের মুখ। এরা কেন এত দরদী? এদের কী দায়, আমি শব্‌নমকে খুঁজে পেলুম কি না? আল্লা আমাকে মারছেন। তাই দেখে তো ভয় পেয়ে এদের উচিত আমার সঙ্গ বর্জন করা। কই, তারা তো তা করছে না! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ল এদের এই অঞ্চলের একটি কাহিনী—

বাচ্চারা পেয়েছে বাদাম। ভাগাভাগি নিয়ে লেগেছে ঝগড়া। পণ্ডিত নস্‌র্-উদ্‌দীন খোজা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে করতে আল্লার প্রশংসাধ্বনি (হাম্‌দ্‌) উচ্চারণ করছিলেন। ছেলেরা তাঁকে মধ্যস্থ মানলে ভাগ-বখরা করে দেবার জন্য। তিনি হেসে শুধালেন, 'আল্লা যে ভাবে ভাগ করে দেয় সেই ভাবে, না মানুষের মত ভাগ করে দেব?' বাচ্চারাও কিংবা বলব বাচ্চারাই আল্লার গুণ মানে বেশী, সমস্বরে বললে, 'আল্লার মত।'

খোজা কাউকে দিলেন পাঁচটা, কাউকে দুটো, কাউকে একটাও না। বাচ্চারা অবাক হয়ে শুধালে, 'এ কি? একে কি ভাগ করা বলে?' খোজা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখ, আল্লা মানুষকে কোনও কিছু সমান সমান দিয়েছেন কি না। সে-রকম সমান ভাগাভাগি শুধু মানুষই করে।'

তাই বুঝি করুণাময় আমার প্রতি অকরুণ হয়েছেন দেখে মানুষ সেটা সহানুভূতি দিয়ে পুষিয়ে দিতে চায়। তাই বুঝি তিনি যখন বিধবার একমাত্র শিশুকে কেড়ে নেন তখন স্বপ্নদেবী তাকে বার বার মা-জননীর কোলে তুলে দেন। তাই বুঝি সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টিতে বার বার অসম্পূর্ণতা রেখে দেন—মানুষ যাতে করে সেটাকে পরিপূর্ণ করে তুলে ধরতে পারে।

কিন্তু আমার গুরু, আমার একমাত্র সাহেব, মুহম্মদ সাহেব যে বার বার বলেছেন, তিনি আল্লার পরিপূর্ণতা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন, শঙ্কর যে বলেন তিনিই পরিপূর্ণ সত্য, অন্য সব মিথ্যা—তার কী ?

আমার এই দুঃসহ বিরহ-ভার আর অসহায় অনিশ্চয়তা ?

মিথ্যা।

মানলুম। কিন্তু এই যে এতগুলো লোকের অন্তরের দরদ তাদের কথায় ভাষায়, তাদের চোখের জলে টলটল করছে ?

মিথ্যা।

মানি নে। আল্লা যদি তাঁর পরিপূর্ণতা কোনও জায়গায় প্রকাশ করে থাকেন তবে সেটা দরদী হৃদয়ে। সৃষ্টির সঙ্গেকার সেই প্রাচীন কথা আজ কি আমাকে নূতন করে বলতে হবে, 'বরঞ্চ আল্লার মসজিদ ভেঙে ফেল কিন্তু মানুষের হৃদয় ভেঙো না।'

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, বাসর রাতে লায়লী-মজনূঁ কাহিনী শেষ করেছিল শব্‌নম ওই কথা বলে, পরমেশ্বর এ সংসারে স্বপ্রকাশ হয়েছেন একটিমাত্র রূপে—সে প্রেমস্বরূপ।

আচ্ছন্নের মত বাড়ি ফিরেছিলুম।

জানেমনের ঘরে শব্‌নমের সখী।

তিনি বললেন, 'সেই ভালো। ওকে নিয়ে যাও সূফী সাহেবের কাছে।'

পাগলকে মানুষ নিয়ে যায় সাধুসন্তদের কাছে। আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছি ?

সখীর বর সঙ্গে চললেন। সখী অনুযোগের সুরে বললে, 'কোথায় না তুমি জ্যোতিহীন বৃদ্ধ চাচাশ্বশুরের সেবা করবে, না তিনি তোমার চিন্তায় ব্যাকুল!'

স্বামী বললে, 'থাক্ না এসব কথা।'

এই প্রথম একটি লোক পেলুম, যিনি আমাদের কথা কিছুই জানেন না।

সব কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাচ্চা, তোমার চাচাশ্বশুর জানেন না, এমন কি কথা আমার আছে যা তোমাকে আমি বলব? তিনি সংসারে থেকেও বৈরাগী। তিনি 'সুফ' (পশম) না পরলেও সুফী।'

আমি অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে বললুম, 'তিনি আমাকে কিছু বলেন নি।'

বললেন, 'তিনিই বা বলবেন কী, আমিই বা বলব কী? আমরা যা-কিছুই বলি না কেন, তুমি তো সেটা বোঝবার চেষ্টা করবে তোমার মন দিয়ে। সেই মন কী, তুমি তাকে চেন? এ যেন একটা কাঠি দিয়ে কাপড় মেপে দেখলে বারো কাঠি হল। যদি সেই কাঠিটা কতখানি লম্বা সেটা তোমার জানা না থাকে তবে কাপড় মেপে বারো বার না বাইশ বার জেনে তো লাভ হল না। নিজের মন হচ্ছে মাপকাঠি। সেই মনকে প্রথম চিনতে শেখ।'

সখী বললে, 'সে মন চেনা যায় কী প্রকারে?'

সুফী সাহেব আমার দিকে তাকালেন। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলুম।

বললেন, 'মনকে শান্ত করতে হবে। বিক্ষুব্ধ জলরাশিতে বনানী প্রতিবিম্বিত হয় না।'

আমি শুধালুম, 'আরম্ভ করতে হবে কী করে?'

কণামাত্র চিন্তা না করে বললেন, 'সুফী-রাজ ইমাম গজ্জালী সকল সুফীদের হয়ে বলেছেন, "মন্দ আচরণ থেকে নিজেকে সংহত করে, বাহ্য জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়গণের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, নির্জনে চক্ষু বন্ধ করে, অন্তর্জগতের সঙ্গে আত্মার সংযোগ স্থাপনা করে, হৃদয় থেকে আল্লা আল্লা বলে তাঁকে স্মরণ করা।"'

আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'বুঝেছি। তুমি এখন আল্লার উপর বিরূপ। তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষের বিরূপ ভাব তাঁর প্রেমকে ছাড়িয়ে যেতে পারে—এ তার দম্ভ। কিন্তু সে-কথা এস্থলে অবান্তর। তুমি সেদিকে মন দিতে চাও না, তবে আপন আত্মার দিকে সমস্ত চৈতন্য একাগ্র কর। সেই আত্মা—যিনি সুখ-দুঃখের অতীত। হদীসে আছে, "মন্ অরফা নফ্‌সহু ফকদ্ অরফা রব্বাহু।" যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রভুকে চিনতে পেরেছে।'

আরেকবার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলে গেল।

'মন সর্বক্ষণ অন্য দিকে ধায়? তাতেই বা ক্ষতি কী? যাকে তুমি ভালোবাস তার সঙ্গে যদি একাত্ম দেহ হয়ে গিয়ে থাক তবে নিজের আত্মার দিকে, না তার দিকে মন রুজু করেছ তাতে কী এসে-যায়! সে তো শুধু নামের পার্থক্য।'

বেদনা আমার জিহ্বার জড়তা কেটে ফেলেছে। বললুম, 'একাত্ম দেহ হতে

পারলে তার বিরহে বেদনা পেতুম না, তার চিন্তা অসহ্য হত না।'

গভীর সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভয় নেই। ঠিক পথে চলেছ। একাধিক সূফী বলেছেন, আল্লার দিকে মন যাচ্ছে না আত্মার দিকে মন যাচ্ছে না—? নাই বা গেল। তোমার কাছে সব চেয়ে যা প্রিয় তাই নিয়ে ধ্যানে বস। সে যদি সত্যই প্রিয় হয় তবে মন সেটা থেকে সরবে কেন ?—আর মূল কথা তো মনকে একাগ্র করা, অর্থাৎ মনকে শান্ত করা।

'আসলে কী জান, মন গঙ্গাফড়িঙের মত। ক্ষণে সে এদিকে লাফ দেয়, ক্ষণে ওদিকে লাফ দেয়। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে চায় না। কিংবা বলতে পার, কাবুল উপত্যকার চাষার মত ছায়ায় জিরোচ্ছে, কিন্তু কিছুক্ষণ না যেতে-যেতেই রৌদ্রে গিয়ে কাজ করছে, ফের ছায়ায় ফিরে আসছে, ফের রৌদ্র ফের ছায়া।

'তার গায়ে জ্বর—তোমার মত। তাকে একনাগাড়ে সমস্ত দিন ছায়ায় শুইয়ে রাখতে হবে, তবে ছাড়বে তার জ্বর।

'তোমার মন হবে শান্ত।'

সূফী সাহেব থামলেন। আমি সব-কিছু ভুলে গিয়ে শুধালুম, 'তার পর ?'

ইচ্ছে করে অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, 'তার পর আর কি বাকী রইল ? তখন মালিক যা করার করবেন। তুমি তখন শান্ত হ্রদ—মালিক তাঁর ছায়া ফেলবেন। তোমার অজ্ঞেয় অগম্য কিছুই থাকবে না।'

হেসে বললেন, 'তাঁকেও তো কিছু একটা করবার দিতে হয়। সব দুর্ভাবনা কি তোমার ?'

আমি সেই পুরাতন প্রশ্ন শুধালুম, যে প্রশ্ন আজ নয়—বহুকাল ধরে মনে জেগে আছে, 'বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা যখন চিন্তা করি, কল্পনাতীত অন্তহীন দূরত্বের পিছনে বিরাটতর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সংবাদ যখন বৈজ্ঞানিকেরা দেয় তখন ভাবি, আমি এই কীটের কীট, আমার জন্য আর কে কতখানি ভাবতে যাবে ?'

সূফী সাহেব বললেন, 'সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তোমার উপর। এই যে কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা বললে—তুমি কল্পনা কর না কেন, তিনি আরও কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তা হলেই তো তিনি সম্পূর্ণ একটা ব্রহ্মাণ্ড তোমার—একমাত্র তোমারই—দেখাশোনার জন্য মোতায়েন করতে পারেন। তা হলেই দেখতে পাবে লক্ষ লক্ষ ফিরিশতা-দেবদূত তোমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, তোমার প্রতিটি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হিসাব রাখছেন হাজার হাজার দেবদূত, তোমার প্রতিটি হৃৎস্পন্দনের খবর লিখে

রাখছেন লক্ষ লক্ষ ফিরিশতা। আর তুমি যদি কল্পনা কর তোমার খুদা মাত্র দশটা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তা হলে অবশ্য তুমি অসহায়।

'কিন্তু তিনি তো অনন্ত-রাজ। তিনি সংখ্যাতীতের মালিক।

'কত সহস্র ব্রহ্মাণ্ড চাও, একমাত্র তোমারই তদারকি করার জন্য?'

আমি অভিভূত হয়ে তাঁর কথা শুনে যাচ্ছি, এমন সময় তিনি আমাকে যেন সর্বাঙ্গ ধরে দিলেন এক ভীষণ নাড়া। বললেন, 'কিন্তু এ সব কথা বৃথা, এর কোনও মূল্যই নেই। কারণ গোড়াতেই বলেছি, আপন মনকে না চিনে সেই মন দিয়ে কোনও কিছু বোঝার চেষ্টা করা বৃথা। তার প্রমাণস্বরূপ দেখতে পাবে, বাড়ি পৌঁছতে না-পৌঁছতেই তোমার গাছতলার ছায়ার চাষা আবার রৌদ্রে ঘোরাঘুরি করছে—তোমার মন আমার কথাগুলোর দিকে আর কান দিচ্ছে না। এবং এগুলো আমার কথা নয়—বড় বড় সূফীরা যা বলেছেন, তারই পুনরাবৃত্তি আমি করেছি মাত্র।'

আমি নিরাশ হয়ে বললুম, 'তা হলে উপায়?'

বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'মনকে শান্ত করা। আর ভুলে যেয়ো না, সাধনা না করে কোন কিছু হয় না। পায়লোয়ানের উপদেশ পড়ে মাংসপেশী সবল হয় না, হেকিমীর কেতাব পড়ে পেটের অসুখ সারে না। মনকেও শান্ত করতে হয় মনের ব্যায়াম করে।

'আর ঠিক পথে চলেছ কি না তার পরখ—প্রতিবার সাধনা করার পর মনটা যেন প্রফুল্লতর বলে মনে হয়। ক্লান্তি বোধ যেন না হয়। পায়লোয়ানরাও বলেছেন, প্রতিবার ব্যায়াম করার পর শরীরটা যেন হাল্কা, ঝরঝরে বলে মনে হয়।

'না হলে বুঝতে হবে, ব্যায়ামে গলদ আছে।'

আমাদের সামনে হালুয়া ধরে বিদায় দিলেন।

আমরা আসন ছেড়ে উঠেছি এমন সময়ে তিনি হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাচ্চা, তোমার একটি আচরণে আমি খুশী হয়েছি। গ্রামের চাষা তিন মাস রোগে ভুগে শহরে এসে হেকিমের কাছ থেকে দাওয়াই নিয়েই শুধায়, "কাল সেরে যাবে তো?"—তুমি যে সে-রকম শুধাও নি, "ফল পাব কবে?"

'ফল নির্ভর করে তোমার কামনার দৃঢ়তার উপর। দিল্‌কে একরুজু করে যদি প্রাণপণ চাও, তবে দেখবে নতীজা নজ্‌দিক্—ফল সামনে।'

ধর্মে ধর্মে তুলনা করার মত মনের অবস্থা আমার তখন নয়। তবু মনে

পড়ে গেল, সংস্কৃত ব্যাকরণের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে গুরুকে শুধিয়েছিলুম, 'অনায়াসে সংস্কৃত কাব্য পড়তে পারব কবে?' তিনি বলেছিলেন, "তীব্র সংবেগানাম্ আসন্নঃ" অর্থাৎ "আবেগ তীব্র থাকলে ফল আসন্ন"।

তার পর বলেছিলেন, 'শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়, সর্বত্রই এটা প্রযোজ্য—পতঞ্জলি বলেছেন "যোগসূত্রে", সাধনার ক্ষেত্রে।'

॥ ৪ ॥

আমার মন শান্ত হয় নি, অশান্তও থাকে নি। আমার মানসসরোবরের জল—জমে বরফ হয়ে গিয়েছে।

ওদিকে কাবুলের বরফ গলতে আরম্ভ করেছে। কাবুল উপত্যকার উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম গিরিপথে সঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ তুষারস্তূপও গলতে আরম্ভ করেছে। এবার জনগণের গমনাগমন আরম্ভ হবে। যে সব পণ্যবাহিনী এখানে আটকা পড়েছিল তারা হন্তে হয়ে উঠেছে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে বলে। কাবুল উপত্যকার বাইরে যারা আটকা পড়েছিল তারাও যে করেই হোক শহরে ঢোকবার চেষ্টা করবে। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতিরও মরসুম গরম হয়ে উঠবে। বাচ্চার বাহুবল কাবুল উপত্যকার বাইরে সম্প্রসারিত নয়। কাজেই দু-দলে লড়াই লাগবে মোক্ষম। তার কারণ এ দেশের ডাকাত আর বণিকে তফাত কম। যে দু-দিন পূর্বে বণিক ছিল সে কিছুটা পয়সা জমিয়ে ডাকাতের দল গড়েছে। আবার যে দু-দিন পূর্বে ডাকাত ছিল সে কিছুটা পয়সা করে আজ পণ্যবাহিনী তৈরী করেছে এবং এর পরও অন্য এক শ্রেণীও আছে। এরা দুটো একসঙ্গে চালায়। পণ্যবাহিনী নিয়ে যেতে যেতে সুযোগ পেলে ডাকাতিও করে।

কিন্তু এ সবেতে আমার কী?

আমার স্বার্থ মাত্র এইটুকুই—কাবুল উপত্যকা তো তন্ন তন্ন করে দেখা হয়ে গিয়েছে। এবার যদি বাইরের থেকে কোনও খবর আসে।

আব্দুর রহমান এখনও কান্দাহার থেকে ফেরে নি। তার থেকেই আমার বোঝা উচিত এখনও গমনাগমন অসম্ভব।

জানেমনের সেবা করতে গিয়ে বার বার হার মানি।

তিনি ডান হাত বাড়িয়ে বাঁ দিকে কি যেন খুঁজলেন। আমি শুধালুম, 'জানেমা (আমাদের জান্), কী চাই?'

'না বাচ্চা, কিছু না।'

পীড়াপীড়ি করি। নিমকদান—লবণের পাত্র।

শবনম জানত।

তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন ; আমি প্রত্যুত্তর দিতে পারি নে।

প্রতি পদে ধরা পড়ে সেবার কাজে আমার অনভ্যাস, অপটুত্ব। অথচ ঠিক সেই কারণেই আমি তাঁর কাছে পেলুম আরও বেশী আদর-সোহাগ। শিশুর আধো-আধো কথা শুনে পিতামাতা যে রকম গদ্গদ হয়, আমার আধো-আধো সেবা তেমনি তাঁর হৃদয়ের দাক্ষিণ্যে যেন বান ডাকালে।

এক রকম লোক আছে যারা সর্বক্ষণ কথা বলে যাওয়ার পর দেখা যায়, তারা কিছুই বলে নি। অন্য দল সংখ্যায় কম। এঁদের নীরবতা যেন বাঙ্ময়। এঁরা নীরবতা দিয়ে এমন একটি বাতাবরণ সৃষ্টি করেন যে, শুভ মুহূর্তে সেই ঘন বাষ্পে তাঁরা একটি ফোঁটা বাক্-বারির ছোঁয়াচ দেওয়া মাত্রই আকাশ-বাতাস মুখর করে ঝরঝরধারে বারিধারা নেমে আসে!

এই রকম একটা সুযোগ পেয়ে আমি তাঁকে শুধালুম, 'আপনি আমার শ্বশুর মশাইকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। আমাকে বলুন তো, তিনি কান্দাহার যাওয়ার সময় বাড়িতে কেন হুকুম রেখে গেলেন, ডাকাতদের যেন কোনও বাধা না দেওয়া হয়?'

জানেমন্ বললেন, 'আওরঙ্গজেব সাধারণ সেনাপতি নয়। প্রকৃত সেনাপতি যে রকম যুদ্ধ জয় করতে জানে, ঠিক সেই রকম জানে কখন আর জয়াশা করতে নেই। সেই সময় সে যতদূর সম্ভব স্বল্প ক্ষয়ক্ষতি হতে দিয়ে সৈন্যবাহিনী রণাঙ্গন থেকে হটিয়ে আনে।

'আওরঙ্গজেব জানত, বাধা দিলে এ বাড়ির কেউই প্রাণে বাঁচবে না। ওদিকে শবনমের উপর ছিল তার অগাধ বিশ্বাস। এ-সব ব্যাপারে সে যে-কোনও পুরুষকে ছাড়িয়ে যায়।

'একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, শবনম যদি অল্প কিছুক্ষণ জাফর খানকে আটকে রাখতে পারত, তা হলেই তো ততক্ষণে বাচ্চার হুকুম পৌঁছে যেত যে তাকে যেন নিরাপদে আপন বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

'সুফীদের অনেকেই তাই পরিপূর্ণ নিষ্ক্রিয়তায় বিশ্বাস করেন। সৎকর্ম, অসৎকর্ম, প্রয়োজনীয় কর্ম, অপ্রয়োজনীয় কর্ম যাই কর না কেন, তার ফলস্বরূপ উৎপাদিত হবে নূতন কর্ম—এবং ক্রমাগত বাড়তে থাকে সেই কর্ম-জিঞ্জির—চেন্-অ্যাকশন। এই কিস্মতের অক্ষমালার কোনও জায়গায় তো গিঁট খুলতে হবে।

না হলে এই অন্তহীন জপমালা তো ঘুরেই যাবে, ঘুরেই যাবে; এর তো শেষ নেই।

'অথচ এ-কথা আমি স্থির-নিশ্চয় জানি, শব্‌নম ঠাণ্ডা-মাথা মেয়ে। ক্ষণিক উত্তেজনায় সংবিৎ হারিয়ে উন্মাদ আচরণ সে করে না। নিশ্চয়ই কোন-কিছু একটা চরমে পৌঁছেছিল।'

আমি চিন্তা করে প্রত্যেকটি বাক্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছি এমন সময় দাসীরা কলরব করে ঘরে ঢুকে বললে, একজন বোরকা-পরিহিতা রমণীকে হিন্দুকুশের গিরি উপত্যকায় দেখা গিয়েছে মজার-ই-শরীফের পথে যেতে।

চিৎকার চেঁচামেচির মাঝখানে এইটুকু বুঝতে আমাদের অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল।

জানেমন্‌ নীরব।

আমি তাড়াতাড়ি মনস্থরকে চিঠি লিখলুম, সে যেন পত্রপাঠ ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে আসে। অন্য লোক পাঠালুম সরাইখানাতে।

কিন্তু শব্‌নম আফগানিস্থানের উত্তরতম প্রদেশ সুদূরতম তীর্থ মজার-ই-শরীফের দিকে যাচ্ছে কেন? প্রাণরক্ষার্থে? সে কি জানে না জাফর খানের খুনের জন্য বাচ্চা তার খুন চায় না?

ঘণ্টা দুয়েকের ভিতর মনস্থর এল। সহৃদয় সরাইওলাও স্বয়ং এসে উপস্থিত। ইউসুফ আসে নি। খবর পাঠিয়েছে, বহু বোরকা-পরা রমণী বহু তীর্থে একা একা যায়। এ রমণী কিছুতেই শব্‌নম বানু হতে পারেন না। আরও বলেছে, এ রকম গুজব এখন ঘড়ি ঘড়ি বাজারে রটবে—আমি যেন ও সবেতে কান না দিই।

মনস্থর বললে, 'ইউসুফ তো আসবে না, পাকা খবর না নিয়ে। আমি এই গুজবটা শুনতে পাই কাল। সঙ্গে সঙ্গে গেলুম সরাইয়ে। তারা খবর পেয়েছে তার আগের দিন। তার পর গেলুম ইউসুফের কাছে। সে বললে, এসব পুরনো খবর। মিথ্যে—সে যাচাই করে দেখেছে। তার পর হুজুর, আমাকে হিসবে করে দেখালে, কাবুল গিরিপথের বরফ গলতে যে সময় লাগে তার আগে সেটা ছাড়িয়ে কেউ হিন্দুকুশ পৌঁছতে পারে না। ও মেয়ে হিন্দুকুশ অঞ্চল থেকেই বেরিয়েছে। আরও অনেক কি সব প্রমাণ দিলে যেগুলো আমি বুঝতেই পারলুম না।'

সকলেরই এক মত। ও মেয়ে কিছুতেই কাবুল থেকে বেরোয় নি। ওর সন্ধান করতে যাওয়া আর চাঁদের আলোতে কাপড় শুকোতে দেওয়া—একই কথা।

আমি সম্ভব অসম্ভব নানা প্রকারের যুক্তিহীন তর্ক এবং তর্কহীন নীরবতা দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব তা সম্ভব হতে পারে বোঝাবার চেষ্টা করলে সবাই এমন সব অভিজ্ঞতাপ্রসূত যুক্তি এবং প্রত্যক্ষদৃষ্ট আপত্তি তুললে যে শেষ-টায় আমি রেগে উঠলুম। তখন সবাই একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চুপ করে গেল।

আমি আমার আহাম্মুকি বুঝতে পারলুম। এদের না চটিয়ে এদের কাছ থেকে আমার জেনে নেওয়া উচিত ছিল, মজার-ই-শরীফ যাবার জন্য আমার কী প্রস্তুতির প্রয়োজন? এখন যখন শুধালুম, সবাই আশকথা পাশকথা বলতে বলতে বাড়ি চলে গেল।

কান্দাহার থেকে শব্‌নমের কোনও খবর না পেয়ে শেষটায় স্বপ্নে প্রত্যাদেশ ভিক্ষে করেছিলুম, কান্দাহার যাব কি না, আজ রাত্রে ঠিক তেমনি সমস্ত হৃদয় মন ঢেলে দিয়ে নামাজ পড়লুম মাঝরাত অবধি। বার বার কাতর রোদনে প্রভুকে বললুম, 'হে করুণাময়, আমাকে দয়া কর, আমাকে দয়া কর।'

সেবারে প্রার্থনান্তে যেন তাঁরই কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, স্বপ্নে প্রত্যাদেশও পেয়েছিলুম, 'কান্দাহার যেয়ো না'—আমার তখন সেটা মনঃপূত হয় নি।

তাই কি করীম-করুণাময় আমাকে শিক্ষা দিতে চাইলেন তাঁর কাহির-রুদ্ররূপে?

সমস্ত রাত চোখে এক ফোঁটা নিদ্রা এল না।

সমস্ত দিন কাটল ওই ভাবে। মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসে। ঘুমে প্রত্যাদেশ পাব আশা করে যেই শুতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব নিদ্রার অন্তর্ধান। তিন দিন পর যখন নির্জীব, ক্লান্ত দেহে প্রত্যাদেশের শেষ আশা ছেড়ে দিলুম সেদিন সুনিদ্রা হল। আশা ছাড়লে দেখি ভগবানও সমঝে চলেন।

শব্‌নম যে রকম পুব-বাঙলার স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসত—যখন-তখন পেশাওয়ার গিয়ে দিল্লী কলকাতা হয়ে পুব-বাঙলায় পৌঁছত, আমিও সে-রকম মজার-ই-শরীফের স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতুম। প্রথম দিন সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি সত্যই জান না, হজরৎ আলী (কর্‌রমল্লাহু ওয়াজহাহু—আল্লা তাঁর বদন জ্যোতির্ময় করুন) মারা যান আরবভূমিতে এবং তাঁর গোর সেখানেই! অশিক্ষিত অজ্ঞ লোকের মত বিশ্বাস কর তাঁর কবর উত্তর আফগানিস্থানে!'

আমি বললুম, 'যেখানে এত লোক তাদের শ্রদ্ধা জানায়, সেখানে না হয় আমি সেই শ্রদ্ধাটিকেই শ্রদ্ধা জানালুম।'

অবজ্ঞার সঙ্গে বললে, 'তা হলে কাবুলী মুটেমজুর যখন নূতন কোনও সোনা-বানানেওলা গুরুঠাকুর মুর্শীদবাবাজীর সন্ধান পেয়ে তার পায়ের উপর গিয়ে আছাড় খায়, তখন তুমিও সেদিকে ছুট লাগাও না কেন? যত সব!'

আমি বললুম, 'মজার-ই-শরীফে কিন্তু ইরান-তুরান-হিন্দুস্থান-আফগানিস্থানের বিস্তর কবি জমাঅৎ হয়ে কবর-চত্বরে সুন্দর সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করেন—মুশাইরা সেখানে সুবো-শাম্।'

সঙ্গে সঙ্গে শব্‌নমের মুখ খুশীতে ভরে উঠল, 'তাই নাকি? এতক্ষণ বল নি কেন? চল।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল। যেন তদ্দণ্ডেই আমাদের যাত্রারম্ভ!

শব্‌নমের কাছে কল্পনা বাস্তবে কোন তফাত ছিল না। না হলে সে আমাকে ভালোবাসল কি করে?

আসলে আমার লোভ হত, হিউয়েন সাঙ তথাগতের দেশ ভারতবর্ষে যাবার সময় যে পথ বেয়ে মজার-ই-শরীফের কাছের বাহ্লীক নগরী—আজকের দিনের বল্‌খ্—থেকে বামিয়ানের কাছে হিন্দুকুশ পেরিয়ে কপিশ—আজকের দিনে কাবুল শহর—এসে পৌঁছেছিলেন সেই পথটি দেখার। তখনকার দিনে তুষারভূমি (আজকের তুখার—স্থান) পেরিয়ে যখন বৌদ্ধ শ্রমণ বাহ্লীকে পৌঁছলেন, তখনই তাঁর চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল, তিনি তাঁর অসহ পথশ্রম সার্থক মেনে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন একশত সঙ্ঘারাম, তিনশত স্থবির আর কত হাজার শ্রমণ-ভিক্ষু কে জানে? এরই কাছে কোথায় যেন এক ভারতীয় মহাস্থবির প্রজ্ঞাকরের কাছে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন অভিধর্ম। আর বামিয়ানে পৌঁছে দেখেছিলেন, তারও বাড়া—হাজার হাজার—সঙ্ঘারাম—পর্বতগুহায়, সমতল ভূমিতে, উপত্যকায়। আর দেখেছিলেন, পাহাড়ের গায়ে দণ্ডায়মান, আসীন, শায়িত শত শত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বুদ্ধ-মূর্তি। শ'-দুশ' ফিট উঁচু!

তার পর তিনি পঞ্জশীর হয়ে পৌঁছেছিলেন কাবুল উপত্যকায়।

যবে থেকে এখানে এসেছি সেগুলোর সন্ধান করেছি এখানে। এখানে কীর্তিনাশা পদ্মা নদী নেই, এখানে কোনও-কিছুই সম্পূর্ণ লোপ পায় না। নবীন যুগের অবহেলা পেলে এখানে প্রাচীন যুগ মাটির তলায় আশ্রয় নিয়ে প্রতীক্ষা করে, কবে নবীনতর যুগের লোক শাবল-কোদাল নিয়ে তাদের সন্ধানে বেরবে।

তারও আগের কথা। আমি বাংলাদেশের লোক। হিউয়েন সাঙের

ভারততীর্থ-পরিক্রমার সর্বশেষ প্রাচ্য-প্রান্ত ছিল বাংলা। বগুড়ার কাছে মহাস্থান-গড় প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনে এসেছিলেন বল্খ্ থেকে হিউয়েন সাঙ—আর কয়েক শতাব্দী পরে সেখানেই আসেন ওই বল্খ্ থেকে দরবেশ শাহ্ সুলতান বল্খী—কত কাছাকাছি ছিল সেদিন বল্খ্ আর বগুড়া।

সেই থেই ধরে ধরে দেখেছি বিক্রমশীলা, নালন্দা। কাবুলে আসার পথে ট্রেন থেমেছিল এক মিনিটের তরে তক্ষশীলায়। সেখানে নামবার লোভ হয় নি এ কথা বলব না। তারপর পেশাওয়ার—কণিষ্কের রাজধানী। সেখানেও সময় পাই নি। গান্ধারভূমি জলালাবাদে শুধু আখ খেয়েই চিত্তকে সান্ত্বনা দিয়েছি যে, এই আখ খেয়েই হিউয়েন সাঙ শতমুখে প্রশংসা করেছিলেন। ভেবেছিলুম পরবর্তী যুগে এই যে আখের গুড় চীন দেশে গিয়ে রিফাইন্‌ড্ হয়ে শ্বেতবর্ণ ধরে যখন ফিরে এল, তখন চীনের স্মরণে এর নাম হল চিনি—তার পিছনে কি হিউয়েন সাঙ ছিলেন? একে উপহাস করেই কি আমাদের দেশে চীনের রাজার আম খাওয়ার গল্প হল?

আজ আবার এই সব কথা মনে পড়ছে। শব্নম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করত—পুব বাঙলায় তার শ্বশুরের ভিটেয় পৌঁছবার পথে এগুলো পড়ে বলে।

কিন্তু যখন কাবুল ছেড়ে আচ্ছন্নের মত বেরলুম মজার-ই-শরীফের সন্ধানে তখন এসব কিছুই মনে পড়ে নি। কী কাজে লাগবে আমার এই 'পাণ্ডিত্যে'র মধুভাণ্ড! জরা-জীর্ণ অর্ধলুপ্ত বাড়ির নিচে লুকনো যে সোনার তাল আছে, সেটা কি তার সামান্যতম উপকারে আসে? ওর শতাংশ ব্যয় করে বাড়িটা মেরামত হয়, কলি ফেরানো যায়, সে তার লুপ্ত যৌবন ফিরে পায়। শব্নমই বলেছিল,

'এত গুণ ধরি কী হইবে বল দুরবস্থার মাঝে,
পোড়া বাড়িটাতে লুকনো যে ধন লাগে তার কোনো কাজে?'

কবিতা আমার মুখস্থ থাকে না। শুধু শব্নমের উৎসাহের আতিশয্যে আমার নিষ্কর্মা স্মৃতিশক্তিও যেন ক্ষণেকের তরে জেগে উঠত। উর্দুতে বলেছিলুম,

দুর্দিনে, বল, কোথা সে সুজন হেথা তব সাথী হয়
আঁধার ঘনালে আপন ছায়াটি সেও, হেরো, হয় লয়!

তঙ্গ-দস্তীমে কৌন কিস্‌কা সাত দেতা হৈ?
কি তারিকীমেঁ সায়াভী জুদা হোতা হৈ ইনসাঁসে!

আমার নিজের সামান্য জ্ঞান, কাবুলে ফরাসী রাজদূতাবাসের প্রত্নতাত্ত্বিক

যিনি জলালবাদ-গান্ধার এবং বামিয়ানে খোঁড়াখুঁড়ি করে শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ অনিন্দ্যসুন্দর বুদ্ধমূর্তি বের করেছিলেন—তাঁর দিনে দিনে দেওয়া অসংখ্য তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞান, আমার কোনও কাজেই লাগল না।

কাজে লাগল সে এক সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

কাবুল ছেড়ে আসার পর, হিন্দুকুশের চড়াই তখনও আরম্ভ হয় নি, এমন সময়—বেশ কিছুক্ষণ ধরে—ক্ষণে ক্ষণে আমার সেই আচ্ছন্ন অবস্থার ভিতরও আমার মনে হতে লাগল, এ জায়গায় আমি যেন পূর্বেও একবার, কিংবা একাধিকবার এসেছি। এ রকম অভিজ্ঞতা নাকি সকলের জীবনেই হয়—কেমন যেন স্বপ্নে না জাগরণে দেখা, আধচেনা-আধভোলা একটা জায়গা বা পরিবেষ্টনী এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হয় যে মানুষ পথে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় আর ভাবে, সামনের মোড় নেওয়া মাত্রই একেবারে সম্পূর্ণ এক চেনা জায়গায় এসে পৌছবে।

তাই আমি বিশেষ কোনও খেয়াল করি নি।

হঠাৎ মোড় নিতেই দেখি, হাতে ঝুলনো ট্রাউট মাছ নিয়ে একটা লোক আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—এ জায়গা আব্দুর রহ্‌মানের পঞ্জশীর!

সামনেই বাজার। ঢুকেই বাঁয়ে দর্জীর দোকান, ডাইনে ফলওলা—তারপর মুদী—সর্বশেষে চায়ের দোকান। নিদেন একশ'বার দেখেছি। দোকানীর মেহদী-মাখানো দাড়ি, কালো-সাদায় ডোরাকাটা পাগড়ি আব্দুর রহ্‌মানের চোখ দিয়ে আমার বহুকালের চেনা। আরেকটু হলেই তাকে অভিবাদন করে ফেলতুম। তার দৃষ্টিতে অপরিচিতের দিকে তাকানোর অলস কৌতূহলের স্পষ্টাভাস আমাকে ঠেকালে। এই চায়ের দোকানই আব্দুর রহ্‌মানের কার্পো, পেলিটি।

আব্দুর রহ্‌মান নিরক্ষর। ফার্সী সাহিত্যে তার কোনও সঙ্গতি নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ অচেনা জিনিস অজানা পরিবেশ যদি শুদ্ধমাত্র কয়েকটি অতি সাধারণ আটপৌরে শব্দের ব্যবহারে চোখের সামনে তুলে ধরাটা আর্টের সর্বপ্রধান আদর্শ হয়—বহু আলঙ্কারিক তাই বলেন—তবে আব্দুর রহ্‌মান অনায়াসে লোতি দোদে মম্‌কে দোস্ত বলে ডাকবার হক্ক ধরে। এ বাজারে প্রত্যেকটি দোকান আমার চেনা—আর এখানে দাঁড়ানো নয়, আব্দুর রহ্‌মান সাবধান করে দিয়েছিল—ওই যে কাঁচা-পাকা দাড়িওলা লোকটা তামাক খাচ্ছে, সে বিদেশীকে পেলেই ভ্যাচর ভ্যাচর করে তার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে।

চায়ের দোকানে পেরোতেই বাঁ দিকে যে রাস্তা তারই শেষ বাড়ি আব্দুর রহ্‌মানদের। বাড়িতে সে নেই—কান্দাহারে। তার বাপকে আমি চিনি। ধরা পড়ার ভয় আছে।

সামনে খাড়া হিন্দুকুশ। আব্দুর রহ্‌মানদের মনে মনে সেলাম জানিয়ে একটু পা চালিয়ে তার দিকে এগোলুম।

হিন্দুকুশে এখনও বরফ তার সর্ব দার্ঢ্য নিয়ে বর্তমান। আসলে তার শরীর সাবুদানার চেয়েও সূক্ষ্ম কণা দিয়ে তৈরি আর হিমকণারই মত নরম। কিন্তু বসন্ত-সূর্যও একে গলাতে পারে নি। শক্তকে ভাঙা যায়, নরমকে ভাঙা শক্ত।

ঝড়-তুফানে দিশাহারা হয়ে আসন্ন মৃত্যু সম্মুখে দেখেছি, তখন জানতুম না যে এখানে পথ মাত্র একটিই, নিরুদ্দেশ হবার উপায় নেই। বামিয়ানেও পৌঁছলুম। বিরাট বুদ্ধমূর্তি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বলেই চিনলুম, এ জায়গা বামিয়ান—না হলে কোনও জায়গার নাম আমি কাউকেও জিজ্ঞেস করি নি। মাঝে মাঝে শুধু জানতে চেয়েছি, কেউ বোরকা-পরা একটি মেয়েকে একা একা মজারের পথে যেতে দেখেছে কি না? 'হাঁ', 'না', 'কাবুলের দিকে গিয়েছে', 'না, মজারের দিকে গিয়েছে', 'কোন্ এক সরাইয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে'—সব ধরনের উত্তরই শুনেছি। দরদী জন আমাকে কাবুলে ফিরে যেতে বলেছে।

দেখি নি, দেখি নি, কিছুই দেখি নি। কয়েদীকে যখন পাঁচশ' মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন কি সে কিছু দেখে? সাইবেরিয়া নির্বাসনে গিয়েছেন সেরা সেরা সাহিত্যিক—তাঁরা কিছুই দেখেন নি। না হলে শোনাতেন না?

হায় রে হিউয়েন সাঙ! স্মৃতির কপালে শুধু করাঘাত।

হিউয়েন সাঙ এ পথে যেতে ঝড়-ঝঞ্ঝার মৃত্যুযন্ত্রণায় একাধিকবার তাঁর জীবন কাতর রোদনে তথাগতের চরণে নিবেদন করেছিলেন। আমি করি নি। তার কারণ এ নয় যে আমি ভিক্ষুশ্রেষ্ঠের চেয়েও অধিক বীতরাগ—দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন, সুখে বিগতস্পৃহ হয়ে গিয়েছিলুম। আমি হয়ে গিয়েছিলুম জড়, অবশ। ক্লোরোফর্মে বিগতচেতন রুগীর যখন পা কাটা যায়, সে যে তখন চিৎকার করে না তার কারণ এ নয় যে সে তখন কায়া-ক্লেশমুক্ত স্থিতধী মুনিপ্রবর। চিন্তামণির অন্বেষণে বিল্বমঙ্গল যা সব করেছিল সে সজ্ঞানে নয়—সম্পূর্ণ মোহাচ্ছন্ন অবস্থায়। কী সুন্দর নাম চিন্তামণি! এ নাম বাঙালী মেয়ে অবহেলা করে কেন? অহল্যার মত 'অসতী' ছিল বলে? হায়! আজ যদি ওঁর শুদ্ধজ্ঞানের এক কণা আমি পেয়ে যেতুম!

ক্রমে আমার সময়ের জ্ঞান লোপ পেল। কবে বেরিয়েছি, কবে মজার

পৌঁছব কোনও বোধই আর রইল না।

সরাইয়ের এক কোণে ঠেসান দিয়ে বসে আছি। যে কাফেলার সঙ্গে আজ ভোরে যোগ দিয়েছিলুম তারা কুঠরির মাঝখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে মৃদুস্বরে কথা বলছে। এদের বেশীর ভাগই আমুদরিয়া পারের উজবেগ। বাঙলা ভাষায় এদের বলে 'উজবুক'। এরা যে কি সরল বিশ্বাসে ট্যারচা চোখ মেলে তাকাতে জানে সে না দেখলে তুলনা শুনে বোঝা যায় না। এদের ভাষা আমার অজানা। কিন্তু এরা আমাকে ভালবেসেছে। আজ সকালে একরকম জোর করেই আমাকে একটা খচ্চরের উপর বসিয়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ কানে গেল কে যেন বললে, 'জশ্‌ন্‌।'

সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার চোখের সামনে দেখতে পেলুম, স্বপ্নমায়া—মতিভ্রম কিছুই নয়, পরিষ্কার দেখতে পেলুম জশ্‌ন্‌ পরবের রাত্রে ডান্‌স্‌ হলের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে শব্‌নম। সে রাত্রে তার ছিল ভ্রূকুটিকুটিল ভাল, আজ দেখি সে ভ্রূবিলাসী, তার মুখে আনন্দহাসি।

তার পরই জ্ঞান হারাই।

॥ ৫ ॥

চোখ মেলে দেখি, শব্‌নমের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। শুচিস্মিতা শব্‌নম প্রসন্নবয়ানে আমার দিকে তাকিয়ে।

হায় এ-ই সত্য হল না কেন? আস্তে আস্তে তার চেহারা মিলিয়ে গেল কেন?

এই 'বিকারে' কত দিন কেটেছিল জানি না। শব্‌নমকে কাছে পাওয়া, তার মুখে সান্ত্বনার বাণী শোনা যদি 'বিকার' হয় তবে আমি 'সুস্থ' হতে চাই নে। আমি সুস্থ হলুম কেন?

মজার-ই-শরীফে হজরৎ আলির কবর-চত্বরের এক প্রান্তে চুপচাপ বসে থাকি গভীর রাত্রি পর্যন্ত।

কাবুলের সূফী সাহেব আমার নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর পেয়ে সেখানকার সরাইখানাতে আমার সন্ধান নিয়ে কিছুদিনের ভিতরই জানতে পারলেন, আমাকে মজারের পথে দেখা গিয়েছে। আমার কাবুল ফেরার মেয়াদ যখন ফুরিয়ে গেল তখন তিনি বেরলেন আমার সন্ধানে। আমাকে যখন পেলেন তখন আমি মজারের কাছেই। উজবেগদের সাহায্যে আমাকে অচৈতন্যাবস্থায়ই এখানে নিয়ে আসেন।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। মধ্যগগনে দশমীর চন্দ্র। হাওয়া আসছে উত্তর-পূব—আমুদরিয়া আর বলখ্‌ থেকে। মসজিদচত্বরে পুণ্যার্থীরা এবার সমবেত উপাসনা শেষ করে এখানে ওখানে নৈমিত্তিক (নফ্‌ল্‌) আরাধনা করছে। সুফীরা স্থাণুর মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে, কিংবা মুদ্রিত নয়নে আপন গভীরে নিবিষ্ট। রাত গভীর হলে মজারের ছায়ায় কেউ বা মধুর কণ্ঠে জিক্‌র্‌ গেয়ে ওঠে।

এ সব রোজ দেখি, আবার রোজই ভুলে যাই। আমার স্মৃতিশক্তি কিছুই ধারণ করতে পারে না। প্রতিদিন মনে হয়, জীবনে এই প্রথম আঁখি মেলে এসব দেখছি। কোনদিন বা সরাই থেকে এখানে আসবার সময় পথ খুঁজে পাই না। শহরের লোক আমাকে চিনে গিয়েছে। কেউ-না-কেউ পথ দেখিয়ে রওজাতে পৌঁছিয়ে দিয়ে যায়।

আমি মজনূন, আমি পাগল—এ কথা আমি সরাইয়ে, রাস্তায় ফিসফিস কথাতে একাধিকবার শুনেছি। এ দেশে প্রিয়বিচ্ছেদে কাতর জনকে কেউ বিদ্রূপের চোখে দেখে না। শুনেছি, 'সভ্য' দেশের কেউ কেউ নাকি এদের এ দৃষ্টান্ত হালে অনুকরণ করতে শিখছেন। এদের চোখে দেখি, আমার জন্য নীরবে মঙ্গল কামনা। দরগায় বসে বসেও যে আমি নমাজ পড়ি নে, তাই নিয়ে এরা মোটেই বিচলিত নয়। 'মজনূনে'র উপর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আর একদিন শুনেছিলুম বোরকা-পরা দুটি তরুণীর একজন আরেকজনকে বলছে, 'কী তোর প্রেম যে তাই নিয়ে হর-হামেশা আপসা-আপসি করছিস! ওই দেখ্‌ প্রেম কী গরল! শব-ই-জুফ্‌কাফের ফুল শুকোবার আগেই এর প্রিয়া শুকিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। হয়েছিস ওর মত তুই মজনূন—পাগল?'

আমি মাথা হেঁট করে এগিয়ে গিয়েছিলুম। প্রেম কি গরল? প্রেম তো অমৃত। আমার মত অপাত্রে পড়েছিল বলেই সঙ্গে সঙ্গে পাত্র চিড় খেল। আমার নামের মিতা আরবভূমির মজনূন তো পাগল হন নি। তিনি প্রেমের অমৃত খেয়ে পেয়েছিলেন দিব্য রূপ। সংসারের আর-কেউ সেটি খায় নি বলে ওঁর সে রূপ চিনতে না পেরে তাঁকে বলেছিল পাগল। যে দু-একটি চিত্রকর বুঝতে পেরেছিল, তারা ছবিতে সেই দিব্যজ্যোতি দেখবার চেষ্টা করেছে।

'সেরে উঠছি'। যদি এটাকে 'সেরে ওঠা' বলে। এতদিন অবশ ছিলুম, এখন এখানে ওখানে বেদনা পাচ্ছি। শব্‌নম এখন আর আমার সম্মুখে যখন-তখন উপস্থিত হয় না। হলেও তার মুখে বিষণ্ণ হাসি। সুফী সাহেবকে সেটা জানাতে তিনি ভারি খুশী হলেন। তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাস তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী; তিনি অতিপ্রাকৃতে একদম বিশ্বাস করেন না। তিনি বিশ্বাস

করেন, শোকে কাতর অপ্রকৃতিস্থ লোকের মনে শান্তি এনে তাকে সবল সুস্থ করতে পারা এ পৃথিবীর সব চেয়ে বড় অলৌকিক ঐশী শক্তি।

এ কথা আমিও মানি। কিন্তু এই যে শব্‌নম আমাকে এসে দেখা দিয়ে যায়, এটাকে তিনি এত সন্দেহের চোখে দেখেন কেন? স্বপ্নে মায়ায় শব্‌নমের এই যে দান এ তো সত্যকে অসম্মান করে না—সে তো তখন অবাস্তব, অসত্যের পরীর ডানা পরে এসে আকাশকুসুম দিয়ে আমার গলায় ইন্দ্রমাল্য পরায় না। কৈশোরে এক সঞ্চয়িতায় পড়েছিলুম, কে যেন এক চীনদেশীয় ভাবুক বলেছেন, 'স্বপ্নে দেখলুম, আমি প্রজাপতির শরীর নিয়ে ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখন জেগে উঠে আমার ভাবনা লেগেছে, এই যে আমি মানুষরূপে ঘুরে বেড়াচ্ছি এটা কি কোনও প্রজাপতির স্বপ্ন নয়—সে স্বপ্নে দেখছে যে সে মানুষের রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?' সর্বসত্তা নিয়ে যেখানে সন্দেহ সেখানে তাঁর বিদ্বেষ আমার স্বপ্নের প্রতি!

সূফী সাহেব বললেন, জানেমন্ খবর পাঠিয়ে জানিয়েছেন, আমি কাবুল না ফিরলে তিনি নিজে আমার সন্ধানে বেরবেন। তাঁর লোক উত্তরের জন্য বসে আছে।

আমি তাঁর দিকে তাকালুম।

তিনি আমার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছেন। শান্তকণ্ঠে বললেন, তার কোনও খবর নেই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সে ভালো আছে।

আমি বললুম, 'চলুন।'

আব্দুর রহমানের পিতাকে এবারে আর ফাঁকি দেওয়া যায় নি। ক্ষেত-খামারের কাজ করে বাকী সময় সে নাকি বাজারের চায়ের দোকানে বসে আমার প্রতীক্ষা করত। তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা না হলেও সমস্ত বাজার আমাকে দেখামাত্রই যে রকম হুলুধ্বনি দিয়ে উঠেছিল তা থেকেই বুঝেছিলুম, বিখ্যাত বা কুখ্যাত হওয়া যায় নানা পদ্ধতিতে, এবং কোনও চেষ্টা না করেও।

তার উপর সূফী সাহেব বুড়োর মুরশীদ বা গুরু।

শুনলুম, আমানুল্লা কর্তৃক ফ্রান্সে নির্বাসিত তাঁর সিপাহসলার বা প্রধান সেনাপতি নাদির খান বাচ্চাকে তাড়াবার জন্য গজনী পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। রঙরুটের অপেক্ষা না করে কান্দাহারেই আব্দুর রহমান তাঁর সৈন্যদলে ঢুকেছে।

শব্‌নমের কাছে শুনেছিলুম, ফ্রান্সের নির্বাসনে আমার শ্বশুর মশাই আর নাদির খানে তাঁদের পূর্বপরিচয় গভীরতর হয়েছিল। বহু যুগের পারিবারিক দ্বন্দ্ব ছিল বলেই একদিন যখন হঠাৎ মৈত্রী স্থাপিত হল তখন সেটা গভীরতম বন্ধুত্বের

রূপ নিল। ফ্রান্সে সব মেয়েরই একটি করে গড্-ফাদার থাকে, শবনমের ছিল না বলে দুঃখ করতে নাদির নিজে যেচে তার গড্-ফাদার হবার সম্মান লাভ করেছিলেন—শবনম বলেছিল। তবু আমার শ্বশুর আমানউল্লা আফগানিস্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত নাদিরের অভিযানে যোগ দেন নি।

আমার ভয় হল, বাচ্চা যদি জানেমনের উপর দাদ নেয়!

কূহ্-ই-দামন, জবল্-উস-সিরাজ অঞ্চল পেরবার সময় দেখি বাচ্চার সঙ্গী ডাকাতরা তাকে ডেজার্ট করে পালাচ্ছে! সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! অত্যাচারী মাস্টারের নিপীড়নে যখন নিরীহ শিশু ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে তখন করুণা হয়, কিন্তু সেই স্যাডিস্ট মাস্টার যখন হেড-মাস্টারের হুড়ো খেয়ে কেঁচোটি হয়ে যান তখন ঘেন্না ধরে, হাসি পায়। নিরীহ বাছুরের দুশমন শূয়োরকে বাঘ তাড়া লাগালে যেমন মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠে। রাস্তার উপরে, এদিকে ওদিকে ছড়ানো তাদের পরিত্যক্ত লুটের মাল, দামী দামী রাইফেল। নাদির-বাঘ আসছে, ওগুলো কুড়োবার সাহস কারও নেই। শুনেছি কোনও শান্ত জনপদবাসী নাকি নিরপরাধ প্রশ্ন শুধিয়েছিল এক পলায়মান ডাকাতকে, সে কোন্ দিকে যাচ্ছে, আর অমনি নাকি ডাকাত বন্দুক ফেলে নিরস্ত্র পথচারীর পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল। ঐতিহাসিক খাফী খান তাহলে বোধহয় খুব বেশী বাড়িয়ে বলেন নি যে, আবদালী দিল্লী আসছে শুনে মারাঠা 'সৈন্যরা' নাকি 'আইমা' 'কাইমা'—অর্থাৎ অর্থাৎ মায়ের স্মরণে—চিৎকার করতে করতে যখন দিল্লী থেকে পালাচ্ছিল তখন নাকি শহরের রাঁড়ী-বুড়ীরাও ধমক দিয়ে ওদের নিরস্ত্র করে মালপত্র কেড়ে নিয়েছিল।

বিজয়ী নাদির কাবুলে প্রবেশ করলেন নগরীর পশ্চিম দ্বার দিয়ে। পরাজিত আমি উত্তর দ্বার দিয়ে।

॥ ৬ ॥

কত মাস, কত বৎসর কেটে গিয়েছে কে জানে!

বাদশা এবং আমার শ্বশুরও হার মেনেছেন।

সে নেই, এ-কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না। নিশ্চিহ্ন নিরুদ্দেশ হয়ে প্রত্যাবর্তন করার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ নির্দয়তর সন্দেহই মেনে নেব—আমার প্রেমে কোনও অপরিপূর্ণতা ছিল বলেই শবনম অন্তরালে বসে প্রতীক্ষা করছে, কবে আমি তাকে গ্রহণ করার জন্য

উপযুক্ত হব, কবে আমার বিরহ-বেদনা-বিক্ষুব্ধ সরোবর নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত হবে সেই শব্‌নমকমলিনীকে তার বক্ষে প্রস্ফুটিত করার জন্য।

নিশ্চয়ই আমার প্রেমে কোনও অপরিপূর্ণতা আছে।

শব্‌নমকেই একদিন সংস্কৃতে শুনিয়েছিলাম, শত্রু বেদনা দেয় মিলনে, মিত্র দেয় বিরহে—শত্রু-মিত্রে তা হলে পার্থক্য কোথায়? অথচ মিত্র যখন দূরে চলে যায় সে তো প্রিয়জনকে বেদনা দেবার জন্য যায় না। তবে কেন হাসিমুখে তাকে বিদায় দিতে পারি নে, তবে কেন হাসিমুখে তার পুনর্মিলনের জন্য প্রতীক্ষা করতে পারি নে—শব্‌নম যে রকম কান্দাহারে ম্লান মুখে, বিষণ্নবদনে সন্ধ্যাদীপ জ্বালত সে রকম না, উজ্জ্বল প্রদীপ, উজ্জ্বলতর মুখ নিয়ে।

সুফী সাহেবও তো ওই কথাই বলেছিলেন—অন্যপ্রসঙ্গে! বলেছিলেন, প্রতিবার যোগাভ্যাসের পর দেহ মন যেন প্রফুল্লতর বলে বোধ হয়, না হলে বুঝতে হবে অভ্যাসের কোনও স্থলে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। প্রেম-যোগেও নিশ্চয়ই তা হলে একই সত্য। সে যোগ, সে মিলনের পর যখন প্রিয়-বিচ্ছেদ আসে তখন আমার হৃদয় থেকে কাতর-ক্রন্দন বেরুবে কেন? আমি কেন হাসিমুখে মুহুর্মুহু বিরহ-দিনান্তের পানে তাকাতে পারব না, সেই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে, সময় হলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হবেই হবে। আমি কি মূর্খ যে দাহন-বেলায় ইন্দুলেখা কামনা করব। আমি হব সমাহিত জ্যোতিষীর ন্যায়, যে সূর্যগ্রাসের সময় বর্বরের মত সূর্য চিরতরে লোপ পেল ভয়ে বিকট অট্টরব করে ওঠে না। অবলুপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য তখন বিরাজ করেন তাঁর জ্ঞানাকাশে। শব্‌নম আমারই বুকের মাঝে চন্দ্রমা হয়ে নিত্য তো রাজে। শব্‌নম-শিশিরকুমারী প্রাতে যদি অন্তর্ধান হয়ে থাকে তবে কি আজই সন্ধ্যায় পুনরায় সে আমার শুষ্কাধরে সিঞ্চিত হবে না?

আমি কেন হাসিমুখ দেখাব না? আমি কি শ্মশানের বৈরাগ্য-বিলাসী নন্দী-ভৃঙ্গী যে দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে ত্রিভুবন শঙ্কান্বিত করব? আমার মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের সঙ্গে হরিহরাত্মা আমিও মৃত্যুঞ্জয়—মধুমাসে আমার মিলনের লগ্ন আসবে, আমার ভালে তখন পুষ্পরেণু, বিরহ-দিগম্বর তখন প্রাতঃসূর্যরুচি রক্তাংশুক পরিধান করবে। না। আমি এখনই, এই মুহূর্তেই বরবেশ ধারণ করব—বিরহের অস্থিমালা চিতাভস্ম আমি এই শুভলগ্নেই ত্যাগ করলুম, আমার প্রতি মুহূর্তই শুভমুহূর্ত।

খৃষ্ট কি বলেন নি, উপবাস করলে ভণ্ডতপস্বীর মত শুষ্কমুখ নিয়ে দেখা দিয়ো না। তারা চায়, লোকে জানুক, তারা পুণ্যশীল। তুমি বেরুবে প্রসাধন করে, তৈলসিক্ত মস্তকে।

লোকে হাসবে, বলবে, এই যে লোকটা মজনূর মত পাগলপারা খুঁজেছে তার লায়লীকে, ঘূর্ণিবায়ু হয়ে প্রতি উটের মহ্‌মিলে, প্রতি সরাইয়ে, মজারে-কান্দাহারে খুঁজেছে তার শব্‌নমকে দুদিন আগে—সে কিনা আজই হেসে খেলে বেড়াচ্ছে।

তাই হোক, সেই আমার কাম্য।

শব্‌নম বলেছিল, 'তুমি আমার বিরহে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।'

অভ্যস্ত সবাই হয়, আমিও হব, তাতে আর কী সন্দেহ?

ধর্মনিষ্ঠ অথচ বিত্তশালী এক গোস্বামীকে তাঁর স্ত্রী হঠাৎ এসে একদিন কাঁদতে কাঁদতে দুঃসংবাদ দিলেন, তাঁদের নায়েব বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁদের সর্বস্ব অপহরণ করেছে। কালই তাঁদের রাস্তায় বসতে হবে। গৃহিণীর মুখের দিকে একটুখানি তাকিয়ে গোস্বামী আবার পুঁথিপাঠে মন দিলেন। তিনি কেঁদে বললেন, 'ওগো, তুমি যে কিছুই ভাবছ না, আমাদের কী হবে।'

গোস্বামী পুঁথি বন্ধ করে, হেসে বললেন, 'মুগ্ধে, আজ থেকে বিশ কিংবা ত্রিশ বৎসর পরে তুমি এই নিয়ে আর কান্নাকাটি করবে না। তোমার যে অভ্যাস হতে ত্রিশ বৎসর লাগবে আমি সেটা তিন মুহূর্তেই সেরে নিয়েছি।'

আমি ওই গোস্বামীর মত হব।

তিন লহমায় গোস্বামী অভ্যস্ত হয়ে গেলেন—এর রহস্যটা কী?

রহস্য আর কিছুই নয়। গোস্বামী শুধু একটু স্মরণ করে নিলেন, বিত্ত যেমন হঠাৎ যায়, তেমনি তার চেয়েও হঠাৎ ফিরে আসতে পারে। আরও হয়তো অনেক তত্ত্বকথা ভেবে নিয়েছিলেন, যথা, বিত্তনাশ সর্বনাশ নয়, বিত্তাবিত্ত সবই মায়া—কিন্তু ওসবে আমার প্রয়োজন নেই। প্রথম আগত প্রথম কারণই যথেষ্ট।

তার চেয়েও বড় কথা—শব্‌নম আমার সাধারণ ধনজনের মত বিত্ত নয়। সে কী, সে-কথা এখনও বলতে পারব না। সাধনা করে তা উপলব্ধির ধন।

স্বীকার করছি, জ্ঞানী গোস্বামীর মত তিন লহমায় আমি সে জিনিস পাই নি। সব জেনে-শুনেও আমাকে অনেক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে হয়েছে—না-ফেলতে পেরে কষ্ট হয়েছে তারও বেশী। পাগল হতে হতে ফিরে এসেছি, সে শুধু শব্‌নমের কল্যাণে। পরীর প্রেমে মানুষ পাগল হয়। পরী মানে কল্পনার জিনিস। কিংবা বলব, প্রত্যেক রমণীর ভিতরই কিছুটা পরী লুকিয়ে থাকে। সেটাকে ভালবাসলেই সর্বনাশ। পুরুষ তখন পাগল হয়ে যায়। শব্‌নমের পরীর খাদ ছিল না। আমি পাগল হয়ে গেলে শব্‌নমের বদনামের অন্ত থাকত না।

আবার বলছি, তিন লহমায় আমি সে জিনিস পাই নি। ভালই হয়েছে। গোস্বামী হয়তো তিন লহমায় ত্রিশ বৎসরের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা এক ধাক্কায় সয়ে নেবার মত শক্তি ধরেন। আমার কি সে শক্তি আছে!

আমি সাধারণ বিরহ-বেদনার কথা বলছি না। পায়ের শব্দ শুনে সে বুঝি এসেছে ভাবা, ঘোড়ার গাড়ি বাড়ির সামনে দাঁড়াতে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বার বার নিরাশ হওয়া, কারও হাতে কোনও চিঠি দেখলেই সেটা শব্‌নমের মনে করা, বাড়ি থেকে বেরুতে না পারা—হঠাৎ যদি সে এসে যায় সেই আশায়, আবার না-বেরুতে পেরে তার সন্ধান করতে পারছি নে বলে যন্ত্রণা ভোগ, যে আসে তার মুখেই বিষাদ দেখে হঠাৎ রেগে ওঠা এবং পরে তার জন্য নিজেকে শাস্তি দেওয়া—এসব তো সকলেরই জানা। যে জানে না, সে-লোকের সঙ্গে আমার যেন কখনও দেখা না হয়। সে সুখী।

জানেমন্ বয়েৎ বলতে বলতে এমন একটি কান্দাহারী শব্দ ব্যবহার করলেন যেটি ইতিপূর্বে আমি মাত্র একবার শব্‌নমেরই মুখে শুনেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব চৈতন্য যেন লোপ পেল। কে যেন আমার মাথায় ডাণ্ডা মারলে—প্রথমটায় লাগে নি, তার পর হঠাৎ অসহ বেদনা, তারপর অতি ধীরে ধীরে সেটা কমল। ডাণ্ডা যেন চেখে-চেখে আমার যন্ত্রণাবোধটা উপভোগ করলে। এসব তো সকলেরই হয়। এ আর নূতন করে কীই বা বলব?

জানেমন্ এখন কথা বলেন আরও কম। শব্‌নমের কথা আমিই তুলে অনুযোগ করলুম। এখন আমার সামনে তার কথা আর কেউ তোলে না—পাছে আমার লাগে, বোঝে না, তাতে আমি ব্যথা পাই আরও বেশী—তাই আমাকেই তো তুলতে হবে তার কথা।

আমার দুখানি হাত তাঁর কোলে নিয়ে বললেন, 'বাচ্চা, শব্‌নম আমাকে দুঃখ দেবে কেন? আর দুঃখ যদি পেতেই হয়, তবে তার হাতেই যেন পাই। যে বন্দীখানায় সোক্রাৎকে (সোক্রাতেস) জহর খেতে হয়েছিল তার কর্তা ছিলেন তাঁরই এক শিষ্য এবং বিষপাত্র সোক্রাৎকে এগিয়ে দেওয়া ছিল তাঁরই কাজ। পাত্র আনবার পূর্বে তিনি কেঁদে বলেছিলেন, 'প্রভু, আমাকেই করতে হবে এই কাজ?' সোক্রাৎ পরম সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আহা! সেই তো আনন্দ। না হলে যে ব্যক্তি আমার মৃত্যু কামনা করে সে যখন জিঘাংসাভরে পৈশাচিক আনন্দে ক্রূর হাসি হেসে আমার দিকে বিষভাণ্ড এগিয়ে দেয় সেটা তো সত্যই পীড়াদায়ক।' এই বেদনার পেয়ালা ভরা আছে শব্‌নমের আঁখি-বারিতে—'

আমার বুকে আবার ভাঙল। সেখানে যেন বিদ্যুৎ-বিভাসে ধ্বন্তালোক হয়ে ফুটে উঠল শব্‌নম। তার দুঃখের মুহূর্তে আমাকে একদিন বলেছিল, 'কত আঁখি-পল্লব নিংড়ে নিংড়ে বের করা আমার এই এক ফোঁটা আঁখিবারি।' হায় রে কিস্মৎ! দুঃখের দিনেই তুমি বদ্‌-কিস্মতের স্মৃতিশক্তি প্রখর করে দাও!

শুনছি, জানেমন্‌ বলে যাচ্ছেন, 'সেই ভাল সেই ভাল।' ধীরে ধীরে আকাশের দিকে দুই বাহু প্রসারিত করে অজানার উদ্দেশে বললেন, 'সেই ভাল, হে কঠোর, হে নির্মম! একদিন তুমি আমার চোখের জ্যোতি কেড়ে নিয়েছিলে—আমি অনুযোগ করেছিলুম। তারপর শব্‌নমরূপে সেটা তুমি আমায় ফেরত দিলে শতগুণ জ্যোতির্ময় করে—আমি তোমার চরণে লুটিয়ে জন্ম-দাসের মত বার বার তোমার পদচুম্বন করি নি? আজ যদি তুমি আবার সেই জ্যোতি কেড়ে নিতে চাও তো নাও—আমি অনুযোগ করব না, ধন্যবাদও দেব না। কিন্তু এই হতভাগ্য পরদেশী কী করেছিল, আমাকে বল, তাকে তুমি—'

দেখি, তাঁর চোখ দুটি দিয়ে অল্প অল্প রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

একবার দেখেছি, একবারের কথা শুনেছি—এই তৃতীয়বার। এর পর আজ পর্যন্ত আর কখনও দেখি নি।

আমি আকুল হয়ে তাঁকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলুম। তাঁর চোখ মুছে দিতে দিতে মনে মনে শব্‌নমকে উদ্দেশ করে বললুম, 'হিমি, বিরহ-ব্যথায় যে আঁখি-বারি ঝরে সেটা শুকিয়ে যায়—প্রিয়-মিলনের সময় সেটা দেখানো যায় না। দেখাতে হলে সেটা বুকে করে বইতে হয়। তুমি যেদিন ফিরে আসবে সেদিন এই রক্তচিহ্ন দেখিয়ে তোমাকে বলব, 'জানেমন্‌ তোমার জন্য তাঁর বুকের ভিতর কী রকম রক্তরেখায় পদ্ম-আসন প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, দেখ।'

আমি জানেমন্‌কে চুম্বন দিতে দিতে বললুম, 'আপনি শান্ত হন। আপনি জানেন না, আমার হৃদয় এখন শান্ত।'

আমি জানতুম, জানেমন্‌ শব্‌নম উভয়ই—অন্তত ক্ষণেকে তার শোক ভুলে যান—ঋষি-কবিদের বাণী শুনতে পেলে। বললুম, 'আপনি সোক্রাতের যে-কথা উল্লেখ করলেন, সেই বলেছেন, আমাদের কবি আব্দুর রহীমন্‌ খান-ই-খানান—

"রহীমন্‌! তুমি বলো না লইতে অনাদরে দেওয়া সুধা—
আদর করিয়া বিষ দিলে কেহ মরিয়া মিটাব ক্ষুধা।

রহীমন্‌! হমে না সুহায় অমি পিয়াওৎ মান বিন্‌।
জো বিষ দেয় বোলায় মান সহিত মরিব ভালো॥"

আমাকে আরও কাছে টেনে এনে বললেন, 'সুন্দর! সুন্দর! দাঁড়াও, আমি ফার্সীতে অনুবাদ করি ;—মুখে মুখেই বললেন,

"আয় রহীমন্, না গো মরা—" '

॥ ৭ ॥

অনেকক্ষণ যেন ধ্যানে মগ্ন থেকে আমাকে শুধালেন, 'তুমি পেয়েছ? কী পেয়েছ?'

'সে কি আমি নিজেই ভাল করে বুঝতে পেরেছি যে আপনাকে বুঝিয়ে বলব। এর সাধনা তো আমৃত্যু, কিংবা হয়তো মৃত্যুর পরক্ষণেই বুঝব এতদিন শুধু বইয়ের মলাটখানাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি, বইটার নাম পড়েই ভেবেছি ওর বিষয়বস্তু আমার জানা হয়ে গিয়েছে, তখন দেখব এতদিন কিছুই বুঝতে পারি নি। শব্‌নমই আমাকে একদিন বলেছিল, সামান্য একটু আলাদা জিনিস—

"গোড়া আর শেষ, এই সৃষ্টির
জানা আছে, বল কার?
প্রাচীন এ পুঁথি, গোড়া আর শেষ
পাতা কটি ঝরা তার!"

হিরণ্ময় পাত্রের দিকে তাকিয়েই মুগ্ধ হৃদয়ে কেটে গিয়েছে সমস্ত জীবন—ওর ভিতরকার সত্যটি দেখতে পাই নি। বিকলবুদ্ধি শিশুর মত এতদিন চুষেছি চুষিকাঠি—এইবারে পেলুম মাতৃস্তন্যের অনাদি অতীত প্রবহমাণ সুধা-ধারা। সেই যে শিশুহারা মা তার বাচ্চাকে কাঁদতে কাঁদতে খুঁজেছিল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি—চলার পথে যে ঝরে পড়েছিল তার মাতৃস্তন্যরস তাই দিয়েই তো দেবতারা তৈরি করলেন, মিল্‌কিওয়ে—আকাশগঙ্গার ছায়াপথ।

'এ জীবনেই তো পৌঁছই নি পাহাড়চুড়োয়, যেখান থেকে উপত্যকার পানে তাকিয়ে বলতে পারব, এই যে উপত্যকার কাঁটাবন খানাখন্দ, কাদা-পাথর, সাপ-জোঁকে ক্ষতবিক্ষত চরণে এখানে এসে পৌঁছেছি—এই উপত্যকাই কত সুন্দর দেখায় গিরিবাসীদের কাছে, যারা কখনও উপত্যকার নামে নি—আমি কিছুটা উপরে এসেছি মাত্র, আর এর মধ্যেই কাঁটাবনকে নর্মকুঞ্জ বলে মনে হচ্ছে, কাদাভরা খালকে প্রাণদায়িনী স্রোতস্বিনী বলে মনে হচ্ছে। গিরিশিখরে পৌঁছলে সমস্ত ভুবন মধুময় বলে মনে হবে, এই আশা ধরি।

জানেমন্ স্মিতহাস্যে বললেন, 'বুঝেছি, কিন্তু এইটুকুই পেলে কী করে?'

আমি বললুম, 'অদ্ভুত, সেও আশ্চর্য! মনে আছে, মাসখানেক আগে সখী

এসেছিল শব্‌নমের। ওর সঙ্গে দমকা হাওয়ার মত এল শব্‌নমের আতরের গন্ধ। গোয়ালিয়র না কোথা থেকে শব্‌নম আনিয়েছিল যে এক অজানা আতর তারই সবটা দিয়ে দিয়েছিল তার সখীকে—মাত্র একদিন ওইটে মেখে এসেছিল আমার—আমাদের—না, আমাদের সকলের বাড়িতে আমাদের প্রথম বিয়ের দিন—'।

'সে কী ?'

অজানতে বলে ফেলেছি। ভালই করেছি। আরও আগেই বলা উচিত ছিল।

কী আনন্দ আর পরিতৃপ্তির সঙ্গে বৃদ্ধ যোগী শুনলেন আমাদের বিয়ের কাহিনী! হাসবেন, না, কাঁদবেন কিছুই যেন ঠিক করতে পারছেন না। খানাতে দোম্বা না মুর্গীর বিরিয়ানী ছিল সেও তাঁর শোনা চাই, তোপলের স্ত্রীধন নিয়ে আহাম্মকির কথা ভাল করে জানা চাই। এক কথা দশবার শুনেও তাঁর মন ভরে না। আর বার বার বললেন, ওই তো আমার শব্‌নম। কী যে বল, গওহর শাদ, কোথায় নূরজাহান।'

কতদিন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও তাঁর পরম মুখ-রোচক মজলিসের জলুস—আমাদের এই প্রথম বিয়ের কাহিনী।

শেষটায় শেষ প্রশ্ন শুধালেন, 'আচ্ছা, বিয়ের পর তোমাতে ওতে যখন প্রথম একলা-একলি হলে তখন সে প্রসন্ন হাসি হাসলে, না কাঁদলে ?'

আমার লজ্জা পাচ্ছিল, বললুম, 'কাঁদলে।'

'জানতুম, জানতুম। আমারই স্মরণে কেঁদেছিল।' এবারে মুখে পরিতৃপ্তির উপর বিজয়-হাস্য। বললেন, 'এইটুকুনই জানতে চেয়েছিলুম। এইবারে বল, তোমার সেই আতরের কথা।'

চেনা দিনের ভোলা গন্ধের আচমকা চড় খেয়েছিলুম, সেদিন। এর পূর্বে আমি জানতুম না, স্মৃতির অন্ধকার ঘরে সুগন্ধ আলোর চেয়েও সতেজ হয়ে মানুষকে কতখানি অভিভূত করতে পারে। আমি অনেকখানি মুহ্যমান হয়ে ওই সুবাস-বন্যায় যেন ভেসে চলে গিয়েছিলুম। আপনাদের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রীতি-সম্ভাষণ দান-প্রদান হয়েছিল—আমি কিছুই শুনতে পাই নি।

এইখানেই আরম্ভ।

শব্‌নম একদিন আমায় শুধিয়েছিল, "যখন সব সান্ত্বনার পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন হৃদয় হঠাৎ এক আনন্দলোকের সন্ধান পায়"—এটা আমি জানি কি না? আমি উত্তর দেবার সুযোগ পাই নি। আমাদের যে কবির এদেশে আমার কথা

ছিল, তিনি ছন্দে বলেছেন

"দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে দুর্দিনে চিত্ত উঠে ভরি,
দেহে মনে চতুর্দিকে তোমার প্রহরী
রোধ করে বাহিরের সান্ত্বনার দ্বার,
সেই ক্ষণে প্রাণ আপনার
নিগূঢ় ভাণ্ডার হতে গভীর সান্ত্বনা
বাহির করিয়া আনে ; অমৃতের কণা
গ'লে আসে অশ্রুজলে ;
সে আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে
যে আপন পরিপূর্ণতায়
আপন করিয়া লয় দুঃখবেদনায়।"

সঙ্গে সঙ্গে এক অবর্ণনীয় আনন্দ-মধুরিমা আমার সর্বদেহ-মনে ব্যাপ্ত করে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল, পরীক্ষা পাসের জন্য মুখস্থ-করা বিদ্যের একটা অংশ—সেটা তখন বুঝি নি, এখন সুগন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা জলজ্বল করে চোখের সামনে ভেসে উঠল।

রাজপুত্র দারা শীকুহ্-কৃত উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ তো আপনি পড়েছেন, কিন্তু সব উপনিষৎ অনুবাদ করেন নি বলে বলতে পারব না বৃহদারণ্যক তাতে আছে কিনা। তারই এক জায়গায় আমাদের দেশে এক দার্শনিক রাজা জনক গেছেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে। ঋষিকে শুধালেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, মানুষের জ্যোতি কী—অর্থাৎ তার বেঁচে থাকা, তার কাজকর্ম ঘোরাফেরা করা কিসের সাহায্যে হয়—কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষঃ ?"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "সূর্য।"

জনক শুধালেন, "সূর্য অস্ত গেলে ?—অস্তমিত আদিত্যে ?"

"চন্দ্রমা।"

"সূর্য চন্দ্র উভয়েই অস্ত গেলে—অস্তমিত আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ ?"

"অগ্নি।"

"অগ্নিও যখন নির্বাপিত হয় ?"

"বাক্—ধ্বনি। তাই যখন অন্ধকারে সে নিজের হাত পর্যন্ত ভাল করে দেখতে পায় না, তখন যেখান থেকে কোন শব্দ আসে, মানুষ সেখানে উপনীত হয়।"

এইবারে শেষ প্রশ্ন।

জনক শুধালেন, "সূর্য চন্দ্র গেছে, আগুন নিবেছে, নৈঃশব্দ্য বিরাজমান—তখন পুরুষের জ্যোতি কী ?" সংস্কৃতটি ভারি সুন্দর, পদ্য ছন্দে যেন কবিতা। "অস্তমিত আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য, চন্দ্রমস্যস্তমিতে, শান্তেঽগ্নৌ, শান্তায়াং বাচি, কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ ?"

যাজ্ঞবল্ক্য শেষ উত্তর দিলেন, "আত্মা।"

আমাদের কবির ভাষায় 'অন্তরের অন্তরতম পরিপূর্ণ আনন্দকণা।' আরবী ফারসী উর্দুতে যাকে আমরা বলি 'রূহ'। এ সব তো আপনি ভাল করেই জানেন।

আমার ধোঁকা লাগল অন্যখানে। যাজ্ঞবল্ক্য যখন চেনা জিনিস সূর্য থেকে আরম্ভ করে জনককে অজানা আত্মাতে নিয়ে যাচ্ছেন তখন 'অগ্নি'কে জ্যোতি বলার পর তিনি 'গন্ধ'কে মানুষের জ্যোতি বললেন না কেন ? গন্ধ তো 'শব্দে'র চেয়ে অনেক বেশী দূরগামী। কোথায় রামগিরি আর কোথায় অলকা—কোথায় নাগপুর আর কোথায় কৈলাস—সেই রামগিরিশিখরে দাঁড়িয়ে বিরহী যক্ষ দক্ষিণগামী বাতাসকে আলিঙ্গন করেছিলেন। সেই বাতাসে হিমালয়ের দেবদারু গাছের গন্ধ পেয়ে ভেবেছিলেন, হয়তো এই বাতাসই তাঁর অলকাবাসী প্রিয়াঙ্গীর সর্বাঙ্গ চুম্বন করে এসেছে ;

"হয়ত তোমারে সে পরশ করি' আসে,
হে প্রিয়া মনে মনে ভাবিয়া তাই
সকল অঙ্গেতে সে বায়ু মাখি লয়ে
পরশ তব যেন তাহাতে পাই।"

ফার্সী এবং সংস্কৃত ছন্দে প্রচুর মিল আছে ; জানেমন্ তাই আমাকে একাধিকবার মূল সংস্কৃতটা আবৃত্তি করতে বললেন।

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি।

আমি ভেবেছিলুম, এই খেই ধরে কাব্যালোচনাই চলবে কিন্তু জানেমন্‌ই বললেন, 'গন্ধের কথা বলছিলে।'

আমি বললুম, 'জী। আর যক্ষের সুবাসানুরাগ না হয় কবিত্ব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু আমি এমন গন্ধকাতর লোক দেখেছি, যে বেহারে দক্ষিণমুখো

হয়ে দাঁড়িয়ে বাতাসের গন্ধ নিতে নিতে আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে বাতাসে বাংলা সাগরের নোনা গন্ধস্পর্শ। এটা কল্পনা নয়।

'তা সে যা-ই হোক, ঋষি গন্ধকে জ্যোতিরূপে বাকের চেয়ে ন্যূনতর মনে করেছেন, কারণ শব্দের সাহায্যে আমরা অন্ধকারে যে দিগ্‌দর্শন পেয়ে উৎপত্তিস্থলে পৌঁছতে পারি সুবাস দিয়ে অতখানি পারি নে, কিংবা হয়তো স্বীকার করেও সংক্ষেপ করেছেন—যেমন স্পর্শের কথাও বলেন নি।

'কিন্তু আসল কথা এই একটুখানি সৌরভেই আমি যদি মুহ্যমান, অভিভূত হয়ে যাই তবে তার পরের সোপান এবং সেটা তো সোপান নয়, সে তো মঞ্জিল, সে তো সাগরসঙ্গম, সে-ই তো আত্মন্—সে তো দূরে নয়, কঠিন নয়। সে-ই তো এইমাত্র অনির্বাণ জ্যোতি, সে-ই তো নূর, ব্রহ্ম। সেই আলোতেই আমি অহরহ শব্‌নমকে দেখতে পাব। সূর্যচন্দ্র যখন অস্তমিত, অগ্নি যখন শান্ত তখন যদি শব্‌নম সুরভিবাস দিয়ে আমাকে পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত করে দিতে পারে তবে আর এইটুকুতে নিরাশ হবার কিছু নেই। বিশ্বাস করা কঠিন, তখন সে জ্যোতি পেলুম আমার অন্তরেই।'

আমি চুপ করলুম। জানেমন্ বললেন, 'এতে অবিশ্বাসের তো কিছুই নেই। আমি যেটুকু পেয়েছি, সেটুকু চোখের আলো হারানোর শোকে—এবং আপন অন্তর থেকেই, বহু সাধনার পর। তুমি পেয়ে গেলে অল্প বয়সেই—সে শুধু পিতৃপুরুষের আশীর্বাদের ফলে।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'কিন্তু চিরস্থায়ী নয় আমার এ সম্পদ। মাঝে মাঝে—'

জানেমন্ আমাকে কাছে টেনে এনে আমার মাথা তাঁর কোলের উপর রেখে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'আমারও তাই। আমাদের বন্ধু সুফী সাহেবেরও তাই। তার পর বল। আমার শুনতে বড় ভাল লাগছে। শব্‌নম ফিরে এলে তার সামনে আবার তুমি সব বলবে।'

কী আত্মপ্রত্যয়! যেন শব্‌নম এক লহমার তরে আমাদের জন্য তৃষ্ণার জল আনবার জন্য পাশের ঘরে গিয়েছে।

আস্তে আস্তে বললুম, 'আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ তাকে অরুন্ধতী তারা দেখাবার সুযোগ পাই নি বলে। এই যে আমি মজার-ই-শরীফ এলুম গেলুম—রাত্রিবেলা একবারও আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারি নি—যে-কোনও তারা দেখতে পেলেই সব বেদনা আবার এক সঙ্গে এসে আমাকে মুষড়ে ফেলবে বলে।

যে রাতে আমি প্রথম জ্যোতি পেলুম, তারই আলোকে আমি নির্ভয়ে অরুন্ধতীর দিকে তাকালুম। তিনি আমায় হাসিমুখে বললেন, "স্বর্গে আসতেই দেবতারা আমায় শুধালেন, 'তুমি কোন্ পুণ্যলোকে যাবে?' তাঁরা ভেবেছিলেন, যে-স্বামীর কোপন স্বভাব পদে পদে উভয়কে লাঞ্ছিত করেছে সেই কলহাস্পদ স্বামীর কাছে আমি যেতে চাইব না। কিন্তু আমি তাঁরই কাছে আছি। তুমি নিজের অসম্পূর্ণতার স্মরণে নিজেকে লাঞ্ছিত করো না। শব্‌নম আমারই মত তার বশিষ্ঠকে খুঁজে নেবে।"

সারা দিনমান কর্তব্যকার্য, নিত্যনৈমিত্তিক সব-কিছু করে যাই প্রসন্ন মনে, দাসী যে রকম মুনিব বাড়ির কাজকর্ম করে যায় নিষ্ঠার সঙ্গে, কিন্তু সর্বক্ষণ মন পড়ে থাকে তার আপন কুঁড়েঘরে, আপন শিশুটিকে যেখানে সে রেখে এসেছে—তার দিকে। সন্ধ্যায় ত্বরিত গতিতে যায় সেই শিশুর পানে ধেয়ে—মাতৃস্তনের উচ্ছলিত-মুখ সুধারসপীড়িত ব্যাকুল বক্ষ নিয়ে—তার ওষ্ঠাধর-নিপীড়নে জননীর সর্বাঙ্গে শিহরণের সঙ্গে সঙ্গে তার মুক্তি, তার আনন্দ-নির্বাণ।

আমিও দিবাবসানে ধেয়ে যাই আমাদের বাসরগৃহের নির্জন কোণে। এখানেই আমার জয়, আর এ ঘরেই আমার সর্বস্ব লয়; তাই বহুকাল ধরে এ-ঘরের কথা ভাবতে গেলেই আমার দেহমন বিকল হয়ে যেত। এখন যাই সেই ঘরে, ওই মায়ের চেয়েও তড়িৎ-ত্বরিত বেগে।

বিশ্বকর্মা যখন তিলোত্তমা গড়তে বসেছিলেন তখন সিংহ দিয়েছিল কটি, রম্ভা দিয়েছিল উরু, আর হরিণী যখন দিতে চাইলে তার চোখ, পদ্মকোরকও পেতে চাইলে সেই সম্মান, তখন নাকি বিশ্বকর্মা দুই বস্তুই প্রত্যাখ্যান করে, প্রভাতের শুকতারাকে দুই টুকরো করে গড়েছিলেন তিলোত্তমার দুটি চোখ। শব্‌নম যখন কান্দাহারে ছিল—

জানেমন্ বললেন, 'বড় কষ্ট পেয়েছে সে তখন। অত যে কঠিন মেয়ে, সেও তখন ভেঙে পড়ার উপক্রম করেছিল। তারপর বল।'

আমি বললুম, 'আমাকে তখন বিশ্বকর্মার মত ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ খুঁজে বেড়াতে হয় নি। তাকে স্মরণ করামাত্রই আস্তে আস্তে তার সমস্ত মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত। রাধার ধ্যান ছিল সহজ, কারণ তাঁর কালিয়া ছিলেন কালা, চোখ বন্ধ করা মাত্রই তাঁকে দেখতে পেতেন—আমার কালা যে গৌরী। কিন্তু বিশ্বকর্মার সঙ্গে আমি তুলনাস্পদ নই। কারণ তাঁর তিলোত্তমা গড়ার সময় তিনি স্রষ্টিকর, চিত্রকর। আমার চারুসর্বাঙ্গীকে গড়ার সময় আমি তুলি ফটোগ্রাফ। তবে হ্যাঁ, মূর্তি গড়ার সময় আমার সামনে বিলাতী ভাস্করের মত

জীবন্ত মডেল থাকত না—খাঁটি ভারতীয় ভাস্করের মত প্রতিমালক্ষণানুযায়ী মূর্তিটি নির্মাণ করে সর্বশেষে তার সম্মিলিত পদযুগলের দুই পদনখকণার উপর ধীরে ধীরে রাখতুম আমার দুই ফোঁটা চোখের জল। এই আমার বুকের হিমিকাকণা—শব্‌নম।

কিন্তু এবারে আর তা নয়। এবারে আমি মূর্তি গড়ি নে।

এবারে সে আমার মনের মাধুরী, ধ্যানের ধারণা, আত্মনের জ্যোতি।

এবারে আমার আত্মচৈতন্য লোপ পেয়ে কেমন যেন এক সর্বকলুষমুক্ত অখণ্ড সত্তাতে আমি পরিণত হয়ে যাই। কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা সে নয়—অথচ সর্ব ইন্দ্রিয়ই সেখানে তন্মাত্র হয়ে আছে। কী করে বোঝাই! সঙ্গীত সমাপ্ত হওয়ার বহু বৎসর পরেও তাকে যখন স্মরণে এনে তার ধ্বনি বিশ্লেষণ করা যায়—এ যেন তারও পরের কথা। রাগিণী, তান, লয়, রস সবে ভুলে গিয়ে বাকী থাকে যে মাধুর্য—সে-ই শুদ্ধ মাধুর্য। অথচ বাস্তব জগতে সেটা হয় ক্ষীণ—এখানে যেন জেগে ওঠে বানের পর বান—গম্ভীর, করুণ, নিস্তব্ধ জ্যোতির্ময় ভূর্ভুবঃস্বঃ।

ওই তো শব্‌নম, ওই তো শব্‌নম, ওই তো শব্‌নম।

॥ ৮ ॥

শুধু দুটি কথা আমার মনের মধ্যে সর্বক্ষণ জেগে থাকে।

একটি উপনিষদের বাণী :

আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহ মন হইতে নিশ্চল।

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণাৎ
যদেষ আকাশো আনন্দো ন স্যাৎ।

আমার প্রথম আনন্দের দিনে হঠাৎ এটি আমার মনের ভিতরে এসেছিল—বহু বৎসর অদর্শনের পর প্রিয়জন আচমকা এসে আবির্ভূত হলে যে রকম হয়। তাকে কোথায় বসাব, কী দিয়ে আদর করব কিছুই ঠিক করে উঠতে পারি নি। এই যে আকাশ-বাতাস, সে আনন্দে পরিপূর্ণ না থাকলে, কে একটি মাত্র নিশ্বাস নিতে পারত এর থেকে?

সেই রাত্রে আমি আমাদের বাসরঘরে যাই। শব্‌নম যেদিন চলে যায়,

সেদিন কেন জানি সে তার কুরান-শরীফখানা টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিল।

প্রত্যাদেশের সন্ধানে অনেকেই কুরান খুলে যেখানে খুশি সেখানে পড়ে। আমার কোনও প্রত্যাদেশের প্রয়োজন নেই। আমি এমনি খুলেছিলুম।

'ওয়া লাওলা ফদ্‌লুল্লাহি আলাইকুম্‌ ও রহ্‌মতহু ফী দুনিয়া ওয়াল আখিরা—'

'ভূলোক দ্যুলোক যদি তাঁর দাক্ষিণ্য ও করুণায় পরিপূর্ণ না থাকত তবে—' তবে? সর্বকালের মানুষ সর্ব বিভীষিকা দেখেছে। তার নির্যাস—মানুষের অসম্পূর্ণতা তখন রুদ্রের বহ্নি (গজব) আহ্বান করে আনত, সৃষ্টি লোপ পেত।

মনে পড়ল, ছেলেবেলাকার কথা। দাদারা ইস্কুলে, আমার সে বয়স হয় নি। দুপুরবেলা মা আমাকে চওড়া লাল-পেড়ে ধুতি, তাঁরই হাতে-বোনা লেসের হাতওয়ালা কুর্তা, আর জরির টুপি পরিয়ে সামনে বসিয়ে কুরান পড়ত। এই জ্যোতি অনুচ্ছেদটিই মা'র বিশেষ প্রিয় ছিল—বহু বহু বিশ্বাসীর তাই। আমার স্মরণে ছিল শুধু দুটি শব্দ 'ফদল' আর 'রহমৎ'—উচ্ছ্বসিত দাক্ষিণ্য ও করুণা: তখন শব্দ দুটির অর্থ বা অন্য কোন-কিছু বুঝি নি। আজও কি সম্পূর্ণ বুঝেছি?

* * *

আরও সহজে বলি।

বয়স তখন দশ কি বারো। চটি বাংলা বইয়ে গল্পটি পড়েছিলুম, বড় হয়ে এ গল্পটি আর কোথাও চোখে পড়ে নি।

এক ইংরেজকে বন্দী করে নিয়ে যায় বেদুইন দল। দলপতি খানদানী শেখ তার মেয়ের উপর ভার দেন বন্দীকে খাওয়াবার।

ভাষাহীন প্রণয় হয় দুজনাতে। তাই শেষটায় বল্লভের বন্দীদশা আর সে সইতে পারল না।—শব্‌নমের লায়লী তো ওই দেশেরই মেয়ে। একদিন পিতা যখন পণ্যবাহিনী আক্রমণ করতে বেরিয়েছেন তখন সে খাদ্য আর তেজী আরবী ঘোড়া এনে বল্লভের দিকে তাকালে। দুজনার পালানো অসম্ভব। যদি ধরা পড়ে তবে দুহিতাহরণকারীকে প্রাণ দিয়ে তার শোধ দিতে হবে—ওই একটিমাত্র আশঙ্কা ছিল বলে সে সঙ্গ নিয়ে দয়িতের প্রাণ বিপন্ন করতে চায় নি। যাবার সময় ইংরেজ শুধু দুটি শব্দ বলে গিয়েছিল—'টম' আর 'লণ্ডন'।

এক মাস পরে দলপতির অনুচরগণ খবর আনল, ইংরেজ বন্দরে পৌঁছতে পেরে জাহাজ ধরেছে।

সরলা কুমারী চেষ্টা করেছিল তাকে ভোলবার—বহুদিন ধরে—পারে নি।

পালিয়ে গেল সমুদ্রপারে। সেখানে প্রতি জাহাজের প্রত্যেককে বলে, 'টম'—'লণ্ডন', 'টম'—'লণ্ডন'।

এক কাপ্তেনের দয়া হল। এ-বন্দর ও-বন্দর করে করে তাকে লণ্ডনে নামিয়ে দিল। ইতিমধ্যে মেয়েটি ওই দুটি শব্দ ছাড়া আর-এক বর্ণ ইংরিজি শেখে নি—সে কাউকে সঙ্গ দিত না। ওর দিকে কেউ তাকালে কিংবা প্রশ্ন শুধালে ম্লান হাসি হেসে বলত, 'টম'—'লণ্ডন'।

সেই বিশাল লণ্ডনের জনসমুদ্র। তার মাঝখান দিয়ে চলেছে একাকিনী বেদুইন-তরুণী। মুখে শুধু 'টম'—'লণ্ডন'। কত শত টম আছে লণ্ডনে, কে জানে, কত কোণে, কিংবা অন্যত্র, কিংবা ফের বিদেশে চলে গিয়েছে আমাদের টম।

হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে আসছে টম। চোখোচুখি হল। দুজনা ছুটে গিয়ে একে অন্যকে আলিঙ্গন করলে—সেই সদর রাস্তার বুকের উপর।

ঠিক তেমনি একদিন আসবে না শব্‌নম ?

সে কি আমাকে বলে যায় নি, 'বাড়িতে থেকো। আমি ফিরব।' ?

* * * *

॥ তামাম্ ন্ শুদ্ ॥

প্রেম

নিকোলাস লেস্‌কফ
রচিত
ম্‌ৎসেনৃস্ক জেলার
'লেডি ম্যাক্‌বেৎ'

শ্রীমান অবধূতের করকমলে

সৈয়দ মুজতবা আলী

অনুবাদকের নিবেদন

নিকোলাই সেমোনোভিচ্ লেস্‌কফের 'প্রেম' (আসলে নাম 'মৎসেন্‌স্ক্ জেলার লেডি ম্যাক্‌বেৎ') গল্পটি আমার কাছে অনবদ্য এবং বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয় বলে মনে হয়। লেস্‌কফের জন্ম ১৮৩১-এ এবং মৃত্যু ১৮৯৫-এ। 'প্রেম' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে। ঐ সময় তলস্তয় ও তুর্গেনিয়েফ্ তাঁদের খ্যাতির মধ্যগগনে। সে সময় লেখক হিসেবে নাম করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। আরেকটি কথা বললেই যথেষ্ট হবে। এর কয়েক বৎসর পরে যখন ফ্রান্সে মপাসাঁর ছোট গল্প মাসিকপত্রে বেরতে আরম্ভ করে তখন সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই—সেগুলোর অনুবাদ অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষায় হতে থাকে, এক রুশ ভাষা ছাড়া—যদিও রুশদেশই সে যুগে ফ্রান্সের সবচেয়ে বেশি নকল করত। তার কারণ রুশাকাশে তখন একাধিক অত্যুজ্জ্বল গ্রহ উপ-গ্রহের সংযোগ।

এই উপন্যাসটি প্রায় যেন গ্রীক ট্রাজেডি। নিয়তির অলঙ্ঘ্য নির্দেশ, কিংবা বলতে পারেন প্রকৃতিদত্ত রজোগুণের কাম-তাড়নায় (কাতেরীনা) কিংবা নীচাশয়তায় (সেরুগেই) এরা যেন কোন্ এক অজানিত করাল অস্তাচলের পানে এগিয়ে চলেছে। নিদারুণ কঠিন অবস্থায় পড়ে এরা তখন কি-সব অমানুষিক কাজ করে তারই উল্লেখ করতে গিয়ে স্বয়ং লেস্‌কফ্‌ই বলেছেন, 'যারা এই উপদেশ-বাণীতে কর্ণপাত করে না, এ-রকম বীভৎস অবস্থায় যাদের হৃদয়ে মৃত্যু-চিন্তা প্রলোভনের চেয়ে ভয়ের সৃষ্টি করে বেশি—তাদের করতে হয় বীভৎসতর এমন-কিছু যেটা এই আর্ত ক্রন্দন-ধ্বনির টুঁটি চেপে ধরে তাকে নীরব করে দেবে। এই তত্ত্বটি আমাদের নিত্যদিনের সাধারণ সাদামাটা সরল মানুষ উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করতে জানে; এ অবস্থায় সে লাগাম ছেড়ে তার নির্ভেজাল নীচ পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়; সে তখন সাজে সঙ, নিজেকে নিয়ে আরম্ভ করে নিষ্ঠুর খেলা, আর-পাঁচজন মানুষকে নিয়েও—তাদের কোমলতম হৃদয়ানুভূতি নিয়ে। এরা (এস্থলে সাইবেরিয়াগামী যাবজ্জীবন কঠোর কারাদণ্ডের কয়েদীর পাল) এমনিতেই অত্যধিক কোমল স্বভাব ধরে না—এ-রকম অবস্থায় পড়ে তারা হয়ে যায় দ্বিগুণ পিশাচ।'

এবং বীভৎস রসের সঙ্গে সঙ্গে এতে আছে অতি মধুর গীতিরস, রুশ নিদাঘ দিনান্তের অপূর্ব বর্ণনা, প্রেমের আকূতি-মিনতি, অভিমান, ক্ষণকলহ, মিলন-বিচ্ছেদ—এবং সর্বশেষে দয়িতের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ।

এস্থলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে সভয়ে সবিনয় নিবেদন করি, এবং যুক্তি না দেখিয়ে সংগোপেই করি, কাতেরীনা যত পাপাচারই করে থাকুক, তার একনিষ্ঠ প্রেম আমাকে মুগ্ধ করেছে। তথাকথিত ভদ্র মানবসমাজেও এ-জাতীয় প্রেম বিরল। চেখফের 'দুলালী' পড়ে তলস্তয় পরবর্তী যুগে যা বলেছেন, হয়তো এস্থলেও তা-ই বলতেন।

মপাসাঁর 'বেল্ আমি'-র সঙ্গে পাঠক এ নভেলিকায় মিল দেখতে পাবেন। কিন্তু 'বেল্ আমি' প্রকাশিত হয় লেস্কফের বইয়ের কুড়ি বৎসর পরে। মপাসাঁর যৌবনে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত তুর্গেনিয়েফের—ফ্লোবেরের বাড়িতে। হয়তো বা সে সময় তুর্গেনিয়েফ্ গল্পটি মুখে মুখে মপাসাঁকে বলে থাকতে পারেন—কারণ মপাসাঁ যখন প্লটের জন্য মা'কে চিঠি লিখতে পারেন, তখন তাঁর প্রতি সদাস্নেহশীল গুরুসম তুর্গেনিয়েফ্‌কে যে তিনি এ বিষয়ে অনুরোধ করবেন তাতে আর বিচিত্র কি? মপাসাঁর চিঠিতেই রয়েছে, তিনি একবার তুর্গেনিয়েফ্‌কে জিজ্ঞেস করেন, মাতাল ইংরেজ খালাসী যদি হঠাৎ গান ধরে তবে তারা কি গান গাইবে—"গড্ সেভ্ দি কুইন?" তুর্গেনিয়েফ্ বললেন, বয়ঞ্চ গাইবে "রুল ব্রিটানিয়া" এবং সেইটি অনুবাদ করে তাঁকে সাহায্য করেন।

এ পুস্তকে আদিরসের প্রাধান্য হয়তো বাঙালী পাঠকের কিঞ্চিৎ পীড়ার কারণ হতে পারে। কিন্তু রুশ-সাহিত্যের মহারথীরাও এই ধরনেই লিখেছেন (তলস্তয়ের নেখলুদফ্-মাস্লভা, এবং গর্কির তো কথাই নেই)। বস্তুত এ বই যদি লিখতেই হয় তবে এ-ছাড়া গতি নেই। 'কুমারসম্ভব' লিখতে হলে কালিদাসের মতই লিখতে হয়, 'চৌরপঞ্চাশিকা' লিখতে হলে চুড়ের মত লিখতে হয়।

অনুবাদ করতে হলে যে-কটি গুণের প্রয়োজন হয়, তার একটিও আমার নেই। তাই আমি আমার একাধিক মিত্র তথা শিষ্যকে এই নভেলিকাটি অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করেছি। তাঁরা করেননি বলেই (মাঝখান থেকে বইখানি আমাকে তিন-তিনবার কিনতে হয়েছে!) আমি এটাতে হাত দিয়েছিলুম। করতে গিয়ে বুঝতে পারলুম, অনুবাদ-কর্ম কী কঠিন গর্ভযন্ত্রণা। নিজের আপন লেখা আপন পাঁঠা, কিন্তু পরেরটা বলি দিতে হয় শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে। তদুপরি যে সমস্যা আমাকে সবচেয়ে চিন্তায় ফেলেছে সেটি এই: যদি সেটাকে মধুর বাঙলায় হুবহু আপন মাতৃভাবায় যে রকম বলি, শুনি, সে-রকম অনুবাদ করি তবে বাঙালী পাঠক সেটি হোঁচট না খেয়ে খেয়ে আরামে পড়ে যাবেন—কিন্তু তাতে রুশ-বৈশিষ্ট্য মারা যাবে। পক্ষান্তরে সে বৈশিষ্ট্য রাখতে গেলে অনুবাদ হয়ে যায়

আড়ষ্ট, পাঠক রস পায় না,—তা হলে আর বৃথা পরিশ্রম করলুম কেন? তবে মাঝে মাঝে ইকন্, সামোভার, আপেল গাছ, ভল্গা, নিজ্নি নভগরদ আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে—প্রয়োজনীয় রুশ আবহাওয়া তৈরি করে। তবু বলি, অনুবাদটি যোগ্য ব্যক্তির করা উচিত ছিল।

সর্বশেষে নিবেদন, কয়েক মাস ধরে নিদ্রাকৃচ্ছ্রতায় ভুগি। তখন চিকিৎসক উপদেশ দেন, কোনো মৌলিক রচনায় হাত না দিয়ে যেন অনুবাদ-কর্ম আরম্ভ করি—তাতে করে রোগশয্যার একঘেঁয়েমি থেকে খানিকটে মুক্তি পাবো। রোগশয্যার অজুহাত শুনে আমার অনুরাগী পাঠক (এ নিবেদনটি একমাত্র তাঁদেরই উদ্দেশে) যে অনুবাদ পছন্দ করে বসবেন, এ আশা আমার করা অনুচিত, কিন্তু কটু-কাটব্য করার সময় হয়তো সে-কথা ভেবে খানিকটে ক্ষমার চোখে দেখবেন। এবং অতি সর্বশেষ নিবেদন, অনিদ্রারোগে অনুবাদকর্ম অতিশয় উপকারী। এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বললুম। আমার মত যাঁরা অনিদ্রায় ভুগছেন তাঁরা উপকৃত হবেন। কিমধিকমিতি॥

সৈয়দ মুজতবা আলী

পাত্রপাত্রী

রুশ উপন্যাসে একই পাত্রকে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রপাত্রী ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকে বলে নিম্নে তাদের নির্ঘণ্ট দেওয়া হল :

ইস্‌মাইলফ্	পরিবারের নাম
বরিস তিমোতেইয়েভিচ্ ইস্‌মাইলফ্ বরিস তিমোতেইয়েভিচ	বাড়ির কর্তা
জিনোভিই বরিসিচ্	পুত্র
কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না ইস্‌মাইলভা, কেট, একেতারীনা ল্‌ভভ্‌না, ল্‌ভভ্‌না	বরিসের পুত্রবধূ, জিনোভিইয়ের স্ত্রী
সের্‌গেই ফিলিপচ্, সেরেজ্‌কা, সেরেজেশ্‌কা, সেরেজেঙ্কা, সেরেজা	পুত্রবধূর প্রণয়ী
আক্‌সীনিয়া	পাচিকা
ফেদর জাখারফ্ লিয়ামিন, ফেদিয়া	সম্পত্তির অংশীদার বালক
তিয়োনা, সোনেৎকা ও অন্যান্য	কয়েদী

মাঝে মাঝে আমাদের এই অঞ্চলে এমন সব নরনারীর আবির্ভাব হয় যে, তারপর যত দীর্ঘকালই কেটে যাক না কেন, তাদের কথা স্মরণে এলেই যেন অন্তরাত্মা পর্যন্ত শিউরে ওঠে। এবং, এদের মধ্যে নিশ্চয়ই পড়ে এক ব্যবসায়ীর স্ত্রী, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না ইস্‌মাইলভা। এর জীবন এমনই বীভৎস নাটকীয় রূপ নিয়েছিল যে, আমাদের সমাজের পাঁচজন ভদ্রলোক কোন এক মস্করাবাজের অনুকরণে একে নাম দিয়েছিল, 'ম্‌ৎসেন্‌স্ক্‌ জেলার লেডি ম্যাকবেৎ'।

কাতেরীনা তেমন কিছু অপূর্ব রূপসী ছিল না, কিন্তু চেহারাটি ছিল সত্যই সুশ্রী। তখন তার বয়েস সবে চব্বিশ; মাঝারি রকমের খাড়াই, ভালো গড়ন আর গলাটি যেন মার্বেল পাথরে কোঁদাই। ঘাড় থেকে বাহু নেমে এসেছে সুন্দর বাঁক নিয়ে, বুক আঁটসাঁট, নাকটি বাঁশীর মত শক্ত আর সোজা, শুভ্র উন্নত ললাট আর চুল এমনিই মিশমিশে কালো যে আসলে ওটাকে কালোয় নীলে মেশানো বলা যেতে পারে। তার বিয়ে হয়েছিল ব্যবসায়ী ইস্‌মাইলফের সঙ্গে। সে বিয়েটা প্রেম বা ঐ ধরনের অন্য কোনো কারণে হয় নি—আসলে ইস্‌মাইলফ্‌ তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল ঐ যা, আর কাতেরীনা গরীবের ঘরের মেয়ে বলে বিশেষ বাছবিচার করার উপায় তার ছিল না।

ইস্‌মাইলফ্‌ পরিবার আমাদের শহরে গণ্যমান্যদের ভিতরই। তাদের ব্যবসা ছিল সবচেয়ে সেরা ময়দার, গম পেষার জন্য বড় কল তারা ভাড়া নিয়েছিল, শহরের বাইরে ফলের বাগান থেকে তাদের বেশ দু'পয়সা আসতো এবং শহরের ভিতরে উত্তম বসত-বাড়ি। মোদ্দা কথায়, তারা ধনী ব্যবসায়ীগুষ্ঠীর ভিতরেরই একটি পরিবার। তার উপর পরিবারটিও মোটেই পুষ্যিতে ভর্তি নয়। শ্বশুর তিমোতেইয়েভিচ্‌ ইস্‌মাইলফ্‌, আশীর মত বয়েস, বহুকাল পূর্বে তার স্ত্রী মারা গেছে। তার ছেলে, কাতেরীনার স্বামী জিনোভিই বরিসিচ্‌ পঞ্চাশের চেয়েও বেশ কিছু বেশী—আর সর্বশেষে কাতেরীনা, ব্যস্‌। পাঁচ বছর হল কাতেরীনার বিয়ে হয়েছে কিন্তু এখনো ছেলেপুলে কিছু হয়নি। প্রথম পক্ষের স্ত্রীও কোনো সন্তান রেখে যায়নি—জিনোভিইয়ের সঙ্গে কুড়ি বছর ঘর করার পরও। তার মৃত্যুর পর সে কাতেরীনাকে বিয়ে করে। এবারে সে আশা করেছিল, বুঝি ভগবানের আশীর্বাদ এ-বিয়ের উপর নেমে আসবে—বংশের সুখ্যাতি সম্পত্তি বাঁচাবার জন্য সন্তান হবে, কিন্তু কপাল মন্দ, কাতেরীনার কাছ থেকেও কিছু পেল না।

এই নিয়ে জিনোভিইয়ের মনস্তাপের অন্ত ছিল না, এবং শুধু সে-ই না, বুড়ো

বরিসেরও। কাতেরীনারও মনে এই নিয়ে গভীর দুঃখ ছিল। আর কিছু না হোক—এই যে অন্তহীন একঘেয়ে জীবন তাকে মৃত্যু মোহ্যমান করে তুলছে তার থেকে সে নিষ্কৃতি পেত, ভগবান জানেন কতখানি আনন্দ পেত সে, যদি নাওয়ানো খাওয়ানো জামা-কাপড় পরানোর জন্য একটি বাচ্চা থাকতো তার—নিষ্কৃতি পেত এই বন্ধ, উঁচু পাঁচিলওলা, মারমুখো কুকুরে ভর্তি বাড়িটার অসহ্য একঘেয়েমি থেকে। শুধু তাই নয়, ঐ এক খোঁটা শুনে শুনে তার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল—'বিয়ে করতে গেলি কেন, তুই? একটা ভদ্রলোকের জীবন সর্বনাশ করলি তুই,—মাগী, বাঁজা পাঁঠি।' যেন মারাত্মক পাপটা তারই, সে পাপ তার স্বামীর বিরুদ্ধে, শ্বশুরের বিরুদ্ধে, এমন কি তাদের কুলে সাধু ব্যবসায়ীগুষ্ঠীর বিরুদ্ধে!

ধনৈশ্বর্য, আরাম-আয়েশে পরিপূর্ণ এই বাড়িতে কাতেরীনার ছিল সবচেয়ে নিঃসঙ্গ জীবন। দেখাটেখা করতে সে যেত খুবই কম এবং যদি বা তার স্বামীর সঙ্গে তার ব্যবসায়ী বন্ধুদের বাড়িতে যেত তাতেও কোনো আনন্দ ছিল না। ওরা সব প্রাচীন ধরনের কড়া লোক। তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত, সে কি ভাবে বসে, তার আচরণ কি রকম, সে কি ভাবে আসন ত্যাগ করে; ওদিকে কাতেরীনা তেজী মেয়ে এবং দুঃখদৈন্যে শৈশব কেটেছে বলে সে অনাড়ম্বর ও মুক্ত জীবনে অভ্যস্ত। পারলে সে এখখুনি দুটো বালতি দু'হাতে নিয়ে ছুটে যায় জাহাজঘাটে। সেখানে শুধু শেমিজ গায়ে স্নান করতে। কিংবা বেড়ার ফাঁক দিয়ে রাস্তার ঐ ছোঁড়াটার গায়ে বাদামের খোসা ছুঁড়ে মারতে। কিন্তু হায়, এখানে সব-কিছু সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভোর হওয়ার পূর্বেই তার শ্বশুর আর স্বামী ঘুম থেকে উঠে জালা জালা চা খেয়ে ছ'টার ভিতর কাজ-কারবারে বেরিয়ে যান, আর সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একা-একা আলস্যে আলস্যে এ-ঘর ও-ঘর করে করে ঘুরে মরে।. সবকিছু ছিমছাম, ফাঁকা। দেব-দেবীদের সামনে স্তিমিত প্রদীপ জ্বলছে। সমস্ত বাড়িতে আর কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই, কারো কণ্ঠস্বরের লেশমাত্র নেই।

কাতেরীনা ফাঁকা এ-ঘর থেকে ফাঁকা ও-ঘরে যায়, তারপর আরেক দফা আরো খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে, তারপর একঘেয়েমির জন্য হাই তোলে। তারপর সরু সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে ওঠে উঁচুতে নিজেদের শোবার ঘরে। সেখানে খানিকক্ষণ অলস নয়নে তাকিয়ে থাকে নিচের দিকে যেখানে দড়ি বানাবার পাটসুতো ওজন করা হচ্ছে, কিংবা অতি উৎকৃষ্ট মিহিন ময়দা গুদোমে পোরা হচ্ছে। আবার সে হাই তোলে—তাই করে যেন সে খানিকটে আরাম পায়। তারপর ঘন্টাখানেক, ঘন্টা দুই ঘুমিয়ে ওঠার পর আবার আসবে সেই

একঘেয়েমি—রুশদেশের খাঁটি একঘেয়েমি, ব্যবসায়ী বাড়ির একঘেয়েমি। সে-একটানা, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমি এমনই নিরন্ধ্র যে তাই লোকে বলে, তখন কোনো গতিকে কোনো একটা বৈচিত্র্য আনার জন্য মানুষ সানন্দে গলায় দড়ি দিয়ে দেখতে চায় তাতে করে কিছু একটা হয় কিনা। কাতেরীনার আবার বই পড়ারও বিশেষ শখ ছিল না; আর থাকলেই বা কি? বাড়িতে ছিল সর্বসুদ্ধ একখানা বই—কিয়েফ শহরে সংকলিত 'সন্তদের জীবনী'।

ধনদৌলতে ভরা শ্বশুরের এই বাড়িতে কাতেরীনার পুরো পাঁচটি বছর কেটে গেল অসহ একঘেয়েমিতে—মমতা-হীন স্বামীর সঙ্গে সহবাস করে। কিন্তু আকছারই যা হয়—এক্ষেত্রেও কেউ সেদিকে ক্ষণতরেও ভ্রূক্ষেপ করলো না।

॥ ২ ॥

কাতেরীনার বিয়ের ছ'বছর পর যে-বাঁধের জলে ইস্‌মাইলফ্‌দের গম-পেষার কল চলতো সেটা ফেটে গেল। আর অদৃষ্ট যেন ওদের ভেংচি কাটবার জন্যই ঠিক ঐ সময়ে মিলের উপর পড়লো প্রচণ্ড কাজের চাপ। তখন ধরা পড়ল যে ভাঙনটা প্রকাণ্ড। জল পৌঁচেছে সকলের নিচের ধাপে। জোড়াতালি দিয়ে কোনো গতিকে ভাঙনটাকে মেরামত করার সর্ব প্রচেষ্টা হল নিষ্ফল। জিনোভিই আশপাশের চতুর্দিক থেকে আপন লোকজন গম-কলে জড়ো করে সেখানে ঠায় বসে রইল দিনের পর দিন, রাত্তিরের পর রাত্তির। বুড়ো বাপ ওদিকে শহরের ব্যবসা-কারবার সামলালে। আর কাতেরীনার কাটতে লাগলো আরো নিঃসঙ্গ একটানা জীবন। গোড়ার দিকে স্বামী না থাকায় তার জীবনের একঘেয়েমি যেন চূড়ান্তে পৌঁছল, পরে আস্তে আস্তে তার মনে হল, এটা তবু ভালো—এতে করে যেন সে খানিকটে মুক্তি পেল। স্বামীর দিকে তার হৃদয়ের টান কখনো ছিল না। স্বামী না থাকায় তার উপর হাম্বাই-তাম্বাই করার মত লোক অন্তত একজন তো কমলো।

একদিন কাতেরীনা ছাতের উপরের ছোট্ট ঘরে জানলার পাশে বসে ক্রমাগত হাই তুলছিল। বিশেষ কিছু নিয়ে যে চিন্তা করছিল তা নয়। করে করে আপন হাই তোলা নিয়ে নিজেই যেন নিজের কাছে লজ্জা পেল। ওদিকে, বাইরের আঙ্গিনায় চমৎকার দিনটি ফুটে উঠেছে; কুসুম কুসুম গরম, রৌদ্রোজ্জ্বল, আনন্দ-ময়। বাগানের সবুজ বেড়ার ভিতর দিয়ে কাতেরীনা দেখছিল, ছোট-ছোট চঞ্চল পাখীগুলো কি রকম এক ডাল থেকে আরেক ডালে ফুরুৎ ফুরুৎ

করে উড়ছিল।

কাতেরীনা ভাবছিল, 'আচ্ছা, আমি সমস্ত দিন ধরে টানা হাই তুলি কেন? কি জানি। তার চেয়ে বরঞ্চ বেরিয়ে আঙ্গিনায় গিয়ে বসি কিংবা বাগানে বেড়িয়ে আসি।'

কিংখাপের একটি পুরনো জামা পিঠে-কাঁধে ফেলে কাতেরীনা বেরিয়ে পড়ল।

বাইরে উজ্জ্বল আলো আর বাতাস যেন নব জীবন দেবার জন্য বইছে। ওদিকে গুদামঘরের কাছে উঁচু চকে সবাই প্রাণ-ভরা খুশীতে ঠা ঠা করে হাসছিল।

'অত রগড় কিসের?' কাতেরীনা তার শ্বশুরের কেরানীদের জিজ্ঞেস করলো।

'অর্থাৎ, ব্যাপারটা হচ্ছে, মা-ঠাকরুণ,—একাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না—আমরা একটা জ্যান্ত শুয়োরী ওজন করছিলুম।'

'শুয়োরী? সে আবার কি?'

'ঐ যে আক্‌সীনিয়া শুয়োরীটা। বাচ্চা ভাস্‌সীলিইকে বিইয়ে গির্জের পরবে আমাদের নেমন্তন্ন করলো না, তাকে'—উত্তর দিল হাসিভরা বেপরোয়া গলায় একটি ছোকরা। বেশ সাহসী সুন্দর চেহারা। মিশকালো চুল, অল্প অল্প দাড়ি সবে গজাচ্ছে। সের্‌গেই তার নাম।

ঐ মুহূর্তেই দাঁড়ে ঝোলানো ময়দা মাপার ধামা থেকে উঁকি মেরে উঠলে রাঁধুনী আক্‌সীনিয়ার চর্বিতে ভর্তি চেহারা আর গোলাপী গাল।

'বদমাইশ ব্যাটারা, শয়তান ব্যাটারা'—রাঁধুনী তখন গালাগালি জুড়েছে। সে তখন ধামা ঝোলানোর ডাণ্ডাটা ধরে কোনো গতিকে পাল্লা থেকে বেরবার চেষ্টা করছে।

'খাবার আগে তার ওজন ছিল প্রায় চার মণ। এখন যদি ভাল করে খড় খায় তবে আমাদের সব বাটখারা ফুরিয়ে যাবে।'—সেই সুন্দর ছোকরা বুঝিয়ে বললে। তারপর পাল্লাটা উল্টে রাঁধুনীকে ফেলে দিলে এক কোণের কতকগুলো বস্তার উপর।

রাঁধুনী হাসতে হাসতে গালমন্দ করছিল আর কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করাতে মন দিল।

'আচ্ছা, ভাবছি আমার ওজন কত হবে।' হাসতে হাসতে দড়ি ধরে মালের দিকটায় উঠে কাতেরীনা শুধলো।

'এক শ' পনেরো পাউণ্ডের সামান্য কম।' বাটখারা ফেলে সের্‌গেই বললে, 'আশ্চর্য!'

'এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?'

'আপনার যে অতখানি ওজন হবে আমি মোটেই ভাবতে পারিনি, কাতেরীনা লভভ্না। আমার কি মনে হয় জানেন ? আপনাকে দু' হাতে তুলে সমস্ত দিন কারো বয়ে বেড়ানো উচিত। এবং সে তাতে করে ক্লান্ত তো হবেই না, বরঞ্চ শুধু আনন্দই পাবে।'

'হুঃ। আমি তো আর পাঁচজনেরই মত মাটির মানুষ। তুমিও ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'—এ ধরনের কথাবার্তা বলতে কাতেরীনা অভ্যস্ত ছিল না বলে উত্তর দিতে গিয়ে তার মুখ একটুখানি রাঙা হয়ে গেল এবং হঠাৎ তার এক অদম্য ইচ্ছা হল অফুরন্ত আনন্দ আর সরস কথাবার্তা বলে তার হৃদয়-মন ভরে নেয়।

সেরগেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে উঠলো, 'কক্‌খনো না, ভগবান সাক্ষী, আমি আপনাকে আমাদের পুণ্যভূমি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবো।'

সাদামাটা পাতলা-দুব্‌লা একজন চাষা ময়দা মাপতে মাপতে বললো, 'ও হিসেব চলে না, সোনা। আমাদের কার কত ওজন তা দিয়ে কি হয় ? তুমি কি মনে করো আমাদের মাংস সব-কিছু করে ? আমাদের মাংসের ওজনের কোনো দাম নেই, বুঝলে দোস্ত। আমাদের ভিতর যে শক্তি আছে সেই শক্তিই সব-কিছু করে—আমাদের মাংস কিছুই করে না !'

আবার কাতেরীনা নিজেকে সংযত না করতে পেরে বলে ফেলল, 'বাঃ ! আমার বয়েস যখন কম ছিল তখন আমার গায়ে ছিল বেশ জোর ; সব পুরুষই যে আমার সঙ্গে তখন পেরে উঠতো সে-কথাটা আদপেই মনের কোণে ঠাঁই দিয়ো না।'

সুশ্রী ছোকরা অনুরোধ জানিয়ে বললে, 'খুব ভালো কথা। তাই যদি হয় তবে আপনার ছোট্ট হাতটি আমায় একটু ধরতে দিন তো !'

কাতেরীনা হকচকিয়ে গেল কিন্তু হাত তবু দিলে বাড়িয়ে।

'লাগছে, লাগছে—ওঃ ! আংটিটা ছেড়ে দাও। ওটাতে লাগছে'—সেরগেই কাতেরীনার হাত চেপে ধরতেই সে চিৎকার করে উঠলো আর অন্য হাত দিয়ে দিলে তার বুকে ধাক্কা। সেরগেই সঙ্গে সঙ্গে তার কর্ত্রীর হাত ছেড়ে দিয়ে ধাক্কার চোটে তাল সামলাতে না পেরে পাশের দিকে দু'পা সরে গেল।

সেই ছোটখাটো সাদামাটা চাষা অবাক হয়ে বললে, 'হুম্! লাও ঠেলা। মেয়েদের কথা আর বলছো না যে ?'

সেরগেই মাথার চুল ঝাঁকুনি মেরে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে উঠলো, 'না, না। আমাদের ধরাধরিটা ঠিক মত হোক, তবে তো।'

কাতেরীনা বললে, 'তবে এসো।' ততক্ষণে তারও মনে স্ফূর্তির ছোঁয়াচ লেগেছে। দুটি সুডৌল কনুই উপরের দিকে তুলে ধরে বললে, 'তবে এসো।'

সেরগেই তার তরুণী কর্ত্রীকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে তার সুঠাম বুক আপন লাল শার্টের উপর চেপে ধরলো। কাতেরীনা তার কাঁধ সরাবার পূর্বেই সেরগেই তাকে শূন্যে তুলে ধরে দু'হাতে উপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে আপন বুকে চেপে ধরেছে। তারপর আস্তে আস্তে নামিয়ে নিয়ে একটা উল্টো ধামার উপর বসিয়ে দিল।

আপন দেহের যে-শক্তি সম্বন্ধে কাতেরীনা দম্ভ করেছিল তার একরত্তিও সে কাজে লাগাতে পারেনি। এবারে সে লালে লাল হয়ে গিয়ে ধামায় বসে কিংখাপের জামাটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে গায়ে ঠিক মত বসালো। তারপর চুপচাপ গুদোমবাড়ি ছেড়ে রওয়ানা দিল। মেকদার মাফিক যতখানি দরকার ঠিক ততখানি দেমাকের সঙ্গে সেরগেই গলা সাফ করে মজুরদের উদ্দেশে হাঁক দিয়ে বললে, 'ওরে ও গাধার পাল! ময়দার স্রোত বন্ধ হতে দিস নি, হালের উপর এলিয়ে পড়ে আরাম করিস নি। যদি কিছু থাকে বাকি, মোরা তো যাবো না ফাঁকি।'

ভাবখানা করলে যে এক্ষুনি যা হয়ে গেল সে যেন তার কোনো পরোয়াই করে না।

কাতেরীনার পিছনে হাঁপাতে হাঁপাতে যেতে যেতে রাঁধুনী তাকে বললে, 'ব্যাটাচ্ছেলে সেরেজ্‌কা মেয়েছেলের পিছনে কি রকম ডালকুত্তার মতই না লাগতে জানে! ঐ চোরটার নেই কি? শরীরের গঠন, চেহারা, মুখের ছবি—সব-কিছুই আছে। দুনিয়ার যে কোনো মেয়েই হোক, ঐ বদমায়েশটা এক লহমায় তাকে মাৎ করে দেবে, তারপর তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠেলে দেবে পাপের রাস্তায়। আর কাউকে ভালোবেসে তার প্রতি অনুগত থাকার কথা যদি তোলেন, তবে ও রকম হাড়েটক বেইমানের জুড়ি পাবেন না।'

আগে যেতে যেতে যুবতী কর্ত্রী শুধালো, 'আচ্ছা, কি বলছিলুম, ঐ যে··· তোমার ছেলেটি বেঁচে আছে তো?'

'বেঁচে আছে, মা ঠাকরুণ, দিব্য জলজ্যান্ত বেঁচে আছে—ওর আর ভাবনা কিসের? ওদের যখন কেউ চায় না তখনই তারা প্রাণটাকে আঁকড়ে ধরে আরো জোর দিয়ে।'

'বাচ্চাটাকে দিল কে?'

'কে জানে? ঘটে গেল—বলতে পারেন মোটামুটি। জোয়ান বন্ধুবান্ধব থাকলে

ওরকম ধারা ঘটে যায় বইকি।'

'ঐ ছোঁড়াটা আমাদের সঙ্গে কি অনেকদিন ধরে আছে?'

'কার কথা বলছেন? সেবুগেই?'

'হ্যাঁ।'

'মাসখানেক হবে। আগে সে কন্‌চনফ্‌দের ওখানে কাজ করতো। সেখানকার মুনিব ওকে খেদিয়ে দেন।' তারপর গলা নামিয়ে আস্তে আস্তে বললো, 'লোকে বলে সেখানে সে খুদ কর্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করেছিল···জাহান্নমে যাক ব্যাটা। সাহসটা দেখুন তো।'

॥ ৩ ॥

মধুর মধুর গরম, দুধের মত সাদা প্রায়ান্ধকার নেমে এসেছে শহরের উপর। জলের বাঁধের মেরামতির কাজ থেকে জিনোভিই এখনো ফেরেনি। সে রাত্রে শ্বশুরও বাড়িতে নেই। তার এক প্রাচীন দিনের বন্ধুর জন্মদিনের পরবে বুড়ো সেখানে গেছে। বলে গেছে রাত্রেও বাড়িতে থাবে না; কেউ যেন তার জন্য অপেক্ষা না করে। আর কিছু করবার ছিল না বলে কাতেরীনা সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে শোবার ঘরের খোলা জানলার উপর হেলান দিয়ে বসে বাদামের খোসা ছাড়াচ্ছে। রান্নাঘরে মজুরদের খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখন তারা আঙ্গিনার উপর দিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আপন আপন শোবার জায়গায় যাচ্ছে। কেউ গোলাবাড়িতে, কেউ মরাইয়ে, কেউ মিঠে মিঠে গন্ধের খড়ের গাদার দিকে। রান্নাঘর থেকে বেরুল সেবুগেই সর্বশেষে। সে প্রথম আঙ্গিনার চতুর্দিকে রোঁদ দিয়ে তদারকী করলে, কুকুরগুলোর চেন খুলে দিলে, শিষ দিতে দিতে কাতেরীনার জানলার নিচে দিয়ে যাবার সময় উপরের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে তাকে অভিবাদন জানালে।

জানলার পাশে বসে কাতেরীনা মৃদুকণ্ঠে প্রত্যভিবাদন জানালো—বিরাট আঙ্গিনা খানিকক্ষণের ভিতরই নির্জন প্রান্তরের মত নিঃশব্দ হয়ে গেল।

মিনিট দুই যেতে না যেতে কাতেরীনার চাবি-বন্ধ ঘরের বাইরে কে যেন ডাকলো, 'ঠাকরুণ!'

কাতেরীনা ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, 'কে?'

কেরানী উত্তর দিলে, 'দয়া করে ভয় পাবেন না। আমি। আমি সেবুগেই।'

'কি চাই তোমার, সেবুগেই?'

'আমি আপনার দয়া ভিক্ষা করতে এসেছি, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না; একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে এসেছি—আমাকে কৃপা করে এক মিনিটের জন্য ভিতরে আসতে দিন।'

কাতেরীনা চাবি ঘুরিয়ে দোর খুলে দিয়ে সের্‌গেইকে ঘরে ঢুকতে দিল।

'কি ব্যাপার, কি চাই?' জানলার কাছে ফিরে গিয়ে কাতেরীনা শুধলো।

'আমি আপনার কাছে এলুম জিজ্ঞেস করতে, আপনার কাছে চটি বই-টই কিছু আছে? আমাকে যদি দয়া করে পড়তে দেন। এখানে কী দুর্বিষহ একঘেয়ে জীবন।'

কাতেরীনা উত্তর দিলে, 'আমার কাছে কোনো প্রকারেরই বই নেই, সের্‌গেই। আমি তো পড়ি নে।'

সের্‌গেই ফরিয়াদ করলে, 'কী একঘেয়ে জীবন!'

'তোমার জীবন একঘেয়ে হবে কেন?'

'অপরাধ যদি না নেন তবে নিবেদন করি, একঘেয়ে লাগবে না কেন? আমার এখন যৌবন কাল, অথচ আমরা এখানে আছি মঠের সন্ন্যাসীদের মত। আর ভবিষ্যতের দিকে তাকালে দেখতে পাই, এই নির্জনতাতেই আমাকে পচে হেজে খতম হতে হবে, যতদিন না আমার কফিন-বাক্সের * ডালায় পেরেক ঠোকা হয়। মাঝে মাঝে আমি যে নৈরাশ্যের কোন্ চরমে পৌঁছই তা আর কি করে বোঝাই!'

'বিয়ে করো না কেন?'

'বিয়ে করবো? বলা বড় সোজা! এখানে আমি বিয়ে করবো কাকে? আমি তো বিশেষ কিছু জমিয়ে উঠতে পারি নে, আর বড়লোকের মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে যাবে কেন? ওদিকে গরীব বলেই আমাদের শ্রেণীর মেয়ে মাত্রই লেখা-পড়ার ধার ধারে না—সে তো আপনি জানেন, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না। তারা কি কখনো সত্যি সত্যি বুঝতে পারে, প্রেম বলতে কি বোঝায়! শুধু তাই নয়, বড়লোকদের ভিতর এ-বিষয়ে কি ধারণা সেটাও

---

* বাঙ্গালী মুসলমান 'কফন' বা 'কাফন' বলতে শবাচ্ছাদনের বস্ত্র বোঝে। (ইংরিজি 'শ্রাউড') শব্দটি ফার্সীর মাধ্যমে আরবী থেকে এসেছে। ইয়োরোপীয় ভাষায় 'কফিন' বলতে যে কাঠের বা পাথরের বাক্সে মৃতদেহ রেখে গোর দেওয়া হয় সেই বাক্স বোঝায়। উভয় শব্দই খুব সম্ভব গ্রীক 'কফিনস' থেকে এসেছে। ইংরিজি 'কফার'—'পেটিকা'—এই শব্দ থেকেই এসেছে।—অনুবাদক।

একবার চিন্তা করুন তো। এই ধরুন আপনার কথা; আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, সামান্যতম স্পর্শকাতরতা যার হৃদয়ে আছে তার কাছে আপনি সান্ত্বনার চিরন্তন উৎস। অথচ দেখুন দেখিনি তারা আপনাকে নিয়ে কি করছে? ময়না পাখীটির মত খাঁচায় পুরে রেখেছে।'

কাতেরীনার মুখ থেকে ফস্কে গেল, 'কথাটা সত্যি; আমি নিঃসঙ্গ।'

'তাই একঘেয়ে লাগবে না তো কী লাগবে মাদাম্—যে-ভাবে আপনি জীবন যাপন করছেন? আপনার অবস্থায় অন্যেরা যা করে থাকে, আপনার যদি সে রকম 'উপরি' কেউ থাকতোও, তবুই বা কি হত? তার সঙ্গে দেখা করাও তো আপনার পক্ষে অসম্ভব।'

'এই! তুমি…একটু সীমা পেরিয়ে যাচ্ছো। আমার একটি বাচ্চা থাকলেই, আমার তো মনে হয়, আমি সুখী হতুম।'

'কিন্তু একটু চিন্তা করুন; আমাকে যদি অনুমতি দেন তবে বলি, বাচ্চা জন্মাবার জন্য তার পিছনে তো কোনো-কিছু-একটা চাই—বাচ্চা তো আর আকাশ থেকে পড়ে না। আপনি কি মনে করেন আমি জানি নে আমাদের ব্যবসায়ীদের বউ-ঝিরা কি ভাবে জীবন কাটায়—এত বছর আমার মুনিবদের মাঝখানে বাস করেও? আমাদের একটা গীত আছে, 'আপন হৃদয়ে প্রেম না থাকলে, জীবন সে তো শুধু বিষণ্ণ দুরাশা!' আর সেই দুরাশা, সেই কামনা—আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, কাতেরীনা ল্ভভ্না, আমার হৃদয় এমনই বেদনায় ভরে দিয়েছে যে, ইচ্ছে করে ইস্পাতের ছুরি দিয়ে হৃদয়টাকে বুকের মাঝখান থেকে কেটে বের করে আপনার কচি দুটি পায়ের উপর রাখি। আমি তাহলেই শান্ত হব—শতগুণ শান্তি ফিরে পাবো।'

'তোমার হৃদয় সম্বন্ধে কি যা-তা সব তুমি আমাকে বলছো? তার সঙ্গে আমার তো কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি এইবারে আস্তে আস্তে রওয়ানা দাও।'

'না, দয়া করুন, ঠাকরুণ।' সের্গেই ততক্ষণে কাতেরীনার দিকে এক পা এগিয়ে এসেছে, তার সমস্ত শরীর তখন কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে উঠছে। 'আমি জানি, হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি, স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনার জীবনও এ-পৃথিবীতে আমার জীবনের মতই অত সহজ সরল ভাবে বয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু এখন শুধুমাত্র একটি কথা—' এ-কথাগুলো সে বলে গেল এক নিশ্বাসে—'এখন, এই মুহূর্তে, সব-কিছু আপনার হাতে, আপনার তাঁবেতে।'

'কি চাও তুমি? এ-সব কি হচ্ছে? এখানে আমার কাছে তুমি এসেছ কেন? আমি এখখুনি জানলা দিয়ে লাফ দেব'—কাতেরীনা যখন এ-কথাগুলো

বলছিল তখন তার মনে হচ্ছিল, কেমন যেন একটা অবর্ণনীয় ভয় তাকে অসহ্য বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছে ; সে তখনো জানলার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে আছে। 'ওগো, আমার তুলনাহীনা, ও আমার জীবনসমা ! জানলা দিয়ে লাফ দেবার কি প্রয়োজন ?'—সহজ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সেরগেই এ-কথাগুলো কাতেরীনার কানে কানে মৃদুস্বরে বললে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে জানলা থেকে টেনে এনে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো।

'ও, ও ! আমাকে ছাড়'—মৃদু কাতর কণ্ঠে কাতেরীনা বললে ; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেরগেইর নিবিড় চুম্বন বর্ষণে তার শক্তি যেন ক্রমেই লোপ পাচ্ছিল। আপন অনিচ্ছায় তার দেহ কিন্তু সেরগেইয়ের দেহের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল।

সেরগেই তার কর্ত্রীকে শূন্যে তুলে নিয়ে দুই বাহুতে করে—যেন একটি ছোট্ট বাচ্চাকে তুলে ধরেছে—ঘরের অন্ধকার কোণে নিয়ে গেল।

সমস্ত ঘরে নীরবতা—শুধু শিয়রের খাড়া তক্তাতে ঝোলানো কাতেরীনার স্বামীর পোশাকী ট্যাঁকঘড়িটি টিকটিক করে যাচ্ছে ; কিন্তু সে আর কি বাধা দেবে !

'যাও।' আধঘণ্টা পরে কাতেরীনা সেরগেইয়ের দিকে না তাকিয়েই আলু-থালু চুল ছোট্ট একটি আয়নার সামনে ঠিক করতে করতে বললো।

'এখন আর আমি যাবো কেন ? বিশ্ব-সংসার খুঁজলেও তো এখন আর কোনো কারণ পাওয়া যাবে না।' সেরগেইয়ের কণ্ঠে এখন উল্লাসের সুর।

'শ্বশুরমশাই বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে দেবেন যে।'

'কি বললে, আমার পরাণের মণি ? এতদিন ধরে তুমি কি শুধু তাদেরই নিয়ে নাড়াচাড়া করেছ যারা রমণীর কাছে পৌঁছতে হলে দরজা ভিন্ন অন্য কোনো পথ জানে না ? আমার ভিন্ন ব্যবস্থা। তোমার কাছে আসতে হলে, তোমার কাছ থেকে যেতে হলে আমার জন্য বহু দরজা খোলা রয়েছে।' ব্যালকনির খুঁটি দেখিয়ে উত্তর দিলে তরুণ।

॥ ৪ ॥

জিনোভিই সাত দিন হল বাড়ি ফেরে নি, আর এই সমস্ত সপ্তাহ ধরে তার স্ত্রী প্রতিটি রাত্রি সেরগেইয়ের সঙ্গে কাটিয়েছে সরস রভসে—শুভ্র প্রভাতের প্রথম আলোর প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত।

এই সাত রাত ধরে জিনোভিই বরিসিচের বেড্রুমে শ্বশুরমশাইয়ের ভাঁড়ার

থেকে নিয়ে আসা প্রচুর ওয়াইন পান করা হল, প্রচুর মিষ্ট-মিষ্টান্ন খাওয়া হল, তরুণী গৃহকর্ত্রীর মধুভরা ঠোঁট থেকে প্রচুর চুম্বন চুমুকে চুমুকে তোলা হল, তুলতুলে বালিশের উপর ঘন কৃষ্ণ অলকগুচ্ছ নিয়ে খেলাভরে প্রচুর আদর-সোহাগ করা হল। কিন্তু হায়, কোনো পথই আদ্যন্ত মসৃণ নয়—মাঝে মাঝে হোঁচট ঠোক্করও খেতে হয়।

বরিস তিমোতেইচের চোখে সে-রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বুড়ো রাত্রির লম্বা রঙীন ঝোল্লা পরে এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াচ্ছিল; জানলার কাছে এসে বাইরের দিকে তাকালো, তার পর আরেকটা জানলার কাছে এসে দেখে, লাল শার্ট পরা সেই খাপসুরৎ ছোকরা সের্গেই তার পুত্রবধূর জানলার একটা খুঁটি বেয়ে অতিশয় নীরব নিঃশব্দে নেমে যাচ্ছে। বরিস তিমোতেইচ্ ঝড়ের বেগে বেরিয়ে পড়ে চেপে ধরলো রোমিয়ো নটবরের পা দু'খানা। সে তখন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথমটায় চেয়েছিল বুড়োকে একখানা খাঁটি বিরাশী সিক্কা লাগায়—আকস্মিক উৎপাতে তারও মেজাজটা গিয়েছিল বিগড়ে—কিন্তু সেটা আর লাগালে না, ভাবলো, তাহলে একটা হট্টগোল আরম্ভ হয়ে যাবে।

বরিস তিমোতেইচ্ জিজ্ঞেস করলে, 'বল্ ব্যাটা চোর, কোথায় গিয়েছিলি?'

সের্গেই উত্তর দিলে, 'লাও! শুধোচ্ছে, কোথায় গিয়েছিলুম আমি! যেখানেই গিয়ে থাকি নে কেন, সেখানে আমি আর এখন নেই! হল, বরিস তিমোতেইচ্ মহাশয়, প্রিয়বরেষু!'

'আমার ছেলের বউয়ের ঘরে তুই রাত কাটিয়েছিস?'

'ঐ কথাটাই যদি জিজ্ঞেস করলেন কর্তা-ঠাকুর, তাহলে আবার বলি, আমি জানি, আমি রাত্তিরটা কোথায় কাটিয়েছি; কিন্তু এইবেলা তোমাকে একটি খাঁটি তত্ত্বকথা বলছি আমি, বরিস তিমোতেইচ্; যা হয়ে গিয়েছে সেটা তুমি আর কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারবে না। খামোখা কেন তোমাদের শিষ্ট ব্যবসায়ী পরিবারের উপর এখন ফালতো কেলেঙ্কারি টেনে আনবে—অন্তত সেটা তো ঠেকাতে পারো। এখন আমাকে সরল ভাষায় বলো, আমাকে কি করতে হবে। তুমি কি দান পেলে সন্তুষ্ট হবে?'

'তোকে আমি পাঁচ শ' ঘা চাবুক কশাবো, ব্যাটা পিচেশ।'

'দোষ আমারই—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক!' সাহসী নাগর স্বীকৃত হল। 'এবারে বলো তোমার সঙ্গে কোথায় যেতে হবে; প্রাণ যা চায় সেই আনন্দ করে নাও—আমার রক্ত চেটে নাও।'

বরিস তখন সেরগেইকে শানে তৈরী তার ছোট্ট একটি গুদোম ঘরে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক চাবকাতে আরম্ভ করলো। যখন বুড়োর আর চাবুক মারার মত শক্তি একরত্তিও রইল না তখনই থামলো। সেরগেইয়ের গলা থেকে কিন্তু একবারের তরেও এতটুকু আর্তরব বেরোয়নি, তবে, হ্যাঁ, শার্টের আস্তিনে সে যে দাঁত কিড়িমিড়ি করে কামড়ে ধরেছিল তার অর্ধেকখানা শেষ পর্যন্ত সে চিবিয়ে কুটি কুটি করে ফেলেছিল।

সেরগেই মাটিতে পড়ে রইল। চাবুকে চাবুকে তার পিঠ তখন কামারের আগুনে পোড়া কড়াইয়ের মত লাল হয়ে গেছে। সেটা শুকোবার সময় দিয়ে বুড়ো তার পাশে এক ঘটি জল রেখে গুদোমঘরের দোরে বিরাট একটা তালায় চাবি মারলে। তারপর ছেলেকে আনবার জন্য লোক পাঠালে।

কিন্তু এই আজকের দিনেও* রাশার বড় রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তায় ছ' মাইল পথ আসা যাওয়া সাততাড়াতাড়িতে হয়ে ওঠে না, ওদিকে আবার কাতেরীনা যে সময়টুকু না হবার নয় তার বেশী একটি মাত্র ঘণ্টাও সেরগেই বিহনে কাটাতে পারে না। তার সুপ্ত প্রবৃত্তি তখন অকস্মাৎ পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং ফলে সে এমনই দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে উঠেছে যে, তখন তার পথ রোধ করে কার সাধ্য! আতিপাতি খুঁজে সে বের করে ফেলেছে সেরগেই কোথায়। সেখানে লোহার দরজার ভিতর দিয়ে সেরগেইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সবকিছু ঠিকঠাক করে ছুটলো চাবির সন্ধানে।

শ্বশুরের কাছে গিয়ে মিনতি জানালে, 'সেরগেইকে ছেড়ে দাও, বাবা, লক্ষ্মীটি।'

বুড়োর মুখের রঙ স্রেফ সবুজ হয়ে গেল। এতখানি বেহায়ামির দুঃসাহস সে তার পাপিষ্ঠা পুত্রবধুর কাছে প্রত্যাশা করেনি—কারণ, পাপিষ্ঠা হোক আর বেহায়াই হোক, এতদিন সে ছিল বড় বাধ্য মেয়ে।

'এ কি আরম্ভ করলি তুই, তুই অমুক-তমুক?'—বুড়ো অশ্লীল ভাষায় তার বেহায়াপনা নিয়ে কটুকাটব্য আরম্ভ করলো।

'ওকে যেতে দাও, বাবা। আমি আমার বিবেক সাক্ষী রেখে শপথ করছি আমরা এখনো কোন পাপাচার করি নি।'

'পাপাচার করে নি! ওঃ! বলে কি?'—বুড়ো যেন আর কিছু না করতে পেরে শুধু দাঁত কিড়িমিড়ি দিতে লাগলো। 'এ ক' রাত্তির ধরে তোমরা উপরে

---

* ১৮৬৫ খৃঃ। —অনুবাদক।

কি করে সময় কাটাচ্ছিলে ? দুজনাতে মিলে তোমার স্বামীর বালিশের ফেঁসো ফুলিয়ে ফালিয়ে তার জন্য জুৎসই করে রাখছিলে।'—বুড়ো ব্যঙ্গ করে উঠলো।

কাতেরীনা কিন্তু নাছোড়বান্দা ; সেই এক বুলি ক্রমাগত বলে যেতে লাগলো, ওকে ছেড়ে দাও,—ফের আবার—ওকে ছেড়ে দাও।

বুড়ো বরিস বললে, 'এই যদি তোর বাসনা হয় তবে শুনে নে ; তোর স্বামী ফেরার পর তোকে বাইরের ঐ আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে আমরা দুজনাতে আপন হাতে চাবুক মারবো—সতী সাধ্বী রমণী কি না তুই ! আর ঐ ব্যাটাকে নিয়ে কি করা হবে শুনবি—ইতর বদমাইশটাকে কালই পাঠাবো জেলে !'

এই ছিল বরিস তিমোতেইচের সিদ্ধান্ত ; শুধু এইটুকু বলার আছে যে সে-সিদ্ধান্ত কখনো কর্মে রূপান্তরিত হল না।

॥ ৫ ॥

সেই রাত্রে বুড়ো বরিস ব্যাঙের ছাতা আর গমের পরিজ্ খেয়েছিল। খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তার বুক-জ্বালা আরম্ভ হল ; হঠাৎ তলপেটে তার অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হতে লাগল। খানিকক্ষণ পর বমির চোটে যেন তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসতে লাগল এবং ভোরের দিকে সে ভবলীলা সংবরণ করলো ; হুবহু যে-রকম গুদোমবাড়ির ইঁদুরগুলো মারা যায়। এদেরই 'উপকারার্থে' কাতেরীনা আপন হাতে এক রকমের মারাত্মক সাদা গুঁড়ো মাখিয়ে খাবার তৈরি করতো—এ গুঁড়োটা কাতেরীনার হেপাজতেই থাকতো।

কাতেরীনা তার আপন সের্‌গেইকে বুড়োর গুদোমঘর থেকে মুক্ত করে নিয়ে সকলের চোখের সামনে, কণামাত্র লজ্জা-শরম না মেনে, শ্বশুরের চাবকানো থেকে সেরে ওঠার জন্য তাকে তার স্বামীর বিছানায় আরাম করে শুইয়ে দিল। ওদিকে কালবিলম্ব না করে শ্বশুরকে খৃষ্টধর্মের আচার-অনুষ্ঠান সহ গোর দেওয়া হল। অবশ্য লক্ষণীয় বলে মনে হতে পারে, কারো মনে কোনো সন্দেহের উদয় হয়নি ; বরিস তিমোতেইচ্ যদি মরে গিয়ে থাকে তবে, হ্যাঁ, সে নিশ্চয়ই মারা গেছে ব্যাঙের ছাতা খেয়ে—আর, ওরকম কত লোক তো ব্যাঙের ছাতা খেয়ে আক-ছারই মারা যায়। ছেলের জন্য অপেক্ষা না করেই বুড়ো বরিসকে সাত-তাড়াতাড়ি গোর দেওয়া হয়েছিল, কারণ বছরের ঐ সময়টায় ভাপসা গরম পড়ে* আর যে লোকটা খবর নিয়ে গিয়েছিল সে জিনোভিই বরিসিচকে 'মিলে'

* ফলে মৃতদেহ খুব তাড়াতাড়ি পচতে আরম্ভ করে। —অনুবাদক।

পায়নি। ষাট মাইল আরো দূরে সে সস্তা কিছু জঙ্গলা জমির খবর পায় এবং সেটা দেখতে সে ঐ দিকে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় সে আবার কাউকে পরিষ্কার করে বলে যায়নি ঠিক কোন্ জায়গায় যাচ্ছে।

সব ব্যবস্থা করে নেবার পর কাতেরীনা একদম বে-লাগাম হয়ে গেল। ভীরু সে কোনো কালেই ছিল না, কিন্তু এখন তার মনের ভিতর কি খেলছে তার কোনো পাত্তাই কেউ পেল না। পুরো পাক্কা হিম্মৎভরে সে চলা-ফেরা করতে লাগলো, বাড়ির সর্বপ্রকার কাজকর্মে ঠিকমত তদারকি করলো এবং সেরুগেইকে এক লহমার তরে চোখের আড়াল হতে দিত না। বাড়িতে যারা কাজ করতো তারা সবাই এসব দেখে তাজ্জব; কিন্তু কাতেরীনা দরাজ হাত দিয়ে প্রত্যেককে বশীভূত করার তত্ত্বটি বিলক্ষণ জানতো, সর্ববিস্ময় তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

যে যার আপন মনে অনুমান করলে, 'কর্ত্রীঠাকুরাণী আর সেরুগেইয়ের ভিতর চলছে বেলেল্লাপনা—ঐ হল গিয়ে মোদ্দা কথা। এখন তো ওটা তারই শিরঃপীড়া, আমাদের কি, আর জবাবদিহি তো করতে হবে একলা তাকেই।'

ইতিমধ্যে সেরুগেই তার স্বাস্থ্য, তার নমনীয় মাধুর্য পুনরায় ফিরে পেয়েছে আর বীরদের সেরা বীরের মত আবার কাতেরীনার উপরে শিকরে পাখীর মত চক্কর খেতে শুরু করেছে। আবার আরম্ভ হয়েছে তাদের আনন্দময় দিন-যামিনী! কিন্তু কালবেগ শুধু ওদের দুজনার তরেই তো আর এগিয়ে যাচ্ছিল না। ওদিকে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর স্বামী হিসেবে বিড়ম্বিত জিনোভিই বরিসিচ্ দ্রুতবেগে আপন গৃহমুখে ধাবিত হয়েছে।

॥ ৬ ॥

আহারাদি শেষ করা হয়েছে। বাইরে তখনও দুর্দান্ত গরম আর চটপট যেদিক-খুশি-সেদিকে-মোড়-নিতে ওস্তাদ মাছিগুলোর উৎপাত অসহ্য হয়ে উঠেছে। কাতেরীনা তার শোবার ঘরের জানলার খড়খড়িগুলো বন্ধ করে তার উপরে ভিতরের দিকে একখানা ফ্ল্যানেলের পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে বণিক সম্প্রদায়ের সমাদৃত উঁচু খাটে সেরুগেইকে নিয়ে বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়েছে। কাতেরীনা নিদ্রা জাগরণে আসা যাওয়া করছে, কিন্তু নিদ্রাই হোক আর জাগরণই হোক, তার মনে হচ্ছিল যেন তার মুখ ঘামে ভেসে যাচ্ছে আর প্রত্যেকটি নিশ্বাস অত্যন্ত গরম আর অতিশয় কষ্টের সঙ্গে ভিতরে যাচ্ছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছিল ঘুম থেকে

উঠে বাইরের বাগানে বসে চা খাবার বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপ্রাণ শত চেষ্টাতেও সে কিছুতেই উঠে বসতে পারছিল না। শেষটায় রাঁধুনী এসে দরজায় টোকা দিল।

প্রচণ্ড পরিশ্রম করে সে পাশ ফিরল, তারপর একটা হুলো বেড়ালকে আদর করতে লাগল। কারণ ইতিমধ্যে একটা খাসা সুন্দর, পুরোবাড়ন্ত, ...র মত মোটাসোটা, খাজনা উশুলের পেয়াদার মত বিরাট একজোড়া গোঁফওলা বাদামী রঙের বেড়াল এসে তার আর সেরগেইয়ের মাঝখানে গা ঘষতে আরম্ভ করেছে। কাতেরীনা তার ঘন লোমের ভিতর আঙ্গুল চালিয়ে তাকে আদর করতে লাগল আর বেড়ালটাও তার ভোঁতা মুখ আর বোঁচা নাক দিয়ে কাতেরীনার কঠোর-কোমল বুকে চাপ দিচ্ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সোহাগের ঘর্‌র্ ঘর্‌র্ শব্দ ছেড়ে যেন গান গাইছিল—কাতেরীনার প্রেম নিয়ে, অতি কোমল মোলায়েম সুরে। কাতেরীনা অবাক হয়ে ভাবছিল, 'এই হোঁৎকা মোটকা বেড়ালটা ঘরে ঢুকলই বা কি করে আর এলই বা কেন?' কাতেরীনা আবার আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, 'আমি খানিকটে সর জানলার চৌকাঠের উপর রেখেছিলুম; এই পাজী হুলোটাকে যদি তাড়া লাগিয়ে খেদিয়ে না দিই তবে সে বেবাক সর চেটে মেরে দেবে।' বেড়ালটাকে পাকড়ে ধরে বাইরে ফেলে দেবার সে যতই চেষ্টা করতে লাগল ততই সে যেন ঠিক কুয়াশার মত তার আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে বার বার গলে যেতে লাগলো। বোবায় ধরা দুঃস্বপ্নের ভিতরও কাতেরীনা মনে মনে তর্ক করতে লাগল, 'তা সে যাক্‌গে, কিন্তু এই হুলো বেড়ালটা এখানে আদৌ এল কোত্থেকে? আমাদের শোবার ঘরে তো কস্মিনকালেও কোনো হুলো বেড়াল ছিল না; তবু, দেখো, কি রকম একটা ইয়া লাশ এখানে ঢুকে পড়েছে!' আবার কাতেরীনা তাকে পাকড়াবার চেষ্টা করলো, আবার বেড়ালটা হাওয়া হয়ে গেল। মনে তার ধোঁকা লাগলো, 'বা রে! এটা তবে কি? দেখি ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে—এটা কি আদপেই হুলো বেড়াল না কি?' হঠাৎ এক দারুণ ভয়ের বিভীষিকা যেন তার সর্বাঙ্গ চেপে ধরে কুল্লে নিদ্রা আর নিদ্রালু ভাব খেদিয়ে দিল। কাতেরীনা ঘরের চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে বেড়ালটার নামগন্ধও নেই। শুধু তার সুদর্শন সেরগেই পাশে শুয়ে তার বুকের মাঝখানে আপন গরম মুখটি গুঁজে দিয়েছে।

কাতেরীনা বিছানায় উঠে বসল; চুম্বনে চুম্বনে সে সেরগেইকে আচ্ছন্ন করে দিল। তার আদর সোহাগ যেন শেষ হতেই চায় না। তারপর হাঁসের বুকের নরম পালকের আলুথালু বিছানাটাকে ছিমছাম করে দিয়ে বাগানে চা খেতে চলে

গেল। সূর্য তখন অস্তাচলে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে আর উষ্ণগর্ভা পৃথিবীর উপরে নেমে আসছে অপূর্বসুন্দর, সম্মোহনী সন্ধ্যা।

ফুলে ফুলে ঢাকা আপেল গাছের তলায় রাগ্-এর উপর বসলো কাতেরীনা চা খেতে। আক্সীনিয়াকে বললে, 'বড্ড বেশি ঘুমোতে ঘুমোতে অবেলা হয়ে গেল।' তারপর বাসন পোছার কাপড় দিয়ে একটা পিরিচ পুছতে পুছতে রাঁধুনীকে শুধলো, 'আচ্ছা, বল তো, এসবের অর্থ কি আক্সীনিয়া, সোনা?'

'কি? কিসের কি অর্থ, মা?'

'ওটা কিন্তু নিছক স্বপ্ন ছিল না। কোথাকার কোন্ এক হুলো বেড়াল বার বার শুধু আমার গা বেয়ে উঠছিল। আর-পাঁচটা বেড়ালের মত হুবহু জলজ্যান্ত বেড়াল। এর অর্থ কি?'

'এসব আপনি কি বলছেন?'

'সত্যি বলছি, একটা বেড়াল আমার গা বেয়ে উঠছিল।'

কি ভাবে বেড়ালটা তার গা বেয়ে উঠছিল সে-সব কথা তখন কাতেরীনা তাকে বললো।

'আপনি আবার ওটাকে আদর করতে গেলেন কেন?'

'তা, বাপু, আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? আমি নিজেই জানি নে, ওটাকে আদর করলুম কেন?'

'সত্যি সত্যি, বড্ডই তাজ্জব ব্যাপার এটা!'

'আমার নিজেরই বিস্ময়ের সীমা নেই।'

'এটাতে নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছে কেউ না কেউ আপনার শত্রুতা না করে ছাড়বে না। কিংবা ঐ ধরনেরই কিছু একটা হবে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু ঠিক কি?'

'ঠিক ঠিক হুবহু কি হবে সেটা কেউই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে না,—ঠিক ঠিক, হুবহু কেউই পারবে না, সোনা মা, শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে, একটা না একটা কিছু ঘটবেই ঘটবে।'

কাতেরীনা বললে, 'আমি ঘুমে বার বার শুক্লপক্ষের ফালি চাঁদ দেখছিলুম, আর সেই বেড়ালটা।'

'ফালি চাঁদ?—তার অর্থ বাচ্চা হবে।'

কাতেরীনার মুখ লাল হয়ে উঠলো।

'সের্‌গেইকে কি তোমার কাছে এখানে নিচে পাঠিয়ে দেব, মা-মণি?'—কলে-কৌশলে ইঙ্গিত দিলে আক্সীনিয়া। আসলে কাতেরীনার বিশ্বাসের পাত্রী

হওয়ার জন্যে তার প্রাণ যেন বেরিয়ে আসছিল।

'হ্যাঁ, সেও তো বেশ কথা। ওকে গিয়ে পাঠিয়ে দাও। আমি তাকে চা দেব'খন।'

'আমিও তাই বলি—এখানে পাঠিয়ে দি।' আক্সীনিয়াই প্রস্তাবটার নিষ্পত্তি করে দিল। তারপর পাতিহাঁসের মত হেলেদুলে বাগানের গেটের দিকে চললো।

কাতেরীনা সের্গেইকেও বেড়ালটার কথা বললে।

সের্গেই বললে, 'কিছু না, স্রেফ দিবাস্বপ্ন।'

'কিন্তু সেরেজা, আমি এর আগে এরকম দিবাস্বপ্ন কখনো দেখি নি কেন, সেইটে বুঝিয়ে বলো।'

'আগে কখনো হয় নি, এই প্রথম হল, এ রকম জিনিস তো নিত্যি নিত্যি হচ্ছে। এমন দিনও ছিল যখন আমি শুধু তোমাকে আড়চোখে একটুখানি দেখে নেবার সাহস করতে পারতুম না, আর তোমার জন্য আপন দুঃখে গুমরে মরতুম। আর এখন দেখো, সব-কিছু বদলে গিয়েছে। এই যে তোমার শ্বেতশুভ্র দেহ—এর সমস্তটি এখন আমার।'

সের্গেই কাতেরীনাকে বুকে ধরে আলিঙ্গন করলো, তারপর শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে নিয়ে কৌতুকভরে তাকে নরম কম্বলের উপর ফেলে দিল।

কাতেরীনা বললে, 'ওগো, আমার মাথা ঘুরছে। সেরেজা, এই দিকে এস। আমার পাশে এসে বসো।'—সের্গেইকে ডাক দিয়ে কাতেরীনা অলস রভসার মৌন ইঙ্গিত দিয়ে শুয়ে পড়ল।

শুভ্র কুসুমদামে আচ্ছাদিত আপেল গাছের তলায় বেপরোয়া রসের নাগর হামা দিয়ে এসে কাতেরীনার পায়ের কাছে বসলো।

'আমাকে পাবার জন্য তুমি কাতর হয়েছিলে,—না? সেরেজা?'

'তুমি যদি শুধু জানতে কতখানি কাতর হয়েছিলুম!'

'সেটা কি রকম ছিল, আমাকে বুঝিয়ে বলো।'

'সে আমি কি করে বুঝিয়ে বলবো? অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার মর্মবেদনায় তিলে তিলে দগ্ধ হওয়া কি কেউ কখনো বোঝাতে পারে? আমার ছিল সেই।'

'তা হলে, সেরেজা, তুমি যে নিজেকে তিলে তিলে মেরে ফেলছিলে সেটা আমি অনুভব করলুম না কেন? লোকে তো বলে সেটা নাকি অনুভব করা যায়।'

সের্গেই নীরব থেকে এ প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল।

'তা হলে তুমি হরদম গান গাইছিলে কি করে, যদি আমার জন্য এতখানি তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মরছিলে? কিছু ভয় নেই! আমি সব জানি। তুমি যে উঁচু বারান্দায় গান গাইতে সে তো আমি শুনতে পেতুম।'—কাতেরীনা সের্গেইকে আদর করতে করতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুধিয়ে যেতে লাগলো।

'গান গেয়েছিলুম তো কি হয়েছিল? একটা মশা জীবনভর গান গায়—সেটা কি ফুর্তির তোড়ে?'—বিরস কণ্ঠে সের্গেই উত্তর দিলে।

খানিকক্ষণের জন্য দুজনাই চুপচাপ। সের্গেইয়ের পূর্বরাগকীর্তন শুনে কাতেরীনার হৃদয় পরিপূর্ণ ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। কাতেরীনার বাসনা আরো কথা বলে কিন্তু সের্গেই ভুরু কুঁচকে কেমন যেন মৌনব্রত অবলম্বন করেছে।

ফুলে ফুলে ভরা আপেল গাছের শাখা-প্রশাখার পর্দার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ নীলাকাশ আর শান্ত প্রশান্ত পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে কাতেরীনা আবেশভরা কণ্ঠে বলে উঠলো, 'দেখো দেখো, সেরেজা,—এ যে স্বর্গপুরী, স্বর্গপুরীতে যেন মেলা বসেছে।'

কাতেরীনা শুয়েছিল চিৎ হয়ে—চাঁদের আলো আপেল গাছের ফুল আর পাতার ভিতর দিয়ে এসে কাতেরীনার মুখ আর দেহের উপর বিচিত্র শুভ্র আলপনার কম্প্রমান শিহরণ জাগাচ্ছিল; বাতাস স্তব্ধ, শুধু সামান্যতম ক্ষীণ মলয় অর্ধসুপ্ত পত্রাবলীতে ঈষৎ কম্পন জাগিয়ে পূর্ণকুসুমিত তরু আর নব উদ্গত তৃণের মৃদু সৌরভ দূরদূরান্তে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বাতাস যেন অলসাবেশে পরিপূর্ণ—যেন সে বাতাস এনে দেয় সর্ব কর্মে অরুচি, আত্মার অসংযম, আর মনের ভিতর দুর্বোধ যত কামনারাজি।

কাতেরীনা কোনো সাড়া না পেয়ে আবার চুপ করে গেল, আর তাকিয়ে রইল ফিকে গোলাপি আপেলফুলগুচ্ছের ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে। সের্গেইও কথা বলছিল না কিন্তু তার চিত্তকে আকাশ বিমোহিত করেনি। আপন হাঁটু দুটো দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল আপন বুট-জোড়ার দিকে।

আহা, যেন স্বর্ণজ্যোতি দিয়ে তৈরি রাত্রিটি। শান্ত, লঘু, সৌরভভরা আর প্রাণদায়িনী ঈষৎ উষ্ণতা! দূরে বহুদূরে, উপত্যকার পিছনে, বাগানের বহু দূরে কে যেন ধরেছে সুরেলা গীত; ঘন চেরী-তরু-ভরা বাগানের বেড়ার কাছে গেয়ে উঠলো একটি পাপিয়া শিহরিত উচ্চকণ্ঠে; উঁচু খুঁটিতে ঝোলানো কুয়েইল পাখীটি উত্তেজিত কণ্ঠে গেয়ে চলেছে সুরের প্রলাপ; ওদিকে আস্তাবলের

দেয়ালের পিছনে বিরাট একটা অশ্ব তন্দ্রালু হ্রেষারব তুললো, আর বাগানের বাইরে গোচারণ মাঠের উপর দিয়ে একপাল কুকুর দ্রুতবেগে ছুটে চলে গিয়ে অর্ধভগ্ন প্রাচীন হূনের ভাণ্ডারের কালো আবছায়ায় বিলীন হয়ে গেল।

কনুইয়ের উপর ভর করে কাতেরীনা একটুখানি উঠে বাগানের লম্বা লম্বা ঘাসের দিকে তাকালো—উজ্জ্বল চন্দ্রালোক ঘাসের উপর পড়ে ঝিলিমিলি লাগিয়েছে, তারই আভা গাছগুলোর ফুলে পাতায় নেচে নেচে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যেন কল্পলোকের অবর্ণনীয়, অত্যুজ্জ্বল লক্ষ লক্ষ চন্দ্রচূর্ণ দীর্ঘ তৃণরাজিকে স্বর্ণমণ্ডিত করে দিয়েছে; এমনই তাদের নিরবচ্ছিন্ন কম্পন, এমনই তাদের নিরবচ্ছিন্ন স্পন্দন যে মনে হয় এরা বহ্নিশিখার প্রজাপতি কিংবা যেন বৃক্ষনিম্নের তৃণরাজি চন্দ্ররশ্মির জাল-আবরণে বন্দী হয়ে এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে মুক্তির আকাজ্ক্ষায়।

কাতেরীনা তাকিয়ে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে বললে, 'আহা, সেরেজা, কী মধুর, কী সুন্দর—সব সব!'

সেরগেই চতুর্দিকের দৃশ্যের দিকে তাচ্ছিল্য-নয়নে একবার শুধু তাকালে।

'তুমি অমন মন-মরা হয়ে আছ কেন, সেরেজো? না, আমার ভালোবাসার প্রতিও তোমার অবসাদ এসে গেছে?'

'কি আবোল-তাবোল বকছো?'—সের্‌গেই নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলে; তারপর নিচু হয়ে কাতেরীনাকে অলস ভাবে চুমো দিল।

কাতেরীনার হৃদয়ে হিংসা এসেছে; বললে, 'তুমি প্রতারণা করছো সেরেজা; তোমার প্রেমে স্থিরতা নেই।'

সেরগেই শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলে, 'তোমার কথাগুলো আমার উদ্দেশে বলেছ এ-কথাই আমি স্বীকার করবো না।'

'তা হলে তুমি আমাকে এভাবে চুমো খেলে কেন?'

সেরগেই তাচ্ছিল্যভরে এর কোনো উত্তরই দিল না।

সেরগেইয়ের কোঁকড়া চুল নিয়ে খেলা করতে করতে কাতেরীনা বলে যেতে লাগল, 'স্বামী-স্ত্রীই তো শুধু একে অন্যকে এরকম চুমো খায়—যেন একে অন্যের ঠোঁট থেকে ঠোনা মেরে ময়লা মুছে দেয়। তুমি আমাকে এমন চুমো খাও, যেন আপেল গাছ উপর থেকে আমাদের উপর সবে-ফোটা ফুলের বর্ষণ লাগিয়ে দেয়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক এই রকম, ঠিক এই রকম, ঠিক এই রকম!' চুপি চুপি কানে কানে গুঞ্জন করলে কাতেরীনা।—দয়িতকে ঘনতর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে সে

তখন হৃদয়াবেগে নিজেকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে কাতেরীনা বললে, 'সেরেজা, এবারে যা বলছি, তুমি মন দিয়ে শোনো। আচ্ছা বলো তো, সবাই কেন একবাক্যে বলে, তোমার প্রেমে স্থিরতা নেই।'

'আমার সম্বন্ধে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে এসব মিথ্যে কথা বলে কে ?'

'সবাই তো এই কথা বলে।'

'হয়তো যে সব হাড়ে হাড়ে অপদার্থগুলোকে আমি ত্যাগ করেছি, তারাই।'

'ওরে হাবা, ওসব অপদার্থগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার তোমার কী দরকার ছিল ? যে মেয়ে সত্যি অপদার্থ তার সঙ্গে তুমি আদপেই প্রেম করতে যাবে কেন ?'

'বলো, বলে যাও, বলা বড় সোজা। মানুষ কি সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনা করে প্রেমে পড়ে ? এর পিছনে কাজ করে একমাত্র প্রলোভন। ওদের কোনো একটার সঙ্গে বিধিভঙ্গ* করলে,—অতি সোজা, কোনো মতলব না, কিছু না, ব্যস্ হয়ে গেল। তারপর মেয়েটা রইল তোমার গলায় ঝুলে! গুলে খাওগে তারপর সেই প্রেম।'

'তা হলে, শোনো, সেরেজা! আমার পূর্বে কারা সব এসেছিল তাদের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি নে, আর আমি ওদের সম্বন্ধে কোনো-কিছু জানতেও চাই নে। শুধু এইটুকু বলার আছে: তুমি নিজে আমাদের এই প্রেমের পথে আমাকে প্রলোভিত করে টেনে এনেছ, এবং তুমি নিজে খুব ভালো করেই জানো, আমি যে এতে পা দিয়েছি তার জন্য তোমার ছলা-কৌশল যতখানি দায়ী আমার নিজের কামনাও ততখানি—আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, সেরেজা, তুমি যদি কোনোদিন বেইমানী করো, তুমি যদি অন্য কারোর জন্য—তা সে যে-ই হোক্ না কেন আমাকে বর্জন করো, আমি তা হলে কস্মিনকালেও—মাফ করো, আমার হৃদয়ের বন্ধু,—এ-দেহে প্রাণ থাকতে কস্মিনকালেও তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে যাবো না।'

সেরগেই চমকে উঠলো।

'এসব কি বলছো, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না, আমার চোখের মণি! আমাদের অবস্থাটার দিকে একবার ভালো করে চেয়ে দেখো। তুমি এখ্‌খুনি লক্ষ্য করেছ,

---

* যে দশটি বিধি (কমাণ্ডমেণ্ট) ইহুদি ও খৃষ্টান মানে তার অন্যতম—'ব্যভিচার করবে না'।

আমি কি রকম আনমনা হয়ে বসে ছিলুম কিন্তু তুমি একবারও শান্ত হয়ে ভাবো না, এই আনমনা হওয়াটা আমি ঠেকাতে পারি কি না। তুমি তো জানোই না, আমার বুকের ভিতর কি রকম শক্ত শক্ত রক্তের টুকরো জমা হয়ে আছে।'

'তোমার কি বেদনা, সেরেজা, তোমার বেদনা আমায় বলো!'

'এর আবার বলার কি থাকতে পারে? প্রথমত দেখ, অল্পদিনের মধ্যেই, ঈশ্বরের আশীর্বাদে তোমার স্বামী এসে উদয় হবেন, আর তুমি বলবে—সের্‌গেই ফিলেপিচ, দূর্ দূর্ বেরো এখান থেকে, আর যা তুই ঐ পেছনের আঙ্গিনায়, ছোকরারা যেখানে গান-টান গাইছে। আর সেখান থেকে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌নার শোবার ঘরে ছোট্ট পিদিমটি জ্বলছে, আর তিনি কি রকম পালকের তুলতুলে বিছানাটি দু'হাত দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জুৎসই করে তাঁর সাতপাকের সোয়ামীর সঙ্গে শুয়ে আরাম করতে যাচ্ছেন।'

'অসম্ভব! ওরকম ধারা কখ্‌খনই হবে না'—সোল্লাসে টানা টানা সুরে কাতেরীনা কথাগুলো বললে, আর সঙ্গে সঙ্গে কচি একখানি হাত নাড়িয়ে সের্‌গেইয়ের কথাগুলো যেন সামনের থেকে সরিয়ে দিল।

'কেন হবে না? আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি, এ পরিস্থিতি থেকে বেরবার জন্যে তোমার তো কোনো পথই নেই। তা সত্ত্বেও, বুঝলে কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না, আমারও একটা আপন হৃদয় আছে, আর নিদারুণ যন্ত্রণাটা আমি অনুভব করতে পারি।'

'ব্যস্ ব্যস্, হয়েছে। তোমার যথেষ্ট বলা হয়ে গিয়েছে।'

সের্‌গেইয়ের এই হিংসের অনুভূতিটা কাতেরীনাকে বড়ই আনন্দ দিল। জোরে হেসে উঠে সে ফের সের্‌গেইকে চুমোর পর চুমো খেতে লাগল।

অতি সাবধানে কাতেরীনার সম্পূর্ণ অনাচ্ছাদিত বাহুপাশ থেকে নিজের মস্তকটি মুক্ত করতে করতে সের্‌গেই কথার খেই ধরে বলে যেতে লাগলো, 'দ্বিতীয়ত, সমাজে আমার যে হীনতম অবস্থা সেটাই আমাকে বহুবার বাধ্য করেছে ব্যাপারটা সব দিক দিয়ে বিবেচনা করতে। এই মনে করো, আমি যদি সমাজে তোমার ধাপের মানুষ হতুম, আমি যদি 'ভদ্রলোক' বা ব্যবসায়ী হতুম, তা হলে এ দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে রাজী হতুম না—কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতিটা—তুমি নিজেই বিবেচনা করে দেখো—তোমার কাছে দাঁড়ালে আমি কে? অল্প দিনের ভিতরই তোমার স্বামী যখন তোমার কচি সাদা হাতটি ধরে তোমাদের শোবার ঘরে তোমাকে নিয়ে যাবে, আমাকে তখন সেটা নীরব হৃদয়ে সয়ে নিতে হবে, এবং হয়তো সেই

কারণেই আমি নিজেকে বাকী জীবন ধরে ঘেন্না করবো। কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না! বুঝলে—আমি তো সে দলের নই যারা যে কোনো একটা রমণীর সঙ্গে ফুর্তি করতে পারলেই অন্য কোনো-কিছুর পরোয়া করে না। প্রেম সত্য সত্য কি, সে অনুভূতি আমার আছে, আর সেটা যেন কালনাগিনীর মত আমার বুকের রক্ত শুষে শুষে খাচ্ছে।'

কাতেরীনা বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তু এসব কথা তুমি আমাকে বার বার বুঝিয়ে বলছো কেন?'

'কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না! না বলে করি কি, বলো। কি করি বলো। হয়তো বা এতদিনে সব কিছু তোমার স্বামীকে কাগজে কলমে ভালো করে বুঝিয়ে রিপোর্ট করা হয়ে গিয়েছে, খুব বেশি দূরের কথা নয়, হয়তো বা আসছে কাল থেকেই এখানে আর সের্‌গেইকে দেখতে পাওয়া যাবে না, তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না।'

'না, না, ও নিয়ে তুমি একটি মাত্র কথা বলো না, সেরেজা! এটা কস্মিন-কালেও হতে পারে না। যা হোক্ তা হোক্, তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না।' চুম্বনে আলিঙ্গনে সোহাগ করে কাতেরীনা সের্‌গেইকে প্রবোধ দিতে লাগল। 'চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যদি একদিন করবার সময়ই আসে, তবে··· হয় নিয়তি তাকে ওপারে নিয়ে যাবেন, নয় আমাকে, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে থাকবেই।'

'সেটা তো সম্ভব নয়, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না!'—বিষণ্ণ কণ্ঠে সের্‌গেই উত্তর দিল। তারপর মাথায় যেন দুঃখের ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'আমি যে এই প্রেম নিয়ে বেঁচে আছি তার জন্যে আমার নিজেরই দুঃখ হয়। সমাজে আমি যে ধাপে আছি সেই ধাপের কাউকে ভালোবাসলে হয়তো আমি সন্তুষ্টই হতুম। এও কি কখনো সম্ভব যে, তুমি চিরকাল আমার সত্য প্রেম হয়ে থাকবে? আর এখন আমার প্রণয়িনী হয়ে থাকাও কি তোমার পক্ষে গৌরবের বিষয়? আমি তো চাই পূত চিরন্তন দেউলের সামনে তোমার স্বামী হতে; তারপর তোমার তুলনায় তখন আমি নিজেকে হীন মনে করলেও আমি সমাজের সামনে বুক চেতিয়ে দেখাতে পারবো, আমার স্ত্রী আমাকে কতখানি সম্মানের চোখে দেখেন —কারণ আমি তাঁকে সম্মান করি—'

সের্‌গেইয়ের কথাগুলো কাতেরীনার মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে। তার ঈর্ষা, কাতেরীনাকে বিয়ে করার তার কামনা—এ কামনা মেয়েছেলে মাত্রেরই বড় প্রিয়, তা সে হোক্ না, বিয়ের পূর্বে তাদের অল্প দিনেরই পরিচয়। কাতেরীনা

এখন সেরগেইয়ের জন্যে আগুনের ভিতর দিয়ে যেতে প্রস্তুত, অতলে তলাতে তৈরি, কিংবা ভয়ঙ্কর কারাগারে অথবা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরতে। সেরগেই তখন কাতেরীনাকে তার প্রেমে এমনই মজিয়েছে যে, সে তার অন্তহীন আত্মসমর্পণ সেরগেইয়ের পদপ্রান্তে করে ফেলেছে। আনন্দে সে তখন আত্মহারা, তার রক্তে রিনিঝিনি বাজছে,—আর কোনো কথা শোনবার সব শক্তি তার তখন নেই। তাড়াতাড়ি হাতের তেলো দিয়ে সে সেরগেইয়ের মুখ বন্ধ করে দিয়ে তার মাথা আপন বুকে চেপে ধরে বললে, 'শোনো, এখন আমার জানা হয়ে গিয়েছে, তোমাকেও কি করে ব্যবসায়ী করে তোলা যায়, আর তোমার সঙ্গে কি ভাবে যথারীতি সসম্মানে বাস করা যায়। যতদিন না আমাদের অবস্থার চরম বোঝা-পড়ার সময় এসেছে—ততদিন কোনো-কিছু নিয়ে আমাকে আর বেদনা দিয়ো না।'

আবার আরম্ভ হল চুম্বন আর আদর-সোহাগ।

নিঃশব্দ নিশীথে, গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকা সত্ত্বেও গুদোমঘরের চালার ভিতর বুড়ো কেরানী শুনতে পাচ্ছিল ক্ষণে মৃদু আলাপের গুঞ্জন, ক্ষণে চাপা হাসির ইঙ্গিত—যেন কতকগুলো দুর্বৃত্ত বালক কোনো নির্বীর্য বৃদ্ধকে নিয়ে নিদারুণতম ঘৃণ্য ব্যঙ্গ করার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে—ক্ষণে আনন্দের উচ্চহাস্য কলরোল—যেন সরোবরের পরীরা কাউকে নির্মম ভাবে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। এ-সবের উৎস কাতেরীনা। চাঁদের আলোতে সে যেন সাঁতার কাটছে, নরম কম্বলের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে আর রসকেলি করছে তার স্বামীর ছোকরা কেরানীর সঙ্গে। কুসুমাচ্ছাদিত আপেলবৃক্ষের কোমল ফুলদল তাদের উপর ক্ষণে ক্ষণে বর্ষিত হচ্ছিল—অবশেষে সে বর্ষণও ক্ষান্ত হল। ইতিমধ্যে নাতিদীর্ঘ নিদাঘ রজনী প্রবহমাণ—চন্দ্রমা উচ্চ ভাণ্ডার গৃহের চূড়ান্তরালে লুক্কায়িত থেকে পাণ্ডু হতে পাণ্ডুরতর নয়নে ধরণীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। হঠাৎ রান্নাঘরের ছাতের উপর দুটো বেড়ালের কানফাটানো দ্বৈতকণ্ঠ শোনা গেল। তারপর আরম্ভ হল থামচাথামচি, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তীক্ষ্ণ গোঙরানোর শব্দ এবং সর্বশেষে পা হড়কে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল ছাদের সঙ্গে ঠেকনা দেওয়া তক্তার ডাঁই পিছলে—গোটা দু'তিন বেড়াল।

'চলো, শুতে যাই'—অতিশয় ক্লান্তির আবেশে রাগ্ ছেড়ে উঠতে উঠতে বললো কাতেরীনা। শায়িত অবস্থায় সেই সামান্য যে শেমিজ আর সাদা সায়া তার পরনে ছিল সেই বেশেই গণ্যমান্য সদাগর-বাড়ির আঙিনার উপর দিয়ে সে চললো। সেখানে তখন মরা-বাড়ির নিশ্চলতা আর নৈস্তব্ধ্য। সেরগেই রাগ্

আর কাতেরীনার খেলা-ভরে ছুঁড়ে-ফেলে-দেওয়া ব্লাউজ নিয়ে পিছনে পিছনে চললো।

॥ ৭ ॥

কাপড়-জামার শেষ রত্তিটুকু ছেড়ে ফেলে, মোমবাতি নিবিয়ে দিয়ে পালকের তুলতুলে বিছানাতে শুতে না শুতে কাতেরীনা সুষুপ্তি-গহ্বরে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেল। দিনভর ক্রীড়াকৌতুক আর উল্লাসরস এতই আকণ্ঠ পান করেছিল যে, সে এখন এমনই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হল যে তার পা যেন ঘুমিয়ে পড়ল, হাতও যেন ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমের ভিতর দিয়েও সে পরিষ্কার দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল এবং সেই আগের দিনের চেনা বেড়ালটা ঢুম্ করে তার বিছানায় পড়ল।

'বেড়ালটার এখানে আগমনের ব্যাপারটা আসলে তবে কি?'—ক্লান্ত কাতেরীনা আপন মনে যুক্তি-তর্ক করতে লাগল। 'আমি দোরের চাবি নিজেই লাগিয়েছি—বেশ ভেবে-চিন্তে বিবেচনা করেই—আর জানলাটাও বন্ধ।—তবু দেখি সেটা আবার এসে জুটেছে। দাঁড়াও, আমি ওটাকে এই মুহূর্তেই বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।' কাতেরীনা উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু তার হাত-পা যেন তার বশে নেই; ইতিমধ্যে বেড়ালটা তার শরীরের উপর দিয়ে সর্বত্র হাঁটাহাঁটি লাগিয়ে দিয়েছে। এবং তার গলার গর্‌র্ গর্‌র্ এমনই আশ্চর্য রকমের যে, সে যেন মানুষের গলায় কথা কইছিল। কাতেরীনার মনে হচ্ছিল যেন এক পাল ক্ষুদে ক্ষুদে পিঁপড়ে তার সর্বশরীরের উপর দিয়ে ছুটোছুটি লাগিয়েছে।

কাতেরীনা মনস্থির করে বললে, 'নাঃ, কালই আমাকে বিছানার উপর মঙ্গল জল ছিটোতে হবে—এ ছাড়া আর কোনো গতি নেই,—যেভাবে বেড়ালটা ভূতের মত আমার পিছনে লেগেছে তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এটা তাজ্জব ধরনের বেড়াল।'

ওদিকে বেড়ালটার সোহাগের গর্‌র্ গর্‌র্ একদম তার কান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। বোঁচা নাকটা তার শরীরের উপর চেপে দিয়ে বেড়ালটা বলে উঠলো, 'আচ্ছা, আমি কোন্ ধরনের বেড়াল সেই কথাটা ভাবছো—না? কিন্তু এ সন্দেহে তুমি এলে কিসের থেকে? সত্যি, তুমি কী অসম্ভব চালাক মেয়ে, কাতেরীনা ল্ভভ্না; ঠিক ঠিক ধরে ফেলেছ আমি আদপেই বেড়াল নই, কারণ আমি আসলে আর কেউ না, আমি হচ্ছি সেই বিখ্যাত সম্মানিত সদাগর বরিস

তিমোতেইচ্। অবশ্য এটা হক্ কথা যে, ঠিক এই মুহূর্তেই আমি খুব বহাল তবিয়তে নেই—কারণ আমার ছেলের বউ আমাকে যে-সব খাসা খানা খাইয়ে আমার সেবা করেছে তারই চোটে আমার নাড়িভুঁড়ি ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। তাই হয়েছে কি'—বেড়ালটা সোহাগের গর্র্ গর্র্ করে যেতে লাগল—'আমি বড্ড কুঁকড়ে-সুকড়ে গিয়ে এখন শুধু হুলো বেড়াল হয়ে, যারা আমাকে সত্যি সত্যি জানে আমি কে, তাদের সামনেই আত্মপ্রকাশ করতে পারি। তা যেন হল ; আচ্ছা, আপনি এখন আপন বাড়িতে কি রকম আছেন, কি করছেন, কাতেরীনা ল্ভভ্না ? আপ্তবাক্যের সব ক'টি বিধি* আপনি কি ভক্তিভরে পালন করে যাচ্ছেন ? আমি সুচিন্তিত উদ্দেশ্য নিয়েই গোরস্তান থেকে এখানে এসেছি স্রেফ্ মাত্র দেখতে আপনি আর সের্গেই ফিলিপিচ্ আপনার স্বামীর বিছানাটাতে কি রকম ওঁম লাগাচ্ছেন। কিন্তু এখন তো আমি আর কিছু দেখতে পারি নে। আপনি খামোখা অত ডরাচ্ছেন কেন ; ব্যাপারটা হয়েছে কি, আপনি যে আমায় ফিস্টিটা খাইয়ে জান্ তর্র্র্ করে দিয়েছিলেন তারই ঠেলায় আমার আদরের পুতুল চোখ দুটি কোটর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমার চোখ দুটোর দিকে সোজাসুজি তাকাও, পরাণ আমার,—ভয় পেয়ো না, মাইরি!'

কাতেরীনা সত্য সত্যই তাকিয়েছিল—আর সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো। হুলো বেড়ালটা ফের তার আর সের্গেইয়ের মাঝখানে শুয়ে পড়েছে, আর তার মাথাটার জায়গায় বরিস্ তিমোতেইচের মাথা। ঠিক তারই মাথার মত বিরাট আকারের মাথা। আর দুটি কোটরে চোখের বদলে আগুনের দুটো চাকা ঘুরছে আর পাক খাচ্ছে, পাক খাচ্ছে আর ঘুরছে—যেদিকে যেমন খুশি!

সের্গেই জেগে উঠলো, কাতেরীনাকে শান্ত করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু নিদ্রাদেবী কাতেরীনাকে ত্যাগ করে চলে গেছেন—ভালোই, এক হিসেবে ভালোই।

বিস্ফারিত নয়নে কাতেরীনা শুয়ে আছে ; হঠাৎ তার কানে এল কে যেন গেট বেয়ে উঠে বাড়ির ভিতরের আঙ্গিনার সামনে পৌঁছে গেছে। সে লোক যেই হোক, কুকুরগুলো তার দিকে ধাওয়া করেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তারা শান্ত হয়ে গেল—হয়তো বা তারা নবাগতের পা চাটতে আরম্ভ করেছে। তারপর

---

* অন্যতম বিধি 'ব্যভিচার করবে না'।

আরো এক মিনিট গেল। ক্লিক্ করে নিচের লোহার খিল খুলে গেল এবং দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল।

'হয় আমি শব্দগুলো কল্পনায় শুনছি, অথবা আমার জিনোভিই বরিসিচ্ ফিরে এসেছেন—এবং দরজা খুলেছেন ফালতো চাবিটি দিয়ে'—চট করে চিন্তাটা কাতেরীনার মাথায় খেলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেরুগেইকে কনুই দিয়ে গুতো দিল।

'কান পেতে শোনো, সেরেজা,' বলে কাতেরীনা কনুইয়ের উপর ভর করে উঠে কান দুটো খাড়া করলে।

সত্যই কে যেন ধীর পদক্ষেপে, সাবধানে শরীরের ওজন এক পা থেকে আরেক পায়ে সরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরের চাবিমারা শোবার ঘরের দিকে আসছে।

শুদ্ধমাত্র শেমিজপরা অবস্থাতেই এক লাফ দিয়ে কাতেরীনা খাট ছেড়ে ব্যালকনির জানলা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেরুগেইও খালি পায়ে লাফ দিয়ে ব্যালকনিতে এসে নামবার জন্য তারই খুঁটিতে পা দিয়ে জড়িয়ে ধরলো—ঐ খুঁটি বেয়েই সে একাধিকবার তার প্রভুপত্নীর শোবার ঘর থেকে নিচে নেমেছে।

কাতেরীনা তার কানে কানে ফিস ফিস করে বললে, 'না, না ; দরকার নেই, দরকার নেই। তুমি এইখেনে শুয়ে থাকো···এখান থেকে নোড়ো না।' তারপর সেরুগেইয়ের জুতো, কোট-পাতলুন তার পিছনে ছুঁড়ে দিয়ে লাফ মেরে কম্বলের তলায় ঢুকে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

সেরুগেই কাতেরীনার আদেশ পালন করলো ; খুঁটি বেয়ে নিচে না নেমে ছোট্ট ব্যালকনিটির কাঠের ছাতার নিচে আরাম করে লুকিয়ে রইল।

ইতিমধ্যে কাতেরীনা শুনতে পেয়েছে, তার স্বামী কিভাবে দরজার কাছে এল, এবং দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল। এমন কি সে তার হিংসাভরা বুকের দ্রুত স্পন্দন পর্যন্ত শুনতে পেল। কিন্তু কাতেরীনার হৃদয়ে করুণার উদয় হল না। বরঞ্চ তাকে যেন ছেয়ে ফেলল পিশাচের অট্টহাস্য।

মনে মনে সে তার স্বামীকে উদ্দেশ করে বললো, 'যাও, গত কাল খোঁজো গে'—মৃদু হেসে সে যতদূর সম্ভব তালে তালে নিষ্পাপ শিশুটির মত দম ফেলতে লাগলো।

প্রায় দশ মিনিট ধরে এই লীলা চললো ; অবশেষে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর ঘুমনোর শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা করাটা জিনোভিইয়ের কাছে ক্লান্তিজনক হয়ে দাঁড়াল। সে তখন দরজায় টোকা দিল।

'কে ?' কাতেরীনা সাড়া দিলে কিন্তু একদম সঙ্গে সঙ্গে না, এবং গলাটা যেন নিদ্রায় জড়ানো।

জিনোভিই উত্তর দিল, 'তোমাদেরই একজন।'

'তুমি নাকি, জিনোভিই বরিসিচ্ ?'

'হ্যাঁ, আমি। যেন আমার গলা শুনতে পারছো না।'

কাতেরীনা সেই যে শুধু শেমিজ পরে শুয়েছিল সেই ভাবেই লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুলে দিল, তারপর ফের লাফ দিয়ে গরম বিছানায় ঢুকলো।

কম্বল দিয়ে গা জড়াতে জড়াতে বললো, 'ঠিক ভোরের আগে কেমন যেন শীতটা জমে আসে।'

জিনোভিই বরিসিচ্ ঘরে ঢুকে চতুর্দিকে তাকালো, তারপর ইকনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলো, মোমবাতি জ্বালিয়ে আবার চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলো। স্ত্রীকে শুধলো, 'কি রকম আছ—সব ঠিক চলছে ?'

কাতেরীনা উত্তর দিলে, 'নালিশ করার মত তেমন কিছু নয়।' তারপর উঠে বসে একটা ঢিলে সুতীর ব্লাউজ পরতে লাগল।

শুধলে, 'তোমার জন্য একটা সামোভারে* আঁচ দেব কি ?'

'তোমায় কিছু করতে হবে না; আকসীনিয়াকে ডাকো—সে তৈরি করুক।'

কাতেরীনা চটি পরে ছুটে বেরলো এবং ফিরলো আধঘণ্টাটাক পরে। এরই ভিতরে সে ছোট্ট সামোভারটিতে কাঠ-কয়লার আগুন ধরিয়ে নিয়েছে এবং অতিশয় সন্তর্পণে বিদ্যুৎবেগে একবার ছুটে গেছে ছোট্ট ব্যালকনিটির নিচে সের্গেইয়ের কাছে।

'এইখানে থাকো'—ফিস ফিস করে কাতেরীনা সের্গেইকে বললে।

সের্গেইও ফিস ফিস করে প্রশ্ন শুধলে, 'এখানে বসে থেকে কি লাভ হবে ?'

'ওঃ! তোমার মাথায় কি রত্তিভর মগজ নেই! আমি যতক্ষণ না অন্য ব্যবস্থা করি তুমি এইখানে থাকো।'

কাতেরীনা স্বয়ং তাকে আগের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সের্গেই বাইরের ছোট্ট ব্যালকনিতে বসে ভিতরে যা-কিছু হচ্ছিল সবই শুনতে

---

* ধাতুর পাত্র। এর নিচের তলায় কাঠ-কয়লার আগুন জ্বালানো হয়। উপরের খোপে জল। ট্যাপ্ খুলে চায়ের জন্য ফুটন্ত জল বের করা হয়। রাশানরা এটা টেবিলের উপর রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চা খায়। 'দেশেবিদেশে' পৃ. ৩৩, ২৩১ ও অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

পারছিল। কাতেরীনা যে দরজা বন্ধ করে স্বামীর কাছে ফিরে এল সেটাও শুনতে পেল। ঘরের ভিতরকার টুঁ শব্দটিও পরিষ্কার তার কানে আসছিল।

জিনোভিই স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে, 'এতক্ষণ ধরে কোথায় আলসেমি করে সময় কাটালে ?'

শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলে, 'আমি সামোভার তৈরি করছিলুম।'

কিছুক্ষণ ধরে আর কোনো কথাবার্তা হল না। বাইরের থেকে সের্গেই পরিষ্কার শুনতে পেল, জিনোভিই তার লম্বা কোটটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলো। তারপর সে চতুর্দিকে জল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, জোরসে নাক সাফ করে হাত মুখ ধুলো। এইবারে সে একখানা তোয়ালে চাইলে—সেটাও শোনা গেল। আবার কথাবার্তা শুরু হয়েছে।

স্বামী শুধলে, 'আচ্ছা, বলো তো তোমরা ঠিক কি ভাবে আমার বাপকে গোর দিলে ?'

'ঠিক যে ভাবে হয়ে থাকে'—উত্তর দিল তার স্ত্রী। 'তিনি মারা গেলেন, সবাই মিলে তাকে গোর দিল।'

'কিন্তু সকলের কাছেই এটা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ঠেকেছে !'

'ভগবান জানেন শুধু।'—কাতেরীনা উত্তর দিয়ে ঠুং-ঠাং করে পেয়ালাগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

জিনোভিই বিষণ্ণ মুখে ঘরের ভিতর পাইচারি করতে লাগলো।

তারপর স্ত্রীকে আবার শুধলো, 'আর এখানে তুমি সময় কাটালে কি করে ?'

'এখানে আমাদের আমোদ-আহ্লাদ কি, সে তো সবাই জানে—আমি আর কি বলবো ; আমরা বল্ নাচে যাই নে, থিয়েটারও দেখি নে।'

'আমার তো মনে হল তোমার স্বামীকে দেখে তুমি বিশেষ কোনো আমোদ-আহ্লাদ অনুভব করো নি—আমোদ-আহ্লাদের কথাটাই যদি উঠলো—।' আড় নয়নে তাকিয়ে জিনোভিই বললে। এইবারে সে অবতরণিকায় পা দিয়েছে।

'তোমাতে আমাতে তো পর্শু দিন বিয়ে হয় নি যে দেখা হওয়া মাত্রই প্রেমে পাগল হয়ে একে অন্যের দিকে ধাওয়া করবো। বাড়ির কাজকর্মে ছুটোছুটি করতে করতে আমার পা দু'খানি ক্ষয়ে গেল—আর সে-সব তোমারই সুখের জন্য। কি করে যে আশা করো তোমাকে দেখামাত্র আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাব ?'

কাতেরীনা সামোভার আনবার জন্য ছুটে বেরিয়ে গেল* আর ধাওয়া করলো

---

* কাঠ-কয়লার ধুঁয়োর শেষ রেশটুকু না বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সামোভার ঘরের ভিতর আনা হয় না।

সের্‌গেইয়ের দিকে। জামায় টান দিয়ে বললে, 'হাই তোলা বন্ধ করো! চোখ দুটো খোলা রাখো, সেরেজা!'

প্রাদ্ধের জল যে কোন্‌ দিকে কতখানি গড়াবে সে সম্বন্ধে সের্‌গেই কোনো স্পষ্ট ধারণা করতে পারেনি, তাই সজাগ হয়ে রইল সে।

কাতেরীনা ফিরে এল। দেখে, জিনোভিই খাটের উপর হাঁটু গেড়ে পুঁতির কেস্‌সুদ্ধ তার ভ্রমণের ঘড়িটা শিয়রের খাড়া তক্তার সঙ্গে ঝোলাচ্ছে।

হঠাৎ সে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে—কেমন যেন একটু বাঁকা-বাঁকা ভাবে 'আচ্ছা, বল তো কাতেরীনা, তুমি তো ছিলে এক্কেবারে একা; তবে এটা কি করে হল যে, তুমি জোড়া বিছানা সাজিয়ে রেখেছো?'

শান্তনয়নে তার দিকে তাকিয়ে কাতেরীনা বললে, 'কেন, আমি তো সর্বক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলুম।'

'কৃতজ্ঞতার ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার জন্য। আচ্ছা, এইবার দেখো, একটা জিনিস; এটা তোমার পালকের বিছানায় প্রবেশপথ পেল কি করে?'—জিনোভিই বরিসিচ্‌ বিছানার চাদরের উপর থেকে উলে বোনা সরু একটি বেল্ট তুলে নিয়ে এক প্রান্ত উপরের দিকে ধরে তার স্ত্রীর চোখের সামনে দোলাতে লাগল। আসলে এটা সের্‌গেইয়ের।

কাতেরীনা সামান্যতম দ্বিধা না করে বললো, 'আমি ওটা বাগানে কুড়িয়ে পেয়ে আমার স্কার্ট বাঁধার জন্য কাজে লাগিয়েছি।'

'বটে!' কথাগুলোয় বদখদ জোর দিয়ে জিনোভিই বললে, 'তোমার ঐ যে স্কার্ট, সে সম্বন্ধে আমরাও আরো দু'একটা কথা জানতে পেরেছি।'

'ঠিক কি শুনতে পেয়েছ?'

'ও! তোমার সব পুণ্য কর্ম!'

'সে-রকম কিছু হয় নি!'

'আচ্ছা, আচ্ছা; পরে সে সব দেখা যাবে, পরে সব-কিছু দেখা যাবে', খালি পেয়ালাটা ঠেলা মেরে তার স্ত্রীর সামনে ফেলে দিয়ে জিনোভিই উত্তর দিল।

কাতেরীনা এ-কথার উত্তরে কোনো সাড়া দিল না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিনোভিই ভুরু কপালে তুলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার তাবৎ কীর্তিকলাপ আমরা প্রশস্ত দিবালোকে টেনে বের করবো, বুঝলে কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না?'

কাতেরীনা উত্তর দিল, 'ভয়ে যারা ইঁদুরের গর্ত খোঁজে তোমার কাতেরীনা সে দলের নয়। সে অত সহজে ভয় পায় না।'

'কি বললে ? কি বললে ?' জিনোভিই গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

'যাগগে ও-সব···আমি আমার ফেরির পসরা দু'বার হাঁকি নে।' স্ত্রী উত্তর দিলে।

'বটে! সাবধান! একটু সাবধান হও দিকিনি—বড্ড বেশি বকর্ বকর্ করতে শিখে গেছ তুমি, যবে থেকে একলা-একলি থাকছো—কি জানি কি করে ?'

কাতেরীনা চোপা দিয়ে বললে, 'বকর্ বকর্ করতে আমার যদি প্রাণ চায় তবে তার বিরুদ্ধে কোনো মহামূল্যবান কারণ আছে কি ?'

'দেখো, এখনো নিজের উপর নজর রাখো।'

'আমার নিজের উপর নজর রাখবার মত কিছুই নেই। কোথাকার কে লম্বা জিভ নাড়িয়ে তোমাকে যা-তা শুনিয়েছে, আর আমাকে বসে বসে হরেক রকমের গালি-গালাজ শুনতে হবে নাকি ? এ আবার কি এক নতুন তামাশা আরম্ভ হল!'

'লম্বা জিভ হোক আর নাই হোক, তোমার ঢলাঢলির কেচ্ছা এখানে বিস্তর লোকই জেনে গিয়েছে।'

কাতেরীনা এবারে সত্যি সত্যি ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'কী ঢলাঢলি আমার ?'

'আমি জানি কোন্‌টা।'

'তাই নাকি ? যদি জানোই তবে চালাও : সাফ সাফ খুলে বলো।'

জিনোভিই কোনো উত্তর না দিয়ে খালি পেয়ালাটা আবার ঠেলা মেরে তার স্ত্রীর সামনে ফেললো।

স্বামীকে যেন খোঁচা দেবার জন্যে একটা চামচ তার স্বামীর পিরিচে খটাং করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘেন্নার সুরে বললে, 'আসলে পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তেমন কিছু বলবার মত নেই। না হলে বলো না, বলো, বলো আমাকে, কার সম্বন্ধে তারা তোমাকে বলেছে ? কে সে আমার প্রেমিক যাকে আমি তোমার চেয়ে বেশী পছন্দ করি ?'

'জানতে পাবে—অত তাড়া কিসের ?'

'বলো না! তবে কি কেউ কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে সের্‌গেইয়ের সম্বন্ধে মিথ্যে মিথ্যে লাগিয়েছে ? তাই কি না ?'

'আমরা সব বের করবো, আমরা সব বের করবো, বাহারে বীবী কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না। তোমার উপর আমাদের যে অধিকার সেটা কেউ কেড়ে নেয় নি,

কেউ নিতে পারবেও না…তুমি শায়েস্তা হয়ে নিজের থেকেই নিজের সম্বন্ধে সব কিছু বলবে—'

'আখ্! আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।' দাঁত কিড়িমিড়ি খেয়ে কাতেরীনা চিৎকার করে উঠলো,—রাগে তার মুখের রঙ সাদা বিছানার চাদরের মত হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ সে লাফ দিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড পরে সের্‌গেইয়ের আস্তিন ধরে ঘরের ভিতর তাকে টেনে এনে কাতেরীনা বললে, 'এই তো, এখানে সে। ওকে আর আমাকে জিজ্ঞেস করো, যখন এত সব তোমার জানাই আছে। হয়তো যতখানি জেনে তৃপ্ত হও তার চেয়েও বেশী জানতে পাবে।'

আসলে জিনোভিই বরিসিচের মাথা তখন ঘুলিয়ে গিয়েছে। সে প্রথমটায় সের্‌গেইয়ের দিকে তাকালে—সে তখন দোরের খুঁটিটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর তাকালো তার স্ত্রীর দিকে—সে ততক্ষণে খাটের বাজুতে বসে বুকের উপর এক হাত দিয়ে আরেক হাতের কনুই ধরে আছে; সমস্ত ব্যাপারটা যে কোন্ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে সে-সম্বন্ধে জিনোভিই কোনো অনুমানই করতে পারছিল না।

'এখানে তুই কি করছিস রে বিচ্ছু?' চেয়ার থেকে না উঠেই কোনো গতিকে সে বললে।

বেহায়ার মত কাতেরীনাই উত্তর দিলে, 'তুমি যা-সব খুব ভালো করে জানো সেগুলো সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞেস করো না? তুমি ভেবেছিলে আমাকে ঠ্যাঙাবার ভয় দেখাবে—' কাতেরীনা বলে যেতে লাগলো; তার চোখে কুমৎলব মিটমিট করছে, 'কিন্তু সেটা আর কক্‌খনই হয়ে উঠবে না। আর আমি? আমার যা করার সে আমি তোমার ঐ প্রতিজ্ঞাগুলো শোনার পূর্বেই স্থির করে রেখেছি, আর এখন সেগুলো তোমার উপর খাটাবো।'

জিনোভিই সের্‌গেইয়ের দিকে চেঁচিয়ে উঠলো, 'কি করছিস এখানে? বেরো!'

কাতেরীনা তাকে চোপা দিয়ে বললে, 'বেশ, বেশ, তারপর?'

ঝট্‌পট্ দোরটা নিখুঁত ভাবে বন্ধ করে চাবিটা সে পকেটে রাখলো, তারপর ঢিলে ব্লাউজসর্বস্বা বিছানায় ফের গড়াগড়ি দিতে লাগলো।

কেরানীকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বললে, 'এখানে তবে এসো সেরেজেচ্‌কা*

* সের্‌গেইয়ের আদরের ডাকনাম সেরেজা; এখানে স্বামীকে অপমান করে আরেক কাঠি আদর করে ডাকছে সেরেজেচ্‌কা—'কচি সেরেজা', 'সেরেজা দুলাল'।

এসো, এখানে এসো, আমার প্রাণের তুলাল।'

সেরগেই মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বাবরী চুল পিছনে ফেরালো; তারপর সাহসীর মত বাড়ির কর্ত্রীর পাশে এসে বসলো।

'হে ভগবান, হে প্রভু! এসব কি হচ্ছে? তোরা কি করছিস—ওরে কাফেরের বাচ্চা'—জিনোভিইয়ের মুখ বেগনি হয়ে গিয়েছে, আরাম-কেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'বটে? তোমার পছন্দ হচ্ছে না? একবার তাকিয়ে দেখো না, ভালো করে তাকিয়ে দেখো আমার বাজপাখীটির চোখ কী রকম জলজল করে, দেখো না, কী সুন্দরই না সে!'

কাতেরীনা অট্টহাস্য করে উঠলো এবং স্বামীর সামনে সেরগেইকে আবেগভরে চুম্বন দিতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে তার গালে একটা চড় পড়ে যেন সেখানে আগুন ধরিয়ে দিল আর জিনোভিই লাফ দিয়ে ধাওয়া করলো ব্যালকনির খোলা জানলার দিকে।

॥ ৮ ॥

'আহ্‌হা! তাহলে এই ব্যবস্থাই হল! বেশ বন্ধু! তোমাকে আমার অনেক ধন্যবাদ জানাই! শুধু এইটের জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলুম—' উঁচু গলায় বলে উঠলো কাতেরীনা, 'বেশ বেশ, তাহলে পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আমারই মর্জি-মাফিক সব-কিছু হবে, তোমার মর্জি আর চলবে না।'

এক ধাক্কায় সের্‌গেইকে পাশ থেকে ঠেলে দিয়ে, বিদ্যুৎবেগে সে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল তার স্বামীর ঘাড়ে; জিনোভিইও লাফ দিয়েছিল ব্যালকনির জানলার দিকে কিন্তু তার পূর্বেই কাতেরীনা তার সরু আঙুল জিনোভিইয়ের গলায় প্রায় ঢুকিয়ে দিয়ে চেপে ধরে তাকে ছুঁড়ে ফেলেছে মেঝের উপর—একগুচ্ছ কাটা তাজা শন মানুষ যে রকম অবহেলে ফেলে।

শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে বেগে পড়ার ফলে তার মাথা সজোরে ঠোক্কর খেল মেঝের উপর—আর মাথা গেল ঘুলিয়ে। সমস্ত ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি তার চরমে পৌঁছে গিয়ে স্বপ্রকাশ হতে পারে—তার সম্ভাবনা সে মোটেই আন্দাজ করতে পারে নি। তার উপর তার স্ত্রীর জীবনে এই প্রথম প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে সে বুঝে গেল যে, তার হাত থেকে ছাড়ান পাওয়ার জন্য হেন কর্ম নেই

যে তার স্ত্রী করবে না, এবং তার বর্তমান অবস্থা সাতিশয় সঙ্কটময়। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছিল বলে সে আর আর্তনাদ করে ওঠে নি—ভালো করেই সে বুঝে গিয়েছিল যে তার আর্তনাদ কারো কানে পৌঁছবে না, বরঞ্চ তাতে করে তার পরিণাম আরো দ্রুতগতিতে পৌঁছে যাবে। নীরবে সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অবশেষে তার দৃষ্টি স্ত্রীর উপর ফেললো। সে দৃষ্টিতে ছিল জিঘাংসা, অভিসম্পাত আর তীব্রতম যন্ত্রণা। ওদিকে তার স্ত্রী সজোরে তার গলা যেন নিংড়ে ফেলছিল।

জিনোভিই আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো না। তার মুষ্টিবদ্ধ প্রসারিত দুই বাহু আচমকা আচমকা খিঁচুনি দিয়ে উঠছিল। তার এক বাহু তখনো সম্পূর্ণ মুক্ত; অন্য বাহু কাতেরীনা তার হাঁটু দিয়ে মাটির সঙ্গে জোরে চেপে ধরেছে।

'ধরো জোরসে ওকে।' বিন্দুমাত্র উত্তেজনার রেশ না দেখিয়ে সে সের্‌গেইকে ফিসফিস করে আদেশ দিল। তারপর ফের স্বামীর দিকে মনোনিবেশ করল।

সের্‌গেই তার মুনিবের উপর বসে তার দুই হাঁটু দিয়ে মুনিবের দুই বাহু চেপে ধরলো। তারপর যেই সে কাতেরীনার হাতের নিচে জিনোভিইয়ের টুঁটি চেপে ধরতে গেছে অমনি সে নিজেই আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো। যে লোকটা তার এমন অন্যায় সর্বনাশ করেছে, তার উপর চোখ পড়তে, রক্ত দিয়ে রক্তের প্রতিশোধ নেবার দুর্বার কামনা জিনোভিইয়ের অবশিষ্ট সর্ব শক্তি উত্তেজিত করে দিল। ভয়াবহ বিক্রম প্রয়োগ করে সে সের্‌গেইয়ের হাঁটুর চাপ থেকে দুই হাত মুক্ত করে, সের্‌গেইয়ের মিশকালো বাবরী বজ্রমুষ্টিতে ধরে নিয়ে তার গলায় কামড় মেরে বসিয়ে দিল—হুবহু হিংস্র পশুর মত—তার দাঁত। কিন্তু এ আক্রমণ দীর্ঘস্থায়ী হল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জিনোভিই গোঁ গোঁ করে কাতরাতে আরম্ভ করলো; মাথা একপাশে হেলে পড়ল।

নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রায় সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে, বিবর্ণ কাতেরীনা তার স্বামী ও প্রেমিকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে; তার ডান হাতে ছাঁচে ঢালাই ভারী একটা মোমবাতিদান—তার ভারী দিকটা নিচের দিকে ঝুলছে। জিনোভিইয়ের রগ আর গাল বেয়ে একটি অতি সূক্ষ্ম সুতোর মত বয়ে নামছিল চুনি রঙের লাল রক্ত।

'পাদ্রী সাহেবকে ডেকে পাঠাও—' স্তিমিত কণ্ঠে গোঙরে গোঙরে কোনো গতিকে জিনোভিই এ ক'টি কথা উচ্চারণ করলো—তার বুকের উপর সোয়ার সের্‌গেইয়ের থেকে সে ঘেন্নার সঙ্গে যতখানি পারে তার মাথা ঘুরিয়ে নিয়েছে। 'আমার অন্তিম অনুষ্ঠান করাতে চাই—' এ ক'টি কথা বেরলো আরো ক্ষীণস্বরে।

সে তখন ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠছে আর চোখ বাঁকা করে দেখছে, তার চুলের নিচে যেখানটায় গরম রক্ত জমাট বাঁধছে।

'তুমি যে রকম আছ, সেই বেশ চলবে।' কাতেরীনা ফিস ফিস করলে, তারপর সেরগেইকে বললে, 'ব্যস্, ওকে নিয়ে আর আমাদের ঝামেলা বাড়াবার প্রয়োজন নেই : টুঁটিটা কষে চেপে ধরো।'

জিনোভিইয়ের গলা ঘড়ঘড় করে উঠলো।

কাতেরীনা উবু হয়ে তার দু'হাত দিয়ে সেরগেইয়ের দু'হাতে ভর দিয়ে জিনোভিইয়ের টুঁটি আরো চেপে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে কাতেরীনা জিনোভিইয়ের বুকের উপর কান পেতে শুনতে লাগল। পাঁচ মিনিট পর উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, 'ব্যস্, তার যা প্রাপ্য সে তাই পেয়েছে।'

সের্‌গেইও উঠে দাঁড়িয়ে গভীর নিশ্বাস নিল। জিনোভিই খতম হয়ে গেছে—তার শ্বাস-নালী থেৎলে গিয়েছে, তার কপালের রগ ফেটে গিয়েছে। তার মাথার বাঁদিকের নিচে রক্তের ছোট একটা থ্যাবড়া কিন্তু এতক্ষণে জমাট রক্ত আর চুলে সেঁটে গিয়েছে বলে জখম থেকে আর রক্ত বইছিল না।

সের্‌গেই বরিসিচ্‌কে মাটির নিচের মদের ভাঁড়ারে বয়ে নিয়ে গেল—এ কুটুরিটা ঠিক সেই পাথরের ছোট ভাঁড়ার ঘরের নিচে যেখানে মাত্র কিছুদিন পূর্বে স্বর্গীয় বরিস তিমোতেইচ্ এই সের্‌গেইকে তালাবন্ধ ক'রে রেখেছিলেন। তারপর ফের কাতেরীনাদের শোবার ঘরে ফিরে এল। ইতিমধ্যে কাতেরীনা হাতের আস্তিন আর পরনের স্কার্ট গুটিয়ে নিয়ে সাবান আর ঘরপোঁছার ন্যাকড়া দিয়ে শোবার ঘরের মেঝের উপরকার জিনোভিইয়ের রক্তের দাগ অতিশয় কষ্ট-সহিষ্ণুতার সঙ্গে সাফ করতে লাগল। সামোভারের বিষ-মাখানো যে জল দিয়ে চা বানিয়ে জিনোভিই তার স্বাধিকার-চেতন, ক্ষুদ্র পুণ্যাত্মাটিকে গরম করে তুলছিল, সে জল তখনো ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি। তারই কৃপায় রক্তের দাগ নিশ্চিহ্ন অবলুপ্ত হল।

সামোভারের সঙ্গে কাপ ধোবার যে জাম-বাটি থাকে সেইটে এবং সাবান-মাখানো ন্যাকড়া তুলে নিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে কাতেরীনা সের্‌গেইকে বললে, 'এসো, আমাকে আলো দেখাবে।' দরজার কাছে এসে বললে, 'আলো নিচু করে ধরো'—টুকরো টুকরো তক্তা জোড়া দিয়ে তৈরি যে মেঝে এবং সিঁড়ির উপর দিয়ে সের্‌গেই জিনোভিইয়ের মৃতদেহ টেনে টেনে মাটির নিচের মদের ভাঁড়ার পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল, কাতেরীনা সেই তক্তার প্রত্যেকটি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করলো।

রঙ্করা তক্তাগুলোর উপরে মাত্র দুটি জায়গায় রক্তের দাগ পাওয়া গেল—আকারে কালোজামের চেয়েও বড় নয়। ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে কাতেরীনা সেগুলো ঘষা মাত্রই দাগগুলো লোপ পেল।

'এইবারে ঠিক হয়েছে—যেমন কর্ম তেমন ফল—আপন বউয়ের পিছনে ওরকম গুপ্তচরের মত তক্কে তক্কে লেগে থেকো না—তার ঘাড়ে লাফ দেবার জন্য ওৎ পেতে থেকো না।'—কাতেরীনা বলতে বলতে শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে শানবাঁধানো যে ছোট্ট কুটুরিতে সের্‌গেই বন্দী ছিল সে দিকে তাকাল।

সের্‌গেই বললে, 'সব-কিছু খতম হল'—নিজের গলা শুনে সে শিউরে উঠলো।

শোবার ঘরে যখন তারা ফিরে এল তখন সরু গোলাপী রেখার মত পূর্বাকাশ ছিন্ন করে উষার উদয় হচ্ছে—ফুলে ঢাকা আপেল গাছের উপর দিয়ে আলতো ভাবে ঢলে পড়ে, দেয়ালের উঁচু বেড়ার রেলিঙের ভিতর দিয়ে কাতেরীনার শোবার ঘরে উষা উঁকি মারলেন।

ঘরের বাইরে উঠোনের উপর দিয়ে যাচ্ছে বুড়ো কেরানী কাঁধের উপর ভেড়ার লোমের কোটটা চড়িয়ে, হাই তুলতে তুলতে, আর ডান হাতের তিন আঙুল দিয়ে গায়ের উপর ক্রুশের প্রতীক আঁকতে আঁকতে বুড়ো চলেছে রান্নাঘরের দিকে।

কাতেরীনা সাবধানে খড়খড়ির ফিতে টেনে সেটাকে বন্ধ করে দিয়ে সের্‌গেইকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো, যেন সে তার অন্তরের আত্মসত্তাটি পর্যন্ত দেখে নিয়ে সেই সত্তাটিকে চিনতে চায়।

সের্‌গেইয়ের কাঁধের উপর তার শ্বেতশুভ্র হাত দু'খানা রেখে বললে, 'কি গো, এইবারে তুমি তো সদাগরদের একজন হতে চললে।'

উত্তরে সের্‌গেই একটি শব্দ মাত্র করল না।

তার ঠোঁট দুটি স্ফুরিত হচ্ছিল, কোন যেন এক পীড়া তার দেহে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। আর কাতেরীনার কিছুই হয় নি, শুধু তার ঠোঁট দুটিতে যেন শীত-শীত করছিল।

লোহার ডাণ্ডা আর ভারি শাবল ব্যবহার করার ফলে দু-এক দিনের ভিতরই সের্‌গেইয়ের হাতে মোটা মোটা ফোস্কা দেখা দিল; তাতে কি এসে যায়—জিনোভিই বরিসিচ্‌কে এমনই পরিপাটিরূপে তারই মাটির তলার কুটুরিতে পুঁতে ফেলা হল যে, তার বিধবা কিংবা বিধবার প্রেমিকের সাহায্য ছাড়া শেষ

বিচারের দিন পর্যন্ত কেউ তাকে খুঁজে পাবে না।

॥ ৯ ॥

সের্‌গেই লাল একখানা স্কার্ফ জড়িয়ে চলাফেরা করে। ইতিমধ্যে সের্‌গেইয়ের গলায় বরিস যে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল তার দাগ শুকোবার পূর্বেই কাতেরীনার স্বামীর অনুপস্থিতি আশঙ্কাভরা জল্পনা-কল্পনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। বরিস সম্বন্ধে আর সকলের চেয়ে বেশী কথা বলতো সের্‌গেই নিজে। বিকেলের দিকে কোনো কোনো দিন ছোকরাদের সঙ্গে বেঞ্চিতে বসে সে বলে উঠতো, 'সত্যি, বলো তো, ভায়ারা, আমাদের কর্তা এখনো ফিরে এলেন না যে?'

তারাও তখন অবাক হয়ে ভাবতো ব্যাপারটা কি।

এমন সময় মিল থেকে খবর এল, অনেক দিন হল কর্তা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছেন। যে কোচম্যান গাড়িটা চালিয়েছিল সে বললে, জিনোভিইকে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ বলে মনে হচ্ছিল এবং কেমন যেন বেখাপ্পা ভাবেই সে তাকে বিদায় দিয়েছিল; শহরের মঠের কাছে পৌঁছে সে তার কার্পেট-ব্যাগটি হাতে তুলে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে চলে যায়। এ কাহিনী শুনে তাদের মনের ধাঁধা আরো যেন বেড়ে গেল।

জিনোভিই বরিসিচ্ অন্তর্ধান করেছে; ব্যস্, এ সম্বন্ধে আর কারো কিছু বলার নেই। তাকে খুঁজে বের করবার জন্য চেষ্টা ও অনুসন্ধান আরম্ভ হল, কিন্তু তার ফলে কিছুই প্রকাশ পেল না; সে যেন হাওয়ার সঙ্গে গলে গিয়ে মিশে গিয়েছে। কোচম্যানটাকে অবশ্য গ্রেফ্‌তার করা হয়েছিল; তার কাছ থেকে মাত্র এইটুকু জানা গেল যে, জিনোভিই তাকে মঠের কাছে ছেড়ে দিয়ে একা চলে যায়। সমস্ত ব্যাপারটা মোটেই পরিষ্কার হল না; ওদিকে বিধবা কাতেরীনা সের্‌গেইয়ের সঙ্গে শান্তভাবে বেপরোয়া জীবন যাপন করতে লাগল। মাঝে মাঝে গুজব রটতো, জিনোভিইকে কখনো এখানে দেখা গিয়েছে, কখনো ওখানে দেখা গিয়েছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর বাড়ি ফিরে এল না। কাতেরীনা আর সকলের চেয়ে ভালো করেই জানতো, জিনোভিই আর কখনো ফিরে আসবে না, ফিরে আসতে পারে না।

এক মাস গেল, দু'মাস গেল, তিন মাস গেল—কাতেরীনা পেটের বাচ্চার ভার বেশ টের পেতে লাগল।

একদিন সে বললে, 'সেরেজেশ্‌কা, এবারে আমাদের ধন-দৌলত নিরাপদ হল।

আমি তোমাকে একটি বংশধর দেব।' সঙ্গে সঙ্গে শহরের কর্মকর্তাগণের কাছে দরখাস্ত করে জানালো: তার এবং তার বিষয়-সম্পত্তি—অমুক, তমুক—এবং সে বুঝতে পেরেছে, সন্দেহ নেই, সে অন্তঃসত্ত্বা; ইতিমধ্যে ইস্মাইলফ্ পরিবারের ব্যবসা-কারবার এক কদম এগোচ্ছে না; তাকে যেন তাবৎ লেনদেনের উপর সর্ব কর্তৃত্ব এবং স্থাবর সম্পত্তির সর্বত্র অবাধ গতিবিধির অধিকার দেওয়া হয়।

এত বড় একটা কারবার সম্পূর্ণ উচ্ছন্ন যাবে—এ তো কল্পনাতীত। কাতেরীনা তার স্বামীর আইনসঙ্গত স্ত্রী, মোটা রকমের কিংবা সন্দেহজনক দেনাও নেই; সুতরাং স্পষ্টই বোঝা গেল দরখাস্ত মঞ্জুর হবে। মঞ্জুর হলোও।

অতএব কাতেরীনা জীবন যাপন করতে লাগল—মহারাণীর মত চলন-বলন হল এবং তার দেখাদেখি অন্য পাঁচ জন আটপৌরে সেরেগাকে পোশাকী সের্গেই ফিলিপিচ্, কেষ্টাকে শ্রীকৃষ্ণ নামে সম্মানিত করতে লাগল। এমন সময় বলা-নেই-কওয়া-নেই আস্মান থেকে বিনামেঘে বজ্রাঘাত। লিভেন শহর থেকে আমাদের মেয়ারের কাছে এই মর্মে চিঠি এল যে, বরিস্ তিমোতেইচ্ যে মূলধন নিয়ে কাজ-কারবার করছিল সেটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ছিল না: তার অধিকাংশ এসেছিল তার এক নাবালক ভাগ্নের কাছ থেকে—তার নাম ফেদোর জাখারফ্ লিয়ামিন্; এবং আইনত একটা ফয়সালা না করে কারবারটা একা কাতেরীনার হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না। নোটিশটা এলে পর মেয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কাতেরীনার সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং তারপর এক সপ্তাহ যেতে না যেতে হঠাৎ লিভেন থেকে এসে উপস্থিত হলেন ছোট্টখাটো একটি বৃদ্ধা মহিলা—সঙ্গে একটি ছোট্ট ছেলে।

মহিলাটি বললেন, 'আমি স্বর্গত বরিস তিমোতেইভিচের সম্পর্কে বোন হই আর ইটি আমার ভাইপো ফেদোর লিয়ামিন্।'

কাতেরীনা তাদের অভ্যর্থনা জানালে।

আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে সের্গেই এদের আগমন এবং নবাগতদের প্রতি কাতেরীনার অভ্যর্থনা জ্ঞাপন দেখে পাদ্রীদের সাদা জোব্বার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল!

বাড়ির কর্ত্রী কাতেরীনা সের্গেইকে জিজ্ঞেস করলে, 'একি? তোমার কি হয়েছে?' সে আঙ্গিনা ছেড়ে অতিথিদের পিছনে পিছনে হল্ঘর পর্যন্ত এসে তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'কিস্সু না, কিস্সুটি না।' হল্ঘর ছেড়ে সদর দরজার কাছে এসে সের্গেই উত্তর দিয়ে বললে, 'আমার মনে হচ্ছিল এই লিভেন্-গুষ্ঠী বাজি হারার পড়তা,

জেতার নয়।' তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গিয়ে পিছনের সদর দরজা বন্ধ করে দিল।

* * *

সে রাত্রে সামোভার ঘিরে বসে সের্গেই কাতেরীনাকে শুধলে, 'তাহলে আমরা এখন করি কি? তোমার আমার—আমাদের দুজনার—সব-কিছু যে ছাইভস্ম হয়ে গেল।'

'ছাইভস্ম কেন, সেরেজা?'

'নয় তো কি? এখন তো সব-কিছু ভাগাভাগি হয়ে যাবে। আমাদের হিস্সেয় যা পড়বে তা দিয়ে আমরা চালাবো কি করে?'

'কেন, সেরেজা? তোমার কি ভয় হচ্ছে, তুমি যথেষ্ট পাবে না?'

'আমি নিজের হিস্সের কথা ভাবছি নে। আমার শুধু সন্দেহ হচ্ছে, আমরা কি আর সুখী হতে পারবো?'

'এ দুর্ভাবনা তোমার মনে কেন উদয় হল? আমরা সুখী হতে পারবো না কেন?'

সের্গেই উত্তর দিল, 'তার কারণ, তোমার প্রতি আমার যে প্রেম, সে প্রেম চায় তোমাকে সমাজের উচ্চস্থানের মহিলারূপে দেখতে; আগে যে রকম নগণ্য জীবন যাপন করতে, সে রকম নয়। আর এখন সব-কিছু ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে; আমাদের আমদানী কমে যাওয়ার ফলে এখন আমাদের আরো টানাটানি করে চালাতে হবে।'

'তাতে করে আমার জীবনে তো কোনো হেরফের হবে না, সেরেজা।'

'ঠিক সেই কথাই তো হচ্ছে, কাতেরীনা ল্ভভ্না; তোমার কাছে সব-কিছু পছন্দ-সই বলে মনে হতে পারে, আমার কিন্তু কস্মিনকালেও তা মনে হবে না—এবং তার একমাত্র কারণ তোমাকে আমি মাত্রাধিক শ্রদ্ধা করি। তার উপর দেখো, সমস্তটা ঘটবে যত সব হিংসুটে ছোটলোকদের চোখের সামনে—সে-সব দেখে আমার বেদনার আর অন্ত থাকবে না। তুমি অবশ্য যা-খুশী তাই করতে পারো কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ পরিস্থিতিতে আমি কক্খনো সুখী হতে পারবো না।'

আর সের্গেই বার বার একটানা ঐ একই রাগিণী কাতেরীনার সম্মুখে গাইতে লাগল; ঐ ফেদোর লিয়ামিন্ ছোঁড়াটার জন্যে তার সর্বনাশ হয়েছে। সে যে আশা করেছিল, একদিন সে বণিকগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে কাতেরীনা ল্ভভ্নাকে বসাবে সে আশা পূরণের সম্ভাবনা থেকে সে বঞ্চিত হল।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে করেই হোক এ ধরনের আলাপ সের্‌গেই শেষ পর্যন্ত এই সমাধানেই নিয়ে আসতো যে, স্বামীর অন্তর্ধানের ন' মাসের ভিতর যদি কাতেরীনা তার পেটের বাচ্চাটিকে প্রসব করে তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হয়, তবে তাদের সুখের আর সীমা পরিসীমা থাকে না—কিন্তু মাঝখানে এই ফেদোর ছোঁড়াটা উড়ে এসে জুড়ে বসে তাদের সর্বনাশ করেছে।

॥ ১০ ॥

অকস্মাৎ সের্‌গেই ফেদোর লিয়ামিন্ এবং তার মালিকানা স্বত্ব সম্বন্ধে সর্ব আলোচনা বন্ধ করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ফেদোরের চিন্তা কাতেরীনার সর্ব হৃদয়-মন যেন গ্রাস করে বসল। দুশ্চিন্তা আশঙ্কা তাকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করে তুললো যে, সে যেন তার জাল ছিন্ন করে কিছুতেই বেরুতে পারছিল না। এমন কি সের্‌গেইকে আদর-সোহাগ করা পর্যন্ত তার আর রুচছিল না। ঘুমন্ত অবস্থায়ই হোক, কিংবা ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম করার সময়েই হোক, অথবা তার ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করার সময়ই হোক—উদয়াস্ত তার মনে মাত্র একটি চিন্তা: 'এ যে এক্কেবারে ডাহা অবিচার। বাস্তবিকই—এ আবার কি? কোত্থেকে পুচকে একটা ছোঁড়া এসে জুটলো, আর আমি আমার সর্বস্ব থেকে বঞ্চিত হব? আমি এতখানি যন্ত্রণা সইলুম, পর্বতপ্রমাণ পাপের বোঝা আমার আত্মসত্তার উপর চাপালুম, আর কোনো হাঙ্গামা-হুজ্জৎ না পুইয়ে, খড়ের কুটোটি পর্যন্ত কুড়িয়ে না তুলে হঠাৎ এই ছোঁড়াটা এসে আমার তাবৎ-সর্বস্ব কেড়ে নেবে?···তাও না হয় বুঝতুম, দাবীদার ভারিক্কি বয়েসের কেউ যদি হত—তা নয়, একটা নাবালক কোথাকার,—পুচকে ছোঁড়া।'

*　　　*　　　*

বাইরে প্রথম শীতের আমেজ লেগেছে। জিনোভিই বরিসিচের কোনো খবরই কোন দিক থেকে এল না—আর আসবেই বা কি করে? কাতেরীনা ক্রমেই মোটা হয়ে উঠেছিল আর সমস্তক্ষণ ভাবনা-ভরা মন নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। ওদিকে শহরের লম্বা রসনা তাকে নিয়ে,—তার কি করে এটা হল, তার কি করে সেটা হল তাই নিয়ে সুবোসাম জল্পনা-কল্পনা গুজোব-গুল্ নিয়ে মেতে উঠেছিল: যেমন,—এই যে ছুঁড়ি কাতেরীনাটা এ্যাদ্দিন ধরে ছিল বাঁজা পাঁঠিটা আর দিনকে দিন শুকোতে শুকোতে হয়ে যাচ্ছিল পুঁই ডাঁটাটির মতন,

এখন, হঠাৎ তার সামনের দিকটা ওরকম ধারা ফেঁপে উঠতে লাগল কেন? এবং এদিকে সম্পত্তির ছোকরা মালিক ফেদিয়া লিয়ামিন্ খরগোসের চামড়ার হাল্কা কোটটি পরে বাড়ির আঙ্গিনায় খেলাধুলো করে আর ছোট-ছোট গর্তে জমে-যাওয়া বরফ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভেঙে ভেঙে দিন কাটাচ্ছিল।

রাঁধুনী আক্সীনিয়া আঙ্গিনার উপর দিয়ে তার পিছনে ছুটে যেতে যেতে চিৎকার করে করে ডাকছে, 'এ কি হচ্ছে ফেদোর ইগ্নাতিচ? খানদানী সদাগরের ছেলে তুমি,—এ কি হচ্ছে সব? গর্তের জলে-কাদায় মাখামাখি করা কি শেঠজীর ছেলের সাজে?'

কাতেরীনা আর তার বল্লভের সব-কিছু ওলোট-পালোট করে সম্পত্তির হিস্সেদারটি নিরীহ ছাগল-ছানার মত বাড়িময় তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে, তার চেয়েও নিরীহ অকাতর নিদ্রায় ঘুমোয় মাত্রাধিক স্নেহময়ী দিদিমার পাশে। জাগরণে বা স্বপ্নে কখনো তার মনে এক মুহূর্তের তরেও উদয় হয় নি সে কারো পাকা ধানে মই দিয়েছে কিংবা কারো সুখে এতটুকু ব্যাঘাত-ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে।

বড্ড বেশি ছুটোছুটির ফলে অবশেষে ফেদিয়ার জল-বসন্ত হল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বুকের ব্যথা। বেচারীকে তখন বাধ্য হয়ে শয্যাগ্রহণ করতে হল। গোড়ার দিকে জড়িমড়ি দিয়ে তার চিকিৎসা করা হল, শেষটায় ডাক্তার ডাকতে হল।

ডাক্তার ভিজিট দিতে শুরু করলেন। তাঁর প্রেসক্রিপশন্ মত ওষুধ ফেদিয়াকে প্রতি ঘণ্টায় খাওয়ানো হল—কখনো দিদিমা খাওয়াতেন, কখনো বা তাঁর অনুরোধে কাতেরীনা।

দিদিমা কাতেরীনাকে বলতেন, 'মা লক্ষ্মী সোনামণি কাতেরীনা আমার! বাচ্চাটিকে একটু দেখ-ভাল্ করো মা আমার। আমি জানি, শরীরের ভারে তোমার নিজেরই বড্ড বেশি চলাফেরা করতে কষ্ট হচ্ছে, আর মা ষষ্ঠীর কৃপার জন্য তুমিও অপেক্ষা করছো—তবু, বাচ্চাটির দিকে একটু নজর রেখো, লক্ষ্মীটি!'

কাতেরীনা অসম্মত হয় নি। বুড়ি যখনই গির্জার সন্ধ্যারতিতে যেত, কিংবা অহোরাত্র উপাসনায় 'রোগশয্যায় যন্ত্রণায় কাতর বাছা ফেদিয়ার' জন্য প্রার্থনা করতে অথবা ভোরবেলাকার প্রথম পূজার প্রসাদ ফেদিয়ার জন্য আনতে যেতে হত, কাতেরীনা তখন অসুস্থ বাচ্চাটির পাশে বসত, জল খাওয়াতো, সময়মত ওষুধ খাইয়ে দিত।

এই করে করে তাই যখন শীতের উপবাস আরম্ভের পরব উপলক্ষে বুড়ি সন্ধ্যারতি আর অহোরাত্র উপাসনা করার জন্য গির্জেয় গেল তখন যাবার পূর্বে 'আদরে'র কাতেরীনাকে অনুরোধ করে গেল সে যেন ফেদিয়ার যত্নআত্তি করে। ততদিনে ছেলেটি অবশ্য আরোগ্যলাভ করে উঠছিল।

কাতেরীনা ফেদিয়ার ঘরে ঢুকে দেখে সে কাঠবেড়ালীর চামড়ার তৈরি কোট পরে বিছানায় বসে 'সন্তদের জীবনকাহিনী' পড়ছে।

গদিওলা কুর্সীতে আরাম করে বসে কাতেরীনা শুধলো, 'কি পড়েছো, ফেদিয়া?'

'আমি সন্তদের জীবনকাহিনী পড়ছি, কাকীমা।'*

'ভালো লাগছে?'

'ভারী চমৎকার, কাকীমা।'

ফেদিয়া যখন কথা বলছিল তখন কনুইয়ের উপর ভর করে কাতেরীনা তার দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে দেখছিল। অকস্মাৎ তার অন্তস্তলে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাক্ষসের পাল যেন মুক্ত হয়ে আবার তার সেই পুরনো চিন্তাগুলো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে ফেলল: এই ছোকরাটা তার কী সর্বনাশই না করেছে, এবং সে অন্তর্ধান করলে তার জীবন কত না আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কাতেরীনা চিন্তা-সাগরে ডুব দিয়ে ভাবতে লাগলো, 'এখন আর কীই বা হতে পারে? ছেলেটা এমনিতেই অসুস্থ, তাকে ওষুধ খেতে হচ্ছে···আর অসুখের সময় কত অঘটনই না ঘটতে পারে। লোকে আর কি বলবে? ডাক্তার ভুল ওষুধ দিয়েছিল!'

'তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে, ফেদিয়া?'

'হ্যাঁ, কাকীমা। তোমার যদি কোনো অসুবিধা না হয়।' তারপর চামচে ভরা ওষুধ গিলে বললে, 'সন্তদের এই জীবনকাহিনী কী অদ্ভুত সুন্দর, কাকীমা।'

কাতেরীনা বললে, 'আরো পড়ো, বেশ করে পড়ো।' কাতেরীনা তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরটার চতুর্দিকে তাকাতে গিয়ে তার দৃষ্টি নক্সা-কাটা ঘষা কাঁচের জানলাগুলোর উপর গিয়ে পড়লো। তখন বললো, 'এগুলোর খড়খড়ি বন্ধ করিয়ে নিতে হবে।' দাঁড়িয়ে উঠে কাতেরীনা পাশের ঘরে গেল, সেখান থেকে বসবার ঘর হয়ে উপরের তলায় নিজের ঘরে গিয়ে বসলো।

—

* আসলে 'বৌদি', কিন্তু রাশানরা আমাদের মত যৌথ পরিবারে বাস করে না বলে একে অন্যকে সম্বোধনের সময় আমাদের মত বাছবিচার করে না।

পাঁচ মিনিটের ভিতর সের্‌গেই তার কাছে এল। পরনে ফুলবাবুটির মত সীলের চামড়ার অস্তরদার পুস্তিনের পোশাক।

কাতেরীনা শুধলো, 'জানলার খড়খড়িগুলো বন্ধ করা হয়েছে ?'

কাটখোট্টা সংক্ষেপে সের্‌গেই 'হ্যাঁ' বলে, কাঁচি দিয়ে মোমবাতির পোড়া পলতেটুকু কেটে ফেলে স্টোভটার কাছে এসে দাঁড়ালো।

সব-কিছু চুপচাপ।

কাতেরীনা জিজ্ঞেস করলো, 'আজ রাত্রে গির্জার উপাসনা অনেকক্ষণ অবধি চলবে—না ?'

সের্‌গেই উত্তর দিল, 'কালকের পরবটা বড় রকমের ; উপাসনা দীর্ঘ হবে।' আবার সব-কিছু চুপচাপ।

কাতেরীনা দাঁড়িয়ে উঠে বললো, 'আমাকে নিচে ফেদিয়ার কাছে যেতে হবে ; সে সেখানে একেবারে একলা।'

ভুরু নিচু করে কাতেরীনার দিকে সোজা তাকিয়ে সের্‌গেই শুধলো, 'একেবারে একলা ?'

'একেবারে একলা।' কাতেরীনা ফিস ফিস করে উত্তর দিয়ে শুধলো, 'কেন ? তাতে কি হয়েছে ?'

দুজনের চোখে চোখে যেন বিদ্যুতে বিদ্যুতে ধারাবহ্নি জ্বলে উঠলো ; কিন্তু দুজনার ভিতর শব্দমাত্র বিনিময় হল না।

কাতেরীনা নিচের তলায় গিয়ে এ-ঘর ও-ঘর প্রত্যেকটি খালি ঘর ভালো করে তদারক করে নিল। সর্বত্র শান্ত,—নিঃশব্দ নৈস্তব্ধ্য। ইকনগুলোর নিচে মঙ্গলপ্রদীপ নিষ্কম্প জ্যোতি বিচ্ছুরিত করছে। কাতেরীনার ছায়া তার সমুখ দিকে যেন দ্রুততর গতিতে এগিয়ে গিয়ে প্রাচীর-গাত্রে প্রসারিত হচ্ছে। খড়খড়ি তুলে দেওয়ার ফলে জানলার উপর জমে-যাওয়া বরফ গলে গিয়ে চোখের জলের মত ঝরে পড়ছে। বিছানার উপর বালিশে ভর করে বসে ফেদিয়া তখনো পড়ছিল। কাতেরীনাকে দেখে সে শুধু বললে, 'কাকীমা, এ-বইখানা নাও, লক্ষ্মীটি, আর ইকনের তাক থেকে ঐ বইখানা দাও তো।'

কাতেরীনা তার অনুরোধ পালন করে বইখানা তাকে দিল।

'ফেদিয়া, এখন তুমি ঘুমিয়ে পড়লে ভালো হয় না ?'

'না, কাকীমা, আমি দিদিমণির জন্য অপেক্ষা করবো।'

'দিদিমণির জন্য অপেক্ষা করবে কেন ?'

'আমার জন্য অহোরাত্র-উপাসনার নৈবেদ্য আনার কথা দিয়েছে দিদিমণি।'

কাতেরীনার মুখ হঠাৎ একদম পাংশু হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডের নিচে সে এই প্রথম তার সন্তানের স্পন্দন অনুভব করলো। সমস্ত বুক তার হিম হয়ে গেল। ঘরের মাঝখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে আপন ঠাণ্ডা হাত দু'খানা গরম করবার জন্য ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে গেল।

শোবার ঘরে নিঃশব্দে ঢুকে দেখল সের্‌গেই স্টোভের কাছে দাঁড়িয়ে। ফিস ফিস করে তাকে বললো, 'ঐখানে।'

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে সের্‌গেই শুধলো, 'কি ?' তার গলাতে কি যেন আটকে গেল।

'সে একেবারে একলা।'

সের্‌গেই ভুরু কোঁচকালো। তার শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে উঠেছে।

কাতেরীনা হঠাৎ দোরের দিকে রওয়ানা দিয়ে বললে, 'চলো।'

সের্‌গেই তাড়াতাড়ি জুতো খুলে ফেলে শুধলো, 'সঙ্গে কি নেব ?'

কাতেরীনা অতি অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'কিছু না।' তারপর নীরবে সের্‌গেইয়ের হাত ধরে তাকে পিছনে পিছনে নিয়ে চললো।

॥ ১১ ॥

এই নিয়ে তিন বারের বার কাতেরীনা যখন অসুস্থ বালকের ঘরে ঢুকলো তখন সে হঠাৎ ভয়ে কেঁপে ওঠাতে বইখানা তার কোলে পড়ে গেল।

'কি হল, ফেদিয়া ?'

বিছানার এক কোণে জড়সড় হয়ে ফেদিয়া ভীত স্মিত হাস্যে বললে, 'ও, হঠাৎ যেন কিসের ভয় পেলুম, কাকীমা।'

'কিসের ভয় পেলে ?'

'তোমার সঙ্গে কে ছিল, কাকীমা ?'

'কোথায় ? আমার সঙ্গে তো কেউ ছিল না, লক্ষ্মীটি।'

'কেউ ছিল না ?'

ফেদিয়া খাটের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা হয়ে, তার কাকীমা যে দোর দিয়ে ঢুকেছিল সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন খানিকটে আশ্বস্ত হল!

বললে, 'বোধ হয় আমার নিছক কল্পনাই হবে।'

কাতেরীনা খাটের খাড়া তক্তায় কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছিল। ফেদিয়া তার কাকীর দিকে তাকিয়ে বললে, তার মনে হচ্ছে, কেন জানি নে,

তাকে বড্ড ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

উত্তরে কাতেরীনা ইচ্ছে করে কেশে দরজার দিকে তাকিয়ে কি যেন প্রতীক্ষা করলে। সেখান থেকে এল—কাঠের মেঝে থেকে সামান্যতম মচমচ শব্দ।

'আমার নামে যে কুলগুরুর নাম—তাঁর জীবনকথা আমি পড়ছি, কাকীমা! বীরযোদ্ধা শহীদ হয়ে কি রকম পরমেশ্বরের কাছে প্রিয়রূপে গণ্য হলেন।'

কাতেরীনা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ভাইপো সোহাগ করে বললে, 'তুমি বসবে, কাকীমা? আমি তাহলে তোমাকে কাহিনীটা পড়ে শোনাই।'

কাতেরীনা উত্তর দিল, 'একটু দাঁড়াও, আমি এখ্‌খুনি আসছি। বসবার ঘরের মঙ্গল-প্রদীপটি ঠিক জ্বলছে কি না দেখে আসি।' সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

পাশের ঘরে যে ফিস ফিস করে কথা আরম্ভ হল সেটা অতিশয় নীরবের চেয়েও ক্ষীণ, কিন্তু চতুর্দিকে যে গভীর নৈস্তব্ধ্য বিরাজ করছিল তার ভিতর সেটা ফেদিয়ার তীক্ষ্ণ কর্ণে এসে পৌঁছল।

কান্নার জলভরা কণ্ঠে ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল, 'কাকীমা, ওখানে কি হচ্ছে? কার সঙ্গে তুমি কথা বলছো?' এক মুহূর্ত পরে আরো অশ্রু-ভরা কণ্ঠে আবার চেঁচিয়ে বললে, 'কাকীমা! এদিকে এস—আমার বড্ড ভয় করছে।' এবার সে যেন কাতেরীনার কণ্ঠে 'ঠিক আছে' শুনতে পেল এবং ভাবলো সেটা তারই উদ্দেশে বলা হয়েছে।

দৃঢ় পদক্ষেপে কাতেরীনা এসে এমন ভাবে দাঁড়ালো যে, তার শরীর ফেদিয়া আর বাইরে যাবার দরজার মাঝখানে। বেশ কড়া গলায় বললে, 'তুমি খালি খালি কিসের ভয় পাচ্ছো?' ঠিক তার পরই বললে, 'এইবারে তুমি শুয়ে পড়ো।'

'আমার যে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে না, কাকীমা!'

'না, না। তুমি এবারে ঘুমোও, ফেদিয়া—আমার কথা শোনো, শুয়ে পড়ো…সত্যি, রাত হয়েছে।'

'কিন্তু কেন এসব, কাকীমা। আমার যে মোটেই শুতে ইচ্ছে করছে না।'

'না, তুমি শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।' কাতেরীনার স্বর আবার বদলে গিয়েছে, অল্প অল্প কাঁপছে। তারপর বাহু দুখানা তুলে ছেলেটাকে দুই কান দিয়ে চেপে ধরে খাটের শিয়রের দিকে শুইয়ে দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ফেদিয়া আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো; সে দেখতে পেয়েছে সেরগেইকে—ফ্যাকাশে মুখ, আর খালি পায়ে সে ঘরে ঢুকছে।

ত্রাসে, ভয়ের বিভীষিকায় ছেলেটা তালু পর্যন্ত মুখ খুলে ফেলেছে। কাতেরীনা সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরলো। কড়া গলায় বললো, 'শিগগির করো, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসো—চেপে ধরো ছেলেটাকে, ধস্তাধস্তি না করে।'

সের্‌গেই ছেলেটার দু হাত পা চেপে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে কাতেরীনা এক ঝটকায় বড় একটা পালকের বালিশ নিয়ে বলির পাঁঠা সেই ছোট্ট বালকের কচি মুখটি ঢেকে দিয়ে, বালিশের উপর ঝাপটে পড়ে তার শক্ত নরম স্তনের উপর চাপ দিতে লাগলো।

কবরের ভিতর যে স্তব্ধতা—প্রায় চার মিনিট ধরে সেটা ঘরে বিরাজ করলো।

অতি মৃদুকণ্ঠে কাতেরীনা বললে, 'ওর হয়ে গিয়েছে।'

কিন্তু—কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে সব-কিছু গোছগাছ করাতে লাগতে না লাগতে, বহু লুকনো পাপের রঙ্গভূমি, নিস্তব্ধ বাড়িটার দেয়ালগুলো সশব্দ তীব্র মুষ্ট্যাঘাতের পর মুষ্ট্যাঘাতে টলমল করে উঠলো; জানলাগুলো খড়খড়িয়ে উঠলো, ঘরের মেঝে দুলতে লাগলো, মঙ্গল-প্রদীপ ঝোলানোর সরু শিকল দুলে দুলে দেয়ালের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের উপর অদ্ভুত ছায়াছবির দৌড়াদৌড়ি লাগিয়ে দিল।

সের্‌গেই আতঙ্কে শিউরে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে লাগাল ছুট। কাতেরীনাও ছুটলো তাকে ধরবার জন্য। ওদিকে হট্টগোল তোলপাড় যেন তাদের পিছনে আসছে। যেন কোনো অপার্থিব শক্তি এই পাপালয়কে তার ভিত্তিতল পর্যন্ত ঝাঁকুনি দিয়ে ওলট-পালট করে দিচ্ছে।

কাতেরীনার ভয় হচ্ছিল, পাছে সের্‌গেই ত্রাসের তাড়নায় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে তার আর্ত চেহারা দিয়ে সব-কিছু ফাঁস করে দেয়; সে কিন্তু ছুটলো সিঁড়ির দিকে উপরের তলায় যাবে বলে।

সের্‌গেই মাত্র কয়েকটি ধাপ উঠতেই অন্ধকারে একটা আধখোলা দরজার সঙ্গে খেল সরাসরি প্রচণ্ড এক ধাক্কা। আর্তনাদ করে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল নিচের দিকে—কুসংস্কার-ভরা আতঙ্কে সে তখন সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে গিয়েছে।

গড় গড় করে তার গলা দিয়ে শুধু বেরুচ্ছে, 'জিনোভিই বরিসিচ্‌! জিনোভিই বরিসিচ্‌!' আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচের দিকে পা উপরের দিকে করে হুড়মুড়িয়ে পড়ার সময় কাতেরীনাকেও ফেলে দিয়ে নিয়ে চলেছে তার সঙ্গে।

কাতেরীনা শুধলো, 'কোথায়?'

সের্‌গেই আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, 'ঐ যে, ঐ তো ঐখানে সে একটা লোহার পর্দার উপর বসে বসে আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। ঐ তো, ঐ—আবার এসেছে সে। শোনো, সে গর্জন করছে—গর্জন করছে সে আবার।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, অসংখ্য হস্ত রাস্তার দিকে মুখ-করা জানলাগুলোর উপর প্রচণ্ড ঘা দিচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কে একজন বাড়ির দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে।

কাতেরীনা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, 'ওরে হাবা। ওঠ্, উঠে পড়্, হাবা কোথাকার!' কথা ক'টি বলা শেষ করতে না করতে সে তীরের মতন ছুটে গেল ফেদিয়ার কাছে। মরা ছেলেটার মাথা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে বালিশের উপর এমনই ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখল যে মনে হয় সে ঘুমুচ্ছে। তারপর শত শত মুষ্টি যে দরজাটা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছিল সেইটে দৃঢ়হস্তে খুলে দিল।

সম্মুখে ভীষণ দৃশ্য। দলে দলে লোক রোয়াকের উপর ওঠবার চেষ্টা করছে। তাদের মাথার উপর দিয়ে কাতেরীনা দেখতে পেল সারি সারি অপরিচিত লোক উঁচু পাঁচিল টপকে বাড়ির আঙ্গিনায় নামছে—আর বাইরের রাস্তা উত্তেজিত কণ্ঠের কথা-বলাবলিতে গম্ গম্ করছে।

কোনো কিছু ভালো করে বোঝবার পূর্বে রোয়াকের দল কাতেরীনাকে উল্টে ফেলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ঘরের ভিতরে।

॥ ১২ ॥

এই প্রচণ্ড উত্তেজনা, তুল-কালাম কাণ্ড এল কি করে?

বছরের বারোটা প্রধান পর্বের যে কোনোটার আগের রাত্রে কাতেরীনা লুভভ্‌নাদের শহরের হাজার হাজার লোক শহরের সব-ক'টা গির্জা ভরে দিত। শহরটা যদিও মফস্বলের, তবু তার ব্যবসাবাণিজ্য শিল্পোৎপাদন নগণ্য নয়। ফলে যে সব গির্জায় ভোরবেলাকার 'ঈশ্বরের-সংযোগ' উপাসনা করা হত সেখানে এমনই প্রচণ্ড ভিড় জমতো যে, বলতে গেলে পোকামাকড়টিও সেখানে নড়াচড়া করার মত জায়গা পেত না। এসব গির্জেয় সমবেত ধর্মসঙ্গীত গাইতো শহরের বণিক সম্প্রদায়ের তরুণের দল। তাদের মূল-গায়েন, আপন ওস্তাদও সেখানে নিযুক্ত থাকতো।

আমাদের শহরবাসীরা প্রভুর গির্জার প্রতি অনুরক্ত উৎসাহী ভক্ত—তাই তাদের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তারা সঙ্গীত ও অন্যান্য কলার সমজ্‌দার। গির্জার

বৈভব-উজ্জ্বল চাকচিক্য এবং অর্গেন সহ বহু কণ্ঠে গীত সঙ্গীত তাদের জীবনের একটি উচ্চতম পবিত্রতম বিমলানন্দ। যে গির্জায় যেদিন ঐক্যসঙ্গীত হত সেখানে আধখানা শহর ভিড় লেগে যেতো, বিশেষ করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের তরুণ দলের, কেরানী-কুল, ছোকরার দল, ফুলবাবুর পাল, কল-কারখানার ছোট-বড় হুন্নুরি-কারিগর, এমন কি মিল-কারখানার মালিকরাও তাঁদের ভামিনীগণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হতেন। সবাই ভিড় লাগাতো একই গির্জায়ঃ সবাই চাইতো যে করেই হোক অর্গেনের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে অষ্ট-কণ্ঠ-সঙ্গীত, কিংবা কোনো ওস্তাদ যখন সপ্তমে উঠে কঠিন কারুকার্য করেন সেগুলো শুনতে—তা সে নরকের অগ্নিকুণ্ডের গরম দিনেই হোক, আর পাথর-ফাটা কনকনে শীতেই হোক; গির্জার ঢাকা আঙ্গিনাতেই হোক, আর জানলার নিচে দাঁড়িয়েই হোক।

ইস্‌মাইলফদের পাড়ার গির্জেয় হবে সর্বমঙ্গলময়ী কুমারী মা-মেরির স্মরণে পরব। তাই তার আগের রাত্রে যখন ইস্‌মাইলফ্ পরিবারে ফেদিয়াকে নিয়ে পূর্ববর্ণিত নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তখন তাবৎ শহরের তরুণদল ঐ গির্জেয় জড়ো হয়েছিল। গির্জে থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বেশ সোরগোল তুলে তারা সে সন্ধ্যার বিখ্যাত তার-সপ্তক-গায়কের গুণ নিয়ে, এবং ওঁরই মত সমান বিখ্যাত খাদ-গায়কের দৈব পদস্খলন নিয়ে আলোচনা করছিল।

কিন্তু সবাই যে কণ্ঠসঙ্গীত-আলোচনায় মেতে উঠেছিল তা নয়; দলের মধ্যে আর পাঁচজন আর পাঁচটা বিষয়ে অনুরাগী।

এদের মধ্যে ছিল একটি ছোকরা কলকব্জার হুন্নুরি। তাকে সম্প্রতি এখানকার একটি স্টীম-মিলের মালিক পেতের্স্‌বুর্গ* থেকে আমদানী করেছেন। ইস্‌মাইলফ্‌দের বাড়ির কাছে আসতে সে বলে উঠলো, 'সবাই বলছে, মেয়েটা তাদের কেরানী সের্‌গেইকে নিয়ে রসকেলিতে অষ্টপ্রহর মেতে আছে।'

ভেড়ার চামড়ার অস্তরদার নীল সুতী কোটপরা একজন বললে, 'যাঃ! সে তো সব্বাই জানে। আর সেই কথাই যখন উঠলো—আজ রাত্রে সে গির্জেয় পর্যন্ত আসেনি।'

'গির্জেয়? কী যে বলছো? বদমাইশ মাগীটা পাপের কাদামাটি এমনই সর্বাঙ্গে মেখেছে যে, সে এখন না ডরায় ভগবানকে, না ডরায় আপন বিবেককে, না ডরায় ভদ্রজনের দৃষ্টিকে।'

কলকব্জার ছোকরাটি বললে, 'ঐ হোথা দেখ, ওদের বাড়িতে আলো

---

* বর্তমান লেনিনগ্রাদ।

জলছে।' আঙল তুলে সে দেখালে, খড়খড়ির ভিতর দিয়ে আসছে আলোর রেখা।

একাধিক গলা তাকে টুইয়ে দিয়ে বললে, 'ফাঁক দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখ না, এবারে তারা কোন্ তালে আছে।'

দুই বন্ধুর কাঁধের উপর ভর করে কলকজার ছোকরাটি ফাঁকের ভিতর দিয়ে ভালো করে তাকাতে না তাকাতেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'ভাইরা সব, ওরা কার যেন দম বন্ধ করে তাকে মারছে—বন্ধুরা সব, দম বন্ধ করে কাউকে মারছে!'

সঙ্গে সঙ্গে সে মরীয়া হয়ে দু হাত দিয়ে খড়খড়ির উপর থাবড়াতে লাগলো। তার দেখাদেখি আরো জনা দশেক লাফ দিয়ে জানলার উপর উঠে হাতের মুঠো দিয়ে খড়খড়ির উপর হাতুড়ি পেটা করতে আরম্ভ করে দিল।

প্রতি মুহূর্তে ভিড় বাড়তে লাগল, এবং এই করেই ইস্মাইলফ্‌দের বাড়ি পূর্বোল্লিখিত ভাবে আক্রান্ত হল।

* * *

ফেদিয়ার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে কলকজার লোকটি সাক্ষ্য দিলে, 'আমি নিজে দেখেছি; আমি স্বচক্ষে দেখেছি; বাচ্চাটাকে চিৎ করে বিছানার উপর ফেলে দিয়ে দুজনাতে মিলে তার দম বন্ধ করে মারছিল।'

সের্‌গেইকে সেই রাত্রেই পুলিস-থানায় নিয়ে যাওয়া হল; দুজন প্রহরী কাতেরীনাকে তার শোবার-ঘরে নজরবন্দী করে রাখল।

* * *

ইস্মাইলফ্‌দের বাড়িতে অসহ শীত ছেয়ে পড়েছে। ঘর গরম করার স্টোভগুলো জ্বালানো হয়নি, সদর দরজা সর্বক্ষণ খোলা, কারণ দঙ্গলের পর দঙ্গল কৌতূহলীর দল একটার পর আরেকটা বাড়ির ভিতরে এসে ঢুকছে। সবাই গিয়ে দেখছে কফিনের ভিতর শুয়ে ফেদিয়া—আরেকটা ডালা-বন্ধ পুরো মখমলের পর্দা দিয়ে ঢাকা বড় কফিন*। ফেদিয়ার কপালের যেখানটায় ডাক্তার ময়না তদন্তের জন্য কেটেছিলেন সেখানকার লাল দাগটি ঢাকবার জন্য তার উপর রাখা হয়েছিল সাটিনের ফুল পাতা দিয়ে তৈরি একটি মালা। তদন্তে প্রকাশ পায়

---

* পরে বলা হয়েছে, এটাতে ছিল কাতেরীনার স্বামীর মৃতদেহ। এটা পচে গিয়েছিল বলে কফিনের ডালা বন্ধ করে তার উপর ভারী পর্দা ফেলে দেওয়া হয়েছিল—যাতে করে দুর্গন্ধ না বেরয়।

যে, ফেদিয়া দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে মারা যায়। সের্‌গেইকে ফেদিয়ার মৃতদেহের পাশে নিয়ে যাওয়ার পর, পাদ্রী ভয়াবহ শেষ বিচারের দিন এবং যারা কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা করে না তাদের কি হবে সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে না বলতেই সে হাউ হাউ করে চোখের জলে ভেঙে পড়লো। সমস্ত প্রাণ খুলে দিয়ে সে যে ফেদিয়ার খুনী এ-কথাই যে স্বীকার করলো তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষা জানালো জিনোভিই বরিসিচের মরা লাশও যেন খুঁড়ে তোলা হয়—স্বীকার করলো যে, পাদ্রী-কৃত শেষ-অন্ত্যেষ্টির পুণ্যফল থেকে জিনোভিইকে বঞ্চিত করে সে তাকে মাটিতে পুঁতেছিল।

তখনো তার লাশ সম্পূর্ণ পচে যায় নি; সেটাকে খুঁড়ে তুলে একটা বিরাট সাইজের কফিনে রাখা হল। সর্বসাধারণকে ত্রাসে আতঙ্কিত করে সে তার দুটি পাপের সহকর্মিণীরূপে যুবতী গৃহকর্ত্রীর নাম উল্লেখ করলো।

সর্ব প্রশ্নের উত্তরে কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌নার মাত্র একটি উত্তর:—'আমি কিচ্ছু জানি নে; আমি এ-সব ব্যাপারের কিচ্ছু জানি নে।'

সের্‌গেইকে কাতেরীনার সামনে মুখোমুখি করে তাকে দিয়ে কাতেরীনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ানো হল। তার সব স্বীকৃতি শুনে কাতেরীনা নীরব বিস্ময়ে তার দিকে তাকালো—সে দৃষ্টিতে কিন্তু কোনো রোষের চিহ্ন ছিল না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'সে যখন সব-কিছু বলার জন্য এতই উৎসুক তখন আমার কোনো-কিছু অস্বীকার করে আর কি হবে? আমি তাঁদের খুন করেছি।'

সবাই শুধোলে, 'কিন্তু কেন, কিসের জন্য?'

কাতেরীনা সের্‌গেইয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বললে, 'ওর জন্য।'

সের্‌গেই মাথা হেঁট করলো।

আসামী দুজনাকে জেলে পোরা হল। এই বীভৎস কাণ্ডটা জনসাধারণের ভিতর এমনই কৌতূহল, ঘৃণা আর ক্রোধের সঞ্চার করেছিল যে, ঝটপট তার ফয়সালা হয়ে গেল। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে সের্‌গেই এবং তৃতীয় বণিক সঙ্ঘের জনৈক বণিকের বিধবা কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌নাকে ফৌজদারী আদালতের রায় শোনানো হল: তাদের আপন শহরের খোলা হাটে প্রথম তাদের চাবুক মারা হবে এবং তারপর সাইবেরিয়াতে কঠিন সশ্রম কারাদণ্ডে উভয়ের নির্বাসন। মার্চ মাসের এক ভোরবেলাকার নিদারুণ হিমের শীতে চাবুকদার কাতেরীনার অনাচ্ছাদিত দুগ্ধধবল পৃষ্ঠে আদালতের স্থির করা সংখ্যা গুনে গুনে চাবুকের ঘা মেরে মেরে নীল-লাল রঙের উঁচু ফুলে-ওঠা দগড়ার দাগ

তুললে। তারপর সের্‌গেই পিঠে কাঁধে তার হিস্তে পেল। সর্বশেষে তার সুন্দর মুখের উপর জ্বলন্ত লোহা দিয়ে তিনটি রেখা কেটে ভ্রাতৃহন্তা 'কেন্'-এর লাঞ্ছন অঙ্কন করে দিল।*

এসব ঘটনা ঘটার সময় আগা-গোড়া দেখা গেল, যে কোনো কারণেই হোক সের্‌গেই কিন্তু কাতেরীনার চেয়ে জনসাধারণের বেশী সহানুভূতি পেল। সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ দণ্ডমঞ্চ থেকে নামবার সময় সে বার বার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, পক্ষান্তরে কাতেরীনা নেমে এল দৃঢ় পদক্ষেপে—তার একমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল যাতে করে তার খসখসে শেমিজ আর কয়েদীদের কর্কশ কোটটা তার পিঠে সেঁটে না যায়।**

এমন কি জেল-হাসপাতালে যখন তাকে তার সদ্যোজাত শিশুকে দেখানো হল সে মাত্র এইটুকু বললে, 'আঃ, কে ওটাকে চায়?' কস্মিনকালেও গোঙরানো কাতরানোর একটি মাত্র শব্দ না করে, কস্মিনকালেও কারো বিরুদ্ধে কণামাত্র অভিযোগ না জানিয়ে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শক্ত তক্তার উপর বুকের ভার রেখে কুঁকড়ে পড়ে রইল।

॥ ১৩ ॥

সের্‌গেই ও কাতেরীনা অন্যান্য কয়েদীর সঙ্গে দল বেঁধে সাইবেরিয়ার উদ্দেশে বেরুলো বসন্ত ঋতুতে। পঞ্জিকায় সেটা বসন্ত ঋতু বলে লেখা আছে বটে, কিন্তু আসলে তখন সেই প্রবাদটাই সত্য যে, 'সূর্য আলোক দেন যথেষ্ট, কিন্তু গরমি দেন অতি অল্পই'।

---

* বাইবেলের প্রথম অধ্যায় 'সৃষ্টি পর্বে' বর্ণিত আছে, আদমের পুত্র কেন্ তার ভ্রাতা আবেলকে হত্যা করে; যেহেতু মানুষ মাত্রই একে অন্যের ভ্রাতা তাই খুনীর কপালে ছ্যাঁকা দিয়ে তিনটি চিরস্থায়ী লাঞ্ছন অঙ্কনের বর্বর প্রথা ইয়োরোপের প্রায় সর্বদেশেই ঊনবিংশ শতাব্দী অবধি প্রচলিত ছিল।

** অনুবাদকের মনে হয়, তার ভয় ছিল, কর্কশ উলের সুতো পিঠের ঘায়ে ঢুকে গেলে শুকোবার সময় সমস্ত পিঠের চামড়া অসমান হয়ে গিয়ে তার পিঠের মসৃণ সৌন্দর্য নষ্ট করবে। কিন্তু অতি অবশ্য মনে রাখা উচিত, সে শুধু তার বল্লভের ভোগের জন্য। আপন সৌন্দর্য নিয়ে কাতেরীনার নিজস্ব কোনো দম্ভ ছিল না—কাহিনীতে তার কোনো চিহ্ন নেই।

কাতেরীনার বাচ্চাটাকে বরিস তিমোতেইয়েভিচের সেই বুড়ি মামাতো বোনের হাতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেওয়া হল। কারণ সে দণ্ডিতা রমণীর নিহত স্বামীর আইনসম্মত সন্তান রূপে স্বীকৃত হল বলে এখন সে ইস্মাইলফ্ এবং ফেদিয়ার তাবৎ সম্পত্তির একমাত্র স্বত্বাধিকারী। এ ব্যবস্থাতে কাতেরীনা যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিল এবং বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিল পরিপূর্ণ তাচ্ছিল্যভরে। বহু অবাধ প্রণয়াবেগবিহ্বল রমণীর মত তার প্রেমও আপন দয়িতে অবিচল হয়ে রইল—দয়িতের সন্তানে সঞ্চারিত হল না।

আর শুধু বাচ্চাটার ব্যাপারেই নয়, সত্য বলতে কি, কাতেরীনার জীবনে এখন আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, আলো নেই অন্ধকারও নেই; না আছে অমঙ্গল না আছে মঙ্গল, দুঃখ নেই সুখও নেই, সে কিছুই বুঝতে পারে না, কাউকে ভালবাসে না—নিজেকে পর্যন্ত না। অস্থির হয়ে সে শুধু প্রতীক্ষা করছিল একটি জিনিসের: কয়েদীর দল রওয়ানা হবে কবে, কারণ তার হৃদয়ে তখন একমাত্র আশা, দলের ভিতর সে সের্‌গেইকে আবার দেখতে পাবে। আপন শিশুটির কথা ততদিনে সে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে।

তার আশা তাকে ফাঁকি দিল না। মুখে 'কেন্'-এর লাঞ্ছন আঁকা, সর্বাঙ্গে ভারী শিকল বয়ে সের্‌গেইও রওয়ানা দিল তারই সঙ্গে একই ছোট দলটাতে।

যতই ঘৃণ্য হোক না কেন, মানুষ সর্ব অবস্থাতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় এবং সর্ব অবস্থাতেই নিজ নিজ ক্ষুদ্র আনন্দের সন্ধান সাধ্যমত করে থাকে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়োজন, কণা মাত্র প্রয়োজন, কাতেরীনার ছিল না। সে সের্‌গেইকে আবার দেখতে পাচ্ছে, এবং তার সঙ্গ পাওয়ার ফলে এই যে রাস্তা তাকে কঠিন কারাগারের নির্বাসনে নিয়ে যাচ্ছে সে-রাস্তাও তার কাছে আনন্দ-কুসুমে পুষ্পাচ্ছাদিত বলে মনে হতে লাগল।

কাতেরীনা তার ছিটের তৈরি ব্যাগে করে মূল্যবান জিনিস সঙ্গে নিয়েছিল অল্পই, এবং রোক টাকাকড়ি নিয়েছিল তার চেয়েও কম। এবং সে-সবও খর্চা হয়ে গেল নিজ্‌নি নফ্‌গরদ্* পৌঁছবার বহু পূর্বেই পাহারাওলাদের ঘুষ দিতে দিতে—যাতে করে সে রাস্তায় সের্‌গেইয়ের পাশে পাশে যেতে পারে, যাতে করে পথমধ্যে রাত্রি-যাপন আশ্রয়ের হিমশীতল এক কোণে, গভীর অন্ধকারে সে তার সের্‌গেইকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টাখানেক আলিঙ্গন করতে পারে।

ওদিকে কিন্তু কাতেরীনার 'কেন্'-মার্কা মারা বল্লভের হৃদয়ে কি জানি কি

* বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ম্যাক্সিম্ গর্কির নামে বর্তমান 'গর্কি'।

করে তার প্রতি স্নেহ-প্রেম শুকিয়ে গিয়েছে। কথা সে বলতো কমই, আর বললে মনে হত যেন আঁকশি দিয়ে কথাগুলো অতি কষ্টে টেনে টেনে বের করছে, আর এ-সব গোপন মিলনের মূল্য দিত সে অত্যল্পই—যার জন্য কাতেরীনাকে তার খাদ্য-পানীয়, আর তার আপন অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের জন্য যে-ক'টি সামান্য দু'চার পয়সা তার তখনো ছিল, সব-কিছু বিলিয়ে দিতে হত। এমন কি সের্‌গেই একাধিকবার বলতেও কসুর করলো না, 'ঐ যে অন্ধকার কোণে আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিচের 'ধূলো সরাবার' জন্য তুমি পাহারাওলাদের পয়সা দিচ্ছো সেগুলো আমাকে দিলেই পারো।'

মিনতিভরা কণ্ঠে কাতেরীনা বললে, 'আমি তো কুল্লে পঁচিশটি কপেক্ দিয়েছি, সেরেজেঙ্কা।'

'আর পঁচিশটি কপেক্ কি পয়সা নয়? পঁচিশটি কপেক্ কি রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া যায়? অতগুলো কপেক্ ক'বার পেয়েছ তুমি? ওদিকে ক'বার অতগুলো তুমি দিয়ে দিয়েছ, কে জানে।'

'কিন্তু ঐ করেই তো আমরা একে অন্যকে দেখতে পাই।'

'বটে? সেটা কি সহজ? ওতে করে আমরা কি আনন্দ পাই—এত সব নরক-যন্ত্রণার পর? আমার তো ইচ্ছে করে আমার জীবনটাকে পর্যন্ত অভিসম্পাত করি, আর এ ধরনের মিলনের উপর তো কথাই নেই।'

'কিন্তু সেরেজা, তোমাকে দেখতে পেলে আমার তো অন্য কোনো কিছুতেই এসে যায় না।'

'এসব ঘোর আহাম্মুকি।'—এই হল সের্‌গেইয়ের উত্তর।

এসব উত্তরে কাতেরীনা কখনো আপন ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে রক্ত বের করতো, আর কখনো বা নিশাকালীন মিলনের অন্ধকারে অশ্রুবর্ষণে অনভ্যস্ত তার সে দুটি চোখও তিক্ততার তীব্র বেদনায় ভরে যেত, কিন্তু সে সব-কিছু বরদাস্ত করে গেল, নীরবে যা ঘটার ঘটতে দিল, এবং নিজেকে নিজে ফাঁকি দিতে কসুর করলো না।

উভয়ের মধ্যে এই নূতন এক সম্পর্ক নিয়ে তারা নিজ্‌নি নফ্‌গরদ্ পৌঁছল। এখানে পৌঁছে তারা আরেক দল কয়েদীর সঙ্গে যোগ দিল—তারা এসেছে মস্কো অঞ্চল থেকে, যাবে ঐ একই সাইবেরিয়ায়।

নবাগত এই বিরাট বাহিনীর হরেক রকম চিড়িয়ার মাঝখানে, মেয়েদের দলে ছিল দুটি মেয়ে যারা সত্যই মনোযোগ আকর্ষণ করে। একটির নাম তিয়োনা, ইয়ারোস্লাভ্‌লের এক সিপাইয়ের স্ত্রী। এরকম চমৎকার কামবিলাসিনী মোহিনী

আর হয় না। সে লম্বা, আর আছে একমাথা চুলের ঘন কুন্তল বেণী, মদিরালস হরিদ্রাভ নয়ন, তার উপর নেমে এসে ছায়া দিচ্ছে নিবিড় আঁখিপল্লবের রহস্যময় অবগুণ্ঠন। অন্যটি সতেরো বছরের নিখুঁত খোদাই করা তরুণী। গায়ের বর্ণটি মোলায়েম গোলাপী, মুখটি ছোট্ট, কচি তাজা দুটি গালের উপর দুটি টোল, আর কয়েদীদের মাথা-বাঁধবার ছিটের রুমালের নিচে থেকে কপালে নেমে এসে এখানে ওখানে নাচছে ঢেউখেলানো সোনালি চুল। দলের সবাই তাকে সোনেৎকা নামে ডাকতো।

সুন্দরী রমণী তিয়োনার স্বভাবটি ছিল শান্ত, মদিরালস। দলের সবাই তাকে ভালো করেই চিনত, এবং তাকে জয় করতে সক্ষম হয়ে কোনো পুরুষই অত্যধিক উল্লাসভরে নৃত্য করতো না, কিংবা সে যখন তার তাবৎ কৃপাভিলাষীদের মস্তকে সমমূল্যের বিজয়-মুকুট পরিয়ে দিত তখন অত্যধিক শোকেও কেউ মোহমান হত না।

পুরুষ-কয়েদীর দল মস্করার সুরে সমস্বরে বলতো, 'মেয়েদের ভিতর আমাদের তিয়োনা পিসি সব চেয়ে দরদী দিল্ ধরেন; কারো বুকে তিনি কস্মিনকালেও আঘাত দিতে পারেন না!'

সোনেৎকা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ঝোপের চিড়িয়া।

তার সম্বন্ধে তারা বলতো, 'যেন বান্ মাছ—পাক দেবে, মোচড় খাবে, কিন্তু কক্‌খনো শক্ত মুঠোয় ধরতে পারবে না।'

সোনেৎকার রুচি ছিল; চট্ করে যা-তা সে তো নিতই না, বরঞ্চ বলা যেতে পারে, বাড়াবাড়িই করতো। সে চাইতো কাম যেন তার সামনে ধরা হয় সাজসজ্জায়,—যেন সাদামাটা তরি-তরকারি তার সামনে না ধরে সেটা যেন তৈরি হয় তীক্ষ্ণ স্বাদের ঝাল-টকের সস্ দিয়ে,—কামে যেন থাকে হৃদয়দহন, আত্মত্যাগ। আর তিয়োনা ছিল খাঁটি, নির্ভেজাল রুশ সরলতার নির্যাস। আর সে সরলতায় ভরা থাকতো এমনই অলসের আবেশ যে, কোনো পুরুষকে, 'কেন জ্বালাচ্ছো, ছেড়ে দাও আমাকে' বলবার মত উৎসাহ তার ছিল না। সে শুধু জানতো, সে স্ত্রীলিঙ্গের রমণী। এ জাতীয় রমণীকে বড়ই আদর করে ডাকাত-ডাকু, কয়েদীর দল আর পেতের্সবুর্গের সোশাল-ডেমোক্রাটিক গুষ্ঠী।

এই দুই রমণী সহ মস্কো থেকে আগত কয়েদীর দল যখন সের্গেই-কাতেরীনার দলের সঙ্গে মিলিত হল তখন এ দুটি রমণী নিয়ে এল কাতেরীনার জীবনে ট্রাজেডি।

দুই দলে সম্মিলিত হয়ে নিজ্‌নি থেকে কাজান রওয়ানা হওয়ার প্রথম দিন থেকেই সের্‌গেই কোনো প্রকারের ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় না করে উঠে পড়ে লেগে গেল সৈনিক বধূ তিয়োনার প্রণয়লাভের জন্য এবং স্পষ্টই বোঝা গেল কোনো প্রকারের অলঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক তার সামনে উপস্থিত হয়নি। অলসাবেশা তিয়োনা সের্‌গেইকে অযথা হতাশায় মন-মরা হতে দিল না—সে তার হৃদয়বশত কদাচ কোনো পুরুষকেই হতাশায় মন-মরা হতে দিত না। তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাত্রির আশ্রয়স্থলে সন্ধ্যার সময় কাতেরীনা ঘুষ দিয়ে তার সেরেজেচ্‌কার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করেছিল ; এখন সে নিদ্রাহীন চোখে প্রতীক্ষা করছিল, যে কোনো মুহূর্তে প্রহরী এসে আস্তে আস্তে তাকে নাড়া দিয়ে কানে কানে বলবে, 'ছুটে যাও! ঝটপট সেরে নিয়ো।' দরজা খুলে গেল, আর কে যেন, কোন্ এক রমণী তীরবেগে করিডর পানে ধাওয়া করলো ; দরজা আবার খুলে গেল, আবার আরেক রমণী তিলার্ধ নষ্ট না করে তার শোবার তক্তা থেকে লাফ দিয়ে উঠে প্রহরীর পিছনে অন্তর্ধান করলো ; অবশেষে কে যেন এসে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা কর্কশ কোটে আস্তে আস্তে টান দিল। তৎক্ষণাৎ সে তার শোবার তক্তা থেকে লাফ দিয়ে উঠলো—তক্তাখানা কত না কয়েদীর গাত্র-ঘর্ষণে চিক্কণ-মসৃণ হয়ে গিয়েছে—কোটটা কাঁধের উপর ফেলে আস্তে আস্তে প্রহরীর গায়ে ধাক্কা দিল তাকে গন্তব্য-স্থল দেখিয়ে দেবার জন্য নিয়ে যেতে।

করিডরের মাত্র একটি জায়গায় অগভীর পিরিচের উপর ঢালাই মোমে প্রদীপের নিষ্প্রভ পলতেটি ক্ষীণ আলো দিচ্ছে। কাতেরীনা চলতে চলতে দু-তিনটি যুগল-মিলনের সঙ্গে ঠোক্কর খেল—গা মিলিয়ে দিয়ে তারা যতদূর সম্ভব অদৃশ্য হবার চেষ্টা করছিল। পুরুষদের ওয়ার্ড পেরিয়ে যাবার সময় কাতেরীনা শুনতে পেল তাদের দরজায় কাটা ছোট জানলার ভিতর দিয়ে চাপা হাসির শব্দ আসছিল।

পাহারাওলা বিড় বিড় করে কাতেরীনাকে বললে, 'হাসাহাসির রকমটা দেখছ ?' তারপর তার কাঁধে ধরে একটা কোণের দিকে ঠেলে দিয়ে চলে গেল।

হাৎড়াতে গিয়ে কাতেরীনার একটা হাত পড়লো কর্কশ কোট আর দাড়ির উপর, দ্বিতীয় হাতটা স্পর্শ করলো কোন্ এক রমণীর গরম মুখের উপর।

সের্‌গেই নিচু গলায় শুধলে, 'কে ?'

'কি, কি করছো তুমি এখানে ? তোমার সঙ্গে এ কে ?'

অন্ধকারে কাতেরীনা সজোরে তার সপত্নীর মাথা বাঁধার রুমালখানা ছিনিয়ে নিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে তাকে এড়িয়ে দিল ছুট। করিডরে ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে সে বায়ুবেগে অন্তর্ধান করলো।

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের ওয়ার্ড থেকে উচ্চকণ্ঠে ফেটে উঠলো একশ' অট্টহাস্য!

কাতেরীনা ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, 'বদমাইশ', আর সের্‌গেইয়ের নবীন নাগরীর মাথা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রুমালের কোণ দিয়ে মারলো তার মুখে ঝাপটা। সের্‌গেই তার দিকে হাত তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেও ইতিমধ্যে ছায়ার মত লঘুপদে করিডর দিয়ে ছুটে গিয়ে ধরেছে তার কুঠুরির হাতল। পুরুষদের ওয়ার্ড থেকে যে অট্টহাস্য তার পিছনে পিছনে ধাওয়া করেছিল সেটা আবার এমনি কলরবে ধ্বনিত হল যে, যে-পাহারাওয়ালাটা পিরিচের গালামোমের কাঁপা-কাঁপা বাতিটার সামনে বসে-সময় কাটাবার জন্য আপন বুটজুতোর ডগাটাকে লক্ষ্য করে মুখ থেকে থুথুর তীর ছুঁড়ছিল সে পর্যন্ত মাথা তুলে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে উঠলো, 'চোপ্‌ ব্যাটারা!'

কাতেরীনা চুপচাপ শুয়ে পড়ে ভোর অবধি সামান্যতম নড়াচড়া না করে সেই রকমই পড়ে রইল। সে চাইছিল নিজেকে বলে, 'আমি তাকে আর ভালোবাসি নে' —আর অনুভব করছিল তাকে সে ভালোবাসে আরো গভীর ভাবে, আরো বেশী আবেগভরা উচ্ছ্বাসে। বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল সেই একই ছবি: তার ডান হাত অন্যটার মাথার নিচে থেকে থেকে কাঁপছে, তার বাঁ হাত চেপে ধরেছে অন্যটার কামাগ্নিতে জ্বলন্ত স্কন্ধদ্বয়।

হতভাগিনী কাঁদতে আরম্ভ করলো। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে সর্ব দেহ-মন দিয়ে কামনা করতে লাগলো, ঐ সেই হাতটি যেন থাকে তার মাথার নিচে, সেই হাতটি যেন চেপে ধরে তার কাঁধ—হায়, সে কাঁধ এখন মৃগী রুগীর মত থেকে থেকে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছে।

সেপাইয়ের বউ তিয়োনা তাকে ভোরবেলা জাগিয়ে দিয়ে বললে, 'তুমি অন্তত আমার রুমালখানা ফেরত দিতে পারো!'

'ও! তুমিই ছিলে তবে?'

'লক্ষ্মীটি, দাও না ফেরত!'

'কিন্তু তুমি আমাদের মাঝখানে আসছো কেন?'

'কেন, আমি কি করছি? তুমি কি ভেবেছো আমাদের ভিতর গভীর প্রণয়, না কি? না এমন কিছু সত্যি একটা মারাত্মক ব্যাপার যে যার জন্য তুমি রেগে টং হবে!'

কাতেরীনা একটুখানি চিন্তা করে বালিশের তলা থেকে আগের রাত্রের ছিনিয়ে নেওয়া রুমালখানা বের করে তিয়োনার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরালো।

তার হৃদয় হাল্কা হয়ে গেল।

আপন মনে বললে, 'ছিঃ! আমি কি এই রঙ-করা পিপেটাকে হিংসে করবো? চুলোয় যাক্ গে ওটা। তার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতেই আমার ঘেন্না ধরে।'

পরের দিন পথে যেতে যেতে সের্‌গেই তাকে বলতে লাগলো, 'শোনো, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না, তোমাকে আমি কি বলতে চাই। দয়া করে তুমি তোমার মাথার ভিতর এই তত্ত্ব-কথাটি ভালো করে ঢুকিয়ে নাও তো যে, প্রথমত আমি তোমার জিনোভিই বরিসিচ্ নই, দ্বিতীয়ত তুমি এখন আর কোনো গেরেম্বারী সদাগরের বউ নও; সুতরাং মেহেরবানী করে এখন আর বড়মানষীর চাল মারবেন না। আমার ব্যাপারে আস্ত একটা পাঁঠির মত যত্রতত্র ঢুঁ মারলে সেটা আমি বরদাস্ত করবো না।'

এর উত্তরে কাতেরীনা কিছু বললো না এবং তারপর এক সপ্তাহ ধরে সে সের্‌গেইয়ের পাশে পাশে হাঁটলো বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটিমাত্র দৃষ্টি বা বাক্য-বিনিময় হল না। তাকেই করা হয়েছে আঘাত, তাই সে নিজের মর্যাদা বাঁচিয়ে তার এই—সের্‌গেইয়ের সঙ্গে তার এই—সর্বপ্রথম কলহ মিটিয়ে সমঝাওতা আনার জন্য তার দিকে এগিয়ে যেতে চাইল না।

এদিকে যখন সের্‌গেইয়ের প্রতি কাতেরীনার রাগ, ততদিনে সের্‌গেই কুন্দধবলা তন্বঙ্গী সোনেৎকার দিকে হরিণের মত কাতর নয়নে তাকাতে আরম্ভ করেছে এবং নর্মভরে তার হৃদয়-দুয়ারে প্রথম করাঘাত আরম্ভ করে দিয়েছে। কখনো সে তার সামনে নম্রতাভরে মাথা নিচু করে বলে, 'আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিবাদন' আর কখনো বা তার দিকে তাকিয়ে মধুর স্মিত হাস্য করে, আর পাশাপাশি এলে ছল করে তাকে হাত দিয়ে ঘিরে দেয় সোহাগের চাপ। কাতেরীনা সব-কিছুই লক্ষ্য করলো, আর তার বুকের ভিতরটা যেন আরো সিদ্ধ হতে লাগলো।

মাটির দিকে না তাকিয়ে যেন ধাক্কা খেতে খেতে এগুতে এগুতে কাতেরীনা তোলপাড় করতে লাগলো, 'কি জানি, তবে কি ওর সঙ্গে মিটিয়ে ফেলব?' কিন্তু এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী বাধা দিতে লাগলো তার আত্মসম্মান—এগিয়ে গিয়ে মিটমাট করে ফেলতে। ইতিমধ্যে সের্‌গেই আরো নাছোড়বান্দা হয়ে

সেঁটে রইল সোনেৎকার পিছনে ; এবং সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, নাগালের বাইরের যে-সোনেৎকা এতদিন পাক দিতেন মোচড় খেতেন কিন্তু ধরা দিতেন না, এইবারে তিনি, যে কোন কারণেই হোক, হঠাৎ যেন পোষ মেনে নিচ্ছেন।

কথায় কথায় তিয়োনা একদিন কাতেরীনাকে বললে, 'তুমি আমাকে নিয়ে নালিশ করেছিলে না? কিন্তু আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করি নি। আমারটা ছিল আজ-আছে-কাল-নেই ধরনের দৈবাৎ ঘটে যাওয়ার একটা ব্যাপার ; এসেছিল, চলে গেল, মিলিয়ে গেল ; কিন্তু সাবধান, এই সোনেৎকাটার উপর নজর রেখো।'

কাতেরীনা মনস্থির করে আপন মনে বললে, 'জাহান্নমে যাক্ আমার এই আত্মসম্মান ; আজই আমি তার সঙ্গে মিটমাট করে ফেলব।' এবং তারপর ঐ একটিমাত্র চিন্তা নিয়ে পড়ে রইল, মিটমাট্ করে ফেলার জন্য সবচেয়ে ভাল কৌশলটা কি হবে?

কিন্তু কিছু করতে হল না ; সের্‌গেই নিজেই তাকে এই ধাঁধা থেকে বেরুবার পথ তৈরি করে দিল।

পরের আশ্রয়ে পৌঁছতেই সের্‌গেই কাতেরীনাকে ডেকে বললে, 'ল্‌ভভ্‌না, আজ রাত্রে এক মিনিটের তরে আমার কাছে এসো তো ; তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

কাতেরীনা চুপ করে রইল।

'কি হল? আমার উপর এখনো রেগে আছ নাকি? কথা বলবে না?'

কাতেরীনা এবারেও কোনো সাড়া দিল না।

কিন্তু পরের ঘাঁটির কাছে আসার সময় শুধু সের্‌গেই না, সবাই লক্ষ্য করলে যে, কাতেরীনা সর্দার পাহারাওলার চতুর্দিকে ঘুর ঘুর করছে, শেষটায় ভিক্ষায় পাওয়া* তার সতেরোটি কপেক্ সে সর্দারের হাতে গুঁজে দিল। মিনতিভরা কণ্ঠে তাকে বললে, 'আরো দশটা জমাতে পারলেই তোমাকে দেব।'

সর্দার পয়সা ক'টি আস্তিনের ভাঁজে লুকলো। বললে, 'ঠিক আছে।'

---

* আজকাল কি হয় অনুবাদকের জানা নেই, কিন্তু ১৯১৭-এর সমাজ বিবর্তের পূর্বের একাধিক লেখক এই মর্মস্পর্শী ভিক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। বৃষ্টি বরফে হুঁচোট হুমড়ি খেতে খেতে যখন এই সব হতভাগার দল সাইবেরিয়ায় আমৃত্যু নির্বাসনের দিকে এগুতো তখন বহু পরদুঃখকাতর গৃহী এমন কি ভিখারী আতুররাও এদের ভিক্ষে দিত। অনেক সময় অযাচিত ভাবে।

লেনদেন শেষ হয়ে গেলে সের্গেই 'ঘোঁৎ' করে খুশী প্রকাশ করে সোনেৎকার দিকে চোখের ইশারা মারলে।

ঘাঁটির সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে কাতেরীনাকে জড়িয়ে ধরে আর সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, 'ওগো, কাতেরীনা, লক্ষ্মীটি',—'শুনছিস ছোঁড়ারা, এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি এমন মেয়ে তো সারা সংসারেও পাওয়া যায় না।'

কাতেরীনার মুখ লাল হয়ে উঠলো—আনন্দে সে তখন হাঁফাচ্ছে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল; একলম্ফে সে বেরিয়ে এল বললে কমই বলা হয়; তার সর্বাঙ্গ তখন ঘন ঘন শিহরিত হচ্ছে আর অন্ধকারে তার হাত সের্গেইয়ের সন্ধানে এখানে ওখানে খুঁজছে।

তাকে আলিঙ্গন করে আপন বুকে চেপে যেন দম বের করে সের্গেই বললে, 'আমার কেটু।'

চোখের জলের ভিতর দিয়ে কাতেরীনা উত্তর দিল, 'ওগো, আমার সর্বনাশের নিধি।' তার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সে যেন ঝুলে রইল।

পাহারাওলা করিডরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি পাইচারি করতে করতে মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছিল; বুটজুতোর ডগায় থুথুর তীর ছোঁড়া অভ্যাস করে ফের পাইচারি আরম্ভ করছিল; ক্লান্তিতে জীর্ণ কয়েদীরা দরজার ভিতরে নাক ডাকিয়ে যাচ্ছে; ঘর গরম করার স্টোভের নিচে কোথায় যেন একটা ইঁদুর কুট কুট করে কম্বল কাটছে; ঝিঁঝির দল একে অন্যের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রাণপণ চিৎকার করে যাচ্ছে—কাতেরীনা তখনো সপ্তম স্বর্গে।

কিন্তু হৃদয়াবেগ ভাবোচ্ছ্বাস স্তিমিত হল এবং রসকষহীন অনিবার্য বাক্যালাপ আরম্ভ হল।

করিডরের এক কোণে মেঝের উপর বসে সের্গেই নালিশ জানালে, 'আমি কী মারাত্মক যন্ত্রণায়ই না কষ্ট পাচ্ছি; পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটু অবধি হাড়গুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমায় পাগল করে তুলেছে।'

সের্গেইয়ের লম্বা কোটের ভিতর সোহাগভরে মাথা গুঁজে কাতেরীনা শুধলো, 'তা হলে কি করা যায়, সেরেজেশ্কা?'

'যদি না…কি জানি, হয়তো বা ওদের বলতে হবে, কাজানে পৌঁছলে আমাকে সেখানকার হাসপাতালে জায়গা করে দিতে। তাই করবো নাকি?'

'সে কি? কী যে বলছো, সেরেজা!'

'এ ছাড়া অন্য কি গতি আছে বলো; যন্ত্রণায় আমার যে প্রাণ যায়।'

'কিন্তু তা হলে তারা তো আমাকে আগে আগে খেদিয়ে নিয়ে যাবে, আর তুমি পড়ে রইবে পিছনে!'

'ঠিক কথা, কিন্তু আমি করি কি? আমি তোমাকে বললুম তো, পায়ের শিকলি ঘষে ঘষে আমাকে যে মেরে ফেললে। শিকলিগুলো যেন ঘষতে ঘষতে আমার হাড়গুলোর ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। হয়তো বা কয়েকদিনের জন্য মেয়েদের লম্বা পশমের মোজা পরলে কিছু-একটা হয়।'

'লম্বা মোজা? আমার কাছে এখনো আনকোরা একজোড়া তো রয়েছে, সেরেজা!'

'তা হলে তো আর কথাই নেই।'

একটি মাত্র বাক্যব্যয় না করে কাতেরীনা ছুট দিয়ে ঢুকলো তার কুটুরিতে। শোবার তক্তার নিচের থেকে হাৎড়ে হাৎড়ে বের করলো তার ব্যাগটা। ফের ছুট দিল সের্‌গেইয়ের কাছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে নীল রঙের পুরু পশমের একজোড়া লম্বা মোজা; দুপাশে রঙিন সিল্কের মিহিন নক্‌শা জ্বল জ্বল করছে—বল্‌কফ্‌ শহরের তৈরি মোজা, এ মোজা তৈরি করেই সে শহর তার ন্যায্য খ্যাতি পেয়েছে।

কাতেরীনার শেষ মোজা জোড়াটি নিয়ে যেতে যেতে সের্‌গেই জোর দিয়ে বললে, 'এগুলো পরলে আর ভাবনা কি!'

কাতেরীনার-কী আনন্দ! ফিরে এসে কঠিন তক্তায় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। শুনতেই পেল না, সে ফিরে আসার পর সোনেৎকা করিডরে বেরিয়ে গেল আর সেখানে সমস্ত রাত কাটিয়ে চুপে চুপে ভোরের ঠিক অল্প একটু আগে কখন ফিরে এল।

এ সমস্ত ঘটল কাজান পৌঁছবার দু ঘাঁটি পূর্বে।

॥ ১৫ ॥

ঘাঁটির বন্ধ গুমোট ঘরের দেউড়ি থেকে বেরুবামাত্রই কয়েদীদের রুদ্র অভ্যর্থনা জানালো শীতে জর্জর বৃষ্টি-বরফে মেশা অকরুণ দিবস। কাতেরীনা বেরিয়েছিল বুকে যথেষ্ট সাহস বেঁধে কিন্তু আপন সারিতে যোগ দেওয়া মাত্রই তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো, মুখের রঙ সবুজে পরিবর্তিত হয়ে গেল। তার চোখের সামনে বিশ্ব-সংসার অন্ধকার হয়ে গেল; তার প্রত্যেকটি হাড়ের জোড়া যেন তাকে ছুঁচের মত খোঁচাতে আরম্ভ করলো, যেন তার দুটি হাঁটু ভেঙে গেছে।—ঐ তার

সামনে সোনেৎকা দেমাক করে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে পায়ের নীল পশমের মোজা—তার উপরের সিল্কের মিহিন কাজ—কাতেরীনা কত না ভালো করেই চেনে!

কাতেরীনা চলতে লাগল—যেন তার সর্বাঙ্গের কোনো জায়গায় জীবন-রসের বিন্দুমাত্র আর অবশিষ্ট নেই। শুধু তার চোখ দুটো পূর্ণ জীবন্ত, চোখের কোটর থেকে বেরিয়ে এসে যেন ভয়াবহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সের্‌গেইয়ের দিকে—সে দৃষ্টি তাকে ছাড়ল না, এক পলকের তরেও না।

জিরোবার পরের ঘাঁটিতে পৌঁছানো মাত্রই কাতেরীনা শান্ত পদক্ষেপে সের্‌গেইয়ের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বললে, 'পিশাচ!' সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সোজা তার চোখে থুথু ফেললে।

সের্‌গেই লাফ দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু আর সবাই তাকে জোর করে ঠেকিয়ে রাখলো।

শুধু বললে, 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।'—আর হাত দিয়ে মুখ মুছলো।

আর-সবাই ব্যঙ্গ করে বললে, 'অতো রোয়াব কিসের, সেও তোমার মোকাবেলা করতে ডরায় না।' আর-সকলের ঠাট্টা-হাসির মাঝখানে সোনেৎকার কলহাস্য শোনালো বড়ই ফুর্তিতে ভরা।

সোনেৎকার সাহায্যে যে গোটা ষড়যন্ত্রটা গড়ে উঠেছিল সেটা এখন তার সম্পূর্ণ পছন্দমতই বিকশিত হচ্ছিল।

সের্‌গেই কাতেরীনাকে শাসালে, 'এত সহজে এর শেষ হবে'না।'

জলঝড়ের ভিতর দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত অবসন্ন, ছিন্নভিন্ন হৃদয় নিয়ে কাতেরীনা সে রাত্রিতে কয়েদীদের শক্ত বেঞ্চে ছেঁড়া তন্দ্রার ভিতর মোটেই টের পেল না, কখন দুটো কয়েদী মেয়েদের ওয়ার্ডে ঢুকলো।

ওরা ঢোকা মাত্রই সোনেৎকা তার বেঞ্চি থেকে গা তুলে নীরবে কাতেরীনাকে দেখিয়ে দিয়ে, ফের শুয়ে পড়ে কয়েদীদের লম্বা কোট দিয়ে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে নিল।

সেই মুহূর্তেই কে যেন কাতেরীনার লম্বা কোট তার গা থেকে তুলে নিয়ে মুখের উপর ছুঁড়ে ঢেকে দিল আর তার পিঠের সূক্ষ্ম মাত্র খসখসে শেমিজের উপর মোটা ডবল দড়ির শেষ প্রান্ত দিয়ে নির্মম চাষাড়ে বলপ্রয়োগ করে বেধড়ক চাবকাতে লাগলো।

কাতেরীনা চিৎকার করে উঠলো, কিন্তু মুখে-মাথায় জড়ানো কোটের ভিতর দিয়ে তার কণ্ঠস্বর বেরতে পারলো না। সে উঠে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু তাতেও ঐ একই অবস্থা—এক তাগড়া কয়েদী তার কাঁধের উপর বসে তার বাহু দুখানা জোরে চেপে ধরে রেখেছিল।

'পঞ্চাশ!' শেষ পর্যন্ত গুনে শেষ হল। কারোরই বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হল না, এটা সের্‌গেইয়ের গলা। দুই নিশাচর দোর দিয়ে অন্তর্ধান করলো।

কাতেরীনা কোট থেকে মাথা ছাড়িয়ে লাফ দিয়ে উঠলো; সেখানে কেউ নেই, কিন্তু অদূরে লম্বা কোটের নিচে কে যেন হাসছে, নির্মম ব্যঙ্গের ঘেন্না ঈর্ষার হাসি। কাতেরীনা সোনেৎকার হাসি চিনতে পারলো।

এ অপমান যে সর্ব-সীমানা পেরিয়ে গেল। আর সীমাহীন ঘৃণা যন্ত্রণা সেই মুহূর্তে কাতেরীনার অন্তরের অন্তস্তলকে যেন সিদ্ধ করতে লাগলো। মতিচ্ছন্ন পাগলের মত সে সমুখপানে ধেয়ে গেল, মতিচ্ছন্নের মত টলে পড়লো তিয়োনার বুকের উপর—পড়ার সময় সে তাকে তুলে ধরলো।

কাতেরীনা ঢলে পড়ল তিয়োনার বুকের উপর। এই পূর্ণ উরসই কিছুদিন পূর্বে তারই বিশ্বাসঘাতক প্রেমিককে আনন্দ দিয়েছে পাপাত্মার কাম্য হেয় মাধুর্য দিয়ে। তারই উপর সে কেঁদে ভেঙে পড়ল তার অসহ বেদনার শোক নিয়ে। তারই সরলা কোমলা সপত্নীকে সে জড়িয়ে ধরলো, শিশু যে রকম মা'কে জড়িয়ে ধরে। এখন তারা দুজনাই এক সমান; দুজনাকে একই মূল্যে নামানো হয়েছে, দুজনাকেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

দু'জনাই এক সমান···তিয়োনা—যার দিকে তার পয়লা খেয়াল গেল তার কাছেই যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, আর কাতেরীনা—সে তার হৃদয়-নাট্যের শেষ দৃশ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু সত্য বলতে কি, এখন আর কোনো অবমাননা তার কাছে অবমাননা বলে মনে হয় না। তার চোখের জল শেষ করে সে এখন শক্ত হয়ে গিয়েছে, যেন সে পাথর হয়ে গিয়েছে, আর এখন সে কাঠের পুতুলের মত শান্ত হয়ে রোল্ কলে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলো।

ড্রাম বেজে উঠলো; দ্রম্-দ্রমাদম্-দ্রমাদম্-দ্রম্। শিকলে বাঁধা, শিকলহীন উভয় শ্রেণীর নিরানন্দ নিষ্প্রভ কয়েদীর দল যেন অদৃশ্য হস্তের ধাক্কা খেতে খেতে ঘাঁটির চত্বরে বেরিয়ে এল। সের্‌গেই আ.ছ সেখানে, আর আছে তিয়োনা, সোনেৎকা, কাতেরীনা, আছে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দণ্ডিত আদর্শ-বাদী এক কয়েদী—এক ইহুদির সঙ্গে শিকলে বাঁধা, একই শিকলে বাঁধা এক পোল আর তাতার।

প্রথম তারা একসঙ্গে জটলা করে দাঁড়িয়েছিল; পরে চলনসই রকমের শৃঙ্খলায় সারি বেঁধে তারা রওয়ানা দিল।

এরকম নিরানন্দ দৃশ্য বড়ই বিরল; পাঁচজনের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন,

উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হৃদয়ে যাদের কণামাত্র আশার ছায়াটুকু পর্যন্ত নেই— এরা কয়েকজন লোক কাঁচা রাস্তার হিমশীতল কালো কাদায় ডুবতে ডুবতে যেন এগিয়ে চলেছে। তাদের চতুর্দিকের সব-কিছু এমনি বিসদৃশ যে, আতঙ্কে মানুষের গা শিউরে ওঠে; অন্তহীন কাদামাটি, শিসার মত বিবর্ণ আকাশ, সর্বশেষ-পত্রবর্জিত নগ্ন সিক্ত উইলো গাছ—আর তাদের লম্বা লম্বা শাখায় বসে আছে উস্কোখুস্কো পালকসুদ্ধ দাঁড়কাকের দল। বাতাস কখনো গুমরে গুমরে ওঠে, তার কণ্ঠস্বর কখনো বা ক্রুদ্ধ, আর কখনো ছাড়ে তীব্র ক্রন্দন রব, আর কখনো বা ভীষণ হুঙ্কার।

এই বীভৎস দৃশ্য দৃশ্যের পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে নরকের সেই গর্জন, যে-গর্জন মানুষের আত্মাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সে-গর্জনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বাইবেলের মহাপুরুষ আইয়ুবের অভিসম্পাত—'ধ্বংস হোক সেই দিন যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করি', আর তাঁর প্রতি তাঁর স্ত্রীর উপদেশ: 'তোমার ভগবানকে অভিশাপ জানিয়ে মরে যাও।'

যারা এই উপদেশ-বাণীতে কর্ণপাত করে না, এ রকম বীভৎস অবস্থায় যাদের মনে মৃত্যু-চিন্তা প্রলোভনের চেয়ে ভয়ের সৃষ্টি করে বেশী—তাদের করতে হয় বীভৎসতর এমন কিছু যেটা এই আর্ত ক্রন্দনধ্বনির টুঁটি চেপে ধরে তাকে নীরব করে দেবে। এই তত্ত্বটি আমাদের নিত্যদিনের সাধারণ সাদামাটা সরল মানুষ উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করতে জানে; এ রকম অবস্থায় সে লাগাম ছেড়ে তার নির্ভেজাল নীচ পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়; সে তখন সাজতে যায় সঙ, নিজেকে নিয়ে আরম্ভ করে নিষ্ঠুর খেলা, অন্য পাঁচজন মানুষকে নিয়েও, তাদের কোমলতম হৃদয়ানুভূতি নিয়ে। এরা এমনিতেই অত্যধিক কোমল স্বভাব ধরে না—এ রকম অবস্থায় পড়ে তারা হয়ে যায় দ্বিগুণ পিশাচ।

* * *

কাতেরীনা-নিগ্রহের পরের দিন ভোরবেলা কয়েদীর দল যখন গ্রামের ভিতরকার ঘাঁটি ছেড়ে সবেমাত্র রাস্তায় নেমেছে তখন সের্গেই ইতর কণ্ঠে কাতেরীনাকে শুধলো, 'ওগো আমার পটের বীবী, সদাগরের ঘরণী—সম্মানিতা মহাশয়া সর্বাঙ্গীণ কুশলে স্বাস্থ্য উপভোগ করছেন তো?'

কথা ক'টা শেষ করেই সে তৎক্ষণাৎ সোনেৎকার দিকে ফিরে তাকে তার লম্বা কোটের এক পাশ দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে তার তীব্র কণ্ঠ তীব্রতর করে গেয়ে উঠলো:

'সোনালি চুলের কোমল মাথাটি দেখিনু জানালা দিয়া,
কুগ্রহ মোর,* ঘুমোও নি তুমি ? আবার ভাঙিবে হিয়া—!
বুকের ভিতর জড়ায়ে রাখিব মম গুণ্ঠনে, প্রিয়া।'

গানটা গাইতে গাইতে সের্‌গেই সোনেৎকাকে জড়িয়ে ধরে তামাম কয়েদীর পালের চোখের সম্মুখে তাকে সশব্দে চুম্বন করলো।

কাতেরীনা এসব দেখল, অথচ সত্যই যেন দেখতে পেল না। এমন অবস্থায় সে তখন পৌচেছে যেন প্রাণহীনা একটা পুতুল হেঁটে চলেছে আর সবাই তাকে খোঁচাতে আরম্ভ করেছে; তাকে দেখাচ্ছে, সের্‌গেই কি রকম অশ্লীলভাবে সোনেৎকার সঙ্গে ঢলাঢলি লাগিয়েছে। সে তখন সকলের সর্বপ্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বলির পাঁঠা।

যেন পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে কাতেরীনা এগোচ্ছে। এ-অবস্থায়ও কেউ তাকে নিয়ে ঠাট্টা জুড়ে দিলে তিয়োনা মাঝখানে পড়তো; বলতো, 'ছেড়ে দে না ওকে, পিচেশের দল, দেখছিস নে, ওর যে হয়ে এসেছে।'

এক ছোকরা কয়েদী যেন বাক্‌পটু হয়ে বললে, 'ওর ছোট্ট পা দু'খানি বোধ হয় ভিজে গিয়েছে।'

সের্‌গেই পাল্লা দিয়ে বললে, 'এ তথ্য সর্বজন-স্বীকৃত যে, আমাদের সম্ভ্রান্ত বণিক সম্প্রদায়ের মহিলাগণকে সাতিশয় সুকোমল ভাবে লালনপালন করা হয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তাঁর যদি একজোড়া গরম বীবীয়ানীর মোজা থাকতো তাহলে হাঙ্গামা কমে যেত।'

কাতেরীনা যেন গভীর নিদ্রা থেকে সাড়া দিল, জেগে উঠলো।

গুঁতোতে গুঁতোতে তাকে যেন সহের সীমানার ওপারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে —'ঘাসেতে লুকনো জঘন্য সাপ তুমি! ঠাট্টা করে হাসো আমাকে নিয়ে—ইতর বদমায়েশ—হাসো, আরো হাসো!'

'কি বলছেন আপনি, সদাগরের পটের বীবী! আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করার কোনো মৎলবই আমার নেই। আসলে সোনেৎকা হেথায় যখন সত্যই এত সুন্দর মোজা বিক্রি করছে, তখন ভাবলুম—কেন, দোষ করেছি নাকি?

---

* যে রাত্রে সের্‌গেই ফাঁকি দিয়ে কাতেরীনার কাছ থেকে মোজা জোড়াটি আদায় করে, তখন কাতেরীনা তাকে 'আমার সর্বনাশের নিধি' বলে সোহাগ করেছিল। এখানে সেটা 'কুগ্রহ মোর'। কাতেরীনাকে সেই সোহাগ স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই সের্‌গেই বিশেষ করে এই গানটাই ধরলো।

আমাদের সদাগরের বেগম সায়েবা হয়তো একজোড়া কিনলেও কিনতে পারেন।'

প্রচুর হাস্যধ্বনি উঠলো। দম দেওয়া কলের মত কাতেরীনা সামনের দিকে পা ফেললো।

আবহাওয়া ক্রমাগত আরো খারাপ হচ্ছে। এতদিন যে ধূসর মেঘ আকাশ ঢেকে রেখেছিল এখন তার থেকে নেমে এল স্তরে স্তরে ভেজা-বরফের পাঁজ। মাটি ছোঁয়া মাত্রই এরা গলে গিয়ে রাস্তার কাদার গর্তকে করে দেয় আরো গভীর,— সেটাকে ঠেলে ঠেলে পা চালানো করে দেয় আরো অসহ্য কঠিন কঠোর। অবশেষে সম্মুখে দেখা দিল শিসার রঙের একটা রেখা। সে রেখার অন্য তীর চোখে ধরা পড়ে না। এই রেখাটি ভল্‌গা নদী। অল্প অল্প জোর হাওয়া ভল্‌গার উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বড় বড় কাটা কাটা ঢেউ সামনে পিছনে খেদিয়ে নিয়ে চলেছে।

সর্বাঙ্গ জবজবে ভেজা, শীতে কাঁপতে কাঁপতে কয়েদীর দল আস্তে আস্তে ঘাটে পৌছে খেয়ার বিরাট কাঠের ভেলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

কালো ভেলার কাঠ থেকে জল ঝরছে। পাড়ে এসে ভিড়তে প্রহরীরা কয়েদীদের ভেলাতে ওঠবার ব্যবস্থা করতে লাগলো।

সর্বত্র ভেজা বরফের পোচ মাখা ভেলা ঘাট ছেড়ে উন্মত্ত নদীর ঢেউয়ের উপর দোলা খেতে লাগলো। ভেলা ছাড়ার সময় কয়েদীদের একজন বললে, 'কারা সব বলাবলি করছিল, ভেলাতে কার কাছে যেন বিক্রির জন্য ভদ্‌কা শরাব আছে।'

সের্‌গেই বললে, 'সত্যি বলতে কি, সামান্য কোনো মাল দিয়ে গলার নালিটা ভেজাবার এই সুযোগটা হারানো বড্ডই পরিতাপের বিষয় হবে।' সোনেৎকার ফুর্তির জন্য সে তখন কাতেরীনাকে বিদ্রূপের খোঁচা দিয়ে উৎপীড়ন করতে শুরু করেছে—'আপনি কি বলেন, আমাদের সদাগরের পটের বীবী? পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে এক পাত্তর ভদ্‌কা দিয়ে আমাদের চিত্তবিনোদন করলে কি রকম হয়? আহা, কিপ্‌টেমি করবেন না। স্মরণ করো, প্রিয়তমা, আমাদের অতীতের প্রেমের কথা! আমি আর তুমি—ওগো, আমার জীবনের আনন্দময়ী, তোমাতে আমাতে দুজনাতে কত না দীর্ঘ শরৎ-হেমন্তের রাত কাটিয়েছি পাশাপাশি বসে, তোমাতে আমাতে কত না আনন্দে সময় কাটিয়েছি কত না হেলা-ফেলায়; কেবলমাত্র তোমাতে আমাতে দুজনাতে মিলে তোমার প্রিয় আত্মীয়-আত্মজনকে ওপারের চিরশান্তিতে পাঠিয়েছি—একটিমাত্র পাদ্রীপুরুতের কণামাত্র সাহায্য না নিয়ে।'

শীতে কাতেরীনার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছিল। সে-শীত তার জবজবে ভেজা কাপড়-জামা ভেদ করে তার অস্থি-মজ্জা পর্যন্ত পৌচচ্ছিল···তার উপর আরো কি যেন কি একটা তার সর্বসত্তা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল। তার মাথা জ্বলছিল···

সত্যই যেন তার ভিতরে আগুন ধরানো হয়েছে···তার চোখের মণি অস্বাভাবিক রকমে বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছে, এক অদ্ভুত তীক্ষ্ণ জ্যোতি এসে সে মণির এখানে ওখানে নাচছে, আর তার দৃষ্টি ঢেউয়ের দোলার দিকে নিশ্চল নিবদ্ধ।

সোনেৎকার গলা ছোট্ট একটি রুপোর ঘণ্টার মত রিনিঝিনি করে উঠলো, 'মাইরি বলছি, এক ফোঁটা ভদ্‌কা পেলে আমি বেঁচে যেতুম ; এ শীতটা যে আমি কিছুতেই সইতে পারছি নে।'

সের্‌গেই ক্রমাগত খোঁচা দিয়ে যাচ্ছিল, 'আসুন না, আমার সদাগরের বেগম, আমাদের একটু খাইয়েই দিন না।'

ভৎর্সনা-ভরা মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে তিয়োনা বললে, 'ছিঃ! তুমি আবার কেন? বিবেক বলে কি তোমার কোনো বস্তু নেই?'

ছোকরা কয়েদী গর্দিউশ্‌কা তার সাহায্যে নেমে বললো, 'সত্যি, এসব ভালো হচ্ছে না।'

'ওর সম্বন্ধে তোমার বিবেকে না বাধলেও, অন্তত আর পাঁচজনের সামনে তোমার হায়া-শরম থাকা উচিত।'

সের্‌গেই তিয়োনার দিকে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'তুই মাগী বিশ্বতোষক! তুই আর তোর বিবেক! তুই কি সত্যি ভাবিস ওর জন্যে আমাকে আমার বিবেক খোঁচাবে? কে জানে, আমি আদপেই তাকে কখনো ভালোবেসেছিলুম কি না, আর এখন—এখন তো সোনেৎকার ছেঁড়া চটিজুতোটি পর্যন্ত ঐ চামড়া-ছোলা বেড়ালটার জঘন্য মুখের চেয়ে আমার ঢের বেশী ভালো লাগে। কিছু বলছো না যে? শোনো, আমি কি বলি। সে বরঞ্চ ঐ বাঁকামুখো গর্দিউশ্‌কাটার সঙ্গে পীরিত করুক ; কিংবা—' এবারে সে সন্তর্পণে চতুর্দিক দেখে নিয়ে হিজড়েপানা, ফেল্টের জোব্বা-পরা, মাথায়-ঝুঁটিদার-মিলিটারী-টুপিওলা, কয়েদীদের ঘোড়-সওয়ার অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তার চেয়েও ভালো হয় যদি দলের ঐ বড় অপিসারের সঙ্গে জুটে যায়—আর কিছু না হোক্ ঐ জোব্বার নিচে সে বৃষ্টিতে ভিজবে না।'

আবার সোনেৎকার গলা ছোট্ট একটি ঘণ্টার মত রিনিঝিনি করে উঠলো, 'আর, তখন সবাই তাকে অপিসারের বীবী বলে ডাকবে।'

ফোড়ন দিয়ে সের্‌গেই বললে, 'একদম খাঁটি কথা···আর এক জোড়া মোজার জন্য তার কাছ থেকে পয়সা যোগাড় করাটা হবে ছেলে-খেলা!'

কাতেরীনা আত্মপক্ষ সমর্থন করল না ; সে আরো স্থির অবিচল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঢেউগুলোর দিকে, শুধু তার ঠোঁট দুটি নড়ছে। সের্‌গেইয়ের

জঘন্য কুবাক্যের ভিতর দিয়ে তার কানে আসছিল নদীর উত্তাল তরঙ্গের জৃম্ভন-বিজড়নের বিক্ষোভিত ধ্বনি, যন্ত্রণাসূচক আর্তরব। হঠাৎ একটা ঢেউ বিরাট হাই তুলে ভেঙে পড়ার সময় তার মাঝখানে কাতেরীনার সামনে দেখা দিল বরিস্ তিমোতেইয়েভিচের বিবর্ণ মুখ, আরেকটার মাঝখান থেকে উঁকি মেরে তাকালো তার স্বামী, তারপর সে ফেদিয়াকে কোলে নিয়ে ডাইনে বাঁয়ে দুলতে লাগলো—ফেদিয়ার অবশ্য মাথা ঢলে পড়েছে। কাতেরীনা তার দেবতার উদ্দেশে কোনো প্রার্থনা স্মরণে আনবার চেষ্টা করে ঠোঁট নাড়ালো, কিন্তু ক্ষীণস্বরে বেরিয়ে এল, 'তোমাতে আমাতে দুজনাতে কত না দীর্ঘ শরৎ-হেমন্তের রাত কাটিয়েছি পাশাপাশি বসে, তোমাতে আমাতে কত না আনন্দে সময় কাটিয়েছি কত না হেলাফেলায় ; এই বিরাট বিশ্ব থেকে তোমাতে আমাতে মানুষ ওপারে পাঠিয়েছি নিষ্ঠুর মৃত্যুর ভিতর দিয়ে।'

কাতেরীনা ল্ভভ্না কাঁপছিল। তার দৃষ্টি এদিক ওদিক ছুটোছুটি ছেড়ে ক্রমেই একটি বিন্দুতে নিবদ্ধ হয়ে আসছিল। সে দৃষ্টি পাগলিনীর মত। দু-একবার তার হাত দু'খানি মহাশূন্যের দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে উঠে আবার পড়ে গেল। আরেক মিনিটকাল অতীত হল—হঠাৎ তার সমস্ত শরীর সামনে পিছনে দুলতে আরম্ভ করলো ; একবার এক মুহূর্তের তরেও তার দৃষ্টি কালো একটা ঢেউয়ের থেকে না সরিয়ে সে সামনের দিকে নিচু হয়ে সোনেৎকার পা দু'খানি চেপে ধরে এক ঝটকায় ভেলার পাশ ডিঙিয়ে তাকে সুদ্ধ নিয়ে ঝাঁপ দিল নদীর তরঙ্গে।

বিস্ময়ে সবাই যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।

একটা ঢেউয়ের চূড়ায় কাতেরীনা ল্ভভ্না দেখা দিয়ে আবার তলিয়ে গেল ; আরেকটা ঢেউ সোনেৎকাকে তুলে ধরলো।

'নৌকোর আঁকশিটা! নৌকোর আঁকশিটা ছুড়ে দাও!'—ভেলা থেকে সমস্বরে চিৎকার উঠলো।

লম্বা দড়িতে বাঁধা নৌকার ভারী আঁকশিটা শূন্যে ঘোরপাক খেয়ে জলের উপর পড়ল। সোনেৎকা আবার জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। ভেলার পিছনকার স্রোতের টানে জলের নিচে অদৃশ্য অবস্থায় দ্রুতবেগে পিছিয়ে পড়ে সোনেৎকা দু সেকেণ্ড পরে আবার উপরের দিকে তার দু'বাহু উৎক্ষেপ করলো ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাতেরীনা আরেকটা ঢেউয়ের উপরে প্রায় কোমর পর্যন্ত জলের উপর তুলে সোনেৎকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো—দৃঢ় বর্শা যে রকম ক্ষুদ্র মৎস্য-শাবকের ক্ষীণ প্রতিরোধ উপেক্ষা করে তাকে ভেদ করে চেপে ধরে।

দু'জনার কেউই আর উপরে উঠলো না।

দু-হারা

নূর্-ই-চশ্‌ম্

শ্রীমান সৈয়দ জগলুল আলীর

করকমলে—

দু-হারা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বরোদার বিখ্যাত মহারাজা সয়াজী রাওয়ের কাছে আমি চাকরি নিয়ে যাই। শহরের আকার ও লোকসংখ্যা গুজরাতের অন্যান্য শহরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু স্বাধীন রাজ্য বলে ছোটখাটো মিউজিয়াম, তোষাখানা, চিড়িয়াখানা, রাজপ্রাসাদ, পালপরবে গাওনা-বাজনা এবং আর পাঁচটা জিনিস ছিল বলে একদিক দিয়ে দেখতে গেলে পাশের ধনী শহর আহমদা-বাদের তুলনায় এর আপন বৈশিষ্ট্য ছিল।

আজ আর আমার ঠিক মনে নেই, মহারাজা নিজে মদ না খেলেও তাঁর ক'টি ছেলে দিবারাত্র বোতল সেবা করে করে বাপ-মায়ের চোখের সামনে মারা যান। ওঁদের মদ খাওয়া বন্ধ করার জন্য কিছুদিনের তরে তিনি তাবৎ বরোদা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ড্রাই করে দেন, কিন্তু তাতেও কোনো ফলোদয় হয় নি। শেষ পর্যন্ত বাকি ছিলেন একমাত্র ধৈর্যশীল রাও। এঁকেও সাদা চোখে বড় একটা দেখা যেত না।

মহারাজার বড় ছেলের ছেলে—তিনিই তখন যুবরাজ—প্রতাপসিং রাও-ও প্রচুর মদ্যপান করতেন—এ নিয়ে বুড়া মহারাজার বড়ই দুঃখ ছিল—কিন্তু নাতি তখনো দু'কান কাটা হয়ে যান নি। রাজা হওয়ার পর তিনিও সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে গেলেন এবং ভারত স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর তিনি আকাট মূর্খ ইয়ারবক্সীর প্ররোচনায় ভারতের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিলেন! তিনি গদীচ্যুত হওয়ার পর তাঁর ছেলে ফতেহ্ সিং রাও মহারাজা উপাধি পান—এবং বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে সংযুক্ত বলে অনেকেই তাঁকে চেনেন। শুনেছি, মানুষ হিসেবে চমৎকার।

কিন্তু এসব অনেক পরের কথা।

বুড়া মহারাজার মদ্যের প্রতি অনীহা ছিল বলে বরোদা শহরে সংযমের পরিচয় পাওয়া যেত—বিশেষ করে যখন অন্যান্য নেটিভ স্টেটে মদ্যপানটাই সবচেয়ে বড় রাজকার্য বলে বিবেচনা করা হত, ও প্রজারাও যখন রাজাদর্শ অনুকরণে পরাঙ্মুখ ছিল না।

কিন্তু বুড়া মহারাজা বিস্তর বিলাতফের্তা যোগাড় করেছিলেন বলে প্রায়ই কারো না কারো বাড়িতে পার্টি বসত। দু-এক জায়গায় যে মদ নিয়ে বাড়াবাড়ি হত না, সে কথা বলতে পারি নে। তবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করতো গৃহকর্তার আপন সংযমের উপর।

এরই দু-একটা পার্টিতে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। ভুল বললুম, পরিচয় হয়। কারণ এ রকম স্বল্পভাষী লোক আমি জীবনে কমই দেখেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি চুপ করে বসে থাকতেন এক পাশে, এবং অতিশয় মনোযোগ সহকারে ধীরে ধীরে গেলাসের পর গেলাস নামিয়ে যেতেন। কিন্তু বানচাল হওয়া দূরে থাক, তাঁর চোখের পাতাটিও কখনো নড়তে দেখি নি। আমি জানতুম, ইনি বন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বছর দশেক পূর্বে ডক্টরেট পাশ করে বরোদায় ফিরে এসে উচ্চতর পদে বহাল হন। আমিও বন্ থেকে বছর তিনেক পূর্বে পাশ করে আসি ও তিনি যে-সব গুরুর কাছে পড়াশোনা করেছিলেন আমিও তাঁদের কয়েক-জনের কাছে বিদ্যার্জন করার চেষ্টা করি। আমি তাই আশা করেছিলুম তিনি অন্তত আমার সঙ্গে দু-চারিটি কথা বলবেন—বন্ বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁর সহপাঠী, তাঁর আমার উভয়ের গুরু, রাইন নদী, শহরের চতুর্দিকের বন-নদী-পাহাড়ের পিকনিক নিয়ে তিনি পুরানো দিনের স্মৃতি ঝালাবেন, নিদেন দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। আমি দু-তিনবার চেষ্টা দিয়ে দেখলুম, আমার পক্ষে তিনি বন্ থেকে পাশ না করে উত্তর মেরু থেকে পাশ করে থাকলে একই ফল হত। সাপের খোলসের মত তিনি বন্ শহরের স্মৃতি কোন্ আঁস্তাকুড়ে নির্বিকার চিত্তে ফেলে এসেছেন। আমি আর তাঁকে ঘাঁটালুম না।

এর পর কার্যোপলক্ষে আমি এক-আধবার তাঁর দফতরে যাই। এক্ষেত্রেও তদ্বৎ। নিতান্ত প্রয়োজন হলে বলেন ইয়েস, নইলে জিভে ক্লোরোফরম মেখে নিয়ে নিশ্চুপ।

বাড়ি ফিরে এসে তাঁর থীসিসখানা যোগাড় করে নিয়ে পড়লুম। অত্যুৎকৃষ্ট জর্মনে লেখা। নিশ্চয়ই কোনো জর্মনের সাহায্য নিয়ে। তা সে আমরা সবাই নিয়েছি এবং এখনো সর্ব অজর্মনই নিশ্চয়ই নেয়, কিন্তু ইনি পেয়েছিলেন সত্যকারের জউরির সাহায্য। তবে তিনি এখন কতখানি জর্মন বলতে এবং বুঝতে পড়তে পারেন তার হদিস পেলুম না। কারণ বরোদায় আসে অতি অল্প জর্মন, তারাও আবার ইংরিজি শেখার জন্য তৎপর। তদুপরি তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষাতে দেখা হলে এবং সে যদি জর্মন না জানে তবে তার অজানা ভাষায় কথা বলাটা বেয়া-দবিও বটে। এতাবৎ হয়তো তাই শ্রীযুত কাণের সামনে জর্মন বলার কোনো অনিবার্য পরিস্থিতি উপস্থিত হয় নি।

এর পরে আরো দু' বৎসর কেটে গেছে ঐ একই ভাবে। তবে ইতিমধ্যে আমার সর্বজ্ঞ বন্ধু পার্সী অধ্যাপক সোহরাব ওয়াডিয়া আমাকে বললেন, আপন অন্তরঙ্গ জাতভাইদের সঙ্গে নিভৃতে তিনি নাকি জিভটাতে লুব্রিকেটিং তেল ঢেলে

দেন এবং তখন তাঁর কথাবার্তা নাকি flows smoothly like oil, রসনার উপর অন্যত্র তাঁর সংযম অবিশ্বাস্য।

এই দু' বছর কাটার পর আমার হাতে ফোকটে কিঞ্চিৎ অর্থ জমে যায়। দয়াময় জানেন সেটা আমার দোষ নয়। সে যুগে বরোদায় খরচ করতে চাইলেও খরচ করার উপায় ছিল না। ওদিকে জর্মনিতে হিটলারের নাচন-কুদন দেখে অন্তত আমার মনে কোনো সন্দ রইল না, তাঁর ওয়াল্‌ট্‌স্‌ নাচ এবারে জর্মনির গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরেও গড়াবে। এবং সেটা আকছারই গড়ায় প্রতিবেশী ফ্রান্সের আঙ্গিনায়। দুই দেশেই আমার বিস্তর বন্ধু। এইবেলা তাহলে তাদের শেষ দর্শনে যাই। ১৯১৮ সালে জর্মনরা আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করে ও রণাঙ্গনে গ্যাসও চালায়। এবারে শুরুই হবে ওসব দিয়ে—অনেক দূরপাল্লার বোমারু এবং জঙ্গী বিমান নিয়ে, তীব্রতর বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে। ধুন্দুমার শেষ হলে আমার ক'জন বন্ধু যে আস্ত চামড়া নিয়ে বেরিয়ে আসবেন বলা কঠিন।

১৯৩৮-এর গরমিকালে ভেনিস মিলান হয়ে বন্‌ শহরে পৌঁছলুম। জাহাজে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করবার ফুরসৎ পাই নি। প্রথম দিনেই আলাপ হয়ে যায় এক ফ্রেঞ্চ ইণ্ডোচায়নার তরুণীর সঙ্গে। অপূর্ব সুন্দরী। 'অপূর্ব' বললুম ভেবেচিন্তেই। আমার নিজের বিশ্বাস—এবং আমার সে-বিশ্বাসে আমার এক বিশ্বপর্যটক বন্ধু সোৎসাহে সায় দেন—দোআঁসলা রমণীরা সৌন্দর্যে সব সময়ই খাঁটিকে হার মানায়। পার্টিশনের পরের কথা বলতে পারি নে, কিন্তু তার পূর্বে কলকাতার ইলিয়ট রোড, ম্যাকলাউড স্ট্রীটের যে অংশে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সুন্দরীদের হাট বসতো—খারাপ অর্থে নেবেন না—সে রকমটা আমি প্যারিস ভিয়েনা কোথাও দেখি নি।

কিন্তু এ তো গেল আর্যে আর্যে সংমিশ্রণ। কিন্তু ইণ্ডোচায়নায় ফ্রেঞ্চ আর্য রক্ত ও চীনা মঙ্গোলিয়ান রক্তে সংমিশ্রণ। এ জিনিস আমার কাছে 'অপূর্ব' বলে মনে হয়েছিল। শুধু আমার কাছে নয়, অন্য অনেকেরই কাছে। কিন্তু হলে কি হয়, পানির দেবতা বদর্‌ পীর আমার প্রতি বড্ডই মেহেরবাণী ধরেন —সপত্নদের কেউই একবর্ণ ফরাসী বলতে পারেন না। আমি যে অত্যুত্তম ফরাসী বলতে পারি তাও নয়। কিন্তু কথায় আছে, 'শয়তানও বিপদে পড়লে মাছি ধরে ধরে খায়।' তরুণী যাবেন কোথায়! জাহাজে অবশ্য দু-একটি পাঁড় টুরিস্ট ছিলেন যাঁরা ফরাসী জানেন, কিন্তু পাঁড় টুরিস্ট হতে সময় লাগে—বয়সটা ততদিন কিছু চুপ করে দাঁড়িয়ে যাত্রাগান দেখে না—পাঁড় টুরিস্ট হয় বুড়ো-হাবড়া। ওদিকে সুভাষিত আছে, 'বৃদ্ধার আলিঙ্গন অপেক্ষা তরুণীর পদাঘাত শ্রেয়।'

প্রবাদটা উল্টো দিক থেকেও আকছারই খাটে। আমার তখন তরুণ বয়স, তদুপরি আমি বাঙলা দেশের লোক—গায়ে বেশ কিছুটা চীনা-মঙ্গোল রক্ত আছে। তরুণীর সেটা ভারী পছন্দ হয়েছে—বলতেও কসুর করলেন না।

আমার তখন এমনই অবস্থা যে ওঁর সঙ্গে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত অবধি যেতে পারি। অবশ্য জানি, পৃথিবীটা গোল—আবার মোকামে ফিরে আসবো নিশ্চয়ই, এই যা ভরসা।

ভেনিস পৌঁছে জানা গেল, এ জাহাজ পৃথিবীর অন্য প্রান্ত অবধি যায় না। ইনি শুধু মাকু মারেন ইতালি ও বোম্বাইয়ের মধ্যিখানে। আমাদের মধ্যে প্রেম হয়েছিল গভীর, কিন্তু ব্যাডমিণ্টনের শাটল কক্ হতে যতখানি প্রেমের প্রয়োজন ততখানি তখনো হয়ে ওঠে নি। আসলে সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছিল সফরটা তেরো দিনের ছিল বলে। তেরো সংখ্যাটা অপয়া। বারো কিংবা চোদ্দ দিনের হলে হয়তো একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত। ভেনিস বন্দরে সজল নয়নে আমরা একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। আমার যেসব সপত্নরা (আজকের দিনের ভাষায় পুংসতীন) ফরাসী জানতো না বলে বিফল মনোরথ হয়েছিল তাদের মুখে পরিতৃপ্তির স্মিতহাস্য ফুটে উঠেছিল। বিদ্যেসাগর মশাই নাকি মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারলে উল্লাস বোধ করতেন; জানি নে তিনি কখনো এমন হাসি দেখেছেন কি না যেটা দেখলে মানুষের মাথায় খুন চাপে।

ব্রেন্নার পাস, অস্ট্রিয়া হয়ে জর্মনিতে ঢুকলুম। বন্ শহরে পৌঁছলুম সন্ধ্যার সময়। বন্ প্রাচীন দিনের গলি-ঘুঁচির শহর। একে আমি আপন হাতের উল্টো পিঠের চেয়েও ভাল করে চিনি। মালপত্র হোটেলে নামিয়ে বেরিয়ে পড়লুম প্রাচীন দিনের সন্ধানে।

ওই তো সামনে হান্‌সেন্ রেস্তোরাঁ। দেখি তো, আমার দোস্ত বুড়ো ওয়েটার হান্‌স্ এখনো টিঁকে আছে কি না। যেই না ঢোকা, হান্‌সের সঙ্গে প্রায় হেড্-অন্ কলিশন। বুড়ো হান্‌স্ বাজিকর। দু-হাতে সে একসঙ্গে পাঁচ প্লেট—দু-হাতে চার প্লেট, পঞ্চমটা এই চারটের মধ্যিখানে, উপরে—স্যুপ রান্নাঘর থেকে খাবার ঘরে তার চিরপ্রচলিত পদ্ধতিতে নিয়ে আসছিল। কোনোগতিকে সামলে নিয়ে হুঙ্কার দিলে, 'ওই রে, আবার এসেছে সেই কালো শয়তানটা!' আমি বললুম, 'তোর জান নিতে।' 'হিটলার তোর জান নেবে—তুই ইহুদি!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে সেই লোকটার কথা ভাবলুম, যে দুঃখ করে বলেছিল, 'হায় মা, টাক তো দিলি, কিন্তু "ক"-এর সঙ্গে "আ"কারটা দিতে ভুলে গেলি।' আমি বললুম, 'ইহুদির কালো চুল দিলি, মা, কিন্তু তার পকেটের রেস্তটা দিতে

ভুলে গেলি।' হান্‌সকে শুধালুম, 'তোমার ডিউটি কটা অবধি?' 'নটা।' 'তাহলে "কাইজার কালে" এসো নটায়।' 'কেন? আমেরিকায় পয়সাওলা কাকা মারা গেছে নাকি?' 'না, কোলারে।' 'সে আবার কোথায়?' 'ভারতবর্ষে সোনার খনি।' 'ওঃ! তাহলে একটা গোল্ড-ডিগার সঙ্গে নিয়ে আসবো।'

'গোল্ড-ডিগার' মানে যে-সব খাবসুরৎ মেয়ে প্রেমের অভিনয় করে আপনার মনি-ব্যাগটি ফাঁকা করতে সাহায্য করে। আপনারই উপকারার্থে। পোকা লাগার ভয়ে সেটাতে বাতাস খেলাতে চায়।

গোরস্তানে ঢুকলে আমরা চেনা লোকের গোরের সন্ধান করি; অচেনা লাইব্রেরিতে ঢুকলে চেনা লেখকের বই আছে কিনা তারই সন্ধান করি প্রথম। বন্ শহর নূতনত্ব অত্যন্ত অপছন্দ করে; তৎসত্ত্বেও দু-চারটে নূতন রেস্তোরাঁ কাফে জন্ম নিয়েছে। সেগুলো তদারক করার কণামাত্র কৌতূহল অনুভব করলুম না। কে বলে মানুষ নূতনত্ব চায়?

কুকুর যে রকম পথ হারিয়ে ফেললে আপন গন্ধ শুঁকে শুঁকে বাড়ি ফেরে, আমিও ঠিক তেমনি সাত দিন ধরে আজ ভেনুসবের্গ, কাল গোডেসবের্গ, পরশু জীবেনগেবের্গে, পরের দিন রাইনে লঞ্চ-বিহার করে করে আপন প্রাচীন দিনের গন্ধ খুজে খুঁজে কাটালুম; আর শহরের ভিতরকার গলি-ঘুঁচির রেস্তোরাঁ-বারের তো কথাই নেই।

অষ্টম দিনে ড্যুসলডর্ফে আমার প্রাচীন দিনের সতীর্থ পাউলকে ট্রাঙ্ক করলুম। প্রথমটায় সে একচোট গালাগালি দিলে আমি কেন আগে জানাই নি। আমি বললুম, 'কেন? বেতার তো আমার টুরের খবর প্রতিদিন বুলেটিনে ঝাড়ছে।'

শুধালে, 'কোন্ বেতার? দক্ষিণ মেরুর?'

'না, কন্‌সানট্রেশন ক্যাম্পের।'

'এই! চুপ চুপ!'

'না রে না, ভয় পাস নি। তোদের ফ্যুরারের সঙ্গে আমাদের এখন খুব দোস্তী। তিনি গোপনে আমাদের দু-একজন বেসরকারী নেতাকে শুধিয়েছেন, তিনি যদি ব্রিটন আক্রমণ করেন তবে ভারতীয়েরা তার মোকা নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে কি না।'

'থাক্ থাক্। আজ সন্ধ্যায় দেখা হবে।'

আমি বললুম, 'হাইল হিটলার।'

রিসীভার রাখার এক মিনিট যেতে না যেতে টেলিফোন বাজলো। রিসীভার তুললুম। অপর প্রান্ত থেকে অনুরোধ এল বামাকণ্ঠে, 'আমি কি ডক্টর সায়েডের

সঙ্গে কথা বলতে পারি ?'

'কথা বলছি।'

'আমি ট্রাঙ্ককল দফতর থেকে কথা বলছি। খানিকক্ষণ আগে আপনি ড্যুসলডর্ফে ট্রাঙ্ক কল করেছিলেন না ?'

সর্বনাশ! পাউলের ভয় তাহলে অমূলক নয়। নিশ্চয়ই নাৎসি স্পাই। আমাদের কথাবার্তা ট্যাপ করেছে। ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, 'হ্যাঁ।'

'আপনি ইণ্ডিয়ান ?'

'কি করে—'

'না, না, মাফ করবেন—আপনার জর্মন উচ্চারণ খুবই খাঁটি, কিন্তু কি জানেন, আমি ট্রাঙ্ক কল একসচেঞ্জে কাজ করি বলে নানান দেশের নানান ভাষা নানান উচ্চারণের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। শুধু কণ্ঠস্বর নিয়ে সব-কিছু বুঝতে হয় বলে অল্প দিনের ভিতরেই এ জিনিসটা আমাদের আয়ত্ত হয়ে যায়।'

আশ্চর্য নয়। মানুষ তার মাতৃভাষার বৈশিষ্ট্য বিদেশী ভাষা বলার সময় আপন অজানতে প্রকাশ করে ফেলে আর ওকীবহাল ব্যক্তি সেটা ধরে ফেলতে পারেন। শুনেছি লণ্ডনের কোন্ এক আর্ট একাডেমির অধ্যক্ষ যে কোনো ছবি দেখেই বলে দিতে পারতেন, কোন্ দেশের লোক এটা এঁকেছে। একই মডেল দেখে দেড়শটি ছেলে স্কেচ করেছে; তিনি দিব্য বলতে পারতেন, কোনটা ইংরেজের, কোনটা চীনার, আর কোনটা ভারতীয়ের। এবং যদিও মডেলের মেয়েটি ইংরেজ তবু সব চাইতে ভাল এঁকেছে ইণ্ডিয়ান। মনকে এরই স্মরণে সান্ত্বনা দিলুম, তবে বোধ হয় আমার জর্মন উচ্চারণ জর্মনদের চেয়েও ভাল!

অনেক ইতিউতি করে নারীকণ্ঠ বললে, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি বার বার ক্ষমা চাইছি, আমি কি পাঁচ মিনিটের জন্য আপনার দর্শন পেতে পারি? আমার একটু দরকার আছে। সেটা কিন্তু জরুরী নয়; আপনার যেদিন যখন সুবিধে হয়।'

তাড়াতাড়ি বললুম, 'পাঁচ মিনিট কেন—পাঁচ ঘণ্টা নিন। আমি এখানে ছুটিতে। দিন ক্ষণ আপনিই ঠিক করুন।'

'কাল হবে? আমার ডিউটি বিকেল পাঁচটা অবধি। আপনার হোটেলের পাশেই তো কাফে "হুফ্‌শ্লাগ্‌"। সেখানে সাড়ে পাঁচটায়? আমি আপনাকে ঠিক চিনে নেব। বন্ শহরে আপনিই হয়তো একমাত্র ইণ্ডিয়ান।'

পরদিন কাফের মুখেই একটি মহিলা এগিয়ে এসে বললেন, 'গুট্‌ন্‌টাখ্‌! হের সায়েড্‌!'

আমি বললুম, 'গুট্‌ন্‌টাখ্‌, ফ্রলাইন—'

এস্থলে প্রথম পরিচয়ে আপন নাম বলা হয়। ফ্রলাইন (কুমারী, মিস্‌) কি একটা অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, আমি ঠিক ধরতে পারলুম না। কিন্তু নিতান্ত জরুরী প্রয়োজন না হলে এস্থলে দু'বার প্রশ্ন করা—বিশেষ করে মহিলাকে—আদব-দুরস্ত নয়।

দেহের গঠনটি ভারী সুন্দর, আঁটসাঁট, দোহারা। প্রলম্বিত বাহু দুখানি এমনি সুডৌল যে, মনে হয় যেন দু গুচ্ছ রজনীগন্ধা। রাস্তার উজ্জ্বল আলোতে দেখছিলুম বলে লক্ষ্য করলুম কনুইয়ের কাছে মণি-খনির মত দুটি টোল। গোটা দেহটি যেন রসে রসে ভরা। শুধু দেহটি দেখলে যে কেউ বলবে, মধুভরা পূর্ণ যুবতী।

কিন্তু মুখটির দিকে তাকানো মাত্র যে-কোনো মানুষের মনের ভাব সম্পূর্ণ বদলে যাবে। ব্লাউজের গলার বোতাম থেকে আরম্ভ করে মাথার চুল পর্যন্ত—মনে হল এ যেন অন্য বয়সের ভিন্ন নারী। মুখের চামড়ায় এক কণা লাবণ্য এক কাঁচ্চা মসৃণতার তেল নেই। গলার চামড়া পর্যন্ত বেশ-কিছুটা ঝুলে পড়েছে। সিকি পরিমাণ চুলে পাক ধরেছে। আর চোখ দুটি—সেগুলোর যেন দর্শনশক্তিও হারিয়ে গিয়েছে—জ্যোতিহীন, প্রাণহীন। এর বয়েস কত হবে?—শুধু যদি মুখ থেকেই বিচার করতে হয়? আর সে কী বিষণ্ণ মুখ! বয়স বিচারের সময় সেই বিষণ্ণতাই তো হবে প্রধান সাক্ষী—জ্যোতিভ্রষ্ট চক্ষুতারকার চেয়েও কণ্ঠদেশের লোলচর্মের চেয়েও।

ইতিমধ্যে আমরা কাফেতে ঢুকে আসন নিয়েছি। মহিলাটি—না যুবতীটি, কি বলবো? (সেই যে কালিদাসের গল্পে বুড়ো স্বামীর ধড়ের সঙ্গে জোয়ান ভাইয়ের কাটা মুণ্ডু জুড়ে দিয়েছিল এক নারী)—ইতিমধ্যে দাস্তানা খুলে নিয়েছেন। মুখের সঙ্গে মিলিয়ে বেরলো হাত দুখানা—রসে ফাটো-ফাটো দেহের সঙ্গে মিলিয়ে নয়—নির্জীব, কোঁকড়ানো চামড়া; ইংরিজিতে বলে ক্রোজ ফীট, কাকের পা। অতি কষ্টে নিজেকে সামলেছিলুম।

বললেন, 'আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ করেছি।' অর্থাৎ তিনি বিল শোধ করবেন। অন্য সময় হলে এ বারতা আমার কর্ণকুহরে নন্দন-কাননের স্বর্ণোজ্জ্বল মধুসিঞ্চন করতো। কিন্তু এই বিষণ্ণ মুখের সামনে আমার গলা দিয়ে যে কিছুই নামবে না। বললুম, 'আমি যখন এখানে পড়তুম—'

বাধা দিয়ে শুধোলেন, 'আপনিও পড়েছেন নাকি?'

এই 'ও'টার অর্থ কি?

আমি বললুম, 'তখন তো কোনো অবিবাহিত রমণীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা আমাদের মধ্যে রেওয়াজ ছিল না।'

তাঁর কণ্ঠটি ছিল এমনিতেই ক্ষীণ—এখন শোনালো মুমূর্ষুপ্রায়। যেন মাফ চেয়ে বললেন, 'ব্যত্যয় সব সময়ই দুটো একটা থাকে। কিন্তু দয়া করে আপনি এসব গায়ে মাখবেন না। আমি আপনার অপ্রিয় কোনো কাজ করতে চাই নে।'

কাফেতে এ সময়ে জর্মনদের ইয়া ইয়া লাশ ভামিনীদের ভিড়। ওয়েট্রেস এক কোণে একটি খালি টেবিল দেখিয়ে দিল। বুঝলুম, মহিলাটি পূর্বাহ্নেই টেবিলটি রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। ব্যাগ খুলতে খুলতে বললেন, 'আপনি কি খেতে ভালবাসেন? চা নিশ্চয়ই। কিন্তু এদেশে যে চা বিক্রী হয় সে তো অখাদ্য। তবে আমার কাছে ভাল চা আছে। আমি লণ্ডন থেকে সেটা আনাই।' ব্যাগ থেকে বের করে একটি ছোট্ট পুলিন্দা তিনি ওয়েট্রেসের হাতে তুলে দিলেন। সে কিছু বললো না বলে বুঝলুম, এ ব্যবস্থায় সে অভ্যস্ত।

আমাদের অর্ডার না দেওয়া সত্ত্বেও ভাল ভাল কেক, স্যান্ড্‌উইজ্‌, টার্ট উপস্থিত হল। বুঝলুম, এগুলো পূর্বের থেকেই অর্ডার দেওয়া ছিল।

কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের দেশের খুব বেশী ছাত্র জর্মনিতে পড়তে আসে না—কি বলেন?'

আমি বললুম, 'অতি অল্পই। তাও বেশীর ভাগ শিখতে আসে সায়ান্স আর টেকনিকাল বিদ্যা।'

একটু হেসে বললেন, 'স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আপনি হিউম্যানিটিজের। আর বন্ তো তারই জন্য বিখ্যাত। তবে এখানে এসেছেন অল্প ভারতীয়ই। আপনারা যাঁরা এসেছিলেন, ভারতে তাঁদের কোনো সঙ্ঘ আছে কি, যার মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে আপনারা যুক্ত থাকতে পারেন?'

আমি বললুম, 'না। এমন কি আমি এঁদের মাত্র দু-একজনকে চিনি। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ—' বলে আমি চায়ে চুমুক দিলুম। তিনি বললেন, 'ডিব্রুগড় থেকে দ্বারকা, কুলু থেকে কন্যাকুমারী।' আমি তো অবাক! আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'আপনি অত ডীটেল জানলেন কোথা থেকে? এখানকার শিক্ষিত লোককে পর্যন্ত ইণ্ডার (ভারতীয়) আর ইণ্ডিয়ানার (রেড ইণ্ডিয়ান) এ দুয়ের পার্থক্য বুঝিয়ে বলতে হয়।'

'এবং তার পরও কেউ কেউ আপনাকে শুধোয়, আপনি ৎসেন্টাল আফ্রিকানার (সেণ্ট্রাল আফ্রিকান) না জ্যুড্ ইটালিয়েনার (সাউৎ ইটালিয়ান)?'

আমি আরো আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'আপনি অতশত জানলেন কি করে ?'

'পরে বলবো। কিন্তু আপনি ভারতে বন্-এর ছাত্রদের সম্বন্ধে কি যেন বলছিলেন ?'

'ভারতের বুদ্ধিজীবীর প্রধান অংশ থাকেন কলকাতায়। সেখানে থাকলেও খানিকটা যোগসূত্র থাকে। আমি থাকি ছোট্ট বরোদায়—'

অস্ফুট শব্দ শুনে আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালুম। দেখি, তাঁর পাংশু মুখে যে দু-ফোঁটা রক্ত ছিল তাও অন্তর্ধান করেছে। ভয় পেয়ে শুধালুম, 'কি হল আপনার ?'

ঢোঁক গিলে খানিকটা সামলে নিয়ে বললেন, 'ও কিছু না। আমি অনিদ্রায় ভুগে ভুগে দুর্বল হয়ে পড়েছি। এখানে বড্ড লোকের ভিড়। সব বন্ধ। আমি আমার অফিস-ঘরের জানলা শীত গ্রীষ্ম সব সময় খোলা রাখি।'

আমি বললুম, 'তা হলে খোলায় চলুন।' তারপর শুধালুম, 'আপনার সহকর্মী অন্য মেয়েরা কিছু বলে না ?'

প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারেন নি। পরে বললেন, 'ও। আমি এককালে টেলিফোন গার্ল'ই ছিলুম। এখন তারই বড় অফিসে কাজ করি। অ্যাডমিনিস্-ট্রেটিভ কাজ। কিন্তু আগেরটাই ছিল ভালো।'

বাইরে বেরিয়ে আসতেই আমি বললুম, 'আমার মনে হচ্ছে আপনি বেশী হাঁটাহাঁটি করতে পারবেন না। তার চেয়ে চলুন, ওই যে প্রাচীন যুগের একখানা ঘোড়ার গাড়ি এখনো অবশিষ্ট আছে, তাই চড়ে রাইনের পাড়ে গিয়ে বসি।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

আস্তে আস্তে শুধোলেন, 'গেলট্নার যে ঋগ্বেদের জর্মন অনুবাদ করেন সেইটের উপর নির্ভর করে যে একটি ইংরেজি অনুবাদ ভারতবর্ষ থেকে বেরোবার কথা ছিল, তার কি হল ?'

আমি এবারে সত্যই অবাক হলুম। গেলট্নারের অনুবাদ অনবদ্য। গত একশ বছরে ঋগ্বেদ সম্বন্ধে ইয়োরোপ তথা ভারতে যত গবেষণা হয়েছে গেলট্-নারের কাছে তার একটিও অজানা ছিল না, এবং অনুবাদ করার সময় যেখানে যেটির দরকার হয়েছে সেখানে সেইটে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ মহিলাটি যে অতিশয় সমীচীন ও সময়োপযোগী প্রস্তাবটির কথা বললেন সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতুম না। বিস্ময় প্রকাশ করে বললুম, 'কিন্তু আপনি এ সবের খবর পেলেন কোথায় ?'

তিনি চুপ করে রইলেন। গাড়ি মন্থর গতিতে বেটোফেনের প্রতিমূর্তির

পাশ দিয়ে, ম্যুন্‌স্‌টার গির্জে পেরিয়ে, য়ুনিভার্সিটি হয়ে রাইনের পাশে এসে দাঁড়ালো।

গাড়ি থেকে নেমে তাকিয়ে দেখি, মহিলার মুখ তখনো ফ্যাকাশে। প্রস্তাব করলুম, 'ওই কাফেটার খোলা বারান্দায় গিয়ে বসি, আর আপনি কিছু একটা কড়া খান।' ওয়েটারকে বললুম কন্যাক্ নিয়ে আসতে।

দুই ঢোঁক কন্যাক্ খেয়ে যেন বল পেলেন। বললেন, 'আমি এখনো অবসরমত কিছু কিছু ইণ্ডলজির চর্চা করি। বছর বারো পূর্বে যখন আরম্ভ করি তখন পূর্ণোদ্যমেই করেছিলুম।'

তারপর আবার অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলেন। রাইনের জলের উপর তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দু-একখানা মোটর বোট আসা-যাওয়া করছে মাত্র। বাতাস নিস্তব্ধ। এমনিতেই রাইনের সন্ধ্যা আমাকে বিষণ্ন করে তোলে, আজ যেন রাইনের জলে চোখের জল ছলছল করছে।

মহিলাটি বললেন, 'কাল থেকে ভাবছি, কি করে কথাটি পাড়ি।'

যে কোনো কারণেই হোক মহিলাটি যে বেদনাতুর হয়ে আছেন সে-কথা আমি ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি। বললুম, 'আপনি দয়া করে কোনো সঙ্কোচ করবেন না। আমাদ্বারা যদি কোন-কিছু করা সম্ভব হয়, কিংবা সুদ্ধমাত্র আমাকে কিছু বলতে পেরে আপনার মন হালকা হয়—'

মানুষকে ক্রমাগত সান্ত্বনার বাক্য দিয়ে প্রত্যয় দিতে থাকলেই যে সে মনস্থির করতে পারে তা নয়; বরঞ্চ কথা বন্ধ করে দিলে সে আপন মনে ভাববার এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সুযোগ পায়। আমি বন্‌-বয়েল শহরের মাঝখানে রাইনের উপরের পাথরের মোটা মোটা থামের তুলে-ধরা বিস্তীর্ণ স্পানওলা সুন্দর সেতুটির দিকে তাকিয়ে রইলুম। লোহার পুল কেমন যেন নদীর সঙ্গে খাপ খায় না—পাথর যেন জলের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়, উভয়েরই রঙ এক।

দুনিয়াতে হেন তালা আবিষ্কৃত হয় নি যেটা কলেকৌশলে, কখনো বা পশুবল প্রয়োগ করে, কখনো বা মোলায়েম আদরসোহাগ করে খোলা যায় না; ওদিকে আবার গেস্তাপো, ওগপু এ সব-কটা পদ্ধতি এবং আরো মেলা নয়া নয়া কৌশল খাটিয়েও বহু মানুষের মনের তালা খুলতে পারে নি। এবং হঠাৎ অকারণে কেন যে সেটা খুলে যায় তার হদিস কন্‌ফেশনের পাদ্রীসায়েব থেকে আরম্ভ করে আমাদের যৌবনকালের টেগার্ট পাষণ্ডও সন্ধান পায় নি।

মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বলুন তো, দময়ন্তী নিদ্রাভঙ্গের পর দেখলেন নলরাজ নেই; তারপর তাঁর ইহজীবনে যদি নলের সঙ্গে আদৌ সাক্ষাৎ না হত

তবে তিনি নল সম্বন্ধে বা আপন অদৃষ্ট সম্বন্ধে কি ভাবতেন ?

নলোপাখ্যানের উল্লেখে আমি আশ্চর্য হলুম না! যে রমণী গেলট্নারের বেদানুবাদের সঙ্গে সুপরিচিতা, নলরাজ তো তাঁর নিত্যালাপী আত্মীয়!

আমি একটু ভেবে বললুম, 'রসরাজও তো বৃন্দাবনে শ্রীমতীর কাছে ফিরে যান নি। তবু তো তিনি তাঁর প্রতি প্রত্যয় ত্যাগ করেন নি। মহাত্মা উদ্ধব যখন বৃন্দাবন দর্শন করে মথুরা ফিরে এলেন তখন রসরাজ সব শুনে বলেছিলেন, "বিরহাগ্নি যদি তাঁর এতই প্রবল হয় তবে তিনি জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যান নি কেন ?" কী বেদরদী প্রশ্ন! কিন্তু শ্রীরাধা সেটা জানতেন বলে উদ্ধবকে বলতে বলে দিয়েছিলেন, তার অবিরাম অশ্রুধারা সেই অগ্নি বার বার নির্বাপিত করছে —"তনু জরি জাত জো ন অসুঁয়া ঢরত্ উধো"—যদুপতি শেষ প্রশ্ন শুধান, "আমার বিরহে তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায় নি কেন ?" এর উত্তরও উদ্ধব শিখে নিয়েছিলেন, "আপনি একদিন না একদিন বৃন্দাবনে ফিরবেন এই প্রত্যয়ই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে।"'

দময়ন্তী নিশ্চয়ই প্রত্যয় ছাড়েন নি।

মহিলা বললেন, 'তুলনাটা কি ঠিক হলো ? শ্রীরাধা তো মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ পেতেন, তিনি কংস বধ করেছেন, তিনি কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে শান্তি স্থাপনার্থ দৌত্য করেছেন, জনসমাজের বৃহত্তর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন—এই ভেবে মনে সান্ত্বনা পেতেন—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'এবং রুক্মিণীকে—সে কুমারী আবার শিশুপালের বাগ্‌দত্তা বধূ—বিয়ে করেছেন, তার পর সত্যভামাকে, সর্বশেষে ভাল্লুকী—'

আমি নিজের থেকে থেমে গেলে পর মহিলাটি বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণের উদাহরণ আপনিই তুলেছিলেন ; আমি তুলি নি।'

আমি বললুম, 'আপনি দময়ন্তীর কথা তুলেছিলেন—ভগবান করুন, আপনার নল যেন—'

তিনি মাথা নাড়তে আমি চুপ করে গেলুম।

বললেন, 'আপনি গোডেসবের্গ চেনেন ?'

আমি বললুম, 'বা রে, সেখানে তো আমি এক বছর বাস করেছি।'

'প্রফেসর কির্ফেল সেখানে বাস করতেন ; আমরা ছিলুম তাঁর প্রতিবেশী। আমি প্রতিদিন বন্ শহরে আসতুম চাকরি করতে। হঠাৎ একদিন দেখি তার পরের স্টপেজ হোথ্-ক্রয়েৎসে একজন বিদেশী উঠলেন। মুখখানা বিষণ্ণ। সেদিন আর কিছু লক্ষ্য করি নি। কাইজার প্লাৎসের স্টপেজে উনিও নামলেন। আমি

বইয়ের দোকান য়োর্‌শাইটে কাজ করতুম। আপন অজান্তেই লক্ষ্য করলুম বিদেশী য়ুনিভার্সিটিতে ঢুকলেন।

তিন-চার মাস প্রায় রোজই একই ট্রামে যেতুম, ভদ্রলোকের প্রতি আমার কোনো কৌতূহল ছিল না কিন্তু লক্ষ্য করলুম, বিদেশীর বিষণ্ণ ভাব আর কাটলো না।

তারপর একদিন তিনি আমাদের দোকানে এসে ঢুকলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে তিনি একেবারে থতমত খেয়ে গেলেন। ভাবলুম এ আবার কোন্‌ দেশের লোক? এত লাজুক কেন?

ভাঙা ভাঙা জর্মন ভাষায় এক জর্মন ইণ্ডলজিস্টের বইয়ের ইংরিজি অনুবাদ চাইলেন। আমি একটু আশ্চর্য হলুম: জর্মনিতে বসে জর্মনের লেখা বই পড়লেই হয়। বললুম, "এটা লণ্ডন থেকে আনাতে হবে।" তারপর কিন্তু-কিন্তু করে বললুম, "মূল জর্মনটা পড়লেই তো ভাল হয়।"

তিনি বললেন, "আমার আছে, কিন্তু বুঝতে বড় অসুবিধা হয়।" সঙ্গে সঙ্গে বইখানা পোর্টফোলিয়ো থেকে বের করে কাউণ্টারের উপর রাখলেন।

আমি তখনো ইণ্ডলজির কিছুই জানতুম না—নামটাম টুকে নিয়ে তাঁকে দু-চারখানা ভাল অভিধান, সরল জর্মন বই, ব্যাকরণ দেখালুম। আমি ইংরিজি জানতুম বলে তাঁর ঠিক কোন্‌ কোন্‌টা কাজে লাগবে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মত সৎপরামর্শ দিলুম। আমি যেটা দেখাই সেটাই তিনি কিনে ফেলেন। শেষটায় আমিই হেসে বললুম, "এগুলো শেষ করুন। এর পরের ধাপের বই আমি বেছে রাখবো।" টাকা দিয়ে বইগুলো নিয়ে যখন চলে গেছেন তখন দেখি তাঁর ইণ্ডলজির বইখানা কাউণ্টারে ফেলে গেছেন। তা যান, কাল ট্রামে দিয়ে দিলেই হবে।

ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে এই আমার প্রথম পাঠ। এবং এখনো সে বইখানা মাঝে মাঝে পড়ি। ভিণ্টারনিৎসের ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস। এ বই দিয়ে আরম্ভ না করলে হয়তো ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আমার কৌতূহল অঙ্কুরেই মারা যেত।

ভিণ্টারনিৎস লেখেন অতি সরল জর্মন; তাই আশ্চর্য হলুম যে বইয়ের মালিক এতদিনেও এতখানি জর্মন শিখে উঠতে পারেন নি কেন?

আমি চেপে গেলুম যে, ঠিক এই বইখানাই ভিণ্টারনিৎস শান্তিনিকেতনে আমাদের পড়িয়েছিলেন।

আর পাঁচজন জর্মনের তুলনায় বিদেশীদের সম্বন্ধে আমার কৌতূহল কম। বইয়ের দোকানে কাজ করলে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় জাত-বেজাতের বই পড়া হয়ে যায়।

আমার কৌতূহল নিবৃত্তি হয়ে গিয়েছিল—অনেকখানি—ওই করে।

কিন্তু এই লোকটির প্রতি কেমন যেন আমার একটু দয়া হল। তবু এটা ঠিক, আমি নিশ্চয়ই গায়ে পড়ে তাঁকে সাহায্য করতে যেতুম না। তবে এ-কথাও ঠিক, ভিণ্টারনিৎসের বেদ অনুচ্ছেদে উষস্ আবাহন এবং জুয়াড়ির মনস্তাপ দুটোই আমার কল্পনাকে এক অপূর্ব উত্তেজনায় আলোড়িত করেছিল। উষামন্ত্র লিরিক, রহস্যময়, ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, আর অবিশ্বাস্য বলে মনে হল যে, ওই একই সময়ে অতিশয় নিদারুণ বাস্তব জুয়োখেলা ও জুয়াড়িজীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা একই সঞ্চয়নে স্থান পেয়েছে। আমার বাবা ছিলেন গ্রীক ভাষার অধ্যাপক। ইস্কুলে আর পাঁচটা ছেলেমেয়ে যা গ্রীক শেখে সেটা ম্যাট্রিক পাশের পরই ভুলে যায়। আমার পিতা সেটা হতে দেন নি। এখন আমার ইচ্ছে হল সংস্কৃত শেখার। তাই তাঁর সঙ্গে ভাল করে আলাপ করলুম। আমি তাঁর জন্য ভিণ্টারনিৎসের জর্মন থেকে ইংরিজি অনুবাদ করে দিতুম, আর তিনি আমাকে সংস্কৃত পড়াতেন।'

আমার মনে সর্বক্ষণ নানা প্রশ্নের উদয় হচ্ছিল, কিন্তু মহিলাকে বাধা দিলুম না।

ততক্ষণে কাফেতে উল্লাস, হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে। জর্মন জনগণের বহুদিনের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। ঘড়ি ঘড়ি খবর আসছে, নাৎসি বিজয়-সেনানী কি ভাবে অস্ট্রিয়ার শহরের পর শহর দখল করে যাচ্ছে, তারা কি ভাবে সর্বত্র উদ্বাহু অভিনন্দিত হচ্ছে।

আমি একটু মুচকি হেসে বললুম, 'ভালুকও মানুষকে আলিঙ্গন করে শুনেছি, কিন্তু সে আলিঙ্গন—যাক্ গে।'

মহিলাটি একটু চমকে উঠলেন। বললেন, 'এসব মন্তব্য আপনি সাবধানে করবেন। কি করে জানলেন, আমি নাৎসি নই ?'

আমি হেসে বললুম, 'জলবত্তরলম্—আপনি তো সংস্কৃত জানেন। তার মানে যে-জন বেদ পড়েছে, সে-ই জানে বেদের আর্যধর্মের সঙ্গে নাৎসিদের এই "আর্যামি"র বড়ফাট্টাইয়ের সূচ্যগ্র পরিমাণ সম্বন্ধ নেই। কিন্তু আপনি চিত্তবিক্ষেপ হতে দেবেন না। তার পরের কথা বলুন।'

একটু চিন্তা করে বললেন, 'প্রথমে সাহচর্য, তারপর বন্ধুত্ব, সর্বশেষে প্রণয় হল আমাদের দুজনাতে।'

এবারে অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'তিন বছরের প্রণয়—তারপর দশ বছর ধরে আমি তাঁর কোনো খবর পাই নি। এই দশ বছর আমার একা একা

কেটেছে। এই দীর্ঘ তেরো বছরের কথা আপনাকে বলতে গেলে ক'মাস ক' বছর লাগবার কথা তার সামান্যতম অনুমান আমার নেই।

এই শেষের দশ বৎসর কি করে কেটেছে, এখন কি করে কাটছে সেটা বোঝাবার চেষ্টাও আমি করবো না। আর সেটা শোনাবার জন্যও আমি আপনার দর্শন কামনা করি নি। এই যে বন্ বিশ্ববিদ্যালয় আমরা পেরিয়ে এলুম, এখানে পড়বার সময় ঠিক একশ বছর আগে, আমাদের সবচেয়ে সেরা লিরিক কবি হাইনে একটি চার লাইনের কবিতা লেখেন:

"প্রথমে আশাহত হয়েছিনু
ভেবেছিনু সবে না বেদনা;
তবু তো কোনো মতে সয়েছিনু
কি ক'রে যে সে-কথা শুধিয়ো না।"

তীব্র বেদনার তীক্ষ্ণ প্রকাশ দেবার চেষ্টা করেছেন হাইনে বার বার, কিন্তু হার মেনে উপরের চতুষ্পদীটি রচেন। একশ বছর ধরে দেশ-বিদেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী সেগুলো পড়ছে—'

এবারে আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমাদের পোয়েট টেগোর তাঁর প্রথম যৌবনে এক জর্মন মহিলার কাছ থেকে অল্প জর্মন শেখার পরই তাঁর গুটিদশেক কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করেন। আপনি যেটি বললেন সেই চতুষ্পদীটিও তাতে আছে।'

'প্রথম যৌবনে তিনি কি শোক পেয়েছিলেন?'

'তাঁর প্রাণাধিকা ভ্রাতৃবধূ আত্মহত্যা করেন। কিন্তু সে-কথা আরেকদিন হবে। আমি নিজে কাপুরুষতম এসকেপিস্ট; তাই দুঃখের কথা এড়িয়ে চলি। তার চেয়ে আপনাদের সেই তিন বছরের আনন্দের কথা বলুন।'

'প্রথম বছর কেটেছে স্বপ্নের মত। স্বপ্ন যেমন চেনা-অচেনায় মিশে যায়, হঠাৎ চেনা জিনিস, চেনা মানুষ মনে হয় অচেনা, আবার অচেনা জন চেনা, এ যেন তাই। তাঁকে যখন মনে হয়েছে এঁর সব কিছু আমার চেনা হয়ে গিয়েছে তখন হঠাৎ মনে হয়েছে যেন ইনি আমার সম্পূর্ণ অজানা জন। আবার কেমন যেন এক প্রহেলিকার সামনে অন্ধকারে ব্যাকুল হয়ে হাতড়াচ্ছি—মধ্যরাত্রে হঠাৎ তাঁর ঘুমন্ত হাত পড়ল আমার গায়ের উপর আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে গেল। আমার চৈতন্যে তখন বিশ্বব্যাপী মাত্র একটি অনুভূতি— এই লোকটির মাঝেই আমার অস্তিত্ব, আমার অন্য কোনো সত্তা নেই। গোডেসবের্গের পিছনে নির্জনে গভীর পাইন বনে সকাল থেকে পরের দিন ভোর

অবধি কাটিয়েছি একটানা, রাইনের ওপারে বরফ ভেঙে ভেঙে উঠেছি মায়্‌গারেটেন হোহ অবধি, ফ্যান্‌সি বলে শ্যাম্পেনের পর শ্যাম্পেন খেয়ে আমি অবশ হয়ে শুয়ে পড়েছি ডান্‌স-হলের সামনের ঘাসের উপর—তিনি পৌঁছে দিয়েছেন বাড়িতে।'

কেন জানি নে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলুম, 'উনি কখনো বে-এক্তেয়ার হতেন না ?'

বললেন, 'আশ্চর্য, আপনি যে এ-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন ! না, কক্‌খনো না। এখানকার পাঁড়দের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে তাঁকে খেতে দেখেছি বহুবার, চোখের পাতাটি পর্যন্ত নড়তো না। অথচ তিনি একাধিক বার আমাকে বলেছেন, তাঁর জানা মতে তাঁর সাত পুরুষের কেউ কখনো মদ খায় নি।

কিন্তু প্রথম বছরের চেয়েও—অন্ততঃ আমার পক্ষে—মধুরতর আর গৌরবময় শেষের দুই বছর।

এক বৎসর ক্লাস আর সেমিনার করার পর অধ্যাপকের আদেশে তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর ডক্টরেট থীসিসের প্রথম খসড়া—অবশ্য ইংরিজিতে। মোটামুটি তিনি কি লিখবেন সে সম্বন্ধে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন।'

থেমে গিয়ে তিনি অত্যন্ত করুণ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কাছে আমার একটা ভিক্ষা আছে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ছি ছি। আপনি আমাকে এখনো চিনলেন না !'

'চিনেছি বলেই চাইছি। এখন যা বলব, আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, কাউকে বলবেন না।'

আমি তাঁর হাতে—সেই শুষ্ক, জরাজীর্ণ হাতে চাপ দিলুম।

'প্রথম পরিচ্ছেদের কাঁচা খসড়া পড়ে আমি অবাক। একেবারে কিছুই হয় নি বললে অত্যুক্তি হয়, কিন্তু এতে যে কোনো বাঁধই নেই, বক্তব্য কোন্ দিকে যাচ্ছে তার কোনো নির্দেশ নেই—আছে গাদা গাদা ফ্যাক্ট্‌স্, এবং তার মধ্যেও কোনো সিস্‌টেম্ নেই।

কারণ ইতিমধ্যে আমি যে খুব বেশী সংস্কৃত শিখেছি তা নয়, তবে আপনি তো জানেন, জর্মন, ফরাসী এবং ইংরেজী, মাত্র এই তিনটি ভাষাতেই ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে এত বই লেখা হয়ে গিয়েছে যে সেগুলো মন দিয়ে বার বার পড়লে, নোট টুকে মুখস্থ করলে কার সাধ্য বলে আপনি সংস্কৃত জানেন না ! যেদিন তিনি আমায় প্রথম তাঁর থীসিসের সাবজেক্ট—'গুপ্তযুগের কালচারাল লাইফ'—বলেন সেদিন থেকেই আমি ঐ বিষয়ের উপর যা পাওয়া যায় তাই পড়তে আরম্ভ

করেছি, নোট টুকেছি, মুখস্থ না করেও যতখানি সম্ভব মনে রাখবার চেষ্টা করেছি। আর সংস্কৃত তো সঙ্গে সঙ্গে চলছেই। আপনি তো আমাদের সিস্টেম জানেন। তাই তিন মাস যেতে না যেতেই আমি র‍্যাপিড্ রীডিং সিস্টেমে খানিকটা বুঝে কিছুটা না বুঝে কালিদাসের সব লেখা—এমন কি কালিদাসের নামে প্রচলিত অন্য জিনিসও পড়ে ফেলেছি। তবে আমার ব্যাকরণ জ্ঞান এখনো কাঁচা, যদিও গ্রীকের সাহায্যে শব্দতত্ত্বে আমার কিছুটা দখল আছে।

ওঁর ইংরিজিটা যে আমি জর্মনে অনুবাদ করবো সেটা তো ধরেই নেওয়া হয়েছিল। তারই অছিলা নিয়ে আমি সমস্তটা ঢেলে সেজে লিখলুম। পাছে তাঁর আত্মসম্মানে লাগে তাই বললুম, "তুমি এ-কাঠামোর উপর আরো ফ্যাক্টের কাদামাটি চাপাও, রঙ বোলাও।"

ইতিমধ্যে আমার বইয়ের দোকান আমাকে পাঠালো লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজে—আমাদের বইয়ের বাজার প্রসার করতে। তিনিও তাঁর প্রফেসরের কাছ থেকে ছুটি নিলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে মাল-মশলার সন্ধানে যাবার জন্য।

সে সুযোগের অবহেলা আমি না করে আমাদের প্রকাশিত আর বিরল আউট অব প্রিন্ট কিছু কিছু বই নিয়ে দেখা করতে গেলুম লণ্ডন স্কুল অব্ ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজের ইণ্ডলজি-অধ্যাপকদের সঙ্গে। তাঁরা আমায় ভারি খাতির করলেন, কেউ কেউ চায়ে ডিনারে নিমন্ত্রণও করলেন। আমি ঘুরে ফিরে শুধু গুপ্ত যুগের কালচারাল লাইফের দিকে কথার মোড় ফেরাই। ওঁরা অকৃপণ হৃদয়ে আপন আপন গবেষণার ফল বলে যেতে লাগলেন। একদিন এক অধ্যাপকের বাড়িতে নিমন্ত্রণে ছিলেন আরো দুজন ইণ্ডলজির অধ্যাপক। আমি গুপ্ত যুগ টুইয়ে দিতেই লেগে গেল তিন পণ্ডিতে লড়াই। ঘণ্টাখানেকের ভিতরই পরিষ্কার হয়ে গেল তিন জনার তিন থীসিস। একজন বললেন : গুপ্ত কেন, তার পরবর্তী যুগেরও সর্ব নাট্যের কাঠামো গ্রীক নাট্য থেকে নেওয়া। দ্বিতীয় জনের বক্তব্য : গুপ্ত যুগের চোদ্দ আনা কৃষ্টির মূলে দ্রাবিড়। বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারতের চোরাবালির ভিতর দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে গুপ্ত যুগে এসে নির্মল তৃষাহরা হ্রদে পরিণত হয়েছে। আর তৃতীয় জনের মতে গুপ্ত যুগের বেশীর ভাগ পরবর্তী যুগের—গুপ্ত যুগের নামে পাচার হচ্ছে। যে রকম ওমর খৈয়ামের দু'শ বছর পরে রচনা বিস্তর চতুষ্পদী তাঁর সঙ্কলনে ঢুকে গেছে।

ভোরের প্রথম বাস্ ধরে আমরা যে যার বাসায় ফিরেছিলুম।

তার পূর্বে আমি সবিনয়ে শুধিয়েছিলুম, আমি তাঁদের বক্তব্যের কিছু কিছু

ব্যবহার করতে পারি কি না। তিনজন একবাক্যে বলেছিলেন, "আলবৎ, নিশ্চয়, অতি অবশ্যই। এসব তো কমন নলেজ। তাই দয়া করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো না। আমাদের বদনাম হবে যে আমরা কমন নলেজ গবেষণা বলে পাচার করি।" একেই বলে প্রকৃত বিনয়!

বাসে বাসেই আমি যতখানি স্মরণে আনতে পারি শর্টহ্যাণ্ড টুকতে আরম্ভ করি। বাড়ি ফিরে বিছানা না নিয়ে যখন কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি তখন বন্ধু বিছানায় বসে চোখ কচলাতে কচলাতে বেড্-টীর জন্য ঘণ্টা বাজালেন।

অক্স্ফোর্ড কেম্ব্রিজেও অধ্যাপকদের সাহায্য পেলুম।

তারপর বনে ফিরে এসে সেই সব বস্তু গুছিয়ে, খসড়া বানিয়ে ফেয়ার কপি টাইপ করে, তাঁর প্রোফেসরের মেরামতির পর সে অনুযায়ী আবার টাইপ করে পরিপূর্ণ থীসিস তৈরী হল।'

আমি বললুম, 'অর্থাৎ—'

তিনি ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'না, না, না। আপনি ভুল ইনফারেন্স্ করছেন। সংস্কৃত ভাষাটি ছিল তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত। হেন ব্যাকরণ নেই যার প্রত্যেকটি সূত্র, নিপাতন, আর্ষপ্রয়োগ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল না। কঠিন কঠিন টেক্স্ট্ দুবার না পড়েই তিনি অর্থ বের করে দিতে পারতেন। বললে বিশ্বাস করবেন না, তিনি তাঁর অধ্যাপককে এই দুরূহ ব্যাপারে সাহায্য করতেন। তাঁর থীসিসে যে অসংখ্য বস্তু মূল সংস্কৃত থেকে নেওয়া হয়েছে তার অনুবাদে তো কোনো ভুল পাবেনই না, আর সেগুলোই করেছে তাঁর বইখানাকে রিচ ইন্ টেকস্চার—সমৃদ্ধশালী। তাঁর কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি আপনার প্রত্যেকটি কথা মেনে নিচ্ছি।'

রমণীটি বড়ই সরলা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাঁচালেন। এসব কথা আমি এ জীবনে কাউকে বলি নি। এবং আরেকটা কথা, ওঁকে তো ভাইভাও দিতে হয়েছিল।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই।' ভাইভাতে কোন্ ক্লাস, আর রিটনে (অর্থাৎ) থীসিসে কোন্ ক্লাস পেয়েছিলেন সেটা আর শুধালুম না। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যেত।

হঠাৎ মহিলাটি চমকে উঠে বললেন, 'ছি ছি! অনেক রাত হয়ে গিয়েছে; ওদিকে আপনার ডিনারের কথা আমি একবারও তুলি নি। কোথায় খাবেন বলুন?'

আমি কিন্তু-কিন্তু করছি দেখে বললেন, 'আমার ফ্ল্যাটে যাবেন? এখানেই,

বেশী দূরে না। গোডেসবের্গের সে-বাড়িতে আমি আর যাই না।'

আমি ইতিমধ্যে একাধিক বার লক্ষ্য করেছি যে মহিলাটি এখনো তাঁর ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁকে বাড়িতে শুইয়ে দেওয়াই ভালো।

মোড় নিতেই দেখি সেই প্রাচীন দিনের শেষ ঘোড়ার গাড়িখানা যেন আমাদের জন্যই দাঁড়িয়ে। মহিলাটি যে-আমলের কথা বলছিলেন তখন এরও ছিল ভরা যৌবন। আমি বললুম, 'কি হে যাবে নাকি?'

টপ্ হ্যাট তুলে বাও করে বললে, 'নিশ্চয়ই, স্যর।' ঘোড়াকে বললে, 'চল্ বার্‌বা রস্‌সা—গোডেসবের্গ।'

আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'না হে না—'

বললে, 'সরি, স্যর! এই বছর পাঁচেক পূর্বেও তো আপনাকে ফ্যান্‌সি ডান্‌স্ থেকে ভোরবেলা হোথায় নিয়ে গিয়েছিলুম! হা হ্‌হা, হা হ্‌হা, আপনি তখন ভারী জলি ছিলেন, স্যর, নামবার সময় ঝপ করে আমার হ্যাটটি কেড়ে নিয়ে হাওয়া। হাহ্‌হা—পরে আমার ওল্ড উম্যান বলে কি না আমি হ্যাট বন্ধক দিয়ে বিয়ার খেয়েছি। হাহা হাহা! চল্, বার্‌বা রস্‌সা—'

মহিলাটি হেসে উঠলেন। তাঁর চেনা দিনের ভোলা দিনের দমকা বাতাস যেন হঠাৎ গলিটাকে ভরে দিয়ে সব শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল রাইন বাগে। শহরের গলির ভিতর নির্বাসিতা সুসান্ দিবাস্বপ্নে যে রকম তার গাঁয়ের নদীটিকে শহরের গলি দিয়ে বয়ে যেতে দেখেছিল।*

তখনও আমার বয়েস ছিল কম, জানতুম না, আমার কপালে ভাগ্যবিধাতা লিখে রেখেছেন এমনই দুর্দৈব যে তখন আমার অন্ধ কারাগারে না বইবে চেনা দিনের ভোলা দিনের বাতাস, না বইবে সুসানের গ্রামের নদী—স্মৃতির আবর্জনা উড়িয়ে নিতে ভাসিয়ে দিতে।

গাড়ি-ভাড়াটা দেবার পর্যন্ত মোকা পেলুম না।

গেট খুলে বাড়িতে ঢোকার সময় শুনি, কোচম্যান বলছে, 'চ বার্‌বা রস্‌সা, —দেখলি তো, তখনি তো তোকে বলি নি অন্য সোয়ারি নিস্ নি। আজ আর না। চ, বাড়ি যাই।' আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললে 'রেতে বেরাতে যখন খুশী ঐ সামনের গলিতে ঢুকে পয়লা বাড়ির সামনে বলবেন, "ডার্লিং বার্‌বা রস্‌সা!" সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পাবেন তৈরী। সম্রাট বার্‌বা রস্‌সার মত আপনার

---

* "সরু গলির মোড়ে যখন দিনের আলো ঝরে
ময়না দাঁড়ে গাহে এমন গাইছে বছর ধরে।"

—ওয়ার্ডসওয়ার্থ, অনুবাদক সত্যেন দত্ত।

বার্‌বা রস্‌সাও দেখবেন ক্রুসেড লড়তে হোলি ল্যাণ্ডে যেতে তৈরী।'

জর্মন কেন, প্রায় সব জাতের লোকই কোনো বিশেষ দেশ ভ্রমণ করে এলে বা সে দেশ নিয়ে চর্চা করলে আপন বাড়ি ভর্তি করে ফেলে সে দেশের ভালোমন্দ মাঝারি রাবিশ-জাঙ্ক-বিল্‌জ-কীচ্‌শ্‌ দিয়ে। এঁর বাড়িতে পরিপূর্ণ ব্যত্যয় না হলেও একথা কেউ বলতে পারবে না যে ইনি সারাজীবন শুধু ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াই করেছেন। মাত্র একখানি ছবি—অজন্তার। রাহুল-জননী পুত্রকে নিয়ে দাঁড়িয়েছেন তথাগতের (তিনি ছবিতে নেই) সামনে। আর লেখা-পড়ার টেবিলের উপর সাংখ্যকার মহর্ষি কপিলের একটি মূর্তি। ইনি এটি যোগাড় করলেন কোথা থেকে? ওটা মূলে মূর্তি কি না জানি নে—হয়তো বা রিলীফ। আমি দেখেছি ছবিতে—বহু বৎসর হল।

কিন্তু অত বড় বড় ঘরওলা ফ্ল্যাট তিনি পোষেন কি করে?

আমার অনুমান ভুল নয়। ফ্ল্যাটে ঢুকে আমাকে আসন নিতে অনুরোধ করে তিনি সোফায় শুয়ে পড়লেন। একটু মাফ-চাওয়ার সুরে বললেন, 'আপনাদের দার্শনিক সর্বপল্লী মহাশয় নাকি লেখাপড়া পর্যন্ত খাটে শুয়ে শুয়ে করেন।'

ফোটোগ্রাফে মহারানী ভিক্টোরিয়ার বৃদ্ধ বয়সের যে ছবি দেখি হুবহু ঠিক সেই পোশাক পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যখণ্ড যেন ঘরে এসে ঢুকলেন। মহিলা আলাপ করিয়ে-দিয়ে বললেন, 'আমার আইমা। ঠাকুরমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসেন। তাঁর ছেলে-নাতিরা ভালো ভালো ব্যবসা করেন। আইমা কিন্তু আমার সঙ্গেই থাকতে ভালোবাসেন।'

আমি বার বার বললুম, 'আমি নিরামিষাশী নই, আমার আহারাদির জন্য তুলকালাম করে রাইনের জলে আগুন লাগাতে হবে না, আমি সব খাই, টিনের খাদ্যেও অরুচি নেই।'

মহিলা বললেন, 'জানেন কি, হিটলার কড়া নিরামিষাশী?'

আমি বললুম, 'তা হলে নিরামিষ ভোজনের বিপক্ষে আরেকটা কড়া যুক্তি পেলুম! আর আপনি?'

ক্লান্তির সুরে বললেন, 'আইমা যা দেয়, তাই খাই।'

আমি বললুম, 'আপনি তাহলে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী!'

'অন্তত হিটলারের মত জৈন গৃহীও নই।'

ইনি সব জানেন।

আমাকে চেয়ারটা কাছে টেনে আনবার অনুরোধ করে বললেন, 'আচ্ছা,

'আপনি নিওরসিস্, সাইকসিস্, মনমেনিয়া, ইদে ফিক্স—এসব কথাগুলোর অর্থ জানেন ?'

আমি বললুম, 'যাঁরা এসব নিয়ে কারবার করেন, তাঁরাই কি জানেন ? এই যে আমরা নিত্য নিত্য ধর্ম, নীতি, মরালিটি, রিয়ালিজম, আইডিয়ালিজম শব্দ ব্যবহার করি, এগুলোর ঠিক ঠিক অর্থ জানি ? তবে আপনি যেগুলো বললেন, তার ভিতর একটা জিনিস সব কটারই আছে : কোনো একটা চিন্তা সর্ব চৈতন্যকে এমনই গ্রাস করে ফেলে যে মানুষ তার থেকে অহোরাত্র চেষ্টা করেও নিষ্কৃতি পায় না।'

'দুষ্মন্ত যে রকম বলেছিলেন, তিনি শকুন্তলার চিন্তা মন থেকে কিছুতেই সরাতে পারছেন না, অপমানিত জন যে রকম আপ্রাণ চেষ্টা করেও অপমানের স্মৃতি মন থেকে তাড়াতে পারে না—বার বার সেটা ফিরে আসে।' তারপর বললেন, 'কিন্তু আশ্চর্য, কালিদাস অপমানের সঙ্গে বিরহবেদনার তুলনা দিলেন কেন ? শকুন্তলা তো দুষ্মন্তকে কোনো পীড়া দেন নি—অপমান দূরে থাক !'

আমি বললুম, 'শত্রু কাছে এসে দহন করে ; মিত্র দূরে গিয়ে দহন করে। দুজনেই দুঃখ দেয়—শত্রু মিত্রে কি প্রভেদ ?

শত্রুর্দহতি সংযোগে বিয়োগে মিত্রমপ্যহো।
উভয়োর্দুঃখ দায়িত্ব কো ভেদঃ শত্রুমিত্রয়োঃ ?

দুশ্‌মন দুষ্মন্তকে অপমানিত করলে তাঁর যে বেদনা-বোধ হত, শকুন্তলার বিরহও তাঁকে সেই পীড়াই দিচ্ছিল। তাই বোধ হয় কালিদাস উভয়কে পাশাপাশি বসিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও কিছুদিন পূর্বে বলেছেন, "তাঁর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন কাছাকাছি এসে গেছে। একই মন্ত্রে দুজনকে আহ্বান জানাবেন"।'

ঘরের আলো যদিও সূক্ষ্ম মলমলের ভিতর দিয়ে রক্তাম্বীর গোলাপী আভার মত মোলায়েম, তবু শ্রীমতী দু'হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছিলেন।

এবারে উঠে বসে আমাকে বললেন, 'আপনাকে সর্বক্ষণ আমার আপন কথা বলে উৎপীড়িত করার ইচ্ছা আমার নেই—বিশেষ করে বাড়িতে টেনে এনে।

আর এখন বার বার মনে হচ্ছে কী লাভ ? নিউরটিক ইত্যাদি যে শব্দগুলো বললুম, তার ক'টা আমার বেলা প্রযোজ্য আমি জানি নে। কিন্তু এ-কথা দৃঢ়নিশ্চয় জানি, আমি নর্মাল নই। কখনো মনে হয়, আমার এই অনুভূতিটা সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, আবার হঠাৎ মাঝরাতে জেগে উঠে দেখি, সেটা সম্পূর্ণ মতিভ্রম। একটা ইদে ফিক্স্—ফিক্সট্ আইডিয়া থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাই নে, এবং নিজের কোনো সিদ্ধান্তকে আর অবিচল চিত্তে গ্রহণ করতে

পারি নে। তাই দয়া করে আপনি এই নিউরটিক, মনমেনিয়াকের কোনো কথা গায়ে মাখবেন না।'

আমি বললুম, 'তথাস্তু (এবং সংস্কৃতেই বলেছিলুম)। কিন্তু আপনি কি যেন জানবার জন্য আমাকে ফোন করেছিলেন ?'

'আরেকদিন হবে। আপনি এখানে আর কত দিন আছেন ?'

'অন্তত দেড় মাস। কয়েকদিনের জন্য ড্যুসলডর্ফ যাবো, সেই যে বন্ধু পাউলকে ট্রাঙ্ককল্ করেছিলুম, তার ওখানে। আপনিও চলুন না।'

বললেন, 'মন্দ নয় ; পরে দেখা যাবে।'

ইতিমধ্যে আইমা একটা বরফে ভর্তি অত্যুজ্জ্বল রুপালি বালতিতে করে এক বোতল শ্যাম্পেন আর এক বোতল মোজেল নিয়ে এসেছেন।

আমি বললুম 'সর্বনাশ !' আইমা কি যেন একটা বললেন। শুধু 'মাটিল্‌ডে' শব্দটি বুঝতে পারলুম। তাহলে এর ক্রিশ্চান নাম ঐ।

তিনি বললেন, 'হোখ্ ডয়েচ্‌স্—হাই জর্মন—ব্যুনেন্ আউস্‌প্রাখে দিয়ে উচ্চারণ করার ফ্যাশান আইমার কুমারী বয়সে চালু হয় নি বলে আমরা এখনো আলজাসের ডায়লেক্ট বলি। আর বোতলগুলো যদিও অত পুরনো নয়, তবু আমার পিতার আমলের। শ্যাম্পেন নাকি পুরনো হলে খারাপ হয়ে যায়। ভালো না লাগলে মোজেলটা খাবেন।'

আমি নিজে খাই আর না-ই খাই, এর মনে যদি একটু রঙ লাগে তবে আমি খুশী।

শুধালুম, 'আপনি কি এখনো ভারতীয় শাস্ত্রের চর্চা রেখেছেন ? আপনার বিশেষ ইণ্টারেস্‌ট্ কিসে ?'

'বিষয়টা কঠিন নয়। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, বৈদিক যুগে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল। এমন কি হোমযজ্ঞেও স্ত্রী-পুরুষে সমান অধিকার—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ইণ্ডলজি আমার সাবজেক্ট নয়। আপনি সবিস্তার না বললে মোষের সামনে বীণা বাজানোর মত হবে।'

তিনি বললেন, 'সে কি, আপনি তো ইণ্ডিয়ান !'

আমি বললুম, 'আপনাদের ইহুদিদের মত আমারও লয়েলটি দ্বি-ধা। আমাকে আমার পারিবারিক মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রাখতে হয় আর যে দেশে পুরুষানুক্রমে আছি তার অতীত গৌরবেও আমার হিস্তে আছে। তবে আমাদের দেশের মেজরিটি আপনাদের নাৎসিদের মত নয়। আমাদের মুসলমান

কবি কাজীকে হিন্দুরা মাথায় তুলে নাচে, আর সেদিন নাৎসিদের একখানা বইয়ে পড়ছিলুম, ইহুদি হাইনে সম্বন্ধে বলেছে, "১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ থেকে অপরিচিত।" উচ্চাঙ্গের রসিকতা বলতে হবে! যে লোককে ১৮১৭।২০ থেকে তাবৎ জর্মনি ও পরবর্তী যুগের রসগ্রাহী বিশ্বজন চেনে তিনি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ 'অপরিচিত' হয়ে গেলেন, যেদিন হিটলার চ্যানসেলর হলেন!'

তারপর তাড়াতাড়ি বললুম, 'কিন্তু এসব থাক। আপনার কথা বলুন।'

'বৈদিক যুগে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার। স্মার্ত যুগেই সেটা কমতে আরম্ভ করলো। কয়ে কয়ে শেষ পর্যন্ত সতীদাহ পর্যন্ত।'

তারপর তিনি যে রকম সবিস্তর ধাপে ধাপে নামতে লাগলেন তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। স্মৃতির আমি জানি সামান্যই— কজন হিন্দুই জানে, স্মার্ত পণ্ডিত ভিন্ন? মন্বাদি যে-সব শাস্ত্রকারদের নাম তিনি বললেন, তার বারো আনাই আমার অজানা। এবং যেটা আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগলো সেটা এই যে, সর্বদাই তিনি চেষ্টা করছিলেন প্রত্যেক বিধানের পিছনে কি অর্থনৈতিক কারণ থাকতে পারে সেটা খুঁজে বার করার। অন্যতম মূল সূত্রস্বরূপ তিনি গোড়াতেই বলেছিলেন, 'কার্ল মার্কস্ বলেছেন, "যুগান্তকারী সামাজিক বিবর্তনের পিছনে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ"—কিন্তু সেটা আমি একমাত্র কারণ বলে স্বীকার করি নে; সার্টেনলি, যদিও সেটা দি মোস্ট্ ইমপর্টেণ্ট কারণ।' এই সূত্রটি তিনি বার বার অতি সুকৌশলে প্রয়োগ করছিলেন।

সে রাত্রে তিনি যা বলেছিলেন তার সিকিভাগ লিখতে গেলে আমাকে একখানা পূর্ণাঙ্গ থীসিস বানাতে হয়!

শেষ করলেন এই বলে, 'শুনেছি, আপনাদের মডার্ণ মেয়েরা এখন নাকি তাদের সর্ব পরাধীনতা, দুরবস্থার জন্য স্মৃতিকারদের—অর্থাৎ পুরুষদের দোষ দেয়। কিন্তু সম্পূর্ণ দোষ ওঁদের নয়। মেয়েদেরও আছে। সে-কথা আরেকদিন হবে। আইমা নোটিশ দিয়েছেন।'

ইতিমধ্যে আমি একটি গেলাস চেয়ে নিয়ে সেইটে মোজেলে ভরে আইমার জন্য রান্নাঘরে নিয়ে যেতে বুড়ী প্রাচীন দিনের পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাতে দু'দিকের স্কার্ট সামান্য তুলে কার্টসি করলেন। বললেন, 'না বাছা, অতখানি না।' বসার ঘরে এসে মাটিল্ডের গেলাসে প্রায় সবখানি ঢেলে দিয়ে 'স্বাস্থ্য পান' করলেন।

আমি মাটিল্ডেকে বললুম, 'আপনি না বলছিলেন, আপনি নিওরটিক? কিন্তু এতক্ষণ ধরে আপনি যে শাস্ত্র-চর্চা করলেন তার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত তো যুক্তিসঙ্গত প্রতিজ্ঞা, প্রত্যক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত অনুমানের দৃঢ়ভূমির উপর নির্মাণ

করলেন। এমন কি নিওরসিসের পুনরাবৃত্তি প্রমাদ থেকেও আপনার ধারাবাহিক প্রামাণ্যবিন্যাস সম্পূর্ণ মুক্ত।'

মাটিল্ডে ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'নিওরসিস, অনুভূতির রোগ। তার হৃৎভূমি আমাদের হৃৎপিণ্ডে, স্মৃতিশাস্ত্র মস্তিষ্ক রাজ্যের নাগরিক।'

তারপর ভেবে বললেন, 'সেখানেও যে হৃৎপিণ্ডের নিপীড়ন একেবারে পৌঁছয় না তা নয়। সেখানেও কিছুটা 'ইদে ফিক্স্' এসে গিয়ে মস্তিষ্ককে নূতন কিছু করতে দেয় না। অর্থাৎ আমি সেই "স্মৃতিশাস্ত্রে স্ত্রীজাতি" থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোনো নূতন কিছুর সন্ধানে লাগতে পারি নে। এই বিষয়ে অত্যন্ত কাঁচা বই বেরুলেও, ওটাতে যে কোন তত্ত্ব নেই জেনে শুনেও সেইটেই পড়ি। দেখি তার বক্তব্য কোথায় কোথায় আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে ক্লিক্ করছে, আর কোথায় কোথায় করছে না। এতে করে কোন্ নবীন জ্ঞান সঞ্চয় হয়, কোন্ চরম মোক্ষপ্রাপ্তি!—আর ওদিকে পড়ে রইল জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভুবনের নবাবিষ্কৃত খনির নব নব মণি-ভাণ্ডার—অবহেলা অনাদরে। ঠাকুরমাকে এনে দিলুম বড়দিনের নূতন স্কার্ট, জ্যাকেট, বনেট, জুতো। ঠাকুরমা মুখ গুঁজে রইলেন তাঁর স্ত্রী-ধনের সারাটোগা সিন্দুকের ভিতর! সেনিলিটি, ভীমরতি, ইদে ফিক্স্!

চলুন—আইমার প্রতি সুবিচার করতে। এমনিতেই না, সেখানে অতি অবশ্য এ-সব কথা তুলবেন না।'

আইমার রান্নার বর্ণনা দেব না। সুশীল পাঠক, তোমার আশী বছরের পাকা-পাচিকা ঠাকুরমা যদি থাকেন তবে তুমি অনায়াসে বুঝে যাবে, এঁরা মিন-নোটিশে, দ্বিপ্রহর রাত্রেও কী ভানুমতীর ভোজবাজি দেখাতে পারেন।

এখানে 'ভোজ' আমি ভোজন অর্থেই নিচ্ছি। বিক্রমাদিত্য-মহিষীর ইন্দ্রজালও অবশ্য তাতে রয়েছে। আর আমাদের জনপদ কাহিনীতেও আছে, ভোজরাজদুহিতা কালিদাসকে ভোজ দিয়ে পরিতুষ্ট করতেন।

মে মাসে রাত একটায় রাইনল্যাণ্ডেও বেশ শীত পড়ে। বেরুবার সময় মাটিল্ডে জোর করে আমার স্কন্ধে তাঁর হাল্কা ম্যান্ট্‌ল্‌টি চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

বার্‌বা রস্‌সার কথা যে আমার মনে ছিল না তা নয়। কিন্তু আমার হোটেল কাছেই।

ভেনুসর্বেকভেক-এ নেমেই সামনে পড়ে কাস্‌লের বোটানিক্যাল গার্ডেনের চক্রাকার পরিখা। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখি অসংখ্য কুমুদিনী সৌরভজাল বিস্তার করেছে। চতুর্দিক নিঝ্‌ঝুম নীরব। আমাদের গ্রামাঞ্চলের চেয়েও নীরব—কারণ সেখানে বেওয়ারিশ কুকুর, বনের শেয়াল, দস্তী মোরগা—কেউ না

কেউ নিস্তব্ধতা ভাঙবেই। দূরে কাইজার প্রাৎসে দু-চারখানা মোটরের আনাগোনা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এরা নিরীহ নিদ্রালুর ঘুম ভাঙানোর জন্যই যে মোটরে হর্ন থাকে সেটা এখনো জানতে পারে নি।

বুকের ভিতরটা কি রকম মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। আমি কবি নই, আর্টিস্ট নই—আমার হৃদয় স্পর্শকাতর নয়, কিন্তু অকালে বিনাদোষে হৃতযৌবনা, কিংবা আমার ছোট বোনের সখী তরুণী মাধুরীর থানকাপড়, কিংবা রবীন্দ্রনাথের বিধবা মল্লিকা একমাত্র রুগ্ন সন্তানকে জলে বিসর্জন দিয়ে মকরবাহিনীর কাছ থেকে লব্ধস্বাস্থ্য সন্তানকে ফিরে পাবার আশায় কঙ্কণ-বলয়হীন হাত দুখানি বাড়িয়ে যখন দেখে—দেখে সব মিথ্যা, সব বঞ্চনা—এসব দেখলে কিংবা কবি দেখালে আমার মত মূঢ় জড়ভরতও চট করে দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যেতে পারে না।

আমি কি ভালোবাসি নি?—আমার মত অপদার্থ ক্ষণতরে ভালোবাসা পেয়েও ছিল—পথের ভুলে অপদার্থের প্রাণের কূলে বসন্তপবন হঠাৎ কখন এসে যায়, আর যাবার সময় ছেড়ে যায় তার অঞ্চল থেকে গ্রীষ্মের খরতাপ, রৌদ্রদাহ, তৃষ্ণাবাণ। ইচ্ছা করেই। কিন্তু সে কথা থাক। খৃষ্টের বদনাম ছিল, তিনি মদ্যপ, তিনি নর্তকীকে সাহচর্য দেন। তিনি সব দেখেই বলেছিলেন, 'কাউকে বিচার করতে যেয়ো না।' পয়গম্বর বলেছেন, 'তোমার সবচেয়ে বড় দুশমন তোমার দুই কাঁধের মাঝখানে'—অর্থাৎ তুমি নিজে। তবে কে তোমার প্রতি অবিচার করেছে সে অনুসন্ধানে আপন জান্ পানি করো কেন?

এঁর ভিতরকার জলন্ত বহ্নিশিখা এঁর মুখ আর হাত দুখানিই পুড়িয়ে ফেলল কেন? ঐ দুটিই মানুষের ভিতরকার মানুষকে প্রকাশ দেয়—সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, তার জন্ম-মৃত্যু। বিশেষ করে মানুষের হাত দুখানি প্রকাশ করে তার পরিবারের ঐতিহ্যগত স্পর্শকাতরতা, চিন্তাশীলতা কিংবা সে দুটি রসে রসে ভরা। মূঢ় জনের হাত দুখানি কচ্ছপের খোলের মত।

ইনি কি জানতেন, যখন তাঁর বন্ধুর থীসিস তিনি টাইপ করে দিচ্ছিলেন যে, প্রত্যেকটি হরপে ঠোকা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর আপন কফিন-বাক্সের ডালায় স্বহস্তে একটি একটি পেরেক পুঁতছেন?

স্বামী-সোহাগিনী কার্লোটা পাগলিনীর মত ছুটে এলেন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের কাছে প্যারিসে, তারপর গেলেন তাঁর ভাশুর প্রবল প্রতাপান্বিত অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সম্রাটের কাছে—পায়ে পড়লেন তাঁদের, 'তোমরাই আমার স্বামীকে পাঠিয়েছিলে মেকসিকোর সম্রাট করে। আমাকে সামান্য একমুঠো সৈন্য

দাও। আমি তাঁকে বাচাতে পারবো।'

ওদিকে স্বামী মাকসিমীলিয়ান প্রহর গুনছেন কার্লোটার প্রত্যাবর্তন কিংবা অবধারিত মৃত্যুর জন্য। দ্বিতীয়টাই হল। খোয়ারেসের আদেশে তাঁকে দাঁড়াতে হল বন্দুকধারী সৈন্যদের সামনে। এমপেরর মাকসিমীলিয়ান ক্ষাত্রধর্মের শেষ আভিজাত্যের প্রতীক—মৃত্যুবেদীতে দাঁড়াবার পূর্বে বন্দুকধারীদের প্রত্যেককে তিনি একটি একটি করে সোনার মোহর দিলেন।

সব খবর কার্লোটা পেলেন, প্যারিস ভিয়েনায় ছুটোছুটির মাঝখানে। তাঁর মাথার ভিতর কি যেন একটা ঘটে গেল। তাঁর চোখে দেখা দিল এক অদ্ভুত দ্যুতি যার দিকে কেউই তাকাতে পারতো না। পারলে তাঁর সম্মুখ থেকে পালাত।

তারপর দীর্ঘ ষাট বৎসর ধরে তিনি কথা বলতেন ওপারের লোকের সঙ্গে। আর বার বার ফিরে আসতেন ঐ এক কথায়: তাঁর স্বামীকে বলতেন, 'মাক্‌স্‌ল্, মাক্‌স্‌ল্, সব দোষ আমারই। আমারই সব দোষ।'

আমি বিমূঢ়ের মত কিছুতেই ভেবে পাই নে মানুষের দোষ কোথায়, তার পাপই বা কি পুণ্যই বা কি?

কী সদাশিব, শান্ত এই বন্ শহর। কিন্তু তাই কি? চেস্টনাট গাছের ঘন পাতা থেকে ঝরে পড়ল আমার হাতের উপর এক ফোঁটা হিমিকাশ্রু। কার এ অশ্রু? আমি জানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে খুব কম মেয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতো—আদৌ আসতো কি না জানি নে—তাই ছাত্রেরা প্রণয় জমাতো বন্-বালাদের সঙ্গে। তারপর টার্ম শেষ হতেই অনেকেই চলে যেত ভিন্ন য়ুনিভার্সিটিতে। তাই এ-প্রেমের নাম সেমেস্টার-লীবে বা এক টার্মের প্রণয়। কারো কারো প্রেম অবশ্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই আপন আপন অধ্যয়ন সমাপন করে উড়ে চলে যেত এদিক ওদিক। আর পড়ে রইত বন্-বালাদল তাদের অশ্রুজল নিয়ে।

বনের আপন তরুণ দলও এ পরিস্থিতির সঙ্গে সুপরিচিত।

আমার একটি ঘটনা মনে পড়লো। আমার এক বান্ধবীকে রাত্রিবেলা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ঘরমুখো রওয়ানা হয়ে কয়েক পা এগিয়েছি এমন সময় শুনতে পেলুম বান্ধবী একতলার দিকে ডাকছে তার ঘুমন্ত ভাইকে নিচের সদর দরজা খুলে দেবার জন্য। আমার উল্টো দিক থেকে আমার দিকে এগিয়ে আসছে একটি তরুণ। সে ভেবেছে মেয়েটি বুঝি আমাকে ডাকছে, আর আমি সাড়া না দিয়ে চলে যাচ্ছি। আমাকে পাশ করার সময় মিনতি-ভরা মৃদু কণ্ঠে বললে,

'এত কঠিন হৃদয় হবেন না, য়ুঙার হার (ইয়াং জেণ্টলম্যান)।'

সে রাত্রে বনের গলিঘুঁচি বেয়ে বেয়ে অনেক ঘোরাঘুরি করেছিলুম। মনটা বড় অশান্ত। ভোরের দিকে হঠাৎ রোঁদের একজন পুলিস আমার সামনে দাঁড়িয়ে বুটের হিলে হিলে ক্লিক করে সেলুট দিল। আমি বললুম, 'গুটন্ আব্ণ্ট।'

পুলিস বলল, 'গুড মর্নিং বলাই কালোপযোগী হবে। ভোর হতে চলেছে।'

তারপর গলা নামিয়ে বললে, 'এই নিয়ে আপনাকে তিনবার ক্রস করলুম। ইস্ট ভাস লোস্? এনিথিং রং?'

এ শহরের পুলিসও দরদী। আমি বললুম, 'না, অনেক ধন্যবাদ।'

বললে, 'এ রকম ছন্নের মত একা একা রাতভর ঘোরাঘুরি করে কি লাভ? চলো, ঐ বেঞ্চিটায় বসে আমার সঙ্গে একটা সিগারেট খাবে।'

আমি নিজের প্যাকেট বের করলুম। আমার সিগারেট নিতে খুব সহজে রাজী হল না।

বললে, 'তুমি ভ্যাগাবণ্ড নও, রাস্তাও হারাও নি, এবং চুরিতে যদি হাতখড়ি হয়ে থাকে তবে সে অতি সম্প্রতি। আমি তোমাকে কিছুটা চিনি। কয়েক বছর আগে যখন এখানে ছাত্র ছিলে তখন আমার বীটেই তোমার বাসা ছিল। তারপর কিছুদিন তোমাকে না দেখতে পেয়ে বুঝলুম আর পাঁচটা ফেৎলেস টমাটোর মত (জর্মনরা কেন টোমাটোকে faithless বলে, জানি নে) পাশ করে দেশে চলে গেছে। কিন্তু জানো, তোমাকে সে পর্যায়ে ফেলা যায় না। বিশ্বাস করবে না, তুমিই পয়লা বিদেশী যে পরীক্ষা পাশ করার পর চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। কিছু মনে করো না, আমি বড় খোলাখুলি কথা বলি। হ্যাঁ, তোমার সেই প্ল্যাটিনাম ব্লণ্ড বান্ধবী গেল কোথায়? তোমাদের দু'জনার চুল ছিল এই শহরের দুই এক্স্ট্রীম। সবাই তাকাতো।'

আমি বললুম, 'ও! মার্লেনে? সে বিয়ে করে ফ্রিজিয়ান দ্বীপে চলে গেছে।'

'তাই বুঝি ছন্নের মত—?'

আমি ধীরে ধীরে বললুম, 'না, আজ একটি মেয়ের জীবনকাহিনী শুনে বড় দুঃখ হল। মন শান্ত হচ্ছিল না।'

বললে, 'সরি।'

সিগারেট শেষ করে শুপো উঠে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার পার্সনাল ব্যাপারে আমি টুঁ মারতে চাই নে সে তো স্বতঃসিদ্ধ। তাই শুধু বলি এই বন্ শহরে ক্রাইম এতই কম হয় যে, দুষ্টের দমন অপেক্ষা শিষ্টের পালন

করতে হয় আমাদের—অর্থাৎ পুলিসের—বেশী। আর্তের সাহায্য করতে গিয়ে কিন্তু আমি বার বার দেখেছি, সত্যকার সাহায্য করা অতি কঠিন, প্রায় অসম্ভব। জর্মনে একটা কথা আছে: মমতায় ভরা এই যে মায়ের শরীর, যে তার বাচ্চার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সে কি পারে তার মুমূর্ষু শিশুকে তার মরণে সাহায্য করতে? এইটুকু দুধের বাচ্চাকেও মরতে হয় আপন মরণ। যে অজানা পথে যেতে ত্রিশ বছরের জোয়ানও ভয় পায়, আট বছরের শিশুকেও সেই পথে পা দিতে হয়।

কে কার সাহায্য করতে পারে?

পারেন শুধু মা মেরি।

আবার দেখা হবে, য়ুঙার হ্যার, শুধু শুধু মন খারাপ না করে হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়ো। আর দরকার হলে পুলিসের পুৎসির খবর নিয়ো।'

বড় দুশ্চিন্তায় পড়লুম। আমার ছাত্রজীবনের ল্যাণ্ড-লেডি এখন থাকেন ব্যাকেবুর্গ নামক ছোট্ট শহরে। তার পাশে একটা গ্যারিসন। তিনি এসেছিলেন বলে, এবং আমার খবর জানতেন বলে আমাকে ফোন করলেন, বললেন জরুরী খবর আছে। তাঁকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলুম তাঁর প্রিয় 'আম্ রাইন' রেস্তোরাঁয়। সেখানে গিয়ে দেখি, তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বিস্ময় প্রকাশ করার পূর্বেই তিনি বললেন, 'নাৎসিদের গোয়েন্দাগিরি চরমে পৌঁছেছে। এঁদের অনেকেই দূর থেকে শুদ্ধমাত্র ঠোঁটের নড়া থেকে কথা বুঝে নিতে পারে। তাই বাইরেই জরুরী গোপন কথাটা সেরে নি।

'খবরের কাগজে নামগন্ধ নেই, লার্ক-হুক জানে না, কিন্তু আমরা গ্যারিসনের কাছে থাকি, আমাদের কাছে ট্রুপ মুভমেণ্ট লুকানো অসম্ভব। পরশু রাতে প্রায় পঁচিশ হাজার সৈন্য গেছে চেক্-সুড্ এটেন্ সীমান্তে। লড়াই যদি আচমকা লেগে যায়, তবে আপনি ইণ্ডিয়ান, অতএব ব্রিটিশ, অতএব শত্রু। নজরবন্দী হয়ে থাকবেন। দেশ থেকে টাকা আসবে না। দুরবস্থার চরম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাই দেখেছি।'

তাঁর সদুপদেশ—না বললেও আমি বুঝলুম—ইংরেজ লড়াই হারলে যে তার নিজস্ব আবিষ্কার করা ভাষায় বলে 'বাহাদুরিকে সাথ হটনা' ('বীরত্বের সঙ্গে পলায়ন!'—শোলার পাথর বাটি, ডুববেও ভাসবেও) সেইটি আমার অবলম্বন করা।

বললুম, 'চলুন, ভিতরে গিয়ে খেতে খেতে চিন্তা করি।'

এ-রেস্তোরাঁর সঙ্গে ল্যাণ্ড-লেডির নিদেন চল্লিশ বছরের পরিচয়। মালিক, ওয়েট্রেস, সবাই উদ্বাহু হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালো।

হঠাৎ যদি এখন আমাকে জর্মনি ত্যাগ করতে হয়, তবে তার পূর্বে মাটিল্‌ডেকে তাঁর শেষ প্রশ্ন শুধোবার একটা সুযোগ দিতে হয়।

টেলিফোনে তাঁকে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ জানালুম আর টাপে-টোপে বোঝালুম, আমার বিশেষ প্রয়োজন।

ফিরে আসতে ফ্রাউ এশ্‌ ফিস ফিস করে বললেন, 'কাউণ্টারের পিছনে ঐ ওয়েট্রেসটিকে লক্ষ্য করুন। বেচারী পড়েছিল এক পিচেশের পাল্লায়। একটা গরীব ডাক্তারীর ছাত্র করে ওর সঙ্গে প্রণয়। মেয়েটি পুরো ছ' বছর ওর খরচা যোগায়। কথা ছিল শেষ পরীক্ষার পর সে তাকে বিয়ে করবে। পরীক্ষা পাসের তিন দিন পরে বদমাইশটা এক খানদানী, ধনী মেডিকেল স্টুডেণ্টকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করেছে।'

মেজাজটা তেতো হয়ে গেল। আমি যে-সব ঘটনা শুনতে চাই নে সেগুলিই যেন গেস্টাপো ডালকুত্তার মত আমার পিছনে লেগেছে।

এশ্‌ বললেন, 'কিন্তু ধন্যি মেয়ে! রেস্তোরাঁর এই যে মালিক, সে মেয়েটাকে বড় স্নেহ করে। সে তো রেগে তার উকিল ভাইকে ফোন করে বললে, "লাগাও দু-দুটো মোকদ্দমা—একটা ফৌজদারী, একটা দেওয়ানী। ব্যাটাকে আমি জেলে পচাবো, আর ব্যাটার ডাক্তারি লাইসেন্স দিয়ে টয়লেট পেপার বানাবো।" কিন্তু ঐ যে বললুম, ধন্যি মেয়ে, কিছুতেই রাজী হল না কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত তুলতে। কী আকাট, কী আকাট মেয়েগুলো!'

আমি কিছু না বলে বিরাট এক পীস কাঁচের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে মাটিল্‌ডের জন্য পথ চেয়ে রইলুম। দেখা পাওয়া মাত্র বাইরে গিয়ে তাকে সব কথা বললুম।

মাটিল্‌ডে কিছুমাত্র আশ্চর্য না হয়ে বললেন, 'আমি অনেক কিছু আজ সকাল বেলা একস্‌চেঞ্জে গিয়েই জানতে পেরেছি। আমরা সব-কিছুই জানতে পাই। এমন কি, বার্লিনস্থ ফ্রান্সের রাজদূত মসিয়ো ফ্রাঁসোয়া পঁসে পর্যন্ত কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েছেন।

আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন।'

খাওয়ার পর হোফ্‌ গার্ডেনে বেড়াতে বেড়াতে স্থির হল, কাল সকালের গাড়িতে আমি প্যারিস চলে যাব। ফাঁড়াটা কেটে গেলে আমি ফের বন্‌ চলে আসবো। নইলে—সে তখন দেখা যাবে।

ফ্রাউ এশ্‌কে আমরা ম্যনস্‌টার গির্জে অবধি পৌছে দিলুম। আচার-নিষ্ঠা রমণী পথে আমার মঙ্গলের জন্য একটা বাড়তি মোমবাতি কিনলেন—মা-মেরির পদপ্রান্তে জ্বালাবেন বলে।

মাটিল্‌ডেকে একস্‌চেঞ্জে পৌঁছে দিয়ে বললুম, 'আপনার সঙ্গে ডিনার খাবো। ক'টায় আসবো?'

'পাঁচটার পরে যে-কোনো সময়।'

হিটলারের উপর পিত্তিটা চটে গেল। একটা নিরীহ বঙ্গসন্তানকে তার ছুটিটা আরামসে কাটাতে দেয় না। কিন্তু গোস্‌সাটা অবিমিশ্র নয়। একটা অস্ট্রিয়ান ভ্যাগাবণ্ড, যুদ্ধে ছিল মাত্র করপরেল, সে কিনা আমাদের দুশমন মহামান্ত ইংলণ্ডেশ্বর—যাঁর রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, (অবশ্য ফরাসীরা বলে, 'ইংরেজকে ভারতীয়দের সঙ্গে অন্ধকারে ছেড়ে দিতে স্বয়ং "বঁ দিয়ো"—করুণাময় সৃষ্টিকর্তাও—সাহস পান না'—) এবং তাঁর স্নব্ কনজারভেটিভ গুষ্টিকে প্রায় চার বছর ধরে তুর্কী নাচন নাচাচ্ছে, এ-সুসমাচারটি কানে এলেই মনে হয়, ইটিকে লিপিবদ্ধ করার জন্য নয়া নয়া মথি মার্কের প্রয়োজন!

অপরাহ্নের এই মধুর আলোতে কার না শরীর অলস আবেশে ভরে যায়। কাইজার প্লাৎসের ফোয়ারার উপর ক্ষণে ক্ষণে রামধনু লাগছে। পাশে, সেই ১৯৩০ থেকে পরিচয়ের বুড়ো উইলি দিশী-বিদেশী খবরের কাগজ বেচছে। জর্মন কায়দায় সে 'দি টাইমস'-কে 'টে টিমেস' উচ্চারণ করতো বলে আমরা কৌতুক অনুভব করতুম। কাছে এসে কানে কানে বললে, 'সব বিদেশী কাগজ বাজেয়াপ্ত। একটা বাজে কাগজ কি করে এসে গেছে, সক্কলের দৃষ্টি এড়িয়ে। আমার মেয়ে পড়ে বললো, প্যারিস লণ্ডনে ধুন্দুমার।' বলে পুট করে আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিল কাগজখানা।

নাঃ! এখন পড়ে কি হবে? তার চেয়ে তাকিয়ে থাকবো চেস্‌নাট সারির দিকে, নাকে আসবে বোটানিকসের সুগন্ধ, কানে আসবে পপেলস্‌ডর্ফের এভিনিউর কাচ্চাবাচ্চাদের খেলাধুলার শব্দ, কিংবা কারো খোলা জানালা দিয়ে পিয়ানো প্রাকটিস। কিংবা—

পা দুটো লম্বা করে একটা বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে নিয়েছি।

সামনে মাটিল্‌ডে। অফিস থেকে বাড়ি আসা-যাওয়ার পথ তাঁর এইটেই। বললেন, 'কি স্বপ্ন দেখছিলেন?'

আমি বললুম, 'সেই যে চীনা দার্শনিক বলেছিলেন, "স্বপ্নে দেখলুম আমি

প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছি। জেগে উঠে চিন্তায় পড়লুম, এই যে আমি ভাবছি আমি মানুষ, সে কি তবে প্রজাপতির স্বপ্ন? প্রজাপতি স্বপ্ন দেখছে, সে মানুষ হয়ে সোনালী রোদে রূপালি ঝর্নার কাছে বসে চা খাচ্ছে।"

মাটিলডে বললেন, 'স্বপ্নে যদি কিছু একটা হবেই, তবে প্রজাপতিটা লক্ষ্মীছাড়া মানুষ হতে যাবে কেন? বরঞ্চ রূপালি ঝর্না হলেই পারে। কত না পাহাড়, কত না সবুজ মাঠ, কত না পাইন বন পেরিয়ে সে হবে প্রশস্ত নদী, তার বুকের উপর দিয়ে ভেসে যাবে নলরাজের রাজহংস, ভরা পালে উড়ে যাবে ময়ূরপঙ্খী, তার বুকে কখনো উঠবে ঝড়ঝঞ্ঝা, কখনো প্রতিবিম্বিত হবে পূর্ণ চন্দ্র। সর্বশেষে সে পাবে তার চরম মোক্ষ পরমা শান্তি-সমুদ্রের সঙ্গে আপন সত্তা মিলিয়ে দিয়ে।'

আমি বললুম, 'অন্তত মানুষ এই স্বপ্নই দেখেছে: "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" —আসলে সেটা কবি রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন।'

'উত্তর মেঘ ও যক্ষের স্বপ্ন।'

কিছু উত্তর না দিয়ে মনে মনে বললুম, 'হায় সৃষ্টিকর্তা, প্রেমের ঠাকুর! কোথায় না এ-রমণী এ-সব কথা বলবে তার দয়িতের সঙ্গে, আর কোথায় সে এ-সব বলছে আমার মত কলাগাছকে। ওমর খৈয়াম তাই পৃথিবীর উপর থুথু ফেলতে চেয়েছিলেন।'

মাটিলডে কি খবর জানতে চান, সেটা আমি মোটামুটি অনুমান করতে পেরেছি, কিন্তু হায়, আমি তো তাঁকে এমন কিছু বলতে পারবো না, যা শুনে তাঁর বেদনাভার লাঘব হবে। তাই তিনি সেটা না শুধালেই আমি শান্তি পাই। কিন্তু আমি যদি তাঁকে শুধোবার সুযোগ না দি, তবে কি সেটা আমার পক্ষে অন্যায় হবে না? কাল যাচ্ছি প্যারিস। যদি সত্যি লড়াই লেগে যায়, তবে আমাদের দুজনাতে পুনরায় দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

যা হয় হবে, আমিই তাঁকে সে সুযোগ দেব।

ব্যালকনিতে লম্বমান হয়েছি দু'খানা ডেক্ চেয়ারে। বললুম, 'দুজনার ভালোবাসা যদি কোনো কমন ইনটারেস্টের চতুর্দিকে গড়ে ওঠে, তবে সেটা হয় বড় প্রাণবন্ত, মধুর ও দীর্ঘস্থায়ী। ব্রাউনিং আর মিসেস ব্রাউনিং দুজনা একে অন্যের মধ্যে মিশে যেতেন কবিতায় কবিতায়। এমন কি, শুষ্ক বিজ্ঞানও দুজন মানুষকে একই রসের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আপনার কথা যখনই ভাবি, তখনই মনে পড়ে প্রফেসর ও মাদাম ক্যুরির কথা।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি বললেন, 'আপনার এ-কথাটি কালিদাসও বলে গেছেন। "গৃহিণী, সচিব ইত্যাদি"—অতখানি আশা আমি

কখনো করি নি। এবং আমি আমাদের প্রণয়ের প্রথম দিন থেকেই জানতুম, ডিগ্রী পাওয়ার পরই তিনি চলে যাবেন আপন দেশে—না, দাঁড়ান, জানলুম কিছুদিন পরে। সংস্কৃত পড়াবার সময় তিনি মহাভারত থেকেও কিছুটা বেছে নেন। তাতে ছিল কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান। আপনি ভাববেন না, তিনি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ উপাখ্যানটিই আমার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তা হলে হয়তো তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। কিন্তু কি জানি, কে জানে—'

হঠাৎ যেন দিশে পেয়ে বললেন, 'দেখুন, কাল আপনাকে যে-কথাটা বলেছিলুম, সেটা আবার, আরো জোর দিয়ে বলি, আমি নিওরটিক, আমার মন যখন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, তখন মনে হয়, সেইটেই ধ্রুব। আবার পরে দেখি, সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।'

হঠাৎ হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বিকৃত কণ্ঠে বললেন, 'শুধু এই দশ বছরের যন্ত্রণা মিথ্যা নয়।'

ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দেখি, দু-হাতের ফাঁক দিয়ে বয়ে বেরুচ্ছে চোখের জল। কত বৎসরের চাপা কান্না, কে জানে? এর পূর্বেও তিনি তাঁর বেদনার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু চোখ দুটি ছলছল করতেও দেখি নি। আর এ যে-ধারা নেমে এসেছে, এ তো কোনো পরিণত বয়স্কা রমণীর কান্না নয়, এ যে অবুঝ শিশুর কান্নার মত। ইনি যখন শাস্ত্রালোচনা করেন তখন মনে হয়, ইনি আমার পিতার বয়সী, দৈনন্দিন আচরণে মনে হয়, ইনি আমার বড়দিদির বয়সী। আর এখন? এখন দেখি তিনি কাঁদছেন আমাদের পরিবারের সবচেয়ে ছোট, আমার অভিমানিনী ছোট বোনের মত। সে কোনো যুক্তি-তর্ক শোনে না, কোনো সান্ত্বনা মানে না। যেন সে এই বিশ্ব-সংসারে একেবারে একা—তার সঙ্গী শুধু তার চোখের জল।

কি আছে বলার, কি যায় লেখা?

কিন্তু তাঁর আত্মসংযম অসাধারণ। বছরের পর বছর চোখের জল চেপে রাখার ফলে শুকিয়ে গেছে তাঁর মুখ আর হাত দু'খানা। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁর জীবনে এই তাঁর প্রথম ভেঙে পড়া।

তাঁর কান্নার ভিতর দিয়ে তিনি শুধু একটি অনুযোগ প্রকাশ করেছিলেন। ডিগ্রী লাভের কয়েক দিন পরই তাঁর বন্ধু দেশে ফিরে যান। বন্ স্টেশনে তিনি তাঁকে বিদায় দেন।

তারপর তাঁর কাছ থেকে একখানা চিঠি না, একখানা পোস্টকার্ড না, একটি ছত্র মাত্র না। নববর্ষে, জন্মদিনেও না। সেই যে বন্ স্টেশন থেকে তিনি

বিলীন হলেন, তারপর তিনি বেঁচে আছেন কি না, সে কথাও মাটিল্‌ডে জানেন না। মাটিল্‌ডে তাঁকে দু'খানা চিঠি লিখেছিলেন।

আমি জানতুম, এইবারে আমার অগ্নি-পরীক্ষা আসবে, কিন্তু পূর্বেই বলেছি, আমি স্থির করেছিলুম, আমি প্যারিস পালিয়ে গিয়ে সেটা এড়াবো না।

এপার ওপার—যে পারই হোক, হয়ে যাক।

যে-প্রশ্ন তিনি বার বার শুধোতে গিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বে শুধোতে পারেন নি, আমি নিজের থেকেই তার উত্তর দিলুম।

ধীরে ধীরে বললুম, 'আমি ডাঃ কাণেকে চিনি। চিনি বললে ভুল বলা হবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে লৌকিকতার দু-চারটি কথা হয়েছে মাত্র।'

এবারে আমারও কড়া একটা কিছু খাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। তারই ছল করে ঘরের ভিতরে চলে গেলুম। ইনি এটা সয়ে নিন।

ফিরে এলে মাটিল্‌ডে শুধোলেন, 'বরোদা তো ছোট শহর ; উনি নিশ্চয়ই জানেন, আপনিও বনের ছাত্র ছিলেন। সে নিয়ে কোনো কথাবার্তা হয় নি ?'

'না, আমি চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু উনি কোনো কৌতূহলই দেখালেন না। তবে আপনি নিশ্চয় জানেন, উনি কথা বলেন অত্যন্ত কম।'

মাটিল্‌ডে এক ঝটকায় খাড়া হয়ে বসলেন। প্রথমটায় বিস্ময়ে যেন বাক্য-হারা। 'কি বললেন আপনি! পাণ্ডুরঙ কথা বলেন কম! আমার সঙ্গে তো অনর্গল কথা বলতেন!'

মনে পড়ল আমার বন্ধু সোহরাব ওয়াডিয়ার মন্তব্য। পাণ্ডুরঙ শঙ্কর কাণে সম্বন্ধে। বললুম, 'যখন দেখলুম তাঁর কৌতূহল অত্যন্ত কম, তখন আমিও তাঁর সম্বন্ধে কোনো খবর নিই নি। তৎসত্ত্বেও তাঁর কথা উঠলে আমার এক বন্ধু বলেছিলেন, আপন জনের মাঝখানে—ঐ যে আপনি বললেন—উনি অনর্গল কথা বলেন।'

মনে হল, মাটিল্‌ডে যেন খানিকটা সান্ত্বনা পেলেন। তাতে আশ্চর্য হবার কি ? কবি রুমীর দিকে তাঁর গুরু রাস্তায় তাঁকে ক্রশ করার সময় একবার মাত্র একটুখানি স্মিতহাস্য করেছিলেন। সেইটুকুর অনুপ্রেরণায়ই তিনি রচলেন তাঁর মহাকাব্য।

এইবারে আমার শেষ বক্তব্যটুকু বলার সময় এসেছে।

আমি বললুম, 'মাটিল্‌ডে, ডাঃ কাণের কি করা উচিত ছিল না-ছিল সে জানেন বিধি। হয়তো আপনাকে যাবার পূর্বে সব-কিছু বুঝিয়ে দিয়ে গেলে ভালো হত, হয়তো না করে ভালোই করেছেন। আপনি যদি *নিওরটিকই* হয়ে গিয়ে থাকেন

—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না—তা হলে উনি যাই করতেন না কেন, আপনি ভাবতেন, তার উল্টোটা করলেই ভালো হত।

কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা এই : কাণে বরোদার রাজ-প্রাসাদের গোপন-বিভাগে কাজ করেন। সেখানকার আইন অনেকটা ফরেন অফিসের মত। জানেন তো, বিদেশিনীকে বিয়ে করাও ওদের মানা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে-অনুমতিও তারা দেয়—ওদের সিনিকাল বিশ্বাস, বরঞ্চ মানুষ তার স্ত্রীর কাছ থেকে জিনিস গোপন রাখতে পারে, প্রণয়িনীর কাছ থেকে কিছুতেই নয় ; এই তো সেদিন গ্যোয়েবলসের মত প্রতাপশালী মন্ত্রীও এই ধরনের ব্যাপারে হিটলার কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়েছেন। নেটিভ স্টেট মাত্রই চক্রান্তের চাণক্যালয়—আর রাজপ্রাসাদ! সেখানে পরস্পরবিরোধী একাধিক গোপন বিভাগ একে অন্যের বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ চক্রান্ত-কর্মে মত্ত। আপনার সঙ্গে পত্রালাপ ধরা পড়তোই এক দিন না এক দিন, এবং তাঁর শত্রুপক্ষ যে সেটা কিভাবে কাজে লাগাতো তার কল্পনাও আমি করতে পারি নে। কাণেকে বৃহৎ সংসার পুষতে হয়—তিনিই একমাত্র উপার্জনক্ষম।'

দাঁড়িয়ে বললুম, 'এইবারে উঠি। কাল প্রভাতে প্যারিস গমন। হিটলার আমার সব প্রোগ্রাম তছনছ করে দিয়েছেন। সবাইকে আজ রাত্রেই চিঠি লিখে জানাতে হবে। তার উপর প্যাকিং রয়েছে।'

মাটিল্ডে যেন চিরকালের মত দাঁড়ালেন। আমার কাঁধের উপর হাত রেখে প্রায়ান্ধকারে আমার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলেন। আমার মনে হল, আমি যেন তাঁর চোখে একটুখানি জ্যোতি দেখতে পেয়েছিলুম। সত্য জানেন অন্তর্যামী।

কিন্তু মিথ্যে বলেছিলুম আমি মাটিল্ডেকে। অন্তর্যামী যেন ক্ষমা করেন। আমি কাণের সাফাই গাই নি। আমি চেয়েছিলুম, মাটিল্ডের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া তাঁর বল্লভ যেন ধূলিতলে লুণ্ঠিত না হয়। মাটিল্ডের জীবন তারই উপর নির্ভর করছে।

প্যারিসে পৌঁছনো মাত্রই শুনি, চেক সীমান্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। হিটলার সৈন্য অপসারণ করেছেন। আমি আমার জাহাজের প্রিয়ার অনুসন্ধানে বেরলুম না। কারণ, বনে থাকতেই তাঁর রোদনভরা প্রথম চিঠি পাই, 'আমি এখানে বাঁচবো কি করে? এ যে বড় হৃদয়হীন জায়গা। তুমি এখানে চলে এসো না, ডার্লিং।'

ভ্যাগ্যিস্ আমি যাই নি। দু' দিন পরে দুসরা চিঠি 'কাল সহকর্মীদের সঙ্গে

গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলুম। ভেরি ইনটারেসটিং! মনে হচ্ছে, এখানে তিন বছর কাটাতে পারবো।' সাদা চিঠির কাগজে সাদা কালিতে লেখা প্রিয়ার প্রাঞ্জল বাণীটি বুঝতে আমার লহমা-ভর সময়ও লাগে নি। বস্তুত প্রথম চিঠি থেকেই সেটা আমার বুঝে নেওয়া উচিত ছিল। যে বলে, 'প্যারিস হৃদয়হীন', সে নিশ্চয়ই সেখানে পৌঁছনো মাত্রই পড়ি-মরি হয়ে, উদোম হিয়া নিয়ে হিয়ার সন্ধানে বেরিয়েছিল। ধন্য আমি, এহেন উদারহৃদয়ার সঙ্গে আমার হার্দিক পরিচয় হয়েছিল। ইনি কাণে গোত্রের নন; নিঃশব্দে, নীরবে মহাশূন্যে লীন হন না। প্যারিস ধন্য। মার্কিন প্রবাদ আছে, পুণ্যশীল মার্কিন মাত্রই মৃত্যুর পর জন্ম নেয় প্যারিসে।

আম্মো বেকার দিন কাটাই নি, কারণ, আমার যে কোনো কাজ নেই। করে করে তিন দিনের জায়গায় কেটে গেল দু' মাস। সর্বনাশ! প্যারিস বড়ই সহৃদয়, কিন্তু দরাজ-দিল নয়। কিপটেমি শিখতে হলে প্যারিসের খাঁটি বাসিন্দাদের সঙ্গে এক সপ্তাহ বাসই যথেষ্ট। শেষটায় র‍্যু দ্য সমরারের ইণ্ডিয়া-ক্লাবে জাতভাইদের সর্বনাশ করে তাদের তহবিল তছরূপ করে বিজয়গর্বে বন্ ফিরে এলুম। একদা নেপোলিয়ন যে-রকম প্যারিস থেকে বেরিয়ে হেলায় কলোন-বন্ জয় করেছিলেন।

মাটিল্ডেকে আমার উপর বেশী চাপ দিতে হল না। আমি সুড়সুড় করে তাঁর ফ্ল্যাটেই ঢুকলুম।

রবিবারে একসঙ্গে গির্জেয় গেলুম।

আইমা দেখি কাণের কাছ থেকে বেশ দু-চারটে ইণ্ডিয়ান ডিশ বানাতে শিখে নিয়েছিলেন। আর মাত্র তিন দিন বাকী। ভেনিস বন্দরে জাহাজ ধরে বোম্বাই পাড়ি দেব। ট্রাভেল আপিসে ভেনিস অবধি ট্রেনের টিকিট কেটে বাড়ি ফিরে দেখি ধুন্দুমার। গলা-কাটা মুর্গীর মত দুই রমণী এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছেন।

সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য! কাণে রাজপ্রাসাদের ঠিকানা দিয়ে মাটিল্ডেকে কেব্‌ল্ করেছেন, ভারতীয় ডাক্তারের উপদেশে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত তাঁর ছেলেকে ইয়োরোপ পাঠাচ্ছেন। মাটিল্ডে তার দেখ্-ভাল্ করতে পারবেন কি না যেন কেব্‌ল্ করে জানান।

মাটিল্ডের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি কেব্‌লের জবাব তো দিয়েছেনই, এখন বসে গেছেন আরেকটা কেব্‌লের মুশাবিদা করতে। আর আমাকে প্রশ্ন, ছেলেটার বয়স কত, কি ব্যামো হতে পারে, সে নিরামিষাশী কি

না, এবং সব চেয়ে বড় প্রশ্ন সে নামবে কোন্ বন্দরে? তিনি সেখানে উপস্থিত থাকতে চান, নইলে তাকে দেখবে কে? মুশাবিদা বন্ধ করে ফোন করেন কখনো বা ট্রাভেল আফিসকে কখনো বা তাঁর দপ্তরকে পাওনা ছুটির মঞ্জুরীর জন্য। হঠাৎ সব কিছু বন্ধ করে লেগে যান প্যাক করতে—হয় যাবেন মার্সেই, নয় রোম। সেখান থেকে ইটালিয়ান যে কোনো বন্দরে পৌছনো যায় ঘণ্টা কয়েকের ভিতর। নইলে এখান থেকে খবর পেয়ে তিনি ইটালিয়ান বন্দরে পৌছতে না পৌছতে জাহাজ হয়তো ভিড়ে যাবে সেখানে। ট্রাভেল দফতর অভয় দেয়, তিনি মানেন না। ইতিমধ্যে তারা পিয়ন মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছে, বোম্বাই-ভূমধ্যসাগরের তাবৎ জাহাজ কোম্পানির টাইমটেবল। আমি সেগুলো অধ্যয়ন করতে লেগে গেলুম গভীর মনোযোগ সহকারে।

তাঁর দ্বিতীয় কেব্‌ল্ যাওয়ার পর মাটিল্‌ডের মনে জাগলো আরেক ঝুড়ি বাস্তব-অবাস্তব প্রশ্ন। তৃতীয় মুশাবিদায় তিনি বসে যান।

হাত নিঙড়াতে নিঙড়াতে পায়চারি করেন আর বলেন, 'মাইন গট্, মাইন গট্'—'হে ভগবান, হে ভগবান!'

হঠাৎ ছুটে এলেন আমার কাছে। মুখ থেকে শেষ রক্তবিন্দু অন্তর্ধান করেছে। আর্তকণ্ঠে শুধালেন, 'হঠাৎ যদি যুদ্ধ লেগে যায়, তবে কি হবে?' আমি শান্ত কণ্ঠে বললুম, 'নিরপেক্ষ সুইটজারল্যাণ্ডে চলে যাবেন। সেখানে চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হবে না।' যক্ষ্মা হলে যে সেখানেই যেতে হবে সে কথা আর তুললুম না। শুধু বললুম, 'বরোদার কেব্‌ল্ মহারাজার অজানতে আসতে পারে না; আপনি তাঁর সাহায্য পাবেন। জর্মন পররাষ্ট্র দফতর বরোদার মহারাজকে প্রচুর সম্মান করে।' তিনি আশ্বস্ত হলেন।

গভীর রাত অবধি পাশের ঘরে তাঁর মৃদু পায়চারি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে বললেন, তিনি মনস্থির করেছেন, আমার সঙ্গে পরের দিন ভেনিস যাবেন।

ট্রেনে উঠেই তিনি হঠাৎ অত্যন্ত শান্ত হয়ে গেলেন। ভেনিস না পৌছনো পর্যন্ত এখন আর কিছু করার নেই।

গভীর রাত্রে স্লীপিং কোচের ক্ষীণালোকে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি কী প্রশান্ত মমতাময় তাঁর মুখচ্ছবি! খানিকক্ষণ পরই ইটালিতে ঢুকবো—যে দেশের মাদোন্না-মাতৃমূর্তি সর্ব বিশ্বে সমাদৃত হয়। আমার মনে হল আমার এই মাটিল্‌ডের মুখে যে মাদোন্নার ছবি ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে এ ক'দিন ধরে প্রহরে প্রহরে, সে তো যে কোনো গীর্জার বেদীকে উজ্জ্বল করে দিতে পারে। এ

রমণী গর্ভে সন্তান না ধরেও মা-জননী মাদোন্নাদের ভিতর শাশ্বত আসন পেল।

কেন পাবে না? জাতকে আছে, একদা নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সময় এক ভিখারিণী নগরপ্রান্তে খর্জুর বৃক্ষের অন্তরালে শিশুসন্তান প্রসব করে পৈশাচিক ক্ষুধার উৎপীড়নে গ্রাস করতে যাচ্ছিল তাকে। তারই পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক বন্ধ্যা শ্রেষ্ঠিনী, সন্তান কামনা করে মহাকালের মন্দিরে পূজা দিতে। মাতৃস্নেহাতুরা অনুনয় করে নবজাতককে কিনতে চাইলেন। পিশাচিনী অট্টহাস্য করে উত্তর দেয়, তার ক্ষুধা মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করতে পারবে না। বরনারী বললেন, 'তবে তিষ্ঠ; এই যে আমার বন্ধ্যাবক্ষের সুপুষ্ট স্তন, অকর্মণ্য নিষ্ফল এ স্তন কোনো শিশুকে দুগ্ধ যোগাতে পারে নি—এটা আমি খর্জুরপত্র দ্বারা কর্তন করে তোমাকে দেব। তোমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে।' পাগলিনী আবার অট্টহাস্যে বললে, 'তুমি জানো না, আপন হাতে আপন মাংস কর্তন করাতে কী অসহ বেদনা, তাই বলছ।' রমণী বাক্যব্যয় না করে কর্তন আরম্ভ করতে না করতেই দরদর বেগে নির্গত হল সেই বন্ধ্যা স্তন থেকে রক্তের বদলে অফুরন্ত মাতৃদুগ্ধ। ভিখারিণী শিশু উভয়েই সে দুগ্ধ পান করে পরিতৃপ্ত হল। অলৌকিক অবিশ্বাস্য এ ঘটনার কথা শুনে তথাগতের শিষ্যরা তিনজনকেই নিয়ে এলেন তাঁর সামনে। অমিতাভ সানন্দে বললেন, 'মাতৃস্নেহ অলৌকিক ক্রিয়া উৎপাদনে সক্ষম।'

বাঞ্ছিতা মাটিল্‌ডের মুখে দিব্য জ্যোতি দেখা দেবে না কেন?

ভেনিস বন্দরে জাহাজের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মাটিল্‌ডে আমার হাত ধরে বার বার অনুরোধ করলেন, আমি যেন বোম্বাই পৌঁছেই কেব্‌ল্ করি, ছেলেটি কবে কোন্ জাহাজে ইয়োরোপ পৌঁচচ্ছে। তাঁর চোখে জল, কিন্তু তাতে আনন্দের রেশও ছিল।

বোম্বাই পৌঁছে খবর নিয়ে জানলুম, ছেলেটি চলে গেছে। মাটিল্‌ডেকে পাকা খবর জানিয়ে দিলুম।

বরোদায় পৌঁছিবার মাসখানেক পরে বন্ধু ওয়াডিয়া—তাঁকে এসব কিছুই বলি নি—কথায় কথায় বললেন, কাণের ছেলেটি কখন যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে কেউ টের পায় নি। খাটের উপর একখানা চিরকুট পাওয়া যায়। অসুস্থ শরীর নিয়ে সে চিরজীবন কারো বোঝা হয়ে থাকতে চায় নি।

আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় নি। হা, হতভাগ্য! তুমি জানতেও পারলে না, স্বয়ং মা মেরি তোমার জন্য বন্দরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন!

আর মাটিল্‌ডে!

প্রেমের প্রথম ভাগ

সর্বপ্রথমই করজোড়ে নিবেদন, এ অধম মরালিটি ইমমরালিটি কোনো কিছুই প্রচারের জন্য এই 'ফরাসী হ্যাণ্ডবুক ফর বিগিনার্স ইন লভ্' লিখতে বসে নি। অবশ্য স্বীকার করি, আমি প্রাচীনপন্থী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে নিই—যাতে করে আমার প্রতি অবিচার না হয়—মডার্ন কবিতা, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ট্রাম-বাস পোড়ানো, পেট-কাটা ব্লাউজ ইত্যাদির বিরুদ্ধে না আছে আমার কোনো অভিযোগ, না চাই আমি দেশের জনসাধারণকে—তন্মধ্যে আমি নিজেও আছি—খৃষ্ট-বুদ্ধ রূপে দেখতে। বিশেষতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস। জনসাধারণে রটে গেছে, আমি নাকি ঐ বস্তুর শত্রু। এটা আমার প্রতি বেদরদ জুলুম। প্রথমত, জনপ্রিয় কোনো জিনিস, অভ্যাস বা আদর্শের শত্রু হতে আমি কিছুতেই সম্মত হই নে। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গেলে পথে যে সব খানাখন্দ পড়ে, সেগুলোর প্রতি লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি তো ওঁদের সেবা করে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। বস্তুত আমি নিজেই একখানা লিখব বলে স্থির করেছি। তবে নিশ্চয়ই জানি অধুনা যেগুলি জনপ্রিয় তার চেয়ে আমার বই অনেক নিরেস হবে; ভরসা এই, দালদাই বাজারে বেশি বিক্রি হয়, আমারটার কাটতি সেই কারণেই হবে অধিকতর।

তবে আমার এ 'ফরাসী হ্যাণ্ডবুক' লেখার সময় ইতিহাসের শরণ নেব অল্পই। যদিও আমার মনে হয়, পেট-কাটা বা টপ-লেসের নিন্দায় যখন হরিশ মুখুজ্যেরা কলরব করে ওঠেন তখন আধুনিকাদের উচিত একটুখানি ইতিহাসের পাতা উল্টোনো, কিংবা ইতিহাসের বাস্তব নিদর্শনভূমি মিউজিয়মে গমন। জাতকে আছে, একটি জেদী রমণী বসন্তোৎসবে যাবার সময় একটি বিশেষ রকমের দুর্লভ ফুল কামনা করে তার স্বামীকে রাজার বাগানে চুরি করতে পাঠায়। ধরা পড়ে বেচারা যখন শূলে চড়েছে তখন সে তার নিষ্ঠুর অকালমৃত্যুর জন্য রোদন করে নি। সে উচ্চকণ্ঠে শোক প্রকাশ করছিল এই বলে, 'আমি মরছি তার জন্য আমার দুঃখ নেই, প্রিয়ে; আমার ক্ষোভ, তুমি তোমার প্রিয় পুষ্পপ্রসাধন করে যে বসন্তোৎসবে যেতে পারলে না তার জন্য।'

তা হলে সপ্রমাণ হল, তথাগতের যুগেও রমণী ফ্যাশানের জন্য এমন ফুলও কামনা করতেন, যেটা শুধু রাজবাড়িতেই পাওয়া যেত, এবং সেটা যোগাড় করার দুঃসাহসিক অভিযানের ফলস্বরূপ তিনি বিধবা হতেও রাজী ছিলেন। এবং শুধু তাই নয়, সে-যুগের স্বামীসম্প্রদায় অতিশয় দার-নিষ্ঠ ছিলেন। প্রিয়ার

মনোরঞ্জনার্থে হেলায় প্রাণ বিসর্জন দিতেন। এই দৃষ্টান্ত কি এ-যুগের যুবক-সম্প্রদায়কে আত্মোৎসর্গের স্বর্গীয় পন্থা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করবে না?

অবশ্য পাঠক বলতে পারেন এ ধরনের ঘটনা সাতিশয় বিরল।

সাতিশয় বিরলই যদি হবে তবে আমাদের কবিগুরু ঐ ধরনের উদাহরণই জাতক থেকে নেবেন কেন?—

'—বালক কিশোর,
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ।'

এবং যেন এ-কবিতাতেই প্রোপাগাণ্ডা কর্ম নিঃশেষ হল না বলে কবি বৃদ্ধ-বয়সে ঐ বিষয় নিয়ে আরো মনোরঞ্জক, আরো চিত্তচাঞ্চল্যকর গীতি-নৃত্য-নাট্য 'শ্যামা' রচনা করলেন।

এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি যে, আমার যতদূর মনে পড়ছে মূল জাতকে গল্পটি একটু অন্যরকমের। আমার স্মৃতিশক্তি হয়তো আমাকে ঠকাচ্ছে, কিন্তু আমার যেন মনে পড়ছে, উত্তীয়কে কোন কিছু না বলেই তাকে শ্যামা নগরপালের কাছে পাঠায়। তাকে আগের থেকেই শ্যামা বলে রেখেছিল, কিংবা উত্তীয়েরই হাত দিয়ে চিঠি লিখে তাকে জানায়, পত্রবাহককে শূলে চড়াও; বজ্রসেনকে মুক্তি দাও। এবং বোধ হয় ঘুষের টাকাও কিছু ছিল, আর সেটাও উত্তীয় তার আপন ভাণ্ডার থেকেই দিয়েছিল—তাবৎ ঘটনার কোনো কিছু না জেনেশুনেই। আবার মাফ চাইছি, ভুল হতে পারে, শ্যামা বোধ হয় উত্তীয়কে বলে 'তুমি এই চিঠি ও অর্থ—' সেটা শ্যামার কিংবা উত্তীয়ের—'নগরপালকে দিয়ে এলে আমি একান্ত তোমারই হব।'*

পাঠক স্বপ্নেও ভাববেন না, আমি শ্যামা বা পুষ্পবিলাসিনীর কার্যকলাপ

---

* রবীন্দ্রনাথ জাতক, ইতিহাস ও অন্যান্য কিংবদন্তীমূলক যে সকল কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন, সেগুলো মূলের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি কি কি পরিবর্তন করেছেন, সে সম্বন্ধে প্রামাণিক গবেষণা করে কেউ ডক্টরেট নেন না কেন?

সম্মতির চোখে দেখছি। আধুনিকাদের অধঃপাতগমনের অহেতুক অভিযোগ কানে এলে আমার এসব দৃষ্টান্ত মনে আসে, এই মাত্র।

তবে এ নিয়ে ভাববার আছে।

যে কালে মুরুব্বীরা মেয়ের বিয়ে ঠিক করে দিতেন, সে সময় ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মুরুব্বীদের ভিতর ভালো বর পাওয়ার জন্য যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত না তা নয়। বস্তুত যে কনের সঙ্গে লোভনীয় বরের বিয়ের কথাবার্তা এগিয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে নাকি উড়ো চিঠি পর্যন্ত যেত তৃতীয় কন্যাপক্ষ থেকে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সংগ্রামে আবার নীতি কি! এবং কিছুমাত্র নতুন তত্ত্ব নয় যে, কুরু-পাণ্ডবরা কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন সে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এ যুগে, বিশেষ করে কলকাতা এবং অন্যান্য বড় শহরে অনেক মেয়েকেই বাধ্য হয়ে বরের সন্ধানে বেরুতে হয়। এবং বররাও বেরোন কন্যার সন্ধানে। ফলে বিত্তশালী, রূপবতী বা উচ্চশিক্ষিতা যার যেমন অভিরুচি— কনের জন্য ছোকরাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে যায়, এবং উল্টোটাও হয়। বোধ হয় সুলেখক সুবোধ ঘোষের গল্পেই পড়েছি, তিনটি মেয়ে তিনটি ফুলের তোড়া নিয়ে পাল্লা দেন এক শাঁসালো বরকে স্টেশনে সী-অফ করতে গিয়ে।

এসব বিয়ে যে দেখা মাত্রই দুম্ করে স্থির হয় না সে-কথা বলা বাহুল্য। কিঞ্চিৎ পূর্বরাগ, প্রেম বা প্রেমের অভিনয়ের প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো স্থলে এটাকে কোর্টশিপও বলা হয়। আমাদের দেশে একদা গান্ধর্ব-বিবাহের প্রচলন ছিল। সে বিবাহ হত বিবাহের পূর্বেকার প্রণয়ের ভিত্তিতে।

কিন্তু এদেশে এখনো প্রণয়ের কোনো কোড্ নির্মিত হয় নি, অর্থাৎ যুবক-যুবতীতে কতখানি প্রণয় হওয়ার পর ছেলে কিংবা মেয়ে আশা করতে পারে যে এবারে অন্য পক্ষ তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত, এবং তখন যদি সে হঠাৎ তাকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে তবে সমাজে তার নিন্দা হয়। ইয়োরোপে মোটামুটি দুটো ধাপ আছে। দু'জনাতে প্রণয় হওয়ার ফলে যদি ছেলেটা মেয়েটিকে ফরাসীতে 'আমি', জর্মনে 'ফ্রয়েণ্ডিন্' ('গার্লফ্রেণ্ডে'র চেয়ে এটাকে ঘনিষ্ঠতর বলে ধরা হয়) বলে উল্লেখ করে তার তখনো মোটামুটি বিয়ের দায়িত্ব আসে না। এটা প্রথম ধাপ। কিন্তু ফরাসীতে 'ফিয়াঁসে'—জর্মনে ঐ একই শব্দ বা 'ফেরলব্‌ট্' ব্যবহৃত হয়—পর্যায়ে পৌঁছলে সেটাকে দ্বিতীয় ধাপ বলা হয়। এবং সে সময় যদি যুবক তাকে এনগেজমেণ্ট আংটি দেয় (অর্থাৎ মেয়েটি তখন 'বাগদত্তা' হল যদিও অর্থটা কিছু ভিন্ন) তবে সেটা বিয়ের প্রতিশ্রুতি

বলেই ধরা হয়। তারপর সে বিয়ে করতে না চাইলে অনেক স্থলে মেয়েটি আদালতে প্রতিজ্ঞা বা চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমা করে খেসারতি চাইতে পারে। সমাজে বদনাম তো হয়ই। মহাভারতে রুক্মিণী বাগদত্তা ছিলেন বলে পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিয়ে করলে শ্রীকৃষ্ণের শত্রুপক্ষ তাঁর নিন্দা করে।

এদেশে প্রণয়ের কোনো স্তরেই বোধহয় এরকম আংটি দেবার রেওয়াজ প্রচলিত হয় নি। তবে প্রণয় ঘনীভূত হওয়ার পর (কতটা ঘনীভূত এবং তার চিহ্ন কি, সেটা বলা কঠিন) যদি কোনো পক্ষ অকারণে 'রণে ভঙ্গ' দেয়, তবে তার যে বদনাম হয় সেটা সুনিশ্চিত। ইয়োরোপেও যে-মেয়ে অকারণে একাধিক প্রণয়ীকে পর পর ত্যাগ করে সে 'জিল্ট' এই বদনামটি পায়।

নিছক প্রেমের জন্য প্রেম—বিয়ে করার উদ্দেশ্য কারোরই নেই—এটা বোধ হয় এদেশে বিরল। ইয়োরোপে মোটেই বিরল নয়। ছাত্র, ছাত্রী, মেয়ে কেরানী, ছোকরা এসিসটেণ্টের ভিতর এ-জাতীয় প্রেম আকছারই হয়। এ-জাতীয় প্রণয়ের ফলে যদি কোনো কুমারী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যায় তবে কোনো কোনো স্থলে সে যুবকের বিরুদ্ধে খেসারতির মোকদ্দমা আনতে পারে। আমি যতদূর জানি, বিয়ে করতে বাধ্য করাতে পারে না—তবে রাশাতে বোধহয় সন্তানটি অন্তত পিতার নামটা আইনত পায়, অর্থাৎ জারজ রূপে ঘৃণার পাত্র হয় না। ইয়োরোপে যদি যুবা প্রমাণ করতে পারে যে, মেয়েটার একাধিক প্রণয়ী ছিল তবে তাকে বা অন্য কাউকে কোনো খেসারতি দিতে হয় না। এক বলশেভিক আমাকে বলেন, এক্ষেত্রে রাশায় সব ক'জনাকে খেসারতি ভাগাভাগি করে দিতে হয়।

তবে ইয়োয়োপের মেয়েরা যুগ যুগ ধরে প্রেমের মারফতে বিয়ে করেছে বলে অনেক কিছু জানে, এবং আর পাঁচজন বিচক্ষণ বান্ধবীদের কাছ থেকে উপদেশও পায়।

এদেশের তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে আমার যোগসূত্র নেই। তবে আমার সব সময়েই মনে হয়েছে আমাদের মেয়েরা বড় অসহায়।

* * *

সিরিয়স প্রবন্ধ লিখব বলে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। আমি প্রণয়, বিবাহ, লাভ ফর লাভস্ সেক্ ইত্যাদি সম্বন্ধে ফরাসীদের দু-একটি মতামত লিখতে যাচ্ছিলুম মাত্র। এ বাবদে ফরাসীদের অধিকারই যে সব চেয়ে বেশি, সেকথা বিশ্বজন মেনে নিয়েছে। লোকে বলে অবাধ অবৈধ প্রেম নাকি ঐ দেশেই সব চেয়ে বেশি। আমি কিছু বলতে নারাজ, তবে একটা কথা জানি। ডিভোর্স বা লগ্নচ্ছেদ ফরাসীরা নেকনজরে দেখে না। পারিবারিক শান্তি ও শিশুদের

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা বড়ই সচেতন। স্বামী-স্ত্রী দুজনাই কিঞ্চিৎ অসংযমী হলে ফরাসী সমাজ সয়ে নেয়, কিন্তু তারা একে অন্যকে ডিভোর্স করতে চাইলে সমাজ অসন্তুষ্ট হয়।

ইয়োরোপের উন্নত দেশগুলো যে-স্থলে গিয়ে পৌঁচেছে আমরাও একদিন সেখানে গিয়ে পৌঁছব, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না (অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে, আমি ইয়োরোপের প্রেম তথা বিবাহ-পদ্ধতির নিন্দা করছি। বস্তুত বাইরের অন্য সভ্যতা অন্য ঐতিহ্যের মানুষ হয়ে আমার পক্ষে ইয়োরোপীয় সভ্যতা বিচার করতে যাওয়াটা খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। যাঁরা আমার চেয়ে বহু ঊর্ধ্বে উঠে প্রকৃত সত্য দেখতে পান তাঁরাই বোধহয় অনাসক্তভাবে আপন দেশ ও বিদেশ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবার অধিকার ধরেন)। এদেশের ঐতিহ্য তাকে প্রেম বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে অন্য প্যাটার্ন বানাতে শেখাবে—এই আমার বিশ্বাস।

* * *

যে ফরাসী যুবতী কয়েকটি তরুণীকে হাসিঠাট্টার ভিতর দিয়ে সদুপদেশ দিচ্ছিলেন তাঁর কথাগুলো শুনে আমি আমোদ অনুভব করছিলুম। তরুণীদের ভাবভঙ্গি-কথাবার্তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল তাঁরা যুবতীটিকে প্রেমের ভুবনে রীতিমত 'সাকসেসফুল' বা বিজয়িনী বলে মনে করছিলেন। তিনি খাচ্ছিলেন কন্যাক্ ও চেসার, অতি ধীরে মন্থরে। অর্থাৎ সামান্য কয়েক ফোঁটা কন্যাক্ পান করে সঙ্গে সঙ্গে অন্য গেলাস থেকে এক ঢোক জল। এই জল কন্যাক্‌কে chase করে নিয়ে যায় বলে একে বলে 'চেসার'। যুবতীটি যে পান বাবদে শুধু সমজদার তাই নয়, আমার মনে হল তিনি এ বাবদে পরিপূর্ণ আত্মকর্তৃত্বও বজায় রাখেন।

লম্বা হোল্ডারে সিগরেট ধরিয়ে, ঊর্ধ্বপানে ধুঁয়োর একসারি চক্কর চালান করে বললেন, 'লেয়োঁ ব্লুমের কেতাবখানা মন দিয়ে পড়ো। বিবাহ সম্বন্ধে তিনি অনেক খাঁটি কথা বলেছেন।' ব্লুম একদা ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি তাঁর বইয়ে বলেন, প্রেম, যৌনজীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ যুবক-যুবতীর বিবাহ সাধারণত তাদের জীবনে দীর্ঘকালব্যাপী দাম্পত্য সুখশান্তি দিতে পারে না। উচিত, উভয় পক্ষেরই এ-সব বিষয়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর বিয়ে করা। বলা বাহুল্য, এ বই প্রকাশিত হলে ইংলণ্ডের অনেকেই এটাকে 'শকিং' 'গর্হিত' বলে নিন্দা করেছিলেন।

সুন্দরীটি ব্লুমের মূল বক্তব্য প্রাঞ্জল ভাষায় পেশ করে বললেন, 'দেখো, আমি নিজে বিশ্বাস করি, নারী-পুরুষ দুই যুযুধান শক্তি, একে অন্যের শত্রু—'

একটি তরুণী কফির ঢোক গিলতে গিয়ে মারাত্মক বিষম খেয়ে বললে, 'আপনি

এ কি কথা বলছেন! কবি দুর্গ্যা এখনো আপনার কথা ভুলতে পারেন নি—আপনি তাঁকে বিদায় দেওয়ার পরও। এখনো তাঁর মুখে ঐ এক মন্ত্র: আপনার মত প্রাণ-মন, সর্বহৃদয়, সর্বস্ব দিয়ে এরকম আত্মহারা হয়ে কেউ কখনো ভালোবাসতে পারে নি।'

যুবতী স্মিত হাস্যভরা চোখে তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেচারী আঁদ্রে! তোমার এখনো অনেক-কিছু শেখবার বাকি আছে। আমি আর্টিস্ট। আমি যা-ই করি নে কেন, সেটাকে পরিপূর্ণতার চরমে পৌঁছিয়ে দিয়ে করি। যখনই ভালোবেসেছি, 'আত্মহারা' হয়েই ভালোবেসেছি। কিন্তু, ডার্লিং, ইহুদিও কি তার ব্যবসা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে আত্মহারা হয়ে ভালোবাসে না? তাই বলে সে কি তার মুনাফার কথা ভুলে যায়? যে ব্যবসাকে সে আপন প্রিয়ার চেয়েও বেশি ভালোবাসে তাকে সে অকাতরে বিসর্জন দেয় না, যদি দেখে সেটা দেউলে হয়ে যাওয়ার উপক্রম?

তাই বলছিলুম, পুরুষ রমণীর শত্রু। যে কোনো পুরুষ আমাকে 'আত্মহারা' হয়ে ভালোবাসলেও একদিন সে আমাকে অকাতরে বিসর্জন দিতে পারে—আমি যে-রকম মঁসিয়ো দুর্গ্যাকে দিয়েছিলুম। অবশ্য আমি স্যাডিস্ট নই, তাই তাকে ড্রপ করার সময় যতদূর সম্ভব মোলায়েমভাবে সেটা সম্পাদন করি—তদুপরি বলা তো যায় না, কখন কাকে আবার প্রয়োজন হয়!'

আরেকটি তরুণী বললে, 'কিন্তু দান্তে—?'

মাদাম বললেন, 'ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি—যদিও ওঁর কাব্য আমার প্রেমপত্রে কাজে লেগেছে। ঐ ধরনের মানুষ আমি দেখি নি। তবে এইটুকু বলতে পারি, যারা কারো বিরহে বা মৃত্যুতে দীর্ঘদিন ধরে আপসা-আপসি করে সেটা শুধু তাদের আত্মম্ভরিতা। নিজের কাছে স্বীকার করতে চায় না যে, এই-বারে তার অন্য ব্যবসা ফাঁদা উচিত। মনস্তত্ত্বে ওদের বলা হয় ম্যাজোকিস্ট্—নিজকে নিজে কষ্ট দিয়ে সুখ পায়। ঐ যে-রকম অনেক সর্বত্যাগী অনাহারে থেকে সুখ পান! তোমার আমার স্বাস্থ্য আছে, ক্ষুধা আছে, আমরা নর্মেল্। খাদ্য যখন রয়েছে তখন উপোস করবো কোন্ দুঃখে?'

'তবে কি একনিষ্ঠ প্রেম বলে কিছুই নেই?'

'কী উৎপাত! কে বললে নেই? নিশ্চয়ই আছে। যখন যাকে ভালোবাসবে তখন তার প্রতি একনিষ্ঠ হবে, আঁদ্রের ভাষায় আত্মহারা হবে। একাধিক জনের সঙ্গেও অক্লেশে একনিষ্ঠ হওয়া যায়। ঐ তো আমার এক বন্ধু ছিলেন লিয়োঁতে। সেখানে মাঝে মাঝে উইক-এণ্ড করতে যেতুম। চমৎকার কথাবার্তা

বলতে জানেন। বাড়িটিও সুন্দর। প্যারিসে প্রতি বৃহস্পতিবারে আমার ফ্ল্যাটে আসতেন আরেক বন্ধু। উনি বিবাহিত। অন্য সময় সুযোগ পেতেন না। তা ছাড়া চাকরির উন্নতির জন্য অফিসের এক বৃদ্ধ কর্তার সঙ্গে তাঁর মোটরে মাঝে মাঝে বেরুতে হত। তিনি আবার ভয়ানক ভীতু। যদি কেউ দেখে ফেলে! তাই রাত্রে মোটরে করে শহর থেকে দূরে যেতে হয় তাঁর সঙ্গে। এদের প্রত্যেককে যদি একনিষ্ঠভাবে না ভালোবাসি তবে—ঐ যে বললুম পুরুষ মাত্রই শত্রু—সে শত্রু ধরে ফেলবে না আমার ভারসেটাইলিটি—বহুমুখী প্রতিভা? শুনেছি, এবং বিশ্বস্তসূত্রেই, যে রসরাজ কবি, যোদ্ধা, ঔপন্যাসিক, শাসনকর্তা দান্নুনদ্জিয়ো একসঙ্গে একগণ্ডা সুন্দরীর সঙ্গে একনিষ্ঠ প্রেমের উচ্চাঙ্গ সাধনা করেছেন, তিনি একই সময়ে চারজনকে যে চার সিরীজ প্রেমপত্র লিখেছেন, তার প্রত্যেকটি অতিশয় অরিজিনাল মাধুর্যময় কবিত্বপূর্ণ—কোনো সিরীজের সঙ্গে কোনো সিরীজের সাদৃশ্য নেই। প্রত্যেকটি বল্লভা আপন সিরীজ পেয়ে ধন্যা হয়েছেন।'

তারপর আরেক তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যুজান্, তুমি এ লাইন ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল। পল্ আর মার্সেল তোমাকে একই সময়ে ভালোবাসতো; আর তুমি মাত্র দুটোকে সামলাতে পারলে না? হায়! প্যারিস কোথায় এসে পৌঁচচ্ছে? আর ডার্লিং স্যুজান্, তুমি নাকি জানতেও না, পল্ আর মার্সেল উভয়েরই তখন আরেক প্রস্ত প্রিয়া ছিল!'

স্যুজান্ তাজ্জব মেনে বললো, 'তাই নাকি? মঁ দিয়ো!'

নানেৎ বললে 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রূল? দ্বিধা করে সিধা রাখো?'

মাদাম বললেন, 'ও! তা কেন? মেনাজ্ আ ত্রোয়া (menage a trois = management by three) যদিও এখন ফ্রান্সে একটু আউট অব ডেট্—তবু তিনজনে মিলেমিশে থাকাটা তো ট্রায়েল পেতে পারে, কিন্তু সব সময়েই মনে রাখতে হবে, শান্তিভঙ্গ যেন না হয়, নো স্ক্যাণ্ডাল, প্লীজ! আর ডুয়েল, খুন, আত্মহত্যা এগুলো তো বর্বরতার চরম—ভুল বললুম, বর্বরদের ভিতর এসব অপ্রিয় ঘটনা প্রায় কখনোই ঘটে না। এগুলো ঘটলে মনের অশান্তি খানিকটে হয় বটে, কিন্তু তার চেয়ে মারাত্মক বদনাম ছড়ায় ভবিষ্যতের বিয়ের বাজারে। অবশ্য এমন কোনো বদনাম নেই যেটা আস্তে আস্তে মুছে ফেলা যায় না। এবং কোনো কোনো স্থলে একাধিক পুরুষ আকৃষ্ট হয় 'ফাম্ ফাতাল্' (fatal woman), 'বিপজ্জনক রমণী'র প্রতি।'

ইনি তাঁদেরই একজন কি-না সেটা জানবার কৌতূহল আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

ইতিমধ্যে তার কন্যাক্ শেষ হয়ে গিয়েছে দেখে গুটিতিনেক তরুণী একসঙ্গে ওয়েটারকে ডাকলে। যুবতী রাজ-রাজেশ্বরীর মত বাঁ হাতখানা দিয়ে যেন বাতাসের একাংশ দু'টুকরো করে অসম্মতি জানালেন, বললেন, 'সুইট্ অব্ ইউ, কিন্তু জানো তো আমার সোনার খনিতে এখন ডবল শিফ্‌টে কাজ চলছে। দ্বিতীয় শিফ্‌টায় আমি অবশ্য অনেকখানি সাহায্য করি। এমনিতেই আমি এক গাদা টাকার কুমিরকে চিনতুম, এখন আমার 'মারী' (স্বামী) প্রতি রাত্রেই দু-একটি নয়া নয়া বাঘ-ভাল্লুক শিকার করছেন আমাকে তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে।—তোমরা বরঞ্চ শ্যাম্‌পেন খাও।'

তরুণীদের একাধিক জন আনমনা হয়ে ভাবলে তাদের জীবনে এ সুদিন আসবে কবে?

হঠাৎ যেন বিজয়িনীর একটি গভীর তত্ত্বকথা মনে পড়লো। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিন্তু, যাদুরা, একটি কথা মনের ভিতর ভালো করে গেঁথে নিয়ো। ব্লুম এটা বলেন নি। সর্বপ্রেমের চরম গতি যখন পতিলাভ তখন সে-পথে নামবার আগে একটি মোক্ষম তত্ত্ব ভুললে চলবে না। ব্লুম বলেছেন, প্রথম ইদিক-উদিক প্রেম এবং ফ্যাকট্‌স অব্ লাইফ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর, ইংরিজিতে পুরুষের বেলা যাকে বলা হয় 'বুনো ভুট্টা বপন'—সেইটে হয়ে গেলে পর বিয়ে করবে। তা হলে একের অন্যের প্রতি সহিষ্ণুতা হবে অনেক বেশি, একে অন্যকে সাহায্য করতে পারবে অনেক বেশি—দাম্পত্য জীবন তাই হবে দীর্ঘকালব্যাপী ও মধুর। ব্লুমের উদ্দেশ্য অতিশয় মহৎ এ-বিষয়ে কেউ সন্দেহ করবে না। আমি তো নিশ্চয়ই করবো না, কারণ তিনি অতিশয় নীতি-বাগীশ—'

কোরাস উঠলো তাবৎ তরুণী কণ্ঠে, 'কি বললেন, মাদাম?'

কণামাত্র বিচলিত না হয়ে মহিলাটি ধীরে সুস্থে আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে বললেন, 'কট্টর নীতিবাগীশ, ধর্মভীরু, আচারনিষ্ঠ এবং ছিন্নভিন্ন উদ্দেশ্যহীন ফরাসীসমাজকে নৈতিক দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যগ্র। তিনি ইহুদি, এবং অনেকেই যে রকম তাঁর ইহুদি-ভ্রাতা ফ্রয়েট্‌কে ভুল বোঝে, এঁর বেলাও তাই হয়েছে। আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি এবং জানি তিনি নীতি, মরালিটিতে অতিশয় আস্থাবান। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন, প্রাচীন নীতি পরিবর্তন করে—বরং বলবো সেটাকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী ও কল্যাণময়ী করে সম্পূর্ণতর করে তোলবার জন্য নবীন নীতির প্রয়োজন। তিনি সেইটে প্রবর্তন করতে চান। কিন্তু এই নবীন নীতি প্রবর্তন

করতে পারি শুধু আমরা ফরাসীরাই। যেরকম আমরাই সর্বপ্রথম ফরাসীবিদ্রোহ করে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা প্রবর্তন করি। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ, এমন কি জর্মনিরও লাগবে এ নীতি গ্রহণ করতে অন্তত একশ বছর। তারা তো এখনো গণতন্ত্রটাই রপ্ত করতে পারেনি। আর যেসব দেশ ধর্ম উৎপাদন করেছে—যেমন প্যালেস্টাইন, আরবদেশ, ইণ্ডিয়া, এরা এ নীতি কখনো গ্রহণ করতে পারবে না, আর যদি করে তবে তাদের সর্বনাশ হবে।'

আমি মনে মনে সম্পূর্ণ সায় দিলুম। এবং যোগ দিলুম, হয়তো চীন পারবে।

'কিন্তু একটা প্র্যাকটিকাল উপদেশ আমি দিই। বিয়ের পূর্বের সর্ব অভিজ্ঞতা যেন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে হয়। তার প্রথম কারণ তারা প্রবীণতর, পক্বতর। তাদের কাছে শুধু প্রণয় নয়, জীবনের মূল্যবান আরো অনেক-কিছু শেখা যায়। কিন্তু খবরদার, আহাম্মুকের মত ককৃখনো তাকে বলবে না, তোমার বউকে ডিভোর্স করে আমাকে বিয়ে করো। এক্স্‌পেরিমেণ্টের ইঁদুরকে আকাট মূর্খও বিয়ে করে না।

আরেকটা কারণ বললে তোমাদের তরুণ-হৃদয়ে হয়তো একটু বাজবে।

ঐ বিবাহিতদেরই দু'পয়সা রেস্ত থাকে। বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে আর সেফ হাওয়া খেয়ে খেয়ে জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় হয় না। সেটা হয় জনসমাজে। ক্লাব, রেস্তোরাঁ, অপ্‌রা, জুয়োর কাসিনো, রেস্, রিভিয়েরা-স্বইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ, এগুলো না করলে, না চষলে কোনো এলেমই হয় না, যেটা তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী ও দাম্পত্য-জীবনে কাজে লাগবে।

আরেকটা স্ববিধে, বলা তো যায় না, তিনি যদি মাত্রা সামলাতে না পেরে তোমাকে বিয়ে করতে চেয়ে বসেন, তুমি তখন অতিশয় ব্রীড়া সহকারে বলতে পারবে, "আমি চাই নে যে আপনার স্ত্রীকে ডিভোর্স করে আপনি একটি পরিবার নষ্ট করুন।"

এবং শেষ স্ববিধে, যেদিন তুমি কেটে পড়তে চাইবে, সেদিন স্বচ্ছন্দে বলতে পারবে, "আমারও তো সংসার পাততে হবে, আমারও তো সমাজের প্রটেকশন দরকার", তারপর ব্লাশ করে বলবে, "আমিও তো, আমিও তো মা হতে চাই"।'

কি বলবো পাঠক, সে যা অনবদ্য অভিনয় করলেন সেই বিবাহিতা যুবতীটি—আহা, যেন ষোল বছরের তরুণীটি, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। ধন্য নটরানী প্যারিস, ধন্য তোমার অভিনয়, ধন্য তোমার নব মরালিটি! সাধে কি

লোকে বার বার বলে, 'সী প্যারিস এ্যাণ্ড ডাই'। প্যারিস দেখার পর পৃথিবীতে দেখবার মত আর তো কিছু থাকে না।

তবে আমার অনুরোধ, অন্যান্য বহু বস্তু নির্মাণ করার সময় ফ্রান্সে আইনত যেমন ছাপ মারতে হয়, 'নট্ ফর্ এক্সপোর্ট'—'বিদেশে চালান নিষিদ্ধ', এই নব মরালিটির উপরও যেন তেমনি ছাপটি সযত্নে মারা হয়।

তবে আমি এটি আমদানি করলুম কেন? বুঝিয়ে বলি। বিদগ্ধা যুবতীটি যা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলেছিলেন আমি তার সহস্রাংশের একাংশও বলি নি। আমি শুধু সেটুকুই বলেছি, যেটুকু আপনার জানা থাকলে যদি কখনো প্যারিসের ঐ নব মরালিটিটি এদেশে চোরাবাজার দিয়ে বা স্মাগল্‌ড্ হয়ে চলে আসে তবে যেন তৎক্ষণাৎ সেটি চিনতে পারেন।

চার্লি চ্যাপলিন এই কর্মটি করেছিলেন। অনেকেই তার 'মঁসিয়ো ভের্দু' ছবি দেখেছেন। চ্যাপলিনের পূর্বেও তার সময়ে ইয়োরোপের কোনো কোনো দার্শনিক সাড়ম্বর প্রচার করেন, জীবনসংগ্রামে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেন সর্বাস্ত্র প্রয়োগ করে সর্ব প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'অর দ্য কঁবা'—দরকার হলে খতম করে দেয়। সেই হাস্যাস্পদ দর্শনের বেকুব চরম পরিণতি প্রমাণ করার জন্য চ্যাপলিন দেখান কি-ভাবে একজন লোক একটার পর একটা ধনী প্রাপ্তবয়স্কা রমণীকে বিয়ে করে তাকে সুকৌশলে খুন করে অর্থ সঞ্চয় করতে থাকে। কিন্তু খুনের কৌশলটি ছবিতে দেখান নি।

আমিও বিদগ্ধা প্যারিসিনীর আসল অস্ত্রটির রহস্য সযত্নে গোপন রেখেছি।

মদ্যপন্থা ওরফে মধ্যপন্থা

মদ্যপান ভালো না মন্দ সে নিয়ে ইয়োরোপে কখনো কোনো আলোচনা হয় না—যেমন তাস খেলা ভালো না মন্দ সে-নিয়েও কোনো তর্কাতর্কি হয় না। কিন্তু এ-কথা সবাই স্বীকার করেন যে মাত্রাধিক মদ্যপান গর্হিত এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক—যে রকম তাস খেলাতে মাত্রাধিক বাজী রেখে, অর্থাৎ সেটাকে নিছক জুয়ো খেলায় পরিণত করে সর্বস্ব খুইয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই অনুচিত।

এ দুটো ব্যসন যে আমি একসঙ্গে উত্থাপন করলুম সেটা কিছু এলোপাতাড়ি নয়। কুরান শরীফে এ-দুটিকে একসঙ্গে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ দুটির উৎপত্তি-স্থল স্বয়ং শয়তান। তৎসত্ত্বেও ইদানীং পূর্ব পাকিস্তানের একখানি দৈনিকে আলোচনা হচ্ছে, মাত্রা মেনে, অতিশয় সাবধানে কিংবা স্বাস্থ্যলাভের

জন্য সামান্য মদ্যপান করা শাস্ত্রসম্মত কিনা ? এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট আলোচনার জন্য যতখানি মুসলিম শাস্ত্রজ্ঞান থাকা উচিত আমার সেটি নেই। এবং শাস্ত্র ছাড়া লোকাচার, দেশাচার নামক প্রতিষ্ঠান আছে। উভয় বাঙলার এই দুটি আচারে মদ্যপান নিন্দিত। বরঞ্চ পশ্চিম বাঙলার কোনো কোনো জায়গায় তাড়ির প্রচলন আছে—পূব বাঙলায় সেটাও নেই, অন্তত আমার চোখে পড়ে নি।

মোদ্দা কথা এই যে, ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে এবং অধিকাংশ অশিক্ষিত সমাজে মদ্যপান নিয়ে যে আলোচনা হয় সেটা নীতির দৃষ্টিবিন্দু থেকে, এ্যাজ এ প্রিন্সিপল। অর্থাৎ হিন্দুর কাছে গোমাংস যেমন আত্যন্তিক ভাবে বর্জনীয়—অতি সামান্য অংশ খাওয়াও মহাপাপ—মুসলমানের কাছে শূকর মাংসও সেইরূপ। তাই এদেশে মদ্যপান ঠিক সেই রকমই বর্জন করতে হবে কি না সেই প্রশ্নটা মাঝে মাঝে ওঠে।

ইতিমধ্যে ঔষধের মাধ্যমে অনেকেই সেটা প্রতিদিন পান করছেন—জানা-অজানায়। বেশীর ভাগ টনিকেই পনেরো, সতেরো পার্সেন্ট এলকহল থাকে। একটি তরুণ এলকহলের তত্ত্ব না জেনে আমাকে এক বোতল টনিক দিয়ে বললে, 'অত্যুৎকৃষ্ট টনিক, স্যর! খাওয়ার সঙ্গেই মাথাটা চিম চিম করে, শরীরে বেশ ফূর্তির উদয় হয়।' আমি মনে মনে বললুম, 'বটে! ফূর্তিটা টনিকে ওষুধ থেকে না ঐ ১৭ পার্সেন্ট মদ থেকে সেটা তো জানো না বৎস! অর্থাৎ পুচ্ছটি উত্তোলন করে—ইত্যাদি। কারণ টনিক বর্জিত ১৭ পার্সেন্ট এলকহল সমন্বিত যে-কোনো মদ্য পান করলেই মাথাটা চিম চিম করে শরীরে বেশ ফূর্তির উদয় হয়।'

ভলতেয়ারের একটি 'আপ্তবাক্য' এত বেশী সুস্বাদ, এত বেশীবার মনে পড়ে যে সেটা আবার বললে পাঠক যেন বিরক্ত না হন। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যখন অতি সামান্য কিছুটা ইউরোপে পৌঁচেছে তখন এক শ্রেণীর কুসংস্কারবাদী বলতে আরম্ভ করলো, ভারতবাসীরা মন্ত্রের জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। ঐ সময় এদেরই একজন ভলতেয়ারকে শুধোয়, 'মন্ত্রোচ্চারণ করে একপাল ভেড়া মেরে ফেলা যায় কিনা ?' ভলতেয়ার একটু বাঁকা হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই। তবে যাতে কোন গোলমাল না হয় তার জন্য আগের থেকে পালটাকে বেশ করে সেঁকো খাইয়ে দিয়ো।'

এই হচ্ছে আসল তত্ত্ব কথা—সেঁকোটাই সত্য; মন্ত্রটা থাকলে ভালো, না থাকলে নেই।

ঠিক তেমনি ঐ যে টনিকের কথা একটু আগে বললুম, তার ঐ ১৭ পার্সেন্টটাই সত্য; বাকি যে সব ওষুধ-বিষুধ আছে সেগুলো থাকলে ভাল—

ইত্যাদি।

ঠিক তেমনি ছেলে বাড়িতে নিজের চেষ্টায় পরিশ্রম করে যেটুকু শেখে সেইটেই সেঁকো, সেইটেই ১৭ পার্সেণ্ট এলকহল। তারই জোরে ছেলে পরীক্ষা পাস করে—আমরা মাস্টাররা ক্লাসে যা পড়াই সেটা মন্ত্রোচ্চারণের মত ; থাকলে ভালো, না থাকলে নেই।

এই যে দেশটা চলছে সেটা জনসাধারণের শুভ বা অশুভ বুদ্ধি দ্বারা—সরকার যেটা আছে, সেটা মন্ত্রোচ্চারণের মত। এবং আজকাল তো আকছারই সেই মন্ত্রোচ্চারণও ভুলে ভুলে ভর্তি। থাক্ আর না। বৃদ্ধ বয়সে জেলে গিয়ে শহীদ হতে চাই নে।

ইয়োরোপীয়রা টনিকের অবান্তর মন্ত্রোচ্চারণ অর্থাৎ ওষুধটা বাদ দিয়ে শুধু এলকহলটাই খায়, তবে ১৭ পার্সেণ্টের মত কড়া করে নয়। কেউ খায় স্টাউট, কেউ খায় পোর্ট।

প্রাচ্যে ইহুদি, ক্যাথলিক ও পার্সীদের ধর্মানুষ্ঠানেও কিঞ্চিৎ মদ্যের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু যাজক সম্প্রদায়ের সকলেই অত্যধিক মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য করে থাকেন।

গল্পচ্ছলে প্রচলিত আছে :

দ্বিপ্রহর রাত্রে এক ধার্মিক যুবক
নিদ্রা যায় ; ঐ তার একমাত্র শখ।
একমাত্র সুখ তার ঐ নিদ্রা বটে,
—পিতা তার বৃদ্ধ অতি, কখন কি ঘটে।
ভগিনীটি বড় হল, বিয়ে দেওয়া চাই
দিবারাত্রি খাটে, আহা, গোনে কড়ি পাই।
যৌবনেই লোলচর্ম হল অস্থি-সার
নিদ্রাতেই ভোলে তাই নির্দয় সংসার ॥

আপনারা তো আর 'কেচ্ছা সাহিত্য' পড়েন না। হায়, আপনারা জানেন না, আপনারা কি নিধি হারালেন! 'বিদ্যাসুন্দর' পড়ে যখন আনন্দ পান, তখন কেচ্ছা সাহিত্যে নিশ্চয়ই পাবেন।

আমার নিজের বিশ্বাস কেচ্ছা সাহিত্যের অনুপ্রেরণাতেই বিদ্যাসুন্দরের সৃষ্টি। তা সে যাক।

এবারে কেচ্ছাটাই শুনুন :

এই কেচ্ছা শোনে যেবা এই কেচ্ছা পড়ে
উত্তম চাউল পাবে রেশনে না ল'ড়ে।
বারো আনা দরে পাবে কিলোর ইলিশ
সরিষার তেল পাবে না সয়ে গর্দিশ।
দেড়টি টাকায় কিলো শোনো পুণ্যবান
খুশীতে ভরপুর হবে জমীন আসমান॥

এ সংসারে যে মেলা পাপ মেলা দুঃখ সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এগুলো আসে কোথা থেকে? সেমিতি—অর্থাৎ ইহুদি, খৃষ্টান, মুসলিম গুরুরা বলেন শয়তান মানুষকে কুপথে নিয়ে গিয়ে পাপ দুঃখের সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে ভারতীয় তিনটি ধর্মেরই বিশ্বাস পূর্বজন্মের অর্জিত পাপপুণ্যের দরুন এ জন্মেও সুখদুঃখ দেখা দেয়—কাজেই হিন্দুধর্মে শয়তানের প্রয়োজন নেই। একদা কিন্তু এই হিন্দু ধর্মেও শয়তান জাতীয় একটি অস্তিত্বের আবির্ভাব হয়ে উপযুক্ত প্র্যাকটিসের অভাবে লোপ পায়।

নল দময়ন্তীর উপাখ্যান যদিও মহাভারতে স্থান পেয়েছে তবু আমার বিশ্বাস মূল গল্পটি বৈদিক যুগেও প্রচলিত ছিল। গ্রীক দেবতা প্রমিথিয়ূস চোঙা বা নলের ভিতর করে আগুন চুরি করেন; নলরাজও ইন্ধন প্রজ্বলনে সুচতুর ছিলেন। স্বয়ং দেবতারা প্রমিথিয়ূসের শত্রুতা করেন। নলের শত্রুতা করে স্বয়ং দেবতারা দময়ন্তীর স্বয়ংবরে উপস্থিত হন—নলকে তাঁর বল্লভা থেকে বঞ্চিত করার জন্যে।

এই নলের শরীরে পাপ কলিরূপে প্রবেশ করেন। এই কলিই আর্যধর্মে শয়তানের অপজিট নাম্বার। মনে করুন সেই শয়তান বা কলি ঐ নিদ্রিত যুবকটির সামনে দিল দেখা:

হঠাৎ দেখিল মর্দ সম্মুখে শয়তান
নিদ্রা তার সঙ্গে সঙ্গে হৈল খানখান।
শয়তানের হাতে হেরে ভীষণ তরবার
আকাশ-পাতাল জুড়ে ফলাটা বিস্তার।
ত্রিনয়ন, কণ্ঠে তার নৃমুণ্ডের মালা
জিহ্বা তার রক্তময় যেন অগ্নি ঢালা।

ইটি আসলে কথকতা। অতএব তাবৎ বক্তব্য ছন্দে দিলে রসভঙ্গ হয়।

যুবক বেতস পত্রের ন্যায় কম্প্রমান।

শয়তান হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'আজ থেকে স্বর্গ-মর্ত্য আমার পরিপূর্ণ দখলে এসেছে। তোকে আমি এই তরবারি দিয়ে দুই টুকরো করবো। তার পূর্বে

আমার স্তব গেয়ে নে।'

যুবা কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আমার মরতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমি মরে গেলে আমার বৃদ্ধ পিতার জন্যে কে অন্ন আহরণ করবে? আমাকে তুমি নিষ্কৃতি দাও।'

শয়তান ক্ষণতরে চিন্তা করে বললে, 'তোমাকে ছাড়তে পারি এক শর্তে। তুমি তোমার পিতাকে হত্যা করো। তাহলে তোমার সমস্যাও সমাধান হয়!' শয়তান অট্টহাস্য করে উঠলো।

পুত্র আর্ত ক্রন্দন করে বললে, 'অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব!

পিতা মোরে জন্ম দিল বাল্যেতে আরাম
কেমনে হইব আমি নেমকহারাম!'

'নেমকহারাম' শুনে শয়তানের ক্রোধ চরমে পৌঁচেছে। কারণ সে একদা আল্লার সঙ্গে নেমকহারামী করেছিল হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে—'হিত' অবশ্য শয়তানের ধারণা অনুযায়ী যেটা হিত—বললে, 'তা হলে তুমি তোমার ভগিনীকে ধর্ষণ করো।'

যুবা এবারে আর কোনো উত্তর দিল না। সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হল।

কিন্তু শয়তানের এ ব্যবস্থা মনঃপূত হবে কেন? সে চায় যুবাকে দিয়ে পাপ করাতে। তাই অন্য ট্যাকটিক অবলম্বন করে বললে, 'তোমাকে শেষ মুক্তির উপায় দিচ্ছি। এই নাও, এক পাত্র মদ্য পান করো।'

যুবা ভাবে:

মদ্য পান মহা পাপ সর্ব শাস্ত্রে কয়
এ পাপ করিলে গতি নরকে নিশ্চয়।
যাইব নরকে আমি নাহি কোনো ডর
শয়তানের শর্ত হীন, পাপিষ্ঠ, বর্বর।

অনিচ্ছায় সে করলে মদ্য পান। তারপর কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত।

মদ্যপান করে পরিপূর্ণ মত্তাবস্থায় পাপপুণ্যজ্ঞানহীন যুবা শয়তানের ঐ 'হীন পাপিষ্ঠ বর্বর' কর্ম দুটি করে ফেলল।

কাহিনীটি সর্বত্র বলা চলে না। কিন্তু যে মহাজন এটির কল্পনা করেন তিনি স্পষ্টত কাউকে ছেড়ে কথা বলতে চান নি, কোনো পাপ স্পেয়ার করতে চান নি। পৈশাচিক বীভৎস রস সৃষ্টি করে সর্ব মানবের হৃৎকন্দরে ভগবানের ভয় প্রবেশ করাতে চেয়েছিলেন।

এ তো গেল এক পক্ষ। অন্য পক্ষ কি বলেন, তার অনুসন্ধান আমি বহুকাল ধরে করে আসছি। কারণ আরব তথা অন্যান্য প্রাচ্যভূমিতে এ তথ্য সর্ববাদি-সম্মত যে, হেন কাহিনী এ পৃথিবীতে নেই যার বিপরীত গাথাও নির্মিত হয় নি। সেটিও পেয়েছি।

কিছুকাল পূর্বে টুরিজ্‌ম্‌-প্রসার সংস্থার আমি সদস্য হয়ে যাই—আমার একমাত্র 'গুণ' যে, কোন দেশই আমাকে দীর্ঘকাল সহ্য করতে পারে না বলে আমি সে-দেশ থেকে সংক্ষেপে বিতাড়িত হই, ফলে আমার বহু দেশবাস, বহু দেশদর্শন হয়। এসব দেশের দেওয়ানি আদালতে দেউলেদের যে লিস্ট টাঙানো থাকে তার প্রত্যেকটিতে আমার নাম পাবেন। যদি কোনোটিতে না পান তবে বুঝে নেবেন সে দেশে আমি নাম ভাঁড়িয়েছিলুম। বস্তুত আমি কোনো দেশের, কি স্বদেশের কি বিদেশের, কারো কাছে অঋণী থেকে মরতে চাই নে।

সেই টুরিজ্‌ম্‌ সংস্থার এক মিটিংএ জনৈক সজ্জন সভারম্ভেই বলেন, 'ভদ্র-মহোদয় ও মহিলাগণ, কর্মসূচী আরম্ভ করার পূর্বেই আমার একটি বক্তব্য নিবেদন করি।

প্রবাদ আছে, মুর্গী-ঘরে যদি শ্যাল ঢুকতে দাও, তবে সকালবেলার মম্‌লেটটির আশা ত্যাগ করেই ক'রো। তাই যদি দেশ থেকে মদ্যপান একদম ঝেঁটিয়ে বের করে দাও, তবে ইয়োরোপীয় টুরিস্টের আশা করো না; সে মম্‌লেটটি আমাদের প্লেট থেকে অন্তর্ধান করবে। অতএব, আপনারা এবং আপনাদের সরকার স্থির করুন, আপনারা টুরিজ্‌ম্‌ চান, না দেশকে মদ্যহীন করতে চান। আমার কাছে দুই-ই বরাবর।'

ভারী স্পষ্ট বক্তা। ওদিকে মুরুব্বীদের অনেকেই গান্ধীটুপি পরিহিত। এটাও চান ওটাও চান, কিন্তু কি করে উলঙ্গ ভাষায় বলেন, মদটা না হয় থাক। ওঁদের মতলব, এমন এক অভিনব কৌশল বের করা, যার প্রসাদে আণ্ডা না ভেঙেও মমলেট বানানো যায়! অতএব এসব ক্ষেত্রে যা উইদাউট ফেল্‌ করা হয় তাই সাব্যস্ত হল। পোস্টপোন করো।

মিটিঙের শেষে আমাদের জন্য লাঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। আমি শঙ্কিত হয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলুম। সরকারী পয়সায় লাঞ্চকে আমি লাঞ্ছনা নাম দিয়েছিলুম। ওদের ডিনারকে অনেকে সাপার বলতেন। আমি বলতুম suffer: সংক্ষেপে দুপুরে লাঞ্ছনা, রাত্রে suffer.

আমার অবস্থা দেখে সেই স্পষ্টভাষী বক্তা আমাকে সন্তর্পণে গাধা-বোটের মত টেনে টেনে করিডরে বের করে দে ছুট—ভদ্রতা বাঁচিয়ে। সেই হোটেলেই

তাঁর কামরা ছিল। সেখানে বসে আমার হাতে মেনু এগিয়ে দিলেন। উৎকৃষ্ট আহারাদি এল। তার পূর্বে জিন এল, বিয়ার এল। তিনি খেলেন সামান্যই।

বললেন, 'যত সব আদিখ্যেতা। কোনো জিনিসে একটা ক্লিয়ার পলিসি নেই। বিশ্বসুদ্দু লোক মদ খেয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিক, এটা কেউই চায় না। ফ্রান্সের মত এলকহলিজম একটা সমস্যারূপে দেখা দিক, সেটাও কেউ চায় না। অথচ ইংরেজ—তথা তাবৎ ইয়োরোপীয়রা—বিজনেস পাকাপাকি করে দুপুর বেলা 'বারে' দাঁড়িয়ে।'

আমাকে বললেন, 'শুনেছি আপনি সাহিত্যিক। একটা ঐ মতীফের (ধরনের) গল্প শুনবেন?'

আমি বললুম 'আলবৎ, একশ বার।'

'হরপার্বতী সাইকল্ জানেন?' অর্থাৎ তাঁদের নিয়ে জনসাধারণের গল্প? তারা যে একে অন্যের সঙ্গে বাজী ধরেন?

এটা তারই একটা।

হরপার্বতী শূন্যমার্গে উড়ে যাচ্ছেন। আকাশ থেকে দেখতে পেলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পুণ্যার্থী গঙ্গাস্নান করছে। পার্বতী তাই দেখে মৃদু হাস্য করলেন।

শিব বললেন, 'কি হল?'

পার্বতী খিলখিল করে হেসে বললেন, 'এবারে তোমার নরকের পথ বন্ধ হল। বিষ্ণু বহুকাল ধরে যমের ঐ পশ্চিমের বাড়িটা চাইছিলেন সেটা পেয়ে যাবেন। বেচারী যম! জানো, যমের সহোদর উকিল ডাক্তারদের পসার কমে গেলে তাদের কি অবস্থা হয়?'

'পসার কমবে কেন?' শিব শিবনেত্র হয়ে শুধোলেন।

কৌতুকে হাসিলা উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া হর পানে। বললেন, 'কে আর যাবে নরকে? দেখছ না, তামাম দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে গঙ্গাস্নান করছে। সবাই হবে নিষ্পাপ। নরকে যাবে কে? তোমাকে বলি নি পই পই করে ঐ গঙ্গাটাকে তাড়াও।' আমার হোস্টটি গল্প থামিয়ে শুধালেন, 'জানেন বোধহয়, গঙ্গা হলেন পার্বতীর সতীন!'

'গঙ্গা তরঙ্গিনী, শিবের শিরোমণি।'

হোস্ট বললেন, 'শিব এই গঙ্গাস্নানের কথা শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন,—কিন্তু তার পূর্বেই

'হর প্রতি প্রিয়ভাবে কন হৈমবতী,
বৎসরের ফলাফল থাক্ পশুপতি!

যমের রাজত্ব যাবে এইটুকু জানি
অমৃত-রেশন্-শপও স্বর্গ নেবে মানি।
ভেজাল না হয় শুরু এই লাগে ভয়
স্বর্গের হাউসিং লাগি চিন্ত মহাশয়।'

থুড়ি! আর কথকতা নয়। আমার হোস্ট এ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি।

শিব কম্বেটা রথের স্টারগার্ড-এ (আকাশে মাড্-এর পরিবর্তে আকছারই নক্ষত্র চূর্ণ উড়ে এসে রথটা ধূলিময় করে বলে ওটা স্টারগার্ড) কম্বেটা ঠুকে ঠুকে সাফ করতে করতে বললেন, 'কিচ্ছু ভয় নাই, ডার্লিং। যারা স্নান করছে তারা এর পুণ্যফলে বিশ্বাস করে না।'

পার্বতী তাজ্জব মেনে বললেন, 'সে কী! তাবৎ পুরাণে যে পষ্ট লেখা রয়েছে। এখন তো ছাপাও হচ্ছে, বেতারেও প্রচার হয়, যে-পণ্ডিত নেহরু—'

শিব তখনো ইণ্ডিয়ার উপরে। ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইনের কথা ভেবে তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমার কথা বিশ্বাস করো আমি প্রমাণ করতে পারি।'

যথারীতি দু'জনাতে বাজী ধরা হল—সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের ভিতর শিব প্রমাণ করবেন, গঙ্গাস্নান যারা করে তারা মা-গঙ্গার কল্যাণে নিষ্পাপ হল বলে বিশ্বাস করে না।

অতি প্রত্যুষে বাজীর চুক্তিমত পার্বতী রাজরাজেশ্বরীর মহিমাময় সজ্জা পরে কিন্তু অতিশয় বিষণ্ণ বদনে বসলেন গঙ্গাতীরে। আর তাঁর কোলে মাথা রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে রইলেন শিবঠাকুর—তাঁর সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ!

গঙ্গাস্নান সেরে উঠে এ দৃশ্য দেখে প্রথম ব্রাহ্মণ অবাক। কৌতূহল দমন না করতে পেরে দরদী কণ্ঠে শুধালো, 'মা, এ কি ব্যাপার!'

নিখুঁত ক্ষুদ্র দুটি নাসারন্ধ্র দিয়ে উষ্ণতম দীর্ঘশ্বাস ফেলে পার্বতী বললেন, 'বাবা, আমার কপাল। দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমার স্বামীর অবস্থা। তবে ভগবানের দয়ায় এক গণৎকারের সঙ্গে দেখা। সে তাঁর হাত দেখে বলেছে, কোন নিষ্পাপ পুরুষ তাঁকে স্পর্শ করা মাত্রই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন।'

ব্রাহ্মণ কাঁচুমাচু হয়ে 'হ্যা মা, তা মা', বলে বাং মাছটির মত মোচড় মেরে হাওয়া।

পার্বতী তো বজ্রাহত। লোকটা এইমাত্র গঙ্গাস্নান করে নিষ্পাপ হয়ে মা গঙ্গার কোল থেকে বেরিয়ে এল। তার মুখেও দয়ামায়ার চিহ্ন। তবে কি—তবে কি গঙ্গাস্নানে তার বিশ্বাস—! শিব মৃদু হাস্য করলেন।

কিছুক্ষণ পরেই আরেক স্নান-সমাপ্ত দ্বিজ। কথোপকথন পূর্ববৎ। বাং

মাছের মোচড়টিও তদ্বৎ। পার্বতী দিশেহারা। ভোলানাথ আস্যদেশ বিস্তীর্ণ করলেন।

চললো যেন প্রশেসন। পার্বতীর গলা থেকে একই রেকর্ড বেজে চললো। ফল একই। ধূর্জটি গণ্ডা দুই হাই তুলে পদ্মনাভ স্মরণে এনে ঘুমিয়ে পড়লেন। দেবসমাজে এই হলো ঘুমের বড়ি সনেরিল্।

করে করে বেলা দ্বিপ্রহর। ভেঙে গেছে প্রভাতের হাট, কোলাহল থেমে গেছে, জনপদবাট পান্থহীন। গঙ্গাতীরও ভূতনাথের শ্মশানসম নির্জন।

অপরাহ্ণ। পার্বতীর ক্লান্তি এসে গেছে। বললেন, 'নন্দীকে ডাকো, বাড়ি যাই। আমি হার মানলুম।'

শিব বললেন, 'সন্ধ্যা অবধি থাকার কথা। তাই হবে।'

এ তো কলকাতা নয় যে বাবুরা হাওয়া খেতে সন্ধেবেলা গঙ্গাতীরে আসবেন। কাগ-কোকিলও সেখানে আর নেই।

এমন সময় ক্ষীণ কনে দেখার মিলোয় মিলোয় আলোতে দূর থেকে দেখা গেল এক ইয়ার-গোছ নটবর। ডান হাত দিয়ে তুড়ি দিতে দিতে গান গাইছে, 'লে লে সাকী, ভর দে পেয়ালা।' বাঁ বগলে হাফ-পাট। বদনটি তার প্রফুল্ল। আপন মনে গান গাইতে গাইতে এদিক পানেই আসছে।

আসন্ন সন্ধ্যায় নির্জন গঙ্গাতীরে অপরূপ সুন্দরী দেখে সে থমকে দাঁড়ালো। আপন মনে 'মাইরি' বলতে না বলতে হঠাৎ তার চোখ গেল সিঁথির সিঁদুরের দিকে। মাতাল যে কখন আচম্বিতে অকারণ পুলকে নেচে ওঠে, আর কখন যে সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়—সেটা পাকা শুঁড়ির শুঁড়িও আগেভাগে বলতে পারে না। এবং মাতালের পুলক এবং কুণ্ঠা দুইই তখন পৌঁছয় চরমে, হাফাহাফি সন্ধিস্থলের বেনের পথই যদি সে নেবে তবে তো সে নর্মাল! বোতলে পয়সা বরবাদ করবে কেন?

মাতালের কৌতূহল হল। তদুপরি সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মবুদ্ধিও জাগ্রত হল। মেয়েটাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত। এই ভরসন্ধেবেলায়—

কুণ্ঠায় যেন আপন পাঞ্জাবির ভিতর মায় পা দুখানা, সর্বশরীর লুকিয়ে নিয়ে বললে, 'মা, এই অবেলায়, আপনি, এখানে, জানেন না, কি বলবো, কিন্তু কেন?'

পার্বতী মাতাল দেখে প্রথমটায় সঙ্কুচিত হয়ে ঘাড়টা একটু ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন। মাতাল কিন্তু মাটির দিকে তাকিয়ে রইল ঠায় দাঁড়িয়ে। কী আর করেন জগন্মাতা পার্বতী? আর বলাও তো যায় না, মাতাল! কখন রঙ বদলায়।

থেমে থেমে বললেন তাঁর হ্রস্ব কাহিনী হ্রস্বতর নির্যাসরূপে।

সঙ্গে সঙ্গে মাতালের মুখে উৎসাহ আর আনন্দের দ্যুতি। হাসিও চাপতে পারে না।

কোন গতিকে বললে, 'হায় রে হায়, এই সামান্য বিষয় নিয়ে মা, তোমার দুর্ভাবনা! তুমি এক লহমা বসো তো মা শান্ত হয়ে।'

তারপর বললে, 'চতুর্দিকে কিন্তু চোর-চোট্টার পাল। হেঁ হেঁ—মা, কিছু মনে করো না, ঐ যে রইল বোতলটা তার উপর আধখানা চোখ রেখো।'

বিড়বিড় করে আপন মনে বললে, 'এই মাঘের শীতের ভরসন্ধেবেলা চানটা না করিয়ে ছাড়লে না। মহামূল্যবান নেশাটাও মেরে যাবে দড়কচ্ছা। তা আর কি করা যায়!'

ঝপ্ করে গঙ্গায় এক ডুব মেরে উপরে উঠে খপ্ করে ধরলে শিবের ঠ্যাঙখানা।

বত্রিশ নয় যেন চৌষট্টিখানা দাঁত বের করে বললে, 'হল মা-জননী? এই সামান্য জিনিসটের জন্যে তুমি এতখানি ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিলে? ছিঃ মা, তোমার বিশ্বাস বড় কম!'

মাঝ গাঙ্গের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ঐটে কি তোমাদের নৌকো? কে যেন ডাকছে? আমি তা হলে আসি। আমার আবার বেতো শরীর। পেন্নাম হই মা, বাবাজী সেরে তো উঠলো—এবারে একটু—ইয়ে মানে সাবধানে—।'

লাঞ্চ শেষ হয়ে এসেছে। সোফায় বসে সিগার ধরিয়ে হোস্ট বললেন, 'দেশ বোন্-ড্রাই হোক কিংবা উচ্ছন্নে যাক্—আমার কিচ্ছুটি বলার নেই। কিন্তু দু' একটা মাতাল না থাকলে ডেয়ারিং কাজ করবে কে?

আমারও নিজের কিচ্ছুটি বলার নেই। আমি দু'পক্ষেরই বক্তব্য নিবেদন করলুম মাত্র।

আমি পক্ষ নেবই বা কেন? এক পক্ষ বলছেন আমাকে ড্রাই করে ছাড়বেন, অন্য পক্ষ বলছেন, আমাকে ভিজিয়ে দেবেন। দু'পক্ষেই দারুণ লড়াই।

দুটো কুকুর যদি এক টুকরো হাড্ডি নিয়ে লড়াই করে, হাড্ডিটা তো তখন কোনো পক্ষে যোগ দিয়ে লড়াই করে না!

শ্রীচরণেষু

কতকগুলো খেলা প্রায় সব দেশের ছেলেমেয়েরাই খেলে। যেমন মনে করো, কানামাছি কিংবা লুকোচুরি। আবার মনে করো সাঁতার কাটা ;—সাহারার মরুভূমিতে, কিংবা মনে করো খুব বড় শহরে, যেখানে নদী পুকুর নেই, সেখানে যে সাঁতার কাটাটা খুব চালু হতে পারে না, সেটা অনায়াসেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। জল আছে অথচ সাঁতার কাটাটা লোকে খুব পছন্দ করে না, তাও হয়। শীতকালে ইয়োরোপের সব নদী-পুকুর জমে বরফ হয়ে যায় না, তবু সেই পাথর-ফাটা শীতে কেউ পারতপক্ষে জলে নামতে চায় না—সাঁতারের তো কথাই ওঠে না।

খেলাধুলো তাই নির্ভর করে অনেকটা দেশের আবহাওয়ার উপর। কিছু না কিছু জল প্রায় সব দেশেই আছে, তাই কাগজ বা পাতার ভেলা সবাই জলে ভাসায়। কিন্তু যে দেশে ঝমাঝ্-ঝম্ বৃষ্টি নেমে আঙ্গিনা ভরে গিয়ে চতুর্দিকে জল থৈ-থৈ করে না, সে দেশের ছেলে-মেয়েরা আর দাওয়ায় বসে আঙ্গিনার পুকুরে কাগজের ভেলা ভাসাবে কি করে? অথচ ভেলা-ভাসানোর মত আনন্দ কম খেলাতেই আছে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বুড়ো বয়সে ছেলেবেলার কথা ভেবে গান রচেছেন :

> পাতার ভেলা ভাসাই নীরে
> পিছন পানে চাইনে ফিরে।

আর ছেলেমেয়েদের জন্য 'শিশু ভোলানাথে'র এ-কবিতাটি তোমরা নিশ্চয় জানো :

> দেখছ-না কি নীল মেঘে আজ
> আকাশ অন্ধকার ?
> সাত-সমুদ্র তেরো-নদী
> আজকে হব পার।
> নাই গোবিন্দ, নাই মুকুন্দ,
> নাইকো হরিশ খোঁড়া—
> তাই ভাবি যে কাকে আমি
> করব আমার ঘোড়া।
> কাগজ ছিঁড়ে এনেছি এই
> বাবার খাতা থেকে,

নৌকো দে-না বানিয়ে—অমনি
দিস, মা, ছবি এঁকে।
রাগ করবেন বাবা বুঝি
দিল্লী থেকে ফিরে ?
ততক্ষণ যে চলে যাব
সাত-সমুদ্র-তীরে।

ভারী চমৎকার কবিতা! কিন্তু বাকীটা আর বললুম না। যাদের পড়া নেই, তারা যেন 'শিশু ভোলানাথ'খানা খোলে, এই হচ্ছে আমার মতলব।

তা সে কথা যাক্। বলছিলুম কি, আবহাওয়ার উপর খেলাধুলো অনেকটা নির্ভর করে। আমাদের দেশ জলে ভর্তি, বিশেষ করে পুব বাঙ্গলা, তাই আমাদের খেলাধুলো জমে ওঠে জলের ভিতরে বাইরে। তেমনি শীতের দেশে বরফ পড়ে বিস্তর, আর তাই নিয়ে ছেলেদের খেলাধুলোর অন্ত থাকে না। 'ধুলো' বলা অবশ্যি ভুল হলো, কারণ বরফে যখন মাঠ-ঘাট, হাট-বাট সব কিছু ছেয়ে যায়, তখন তামাম দেশে এক রত্তি ধুলোর সন্ধান আর পাওয়া যায় না।

কাবুলে যখন ছিলুম, তখন জানলা দিয়ে দেখতুম, ছেলেমেয়েরা সকাল থেকে পেঁজা বরফের গুঁড়ো হাতে নিয়ে ঢেলা পাকিয়ে একে ওকে ছুঁড়ে মারছে, সে ঢিল ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে চট করে সরে যাবার চেষ্টা করছে। যদি তাগমাফিক লেগে গেল তবে তুমি ওস্তাদ ছেলে, হাতের নিশান ভালো, হয়তো একদিন ভালো বোলার হতে পারবে। আর না লাগলেও তা নিয়ে ভাবনা করা চলবে না, কারণ ততক্ষণে হয়ত তোমার কানে এসে ধাঁই করে লেগেছে আর কারো ছুঁড়ে মারা গোলা। কানের ভিতর খানিকটা বরফের গুঁড়ো ঢুকে গিয়ে কানের ভিতরকার গরমে গলতে আরম্ভ করেছে। ভারী অস্বস্তি বোধ হয় তখন—মনে হয়—যেন কেউ সুড়সুড়ি দিচ্ছে। তখন খেলা বন্ধ করে কান সাফ করার জন্য দাঁড়াতে হয়। আর ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যিখানে ও রকম ধারা দাঁড়ানো মানেই আর পাঁচজনের তাগ হওয়া। মাথা নীচু করে যতক্ষণ তুমি কান সাফ করছো, ততক্ষণে এ-দিক, ও-দিক, চতুর্দিক থেকে গোটা দশেক গোলাও খেয়ে ফেলেছ।

তা বয়েই গেল। বরফের গোলা যত জোরেই গায়ে এসে লাগুক না কেন, তাতে করে চোট লাগে না। গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই গোলা চুরমার হয়ে যায়। কিছুটা বরফের গুঁড়ো অবশ্যি জামা-কাপড়ে লেগে থাকে। তা সেটা হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেললেই হয়—না হলে গরম জামা কাপড়ের ওম লেগে খানিকক্ষণ বাদে বরফ গলে গিয়ে কাপড় ভিজিয়ে দেবে।

বরফ জমলেই এ খেলা জমে উঠতো। আর আমি কাজকর্ম ধামাচাপা দিয়ে জানালার কাছে গিয়ে বসতুম।

এ খেলায় সত্যিকার ওস্তাদ ছিল একটি সাত-আট বছরের ছেলে। খেলার মধ্যিখানে সে এমনি চর্কিবাজির মত ঘুরত যে তার গায়ে গোলা ছোঁড়ে কার সাধ্যি। আর আমাদের দেশের পাকা লেঠেলের মত সে একাই জন আষ্টেককে অনায়াসে কাবু করে ফেলত। ভারী মিষ্টি চেহারা, পাকা আপেলের মত টুকটুকে দু'টি গাল, নীল চোখ, আর সেই দু'চোখে যেন দুনিয়ার যত দুষ্টুমি বাসা বেঁধে বসে আছে। নাম ইউসুফ, পাশের বাড়িতে থাকে, আর তার বাপ আমাদের কলেজের কেরানী। আমাকে পথে পেলে সেলাম করে কিন্তু সসম্ভ্রম সেলামের সময়ও চোখের দিকে তাকালে মনে হত ছেলেটা কোনো এক নতুন দুষ্টুমির তালে আছে। যদি জিজ্ঞেস করতুম, 'কি রকম আছিস?' তাহ'লে এক গাল হেসে কি একটা বলত, যার কোনো মানে হয় না। কিন্তু সেই হাসির ফাঁকে ফাঁকেও আমি স্পষ্ট দেখতে পেতুম কোনো একটা দুষ্টুমির সুযোগ পেলে সে আমাকেও ছাড়বে না।

সে-ই একদিন বাড়ি বয়ে এসে সোৎসাহে খবর দিয়ে গেল, আমি তাদের ইস্কুলে বদলি হয়ে এসেছি। তার চোখে মুখে হাসি আর খুশী। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, আমি তার চোখে যেটি লক্ষ্য করলুম সেটি হচ্ছে "এইবার আসুন স্যর, আপনাতে আমাতে এক হাত হয়ে যাবে।" আমি যে খুব ভয় পেলুম তা নয়, কারণ ছেলেবেলায় আমিও কম দুষ্টু ছিলাম না।

ওদের ইস্কুল বড় অদ্ভুত। পাঁচ-ছ' বছরের ছেলেদের ক্লাস ওয়ান থেকে আই-এ ক্লাসের ছেলেরা একই বাড়িতে পড়ে। তাই সেটাকে পাঠশালা বলতে পারো, হাইস্কুল বলতে পারো, আর কলেজ বললেও বাধবে না। আমি বদলি হলুম কলেজ বিভাগে—ফার্স্ট আর সেকেণ্ড ইয়ারের ছেলেদের ইংরিজি পড়াবার জন্য। এ দু' ক্লাস পড়িয়ে আমার হাতে মেলা সময় পড়ে থাকত বলে একদিন প্রিন্সিপাল অনুরোধ করলেন, আমি যদি ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলেদেরও ইংরিজি পড়াই তবে বড় উপকার হয়। আমি খানিকটে ভেবে নিয়ে বললুম, তার চেয়ে আমাকে বরঞ্চ ক্লাস ওয়ানে পড়াতে দিন। আসছে বছর ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও প্রোমোশন দেবেন—অর্থাৎ আমি টু'তে পড়াব, তার পরের বছর থ্রী'তে। এই করে করে যাদের কলেজে টেনে নিয়ে আসতে পারব তাদের ইংরিজি জ্ঞান থেকে বুঝতে পারবো আমি ভালো পড়াতে পারি কি না। প্রিন্সিপাল তো কিছুতেই মানেন না; বলেন, 'সে কি কথা! আপনি পড়াবেন

ক্লাস ওয়ানে!' আমার প্রস্তাবটার তত্ত্ব বুঝতে তাঁর বেশ খানিকটা সময় লাগল। কাবুলী প্রিন্সিপালের বুদ্ধি—থাক, গুরুজনদের নিন্দে করতে নেই।

ওদিকে ক্লাস ওয়ানে হৈ হৈ রৈ রৈ। কলেজ বিভাগের অধ্যাপক আসছেন ক্লাস ওয়ানে পড়াতে!

আমার তখন আদপেই মনে ছিল না ইউসুফ ক্লাস ওয়ানে পড়ে। প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকতেই দেখি, সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবাইকে কি যেন বোঝাচ্ছে। অনুমান করলুম, প্রতিবেশী হিসেবে সে আমার সম্বন্ধে যেটুকু জানে সেটুকু সকলকে সগর্বে সদম্ভে জানিয়ে দিচ্ছে। আমার চাকর আবদুর রহমানের সঙ্গে ইউসুফের আলাপ পরিচয় ছিল। আর আবদুর রহমান ভাবতো তার মনিবের মাথায় একটুখানি ছিট আছে। আবদুর রহমান যদি সেই সুখবরটি ইউসুফকে দিয়ে থাকে, আর সে যদি ক্লাসের সবাইকে সেই কথাটি জানিয়ে দেয়, তবেই হয়েছে!

ক্লাসে মাস্টার ঢুকলেই কাবুলের ছেলেরা মিলিটারি কায়দায় সেল্যুট দেয়—আফগানিস্থান মিলিটারি দেশ। আমি ক্লাসে ঢুকতেই ইউসুফ তড়াক করে সুপারি গাছের মত খাড়া হয়ে মিলিটারি সেল্যুটের হুকুম হাঁকল। তার পর খুশীতে ডগমগ হয়ে আপন সীটে গিয়ে বসল।

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই ইউসুফ উঠে দাঁড়ালো। 'বাইরে যেতে পারি, স্যর?' আমি বললুম, 'যা, কিন্তু দেখ, আমি বাইরে যাওয়া-যাওয়ি জিনিসটা মোটেই পছন্দ করি নে। যাবি আর আসবি।' 'নিশ্চয় স্যর।' বলে আরেকটা মিলিটারি সেল্যুট ঠুকে বেরিয়ে গেল।

এক মিনিট যেতে না যেতে ইউসুফ ফিরে এল। তাই তো, ছেলেটা তা হলে অতটা দুষ্টু নয়। কিন্তু আরো তিন মিনিট যেতে না যেতে আমার ভুল ভাঙ্গলো। ইউসুফের পাশের ছেলেটা পড়ার মাঝখানে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 'স্যর, আমার পকেট ভিজে গিয়েছে,—এই ইউসুফটা আমার পকেটে বরফের ঢেলা রেখেছিল।' ইউসুফ আরো চেঁচিয়ে বলল, 'না স্যর, আমি রাখি নি।' ছেলেটা আরো চেঁচিয়ে বলল, 'আলবাৎ তুই রেখেছিস।'

ইউসুফ বলল, 'তোর ডান পকেট ভেজা, আমি তো বাঁ দিকে বসে আছি।' ছেলেটা বলল, 'তুই না হলে বরফ আনল কে? তুই তো এক্ষুনি বেরিয়ে গিয়েছিলি।'

হট্টগোলের ভিতর আমি যে তাবৎ তর্কাতর্কি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলুম তা নয় কিন্তু কথা কাটাকাটিটা মোটের উপর এই রকম ধারায়ই চলেছিল। বিশেষ করে শেষের যুক্তিটা আমার মনের উপর বেশ জোর দাগ কাটল। ইউসুফ না

হলে বরফের ঢেলা আনল কে? আর বরফ তো আগের থেকে ঘরে এনে জমিয়ে রাখা যায় না—গলে যায়।

রাগের ভান করে কড়া হুকুম দিলুম, 'ইউসুফ, তুই বেঞ্চির উপর দাঁড়া।'

ইউসুফ বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে তড়াক করে পলটনি কায়দায় বুট দিয়ে খটাস করে শব্দ করে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে ফের সেল্যুট দিল। পূর্বেই বলেছি আফগানিস্থান মিলিটারি দেশ—ছোট ছেলেরা পর্যন্ত পলটনি জুতা পরে আর হুকুম তামিল করার সময় পলটনি সেল্যুট ঠোকে।

ভাবলুম, ইউসুফ আমাদের দেশের ছেলের মত 'বসি, স্যর?' বলে অনুনয় করবে। আদপেই না। চাঁদপানা মুখ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। শেষটায় আমিই হার মানলুম। বললুম, 'বস্। আর ও রকম করিস নে।' ইউসুফ আরেকবার সেল্যুট জানিয়ে বসে পড়ল।

বাড়ি ফেরার সময় বুঝতে পারলুম, সব দেশের খেলাধুলা যে রকম আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে, দুষ্টুমিটাও ঠিক সে রকম অনেকটা আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশের ছেলেরা বরফের গুঁড়ো পাবে কোথায় যে তাই নিয়ে দুষ্টুমি করবে?

তারপর দু' তিন দিন ইউসুফ ঠাণ্ডা। ভাবলুম প্রথম দিনের সাজাতে হয়তো ইউসুফের আক্কেল হয়ে গিয়েছে। আর জ্বালাতন করবে না।

আমাদের দেশ গরম, তাই ঘরে ঘরে পাখার ব্যবস্থা থাকে। কাবুল ঠাণ্ডা, তাই সেখানে ক্লাসে ক্লাসে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা। একদিন ক্লাসে ঢুকে দেখি ঘরভর্তি ধুঁয়ো, আর চিমনির আগুন নিভে গিয়েছে।

ছেলেরা কাশছে আর ইউসুফ পাতলুনের দুই পকেটে হাত পুরে অত্যন্ত বিষণ্ন নয়নে তাকিয়ে আছে। দেশে টানাপাখার দড়ি ছিঁড়ে গেলে যে রকম চাপরাসীর সন্ধানে ছেলে পাঠানো হয় আমি তেমনি বললাম, 'চাপরাসীকে ডাকো।' ইউসুফকে পাঠানো আমার মতলব ছিল না। কিন্তু সে চট করে 'এক্ষুনি ডাকছি স্যর' বলে ছুট করে বেরিয়ে গেল। থামাবার ফুরসৎ পেলুম না।

মিনিট তিনেক পরে এলেন খুদ্ প্রিন্সিপাল। মুখে কেমন যেন একটু বিরক্তি। বললেন, 'আপনি নাকি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?' আমি তো অবাক!

'সে কি কথা! আমি আপনাকে ডেকে পাঠাবো কেন? আমার দরকার হলে আমি নিজেই তো আপনার কাছে যেতে পারি। আমি তো ডেকে পাঠিয়েছি চাপরাসীকে, আগুন নিভে গিয়েছে বলে।' প্রিন্সিপালের মুখ থেকে

বিরক্তির ভাব কেটে গিয়ে দেখা গেল রাগ। ইউসুফের দিকে ফিরে বললেন, 'তবে তুই আমাকে ডাকলি কেন?'

ইউসুফ তার ড্যাবড্যাবে চোখ হরিণের মত করুণ করে বলল, 'আমি তো শুনলুম, প্রিন্সিপাল সায়েবকে ডেকে নিয়ে আয়। তা কি জানি ওঁর ফার্সী আমি ঠিক বুঝতে পারি নি হয়তো।' প্রিন্সিপাল ইউসুফকে দুই ধমক দিয়ে চলে গেলেন।

কি ঘড়েল ছেলে রে বাবা! আমি বিদেশী বলে যে খুব ভালো ফার্সী বলতে পারি নে তার পুরো সুযোগ নিয়ে সে আমাকে এক দফা বোকা বানিয়ে দিল।

ততক্ষণে চাপরাসী এসে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই আগুন জ্বলতে চায় না। ঘর আরো ধুঁয়োয় ভরে গিয়েছে। ছেলেরা কাশতে আরম্ভ করেছে, কারো কারো চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে, আমার তো প্রায় দম বন্ধ হবার উপক্রম। চাপরাসী ততক্ষণে হার মেনে চলে গিয়েছে বুড়ো চাপরাসীর সন্ধানে —সে যদি কিছু করতে পারে। ইউসুফ বলল, 'স্যর, জানলাগুলো খুলে দিই?' আমি বললুম, 'দাও।' দম বন্ধ হয়ে তো আর মারা যেতে পারি নে।

এক মিনিটের হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের ভিতর ঢুকে আমাদের হাড়ে হাড়ে কাঁপন লাগিয়ে দিল। পড়াবো কি, আর পড়বেই বা কে? আমাদের দেশে যে রকম ভয়ঙ্কর গরমের দিনে ক্লাসের পড়ার দিকে মন যায় না, কাবুলে তেমনি দারুণ শীতের মাঝখানে পড়াশোনা করা অসম্ভব। হাতের আঙ্গুল জমে গিয়েছে, কলম ধরতে পারছি নে, বইয়ের পাতা ওল্টানো যায় না। ছেলেরা ততক্ষণে আবার আপন আপন দস্তানা পরে নিয়েছে—আর দস্তানা-পরা হাতে লেখা, পাতা ওল্টানো, এসব কাজ আদপেই করা যায় না।

ততক্ষণে বুড়ো চাপরাসী এসেও হার মেনেছে। কিন্তু লোকটা বিচক্ষণ। খানিকক্ষণ চেষ্টা দেওয়ার পর বলল, 'ধুঁয়ো উপরের দিকে না উঠে ঘর ভরে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে ধুঁয়ো বেরোবার চোঙা কেউ বন্ধ করে দিয়েছে।'

তদারক করে দেখা গেল বুড়ো ঠিক কথাই বলেছে। চোঙার ভিতরে, উপরের দিকে হাত চালানোতে বেরিয়ে এল একটা ক্যানাস্তারার টিন, ছেঁড়া কম্বল দিয়ে জড়ানো। বোঝা গেল, বেশ যত্নের সঙ্গে, বুদ্ধি খরচ করে চোঙাটি বন্ধ করা হয়েছে, যাতে করে ধুঁয়ো উপরের দিকে না গিয়ে সমস্ত ক্লাস ভরে দেয়।

আমি হুঙ্কার দিয়ে বললুম, 'চোঙা বন্ধ করল কে?'

সমস্ত ক্লাস এক গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই ইউসুফ। আর কে করতে যাবে ?'

ইউসুফের দুশমন গোলাম রসুল বলল, 'আমি যখন ক্লাসে ঢুকি তখন ইউসুফ ছাড়া আর কেউ ক্লাসে ছিল না। নিশ্চয়ই ও করেছে।'

ইউসুফ বলল, 'আমি যখন ক্লাসে ঢুকলুম তখন গোলাম রসুল ছাড়া আর কেউ ক্লাসে ছিল না। নিশ্চয়ই ও করেছে।'

গোলাম রসুল চটে গিয়ে বলল, 'মিথ্যেবাদী !'

ইউসুফ মুরুব্বীর সুরে বলল, 'এই, স্যরের সামনে গালমন্দ করিস নে।'

কি জ্যাঠা ছেলে রে বাবা ! বললুম, 'তুই এদিকে আয়।'

কুইক মার্চে সামনে এসে সেল্যুট দিল। আমি বললুম, 'তোকে ভালো রকমের সাজা দেওয়া উচিত। আজকে সমস্ত ক্লাসের পড়া নষ্ট করেছিস। ঢোক্ গিয়ে টেবিলের তলায়। চুপ করে সেখানে বসে থাকবি, আর কথাটি কয়েছিস কি তোর গলা কেটে ফেলব।'

সুড় সুড় করে টেবিলের তলায় গিয়ে ঢুকল।

কাবুলের ক্লাসে মাস্টার মশায়দের টেবিল বিলিতি কায়দায় বানানো হয়। অর্থাৎ তার তিন দিক ঢাকা। শুধু মাস্টার যে দিকে বসেন সেদিকটা খোলা। মনে করো খুব বড় একটা প্যাকিং কেসের ডালাটা খুলে নিয়ে তাই দিয়ে টেবিল বানাও আর খোলা দিকটায় পা ঢুকিয়ে দিয়ে বাক্সটা দিয়ে টেবিলের কাজ চালাও। আমি ঠিক তেমনি ভাবে ব'সে, আর ইউসুফ চুপ করে ভিতরে। নড়নচড়ন নট কিচ্ছু।

মনে হল ইউসুফের তা নিয়ে কোন খেদ নেই ; কারণ পঞ্চাশ মিনিটের পিরিয়ডের প্রায় আধঘণ্টা সে ধুঁয়ো, প্রিন্সিপাল, আর চাপরাসী দিয়ে বরবাদ করে দেবার বিমলানন্দ আপন মনে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছে।

আমি ছেলেদের পড়াতুম মুখে মুখে। চেঁচিয়ে বলতুম I go, সমস্ত ক্লাস আমার পরে বলত I go, আমি বলতুম We go, ক্লাস বলত We go, এ রকম ধারা you go, you go, কিন্তু Rahim goes, Karim goes, তারপর হুঙ্কার দিয়ে বলতুম Rahim and Karim go-o-o-o।

ওদিকে ইউসুফ চুপচাপ। জিজ্ঞেস করলুম—'তুই বলছিস না কেন রে ?' বাক্সের অথবা টেবিলের, যাই বলো—ভিতর থেকে ইউসুফের গলা শোনা গেল, 'ও তো আমি জানি।' আমি বললুম, 'বলে যা।' সে সমস্ত কনজুগেশনটা ভুল না করে গড় গড় করে আবৃত্তি করে গেল। হুঁ ! ছেলেটা শয়তান বটে, কিন্তু পড়াশোনায় ভালো।

ঘণ্টা পড়লো। বললুম, 'ইউসুফ বেরিয়ে আয়।' সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল। বললুম, 'বল্ আর কক্‌খোনো করবি নে।' কি যেন একটা বিড় বিড় করে বলল, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

ততক্ষণে ক্লাস ডিসমিস করে দিয়েছি বলে সে একটা ছোটাসে ছোটা সেল্যুট সেরে ডবল মার্চ করে বেরিয়ে গিয়েছে। তখন বুঝতে পারলুম, দুষ্টুমি করবে না এ প্রতিজ্ঞা করতে সে নারাজ, তাই তাড়াতাড়ি কেটে পড়েছে।

রেজিস্টার, বই, খড়ি, ডাস্টার গুছিয়ে নিয়ে যেই দাঁড়াব বলে টেবিলের তলা থেকে পা টেনে আনতে গিয়েছি অমনি দু'পা-ই আটকা পড়ে গেল। কি ব্যাপার! ঘাড় নিচু করে দেখি, আমার দু'জুতোর দুই ফিতে একসঙ্গে বাঁধা।

কি করে হল? এ তো বড় তাজ্জব! অবশ্যি, বুঝতে সময় লাগল না। আমার অভ্যাস পা দু'খানি একজোড় করে বসার। ইউসুফ তারই সুবিধে নিয়ে অতি আস্তে আস্তে ফিতের গিঁঠ খুলে দু'ফিতে অর্থাৎ দুই জুতো একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছে! আর সে এমনি মোলায়েম কায়দায় যে, আমি কিছুই টের পাই নি!

আমি হার মানলুম।

বাড়ি ফেরার পথে দূর থেকে দেখি, বাড়ির দেউড়ির সামনে ইউসুফ আমার চাকর আব্দুর রহমানকে হাত-পা নেড়ে কি সব বোঝাচ্ছে, আর বিরাট-বপু আব্দুর রহমান সর্বাঙ্গ দুলিয়ে হেসে কুটিকুটি। আমাকে দেখেই ইউসুফ চট্‌পট্ চম্পট।

পরদিন কলেজ যাবার সময় আব্দুর রহমান জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'এক রকম বোতামওলা বুট ফিতেওলা জুতোর চেয়ে ভাল।'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'বস্ বস্, আর জ্যাঠামো করতে হবে না।'

পুচ্ছ (প্র) দর্শন

কুকুর মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে—এ-তথ্য কিছু নূতন নয়। কিন্তু কুকুরের কাটা লেজের অবশিষ্ট চার আঙুল পরিমাণ একটা ছ' ফুট লম্বা তাগড়া জোয়ানকে বাঁচিয়েছে—এটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু যে-ব্যক্তি এ ঘটনাটির বর্ণনা আমাকে দেন, তিনি অনেকের কাছেই সুপরিচিত এবং তাঁরা সকলেই সানন্দে শপথ করতে প্রস্তুত হবেন যে, শ্রীযুত বিনায়ক রাও শিবরাম মসোজীকে কেউ কখনো মিথ্যা-ভাষণ করতে শোনেন নি।

আমার শুধু ক্ষোভ যে, বিনায়ক রাও যখন আমাকে প্রাগুক্ত ঘটনার সঙ্গে

বিজড়িত তাঁর হিমালয় ভ্রমণ বর্জন করে যান, তখন আমার সুদূর কল্পনাদৃষ্টি দিকচক্রবালে এতটুকু আভাস দেখতে পায় নি যে, আমার মত নগণ্যজনও একদিন বাঙলা সাহিত্যের সংস্পর্শে আসবে ; নইলে সেদিন আমি সাতিশয় শ্রদ্ধা ও যত্নসহকারে বিনায়ক রাওয়ের ভ্রমণকাহিনীটি সবিস্তার লিখে রাখতুম। কারণ, আমাদের পরিচিত জন নিত্য নিত্য মানসসরোবর দর্শনে যায় না ; তা'ও পিঠে মাত্র একটি হ্যাভারস্যাক নিয়ে। পরবর্তী যুগে আমাকে এক মারাঠা দম্পতি বলেন যে, মানসরোবরে (না মানস সরোবরে তাই আমি জানি নে) যাবার পথে ডাকাতের ভয় আছে বলে তাঁরা সঙ্গে সেপাইশান্ত্রী নিয়ে যান।

বিনায়ক রা'ও শ্রীযুত নন্দলালের শিষ্য এবং শিক্ষাশেষে তিনি গুরু নন্দলালের সহকর্মীরূপে কলাভবনের সহকারী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। নন্দলাল যেরকম দেব-দেবীর ছবি আঁকতেন, বিনায়ক রাও তেমনি ভারতীয় দৃষ্টিবিন্দু থেকে ভারতীয় বাতাবরণে, ভারতীয় বেশভূষায় মাদন্না মা-মেরির একাধিক ছবি এঁকে দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেন। ইয়োরোপীয় চিত্রকরদের মাদন্না দেখে দেখে আমরা ভুলে গিয়েছিলুম যে, মা-মেরি প্যালেস্টাইন-বালা এবং প্যালেস্টাইন প্রাচ্যভূমি। বিনায়ক রাওয়ের একখানি উৎকৃষ্ট মাদন্না কিছুদিন পূর্বেও এলগিন রোডের একটি গির্জার শোভাবর্ধন করতো।

তিনি যে চিত্রকর ছিলেন, তার উল্লেখ করছি আমি অন্য কারণে। আর্টিস্ট মাত্রেরই অন্যতম প্রধান গুণ যে, তাঁরা কোনো বস্তু প্রাণী বা নৈসর্গিক দৃশ্য দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো (ক্যারেকটারিস্টিক) লক্ষ্য করেন এবং ঠিক সেইগুলো মাত্র কয়েকটি আঁচড়ে প্রকাশ করতেই আমাদের কাছে রূপায়িত বিষয়বস্তু প্রাণবন্ত হয়ে ধরা দেয়। ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনার সময় বিনায়ক রাও দৃশ্যের পর দৃশ্য মাত্র কয়েকটি ক্যারেকটারিস্টিক শব্দের দ্বারা প্রকাশ করতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি হিমালয়ের গিরি-পর্বত-তুষার-ঝঞ্ঝা চটি-কাফেলা সব যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেতুম। সেটা এখানে এখন আমার পক্ষে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব কারণ আমি কোনো অর্থেই আর্টিস্ট নই।

বিনায়ক রাওয়ের গভীর বন্ধুত্ব ছিল এক জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে—নাম খুব সম্ভব ছিল—এতকাল পরে আমার সঠিক মনে নেই—হাসেগাওয়া। পাঁচ ফুটের বেশী দৈর্ঘ্য হয় কি না হয়, কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি পেশী ছিল যেন ইস্পাতের স্প্রিং দিয়ে তৈরি। প্রায় কিছু না খেয়েই কাটাতে পারতেন দিনের পর দিন এবং বীরভূমের ১১০ ডিগ্রীতেও তাঁর মুখে কোনো ভাবের পরিবর্তন দেখা যেত না। বিনায়ক রাওয়ের সঙ্গে তাঁর আরেকটা বিষয়ে ছিল হুবহু মিল, দুজনাই

অত্যন্ত স্বল্পভাষী। হাসেগাওয়াই প্রস্তাব করেন মানসসরোবরে যাওয়ার।

আমার আজ মনে নেই, কোন্ এক সীমান্তে গিয়ে ঐ পুণ্যসরোবরে যাবার জন্য পারমিট নিতে হয়। বিনায়ক রাও আমাকে বললেন, 'সব সরকারই বিদেশীদের ডরায়, ভাবে ওরা গুপ্তচর, কি মতলব নিয়ে এসেছে, কে জানে। ওসব জায়গায় তো যায় মাত্র দু'ধরনের লোক। তীর্থযাত্রী, আর যেটুকু সামান্য ব্যবসা-বাণিজ্য আছে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারবারী লোক—এরা যায় ক্যারাভান বা কাফেলার দল বানিয়ে। আমি খৃষ্টান, হাসেগাওয়া বৌদ্ধ; মানসসরোবর আমাদের কারোরই তীর্থ হতে পারে না। তবু ফর্মে লিখে দিলুম তীর্থযাত্রী, নইলে পারমিট অসম্ভব। হাসেগাওয়া বললেন, "আমরা গা-ঢাকা দিয়ে রইব, যতদিন না পারমিট পাই, পাছে আমাদের স্বরূপ না ধরা পড়ে। ইতিমধ্যে তোমাকে মাউণ্টেনীয়ারিং বা পাহাড় চড়ার আর্টে তালিম দেব।" ' বিনায়ক রাও বললেন, 'আমি তো মনে মনে হাসলুম। হাসেগাওয়ার তুলনায় আমি তো রীতিমত পালওয়ান। আমি পাহাড় চড়ি চড় চড় করে—ও আবার আমায় শেখাবে কি? কিন্তু ভুল ভাঙল প্রথম দিনই। পাশেই ছিল একটা ছোটখাটো পাহাড়। সেইটে দিয়েই হল আমার প্র্যাকটিস শুরু। হাসেগাওয়া আমাকে পই পই করে বার বার বললেন, "কনে-বউটির মত চলি চলি পা পা করে ওঠো, নইলে আখেরে পস্তাবে।" আমি মনে মনে বললুম, দুত্তোর তোর পা পা। চড় চড় করে উঠতে লাগলুম চড়াই বেয়ে—বাঘের শব্দ পেলে বাঁদর যে-ধরনে সোঁদরবনে সুন্দরী গাছ চড়ে। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু মশাই, ঘণ্টাদুই পরে দেখি অবস্থা সঙ্গীন। আর যে এক কদমও পা চলে না। ভিরমি যাবার উপক্রম। সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় আমি বসে পড়লুম একটা পাথরের উপর। ঘণ্টাটাক পরে হাসেগাওয়া আমাকে পাস্ করলেন, আমার দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হেসে। তিনি চূড়ায় উঠলেন। আমি বসে বসে দেখলুম। নেমে এলেন। বিশ্বাস করবেন না, সৈয়দসাহেব, আমার আত্মাভিমানে লাগল জোর চোট।'

আমি বললুম, 'দাক্ষিণাত্যের তীরু আন্নামলাইয়ের রমন মহর্ষির নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। তিনি অরুণাচলম পাহাড়ের উপর কাটান চল্লিশ না পঞ্চাশ বছর কিংবা ততোধিক। পাহাড়টা কিছু মারাত্মক উঁচু নয় কিন্তু ঝড়ে-বাদলায়, গরমে-ঠাণ্ডায়, কখনো বা অত্যন্ত অসুস্থ দুর্বল শরীর নিয়ে তাঁকে দিনে অন্তত একবার করে ওঠানামা করতে হত। এক পুণ্যশীলা গ্রামের মেয়ে তাঁর জন্য প্রতিদিন খাবার নিয়ে আসতো পাহাড়ের তলায়, যেখানে আজকের দিনের আশ্রম। তিনিও আমাদের ঐ চলি চলি পা পা-র উপদেশ দিয়েছেন, খুব ভালো

ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে। তারপর বলো।'

বিনায়ক রাও বললেন, 'পরদিন আরেকটা পাহাড়ে চেষ্টা দিলুম। সব জেনে-শুনেও আমার কিন্তু ঐ কনে-চাল কিছুতেই রপ্ত হচ্ছিল না। আর হাসেগাওয়া প্রতিদিন আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে পাস্ করতেন ও জিততেন লজ্জাকর মার্জিন রেখে।

'আমরা দিনের পর দিন প্রহর গুনছি—পারমিট আর আসে না, ওদিকে আমরা জনমানবহীন পাহাড়গুলো চড়ছি আর ভাবছি, আত্মগোপন করেছি উত্তমরূপেই। কিন্তু ইতিমধ্যে সীজন যে বেশ এগিয়ে গিয়েছে। আর বেশী দেরি হলে তো বরফ পড়তে আরম্ভ করবে।

'শেষটায় এক বড়কর্তার কাছে ডাক পড়ল। তাঁর প্রাসাদে উঠে দেখি, ইয়া আল্লা। তার সেই উঁচু টিলার স্ট্যাণ্ডের উপর খাড়া জোরদার টেলিস্কোপ। আমরা যখন অস্ট্রিচ পাখীর মত বালুতে মাথা গুঁজে আত্মগোপনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি, ইনি তখন প্রতিদিন নিঝঁঞ্ঝাটে আমাদের প্রতিটি পাহাড় ওঠা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং কৌতূহলী হয়ে আমাদের সম্বন্ধে সর্বসংবাদ সংগ্রহ করেছেন। বেশ রসিয়ে রসিয়ে আদ্যোপান্ত বললেন। আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল—ইস্তেক যে-জাপানী বদন অনুভূতি প্রকাশে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ও অনিচ্ছুক সেটিও কিঞ্চিৎ বিকৃত হল।

'কিন্তু বৃথাই আতঙ্ক; আমরা খামোখাই ঘামের ফোঁটায় কুমীর দেখছিলুম। আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। বড়কর্তা সর্বসংবাদ শুনে আমাদের অভিযানাকাঙ্ক্ষা প্রসন্নতর দৃষ্টিতে আশীর্বাদ করেছেন। কারণ, আমরা ধর্ম বা অর্থ কোনোটাই সঞ্চয় করতে যাচ্ছি না—আমরা আসলে তীর্থযাত্রী নই, আর ব্যবসায়ী তো নই-ই। তবে তখনো জানতুম না, আরেকটু হলেই অনিচ্ছায়, অন্তত আমার, মোক্ষলাভটা হয়ে যেত।'

আমি বললুম, 'ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ তিনটের তো জমা-খরচ হল, আর কাম ?'

মসোজী বললেন, 'রাম, রাম।' ওর মত প্যুরিটান আমি কোনো মঠ, কোনো মনাস্টেরিতে দেখি নি।

তারপর বিনায়ক রাও আমার চোখের সামনে একটার পর একটা ছবি এঁকে যেতে লাগলেন। কত না বনস্পতি, অজানা-অচেনা বিহঙ্গের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, আন্দোলিত উপত্যকার উপর ক্রোশের পর ক্রোশব্যাপী দোদুল্যমান ফুলের বন্যা, পার্বত্য-নদী, জলপ্রপাত, অভ্রংলেহী পর্বত, পাতালস্পর্শী অন্ধকূপ, সংকটময় গিরি-সংকট, পান্থশালা, চটি, পার্বত্য শ্রমণদের জিহ্বানিষ্ক্রমণপূর্বক তৎসঙ্গে ঘন ঘন

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় আন্দোলন দ্বারা অভিবাদন, দুর্গন্ধময় স্নেহজাতীয় পদার্থসহ চা-পানের নিমন্ত্রণসহ অতিথি সৎকার। আরো এত সব বিজাতীয় বস্তু ও কল্পনাতীত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছিলেন যে, সেগুলোর নির্ঘণ্ট মাত্র দিতে হলে প্রচুর অবকাশ ও প্রচুরতর পরিশ্রমের প্রয়োজন। য়েতি বা এবমিনেবল স্নোম্যান সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী বর্ণন করেছিলেন শুধু সেগুলো শিকের হাঁড়িতে সযত্নে তুলে রেখেছি: অস্মদ্দেশীয় সম্পাদক ও প্রকাশকদের শেষশয্যায় সেগুলো তাঁদের রসিয়ে রসিয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে তাঁদের শেষ যাত্রাটি বিভীষিকাময় করে দেবার জন্যে!

বিনায়ক রাও বললেন, 'ক্রমে ক্রমে আমরা লক্ষ্য করলুম, পাহাড় থেকে নেমে আসছে সবাই, উপরের দিকে যাচ্ছে না কেউই। চট্টির পর চট্টি দেখি হয় জনমানবহীন—দরজা-খা-খা করছে কিংবা তালাবন্ধ—সমস্ত শীতকালভর এখানে তো আর কেউ আসবে না।

'আমরা চড়াইয়ের দিকে শেষ কাফেলাও মিস্ করেছি।

'কিন্তু হাসেগাওয়ার ঐ একটি মহৎ সদ্‌গুণ যে, কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন না হওয়ার পূর্বে তিনি ঐ নিয়ে মাথা ঘামান না।

'আমরা যতই উপরের দিকে উঠছি, ততই রাস্তা এবং চট্টি জনবিরল হতে লাগলো। শেষটায় আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলার পরও কাউকে নেমে আসতে দেখি না—ওঠার তো প্রশ্নই ওঠে না। তখন দেখি এক পরিত্যক্ত চট্টির সামনে একজন সাধু বসে আছেন। সন্ধ্যা হয়-হয়। মোক্ষম শীত পড়েছে কিন্তু সাধুজী কৌপিনসার। সর্বাঙ্গে ভস্মও মাখেন নি কিংবা অন্য কোনো ব্যবস্থারও প্রয়োজন-বোধ করেন নি। অথচ দেহটির দিকে তাকালে মনে হয়, এইমাত্র প্রচুর তেল ডলাইমলাই করে স্নান সেরে উঠেছেন—গা বেয়ে যেন তখনো তেল ঝরছে। আমাদের সঙ্গে চাপাতি ও শুকনো তরকারি ছিল। সাধুজীকে তার থেকে হিস্যে দিলুম। তিনি কোনো প্রকারের বাক্যালাপ না করে খেলেন। আমরাও কোনো প্রশ্ন শুধালুম না। পরের দিন ভোরবেলা দেখি, তিনি তখনো সেখানে ঠায় বসে। আমরা তাঁকে প্রণাম করে রাস্তায় নামবার সময় মনে হল এই যেন সর্বপ্রথম তাঁর চোখে ভাবের পরিবর্তন দেখা গেল—সে পরিবর্তনে যেন আমাদের প্রতি আশীর্বাদ রয়েছে। রাস্তায় নামার পর হাসেগাওয়া বললো, 'আমার দুশ্চিন্তা গেছে। আমাদের যখন উনি চড়াইয়ের পথে যেতে বারণ করলেন না, তখন মনে হচ্ছে, আমাদের যাত্রা সফল হবে।

'হিমালয়ের অন্যতম এই রহস্যের সমাধান এখনো হয় নি। এইসব একাধিক

সন্ন্যাসী সমস্ত শীতকালটা এসব জায়গায় কাটান কি করে? পাঁচ-সাত হাত বরফ এখানে তো জমেই—সেখানে না আগুন, না কোনো প্রকারের খাদ্য। এক চটিওলা আমাকে পরে বলেছিল, বরফের তলায় নাকি একরকমের লতা গজায়। তারই রস নাকি এদের খাদ্য, বস্ত্র, আগুন—সব।

'আর হাসেগাওয়া তুলে যাচ্ছে, একটার পর একটা ছবি। এই গিরি অভিযানে বেরুবার তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য—যত পারে, যত রকমের হয়, ফোটোগ্রাফ তোলা। দাঁড়ান, আপনাকে বইখানা দেখাই।'

বিনায়ক রাও নিয়ে এলেন ঢাউস এক ফোটোগ্রাফের বই। মলাটের উপরকার ছবি দেখেই আমার বুঝতে বাকি রইল না যে, এই বই জাপানী। জার্মানরাও বোধহয় এরকম প্রিণ্ট করতে পারে না। কে বলবে এগুলো ব্লক থেকে তৈরি! মনে হয় কণ্টাক্ট প্রিণ্ট!

বিনায়ক রাও বললেন, 'জাপানে ফিরে গিয়ে হাসেগাওয়া তাঁর তোলা ছবির একটি প্রদর্শনী দেখান। সে-দেশের রসিক-বেরসিক সর্বসম্মতিক্রমে এই সঞ্চয়ন ফোটোগ্রাফির প্রথম বিশেষ পুরস্কার পায়।'

ছবি বোঝাবার জন্য এ-বইয়ে টেক্সট অত্যল্প। আমার বড় বাসনা ছিল বইখানা যেন ভারতের বাজারেও জাপানীরা ছাড়ে। কিন্তু ঠিক তখনই মার্কিন হিরোশিমার উপর এটম বোমা ফেলছে। পরবর্তীকালে আমি আবার কঁহা কঁহা মুল্লুকে চলে গেলুম।

এ-বইখানা আনাতে কিন্তু আমার অসুবিধা সৃষ্ট হল। বিনায়ক রাও বই আনার পর আর বর্ণনা দেন না। শুধু বলেন, 'এর পর আমরা এখানে এলুম' বলে দেখান একটা ফোটো, ফের দেখান আরেকটা অনবদ্য ছবি। কিন্তু এখন আমি সেসব ছবির সাহায্য বিনা তাঁদের যাত্রাপথের গাম্ভীর্য, মাধুর্য, বিস্ময়, সঙ্কট, চিত্র-বর্ণন করি কি প্রকারে! পাঠক, তুমি নিরাশ হলে, আমি নিরুপায়।

বিনায়ক রাও, হাসেগাওয়া তোমার ও আমার পরম সৌভাগ্য যে, ওঁরা দুজনা পথিমধ্যে একটি কাফেলা পেয়ে গেলেন—এবং অবিশ্বাস্য, সেটা যাচ্ছে উপরের দিকে। এদের ভিতর আছে তীর্থযাত্রী ও অল্পবিত্ত ব্যবসায়ী। এই শেষ কাফেলা। নানা কারণে এদের বড্ড বেশী দেরি হয়ে গিয়েছে বলে ব্যবসায়ীদের মনে শঙ্কা, বরফ-নামার পূর্বে এঁরা পাহাড় থেকে নামতে পারবেন কিনা। তীর্থযাত্রীদের মনে কিন্তু কোনো প্রকারের দুশ্চিন্তা নেই। এ-ধরনের তীর্থদর্শনে যারা বেরয়, তারা ঘরবাড়ির মোহ, প্রাণের মায়া সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়েই সম্মুখপানে পা ফেলে। পথিমধ্যে মৃত্যু, মানসে মৃত্যু, গৃহ-প্রত্যাবর্তন না

করা পর্যন্ত যেখানেই মৃত্যু হোক না কেন, তাঁরা আশ্রয় পাবেন ধূর্জটির নিবিড় জটার মাঝখানে—যে-জটা হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে চিরজাজ্বল্যমান।

আর কাফেলার ঐসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কথা চিন্তা করলে মনে হয়, কি বিচিত্র দ্বন্দ্বময় পরস্পরবিরোধী কার্যকলাপ এদের জীবনে। যে-প্রাণরক্ষার জন্য এরা দুটি মুঠি অন্ন উপার্জন করতে এসেছে এখানে, সেই প্রাণ তারা রিস্ক করছে প্রতি দিন, প্রতি বৎসর! হুবহু সার্কাসের স্টাণ্ট খেলাড়িদের মত—প্রাণধারণের জন্য যারা প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে প্রতি সন্ধ্যায়!

তা সে যাক্। এ-লেখাটি এখন সংক্ষিপ্ত করি। কারণ, হিমালয়ের বর্ণনাই যখন দিতে পারছি নে, তখন হিমালয় নিয়ে কাহিনী বলা শিবহীন দক্ষযজ্ঞ এবং যদ্যপি হিন্দু পুরাণের সঙ্গে পরিচয় আমার ঘনিষ্ঠ নয়, তবু এটুকু জানি, সে প্রলয়-কাণ্ড ঘটেছিল এই হিমালয়েই—দক্ষালয়ে।

আমি অরসিক। হঠাৎ শুধালুম, 'বিনায়ক রাও! তোমরা খেতে কি?'

'শেষের দিকে পথে যেতে যেতে—'পথ' বললুম বটে কিন্তু আমি আপনারা পথ বলতে যেটা বোঝেন, সেটাকে অপমান করতে চাই নে—আমার শ্যেনদৃষ্টি থাকতো কিসের উপর জানেন? শকুনি, শকুনি—আমি তখন সাক্ষাৎ শকুনি। শকুনি যেমন নির্মল নীলাকাশে ওড়ার সময়ও তাকিয়ে থাকে নিচে ভাগাড়ের দিকে, আমিও তাকিয়ে থাকতুম নিচের দিকে। কোথাও যদি ভারবাহী য়াক্ পশুর এক চাবড়া গোবর পেয়ে যাই। সে-ঘুঁটেতে আগুন ধরিয়ে ধুঁয়োর ভিতর নাড়াচাড়া করি, চেপে ধরি, দু হাত দিয়ে চড়চাপড় মেরে তৈরি করা এবড়ো-থেবড়ো রুটি—গুজরাতীতে যাকে বলে রোটলা, কাবুলী নানের চেয়েও তিন ডবল পুরু। কিন্তু সেই ডাঁশা রুটিই মনে হত সাক্ষাৎ অমৃত—ওলড্ টেস্টামেণ্টের বিধিদত্ত মান্না, যার স্বাদ আজো ইহুদিকুল ভুলতে পারে নি।'

বিনায়ক রাও বললেন, 'পঙ্গুও ঈশ্বরপ্রসাদাৎ গিরি লঙ্ঘন করে—এটা মানসে পৌঁছে জন্মের মত উপলব্ধি করলুম। হাসেগাওয়ার দর্শনই ঠিক—পঙ্গু বাধ্য হয়েই এগোয় অতি ধীরে-মন্থরে, তাই শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় মানসসরোবরে। পঙ্গুর কাছে যা বিধিদত্ত, সুস্থ মানুষকে সেটা শিখতে হয় পরিশ্রম করে।'[১]

---

১ চেকোশ্লোভাকিয়ার পাহাড়-পর্বত হিমালয়ের তুলনায় নগণ্য। সেখানে পাহাড় চড়তে গিয়ে শ্রীযুক্ত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের যে অভিজ্ঞতা হয় সেটি এস্থলে তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।

বিনায়ক রাও ভেবে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, সরোবরে স্নান করেছিলুম। আমার জীবনের মহামূল্যবান অভিজ্ঞতার ভিতর এটা আমার চিরকাল মনে থাকবে।'

'সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল—না? পুণ্যস্নান তো বটে।'

বিনায়ক রাও শিউরে উঠলেন, 'বাপরে বাপ! জলে দিয়েছি ঝাঁপ আর সঙ্গে সঙ্গে মেরেছি পারের দিকে লাফ। সেদিন আকাশ ছিল পরিষ্কার। দ্বিপ্রহরের সেই উগ্র রৌদ্রে আমি ঘণ্টাদুয়েক ছুটোছুটি করেছিলুম শরীরটাকে গরম করার জন্যে। ছুটেছি পাগলের মত দু-হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পা-দুটো ছুঁড়ে ছুঁড়ে আছাড় মেরে মেরে। তারপর ক্লান্ত হয়ে থামতে বাধ্য হয়েছি। ফাঁসির লাশের মত জিভ বেরিয়ে গিয়েছে হাঁপাতে হাঁপাতে। ফের ছুটতে হয়েছে গা গরম করার জন্য। গা আর কিছুতেই গরম হয় না। সে কী যন্ত্রণাভোগ!'

আমি বললুম, 'শুনেছি, গত যুদ্ধে যেসব এ্যার পাইলট শীতকালে ইংলিশ-চ্যানেলের জলে পড়েছে, তাদের কেউই কুড়ি মিনিটের বেশী বাঁচে নি।'

বিনায়ক রাও বললেন, 'লোকে বলে, অগ্নিপরীক্ষা! আমি বলি শীতের পরীক্ষা।'

'হ্যাঁ, আফ্রিকাবাসীরাও বলে—Heat hurts, cold kills.'

বিনায়ক রাও বললেন, 'হাসেগাওয়া প্রাণভরে ছবি তুললেন। তারপর প্রত্যাবর্তন। অন্য পথ দিয়ে।

মিরেক (একজন পাহাড়-বন-বিভাগের চৌকিদারকে) শুধোলে, 'আচ্ছা, আপনি এত আস্তে চলছেন কেন?'

প্রশ্ন শুনে চৌকিদার হোঃ হোঃ করে খুব খানিকটা হেসে নিলেন। তারপর বললেন—'শুনুন। বহু বছর, চল্লিশেরও উপর, বনের পথে, পাহাড়ে রাস্তায় নানান গতিতে হেঁটেছি। কখনও জোরে কখনও ধীরে। আপনাদের মত আগে হাঁটতুম, আরো জোরে হাঁটতুম। লাফিয়ে ঝাঁফিয়ে পাহাড়ে উঠে তার পর হাঁপাতুম। হাত-পা ছড়িয়ে ঘাসের উপর শুয়ে জিরিয়ে নিতুম, তারপর আবার চলতুম। কাজের তাগিদে কখনো সারাদিন হাঁটতে হয়েছে, কখনও সারারাত। কিন্তু এই যে এখনকার আমার চলার গতি দেখছেন, এ হচ্ছে বহুদিনের বহু সাধনার পর আবিষ্কৃত। এ গতিতে চললে কখনও ক্লান্তি আসবে না শরীরে। যত দূর-দূরান্তরে বনান্তরে যান না কেন, যাত্রার শুরুতে যেমন শরীর তাজা তেমনিই থাকবে। চরণিক, প্রথম (বেঙ্গল) সংস্করণ, পৃ ১১৩।১৪॥

'চলেছি তো চলেছি, তারপর এল আমাদের কঠিনতম সংকট। আমাদের একটা গিরিসংকট পেরুতে হবে। এবং এটা পৃথিবীর অন্যতম সর্বোচ্চ গিরি-সংকট। সমুদ্রতট থেকে বারো হাজার ফুট উঁচুতে না বাইশ হাজার আমার মনে নেই। এবং একটুখানি যাওয়ার পরই আরম্ভ হয় চড়াইয়ের পর চড়াই। ক্যারাভানের এক ব্যবসায়ী আমাকে বলেছিল, যেসব তীর্থযাত্রী মারা যায়, তাদের অধিকাংশই মরে এইখানে।

'ক্রমেই বাতাসের অক্সিজেন কমে আসছিল। অতিকষ্টে আমরা ধীরে ধীরে এগুচ্ছি। এমন সময় চোখে পড়ল একটা লোক অকাতরে ঘুমুচ্ছে 'পথের' এক-পাশে। কাছে এসে বুঝলুম, মৃতদেহ! এবং সম্পূর্ণ অবিকৃত মৃতদেহ। এ-বছরে মরেছে, না গেল বছরে বুঝতে পারলুম না। কারণ, আমি শুনেছিলুম, উপরে-নিচে বরফ থাকে বলে মড়া পচে না।

'এর পর আরো কয়েকটা। আমি মাত্র একবার একজনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম, আহা! সে কী শান্ত, প্রশান্ত, নিশ্চিন্ত মুখচ্ছবি। মায়ের কোলে ঘুমিয়ে-পড়া শিশুর মুখেও আমি এরকম আনন্দভরা আত্মসমর্পণের ছবি দেখি নি।

'ইতিমধ্যে আমার দৃষ্টি গেল অন্যদিকে। দেখি, আমাদের দলের একজন বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। কারো সেদিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নেই। আমি জানতুম, এবং হাসেগাওয়াও আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এখানে বলবান যুবা পুত্রও হাত বাড়িয়ে মাতাকে পর্যন্ত সাহায্য করতে পারে না। কারো শরীরে একবিন্দু উদ্বৃত্ত শক্তি নেই যে, সে সেটা অন্যের উপকারে লাগাবে। সামান্য দুটি কথা বলে যে সাহস দেবে সে শক্তিও তখন মানুষের থাকে না। আমার মনে হল, হালকা একটি পালক দিয়েও যদি কেউ আমাকে ঠোনা দেয় আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবো।

'আমি খুব ভালো করেই জানতুম, কাফেলা কারো জন্য অপেক্ষা করে না; করলে সমস্ত কাফেলা মরবে। আমাদের যে করেই হোক সন্ধ্যা নাগাদ সামনের আশ্রয়স্থলে পৌঁছুতে হবে।

'এমনিতেই আমাদের প্রত্যেকেরই ছিল শম্বুকগতি। আমি সেটাও কমিয়ে দিলুম ঐ বৃদ্ধকে সঙ্গ দিতে। হাসেগাওয়া বুঝতে পেরেছে। আমার দিকে রহস্যভরা নয়নে সে তাকাল। আমি ইঙ্গিতে জানালুম, সে যেন তার গতি শ্লথ না করে।'

এস্থলে আমি সামান্য একটি তথ্যের উল্লেখ না করলে কর্তব্যবিচ্যুতি হবে।

বিনায়ক রাওয়ের মত পরদুঃখকাতর মানুষ আমি এ-জীবনে কমই দেখেছি, এবং একেবারেই দেখি নি পরোপকার গোপন রাখতে তাঁর মত কৃতসঙ্কল্প জন। প্রভু যীশুর আদেশ 'তোমার বাঁ হাত যেন না জানতে পারে তোমার ডান হাত কি দান করলো' এরকম অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে আমি কোনো খৃষ্টান অখৃষ্টান কাউকে দেখি নি। কাফেলার বৃদ্ধের প্রতি তাঁর দরদ গোপন রাখতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই তাই করতেন—এ সত্য আমি কুরান স্পর্শ করে বলতে রাজী আছি। কিন্তু এটা গোপন রাখলে তাঁর মূল বক্তব্য একেবারেই বিকলাঙ্গ হয়ে যেত বলে তিনি যতটা নিতান্তই না বললে নয়, সেইটুকুই বলেছিলেন।

বিনায়ক রাও সেদিনের স্মরণে একটুখানি শ্বাস ফেলে বললেন,—'বৃদ্ধকে আমি বলবো কি—স্পষ্ট দেখতে পেলুম, সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে যেন কাফেলা থেকে সে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে। এই যে আমি তার তুলনায় শক্তিশালী, আমারই থেকে থেকে মনে সন্দেহ হচ্ছিল, আমিই কি পৌঁছতে পারবো গন্তব্যস্থলে ? তখন হৃদয়ঙ্গম করলুম, এখানে এ-সঙ্কট থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য শারীরিক বলের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন মানসিক বলের। এবং এ বৃদ্ধের সেটা যেন আর নেই। তীর্থদর্শন হয়ে যাওয়ার পর ফেরার মুখে অনেকেই সেটা হারিয়ে ফেলে—কারণ তখন তো সামনের দিকে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, আর কোনো চরম কাম্য বস্তু নেই। ফিরে তো যেতে হবে আবার সেই সংসারে, তার দিনযাপনের প্রাণ-ধারণের গ্লানির ভিতর।

'আমার মনে হচ্ছিল আমি নিজে যেন সন্তরণে অক্ষম, আরেক সন্তরণে অক্ষম জনকে সাহায্য করার নিষ্ফল প্রচেষ্টা করছি। তবু বললুম, "আরেকটুখানি পরেই উৎরাই। চলুন।" এই সামান্য কটি শব্দ বলতে গিয়েই যেন আমার দম বন্ধ হয়ে এল।

'বুড়ো আমার দিকে তার ঘোলাটে চোখ তুলে তাকিয়ে হঠাৎ কি যেন দেখতে পেল। অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বললে, "বাবু, তোমার বোতল থেকে একটু শরাব।"

বিনায়ক রাও বললেন, 'আমি জীবনে কখনো শরাব স্পর্শ করি নি ; আমার বুকের পকেটে ছিল চ্যাপ্টা বোতলে জল।

'কোনো গতিকে বললুম, "জল।" বুড়ো বিশ্বাস করে না। কাতর নয়নে তাকায়।

'আস্তে অতি আস্তে বুড়ো এগোচ্ছে ঐ শরাবের আশায়।

'এইভাবে খানিকক্ষণ চললো। হঠাৎ বুঝি বুড়ো লক্ষ্য করেছে কাফেলা একেবারেই অন্তর্ধান করেছে। কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো বলল, "জিরোবো।" আমি শুষ্ককণ্ঠে যতখানি পারি চেঁচিয়ে বললুম, "না, না।" আমি জানি, এ জিরোনোর অর্থ কি। এই বসে পড়ার অর্থ, সে আর উঠে দাঁড়াবে না। তার মনে হবে এই তো পরমা শান্তি—আরাম, আরাম। আর শেষ নিদ্রায় ঢলে পড়বে।

'বুড়ো তার শেষ ক'টি কথা বললে যার অর্থ, এক ঢোক শরাব পেলে সে হয়তো সঙ্কট পেরুতে পারবে। আমার দিকে হাত বাড়ালো। আমি আর কী করি? দিলুম বোতল। সে টলতে টলতে বসে পড়ল। এ কী সর্বনাশ! তারপর বোতল মুখে দিয়ে যখন দেখল সত্যি জল, তখন আমার দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো।

'এই শরাবের আশাতেই সে এতক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে কোনো গতিকে এসেছে। এবারে শেষ আশা বিলীন হতে সে ঢলে পড়লো।

* * *

'চলেছি তো চলেছি। কতক্ষণ চলার পর উৎরাই আরম্ভ হয়েছিল, কখন যে উপত্যকায় নেমেছি সেগুলো আমার চৈতন্যসত্তা যেন গ্রহণ করে নি।

'সম্বিতে এলুম হঠাৎ বরফপাতের সঙ্গে সঙ্গে। অতি হাল্কা চাদরের মত কি যেন নেমে এল। তবু সম্মুখপানে খানিকটা দেখা যায়। ঈষৎ দ্রুততর গতিতে চলতে আরম্ভ করলুম। কয়েক মিনিট পরেই বরফপাত থেমে গেল। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে ভয়ে আতঙ্কে আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, একটুখানি বেশী আগেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বসেছি।

'সামনে উপত্যকা, এবং এইমাত্র যে বরফপাত হয়ে গেল তারই "কল্যাণে" মুছে গেছে কাফেলার পদচিহ্ন। এবং সঙ্কটটাকে যেন তার বীভৎসতম রূপ দেবার জন্য সামনে, ধীরে ধীরে, নেমে আসছে কুয়াশার জাল—দিনের আলো ম্লান হয়ে গেছে।

'তারই ভিতর দিয়ে লক্ষ্য করলুম, আরেকটু সামনে একটা পাথরের টিলা। সেখানে পৌঁছে আমাকে যেতে হবে হয় বাঁয়ে নয় ডাইনে। কিন্তু মনস্থির করি কি প্রকারে? বরফের উপর যে কোনো চিহ্নই নেই। তবু আমার মনে যেটুকু দিক্-বিদিক জ্ঞান ছিল সেটা পরিষ্কার বললে, যেতে হবে বাঁ দিকে।

'এমন সময় হঠাৎ কুয়াশার ভিতর যেন একটু ছিদ্র হল, এবং তার ভিতর দিয়ে এক মুহূর্তের তরে, যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, দেখি একটা কুকুরের ইঞ্চি-তিনেক লেজ, বোঁ করে ডান দিকে মোড় নিল, কুকুরটাকে কিন্তু দেখতে

পেলুম না—'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কুকুর! কোথাকার কুকুর? কুকুরের কথা তো এতক্ষণ কিছু বলো নি!'

'ও। সত্যি ভুলে গিয়েছিলুম। ঐ কুকুরটা থাকতো একটা চট্টিতে। আমরা সে চট্টিতে, বৃষ্টির জন্য আটকা পড়ে, দিন তিনেক ছিলুম। ঐ সময় আমি ওটাকে সামান্য এটা সেটা খেতে দিয়েছি। সে-চট্টি ছাড়ার খানিকক্ষণ পরে দেখি, তিনি আমার পিছু নিয়েছেন। বিস্তর হাই-হুই করে পাথর ছুঁড়েও তাকে চট্টিতে ফেরত পাঠাতে পারলুম না।'

আমি বললুম, 'এই তো সেই জায়গা যেখানে যুধিষ্ঠিরের সারমেয় তাঁকে ত্যাগ করতে চায় নি।'

মসোজী বললেন, 'এসব কেন, কোনো কুকুরেরই লেজ কাটা উচিত নয়; তবু কে যেন বেচারীর বাচ্চা বয়সে তার লেজ কেটে দিয়েছিল। আমি দেখতে পেলুম সেই টুকরোটুকু, যেটুকু অবশিষ্ট ছিল। এবং সেটা মোড় নিল ডানদিকে।

'আমার অভিজ্ঞতা, আমার পর্যবেক্ষণ, আমার বিচারশক্তি সব—সব—আমাকে চিৎকার করে বলছিল, "বাঁ দিকে বাঁ দিকে মোড় নাও" আর অতি স্পষ্ট যদিও অতিশয় ক্ষণতরে আমি দেখলুম, কুকুরটার লেজ মোড় নিল ডান দিকে।

'আমি নিজের বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে কুকুরটার লেজকেই বিশ্বাস করলুম বেশী।

'কুকুরটাকে কিন্তু তখনকার মত আর দেখতে পেলুম না।

'ঘণ্টাটাক পরে চট্টিতে পৌঁছলুম। হাসেগাওয়া বললেন, আমি বুড়োর জন্য অপেক্ষা করার পর থেকেই কুকুরটা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছিল। শেষটায় সে অদৃশ্য হয়ে যায়।'

আমি শুধালুম, 'আর বাঁ দিকে মোড় নিলে কি হত?' প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেই বুঝলুম আমি একটা ইডিয়ট্।

বিনায়ক হেসে বললেন, 'তাহলে আপনি আপনার বন্ধু বিনায়ককে আর—'

আমি বললুম, 'ষাট ষাট'।[২]

---

২ বিনায়ক রাও আমাকে তাঁর মানস-গমন কাহিনী বহু বৎসর পূর্বে বলেছিলেন। এখন কেতাবপত্র ঘেঁটে লুপহোল্গুলো যে পূর্ণ করা যেত না তা নয়, কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হল এই থাপছাড়া থাপছাড়া অসম্পূর্ণ পাঠটাই সত্যের নিকটতর থাকবে।

নটরাজনের একলব্যত্ব

বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মার উপর দিয়ে পূরবৈয়া বায়ু বইতে আরম্ভ করে না। সে হাওয়া আসে তার দিন আষ্টেক পরে। কিন্তু তখনই সাড়া পড়ে যায় বন্দরে বন্দরে মাঝি-মহল্লায়। হালের বলদ পালের গরু বিক্রি করে তারা তখন কেনে নৌকোর পাল। পুরনো পালে জোড়াতালি দিয়ে যেখানে চলে যাওয়ার আশা, সেখানে চলে কাঁথার ছুঁচ আর মোটা সুতো। তার পর আসবে ঝোড়ো বেগে পূব হাওয়া। দেখ্ তো না দেখ্, নারায়ণগঞ্জী নৌকো পৌছে যায় রাজশাহী। বিশ্বাস করবেন না, স্রোতের উজানে, তর তর করে।

আমিও বসে আছি হাল ধরে, পাল তুলে—হাওয়া এই এল বলে। নোঙ্গর নিই নি। এই শেষ যাত্রায় যেতে হয় এক ঝটকায়। কোথাও থামবার হুকুম নেই।

নাতি ডাবাটি এগিয়ে দিয়ে বললে, 'দাদু, তামুক খাও।'

হাওয়ার আশায় বসে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দ-আবেশে ভরে যায়।

নাতি বললে, 'দাদু, সারাজীবন ধরে পদ্মার উজান-ভাটা করলে। কত লোকের সঙ্গেই না তোমার দোস্তী হল। বাড়িতে থেকে খেত-খামার করে দোকানপাট চালালে তো অতশত লোকের সঙ্গে তোমার ভাবসাব হত না—আর বিদেশীই বা কিছু কম। কহাঁ কহাঁ মুল্লুকের রং-বেরংয়ের চিড়িয়া। আমারে কও, তাদের কথা।'

শ্রীযুত গাঙ্গুলীর পাহাড় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা একটু আগেই ফুটনোটে উল্লেখ করেছি। মোরাভিয়ার পাহাড় তেমন কিছু উঁচু নয়, কিন্তু বরফের ঝড়ে কিংবা নিছক ক্লান্তিবশতঃ পর্যটকের মরণবরণ একই পদ্ধতিতে হয়। গাঙ্গুলিমশাই লিখছেন :

'সেবারে দুটি স্লোভাক ছেলে প্রাড্য়েটের চুড়োয় এসে হাজির হল। তখন খুব বরফ পড়ছে। (সেখানকার) কাফিখানায় এক চুল জায়গা নেই—যত রাজ্যের স্কী-চালক সেখানে এসে জমেছে। এই দুই স্লোভাক ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু পেয়ালা গরম দুধ খেয়ে বেরিয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছ জিজ্ঞেস করায় তারা জবাব দিলে—চের্ভেনে সেডলো।

বরফ পড়লেও দিনটা মোটামুটি পরিষ্কার ছিল। কিন্তু ছেলে দুটি বেরিয়ে যাবার খানিক পরেই হঠাৎ কুয়াসা এসে চারিদিক ছেয়ে ফেললো। তারপর এই কুয়াসা কাটল না, ছেলে দুটিও ফিরে এল না। এদিকে অন্ধকার নেমে এল

আমি পদ্মা নদীর মাঝি নই। কিন্তু আমার জীবনধারা বয়ে গেছে পদ্মার চেয়েও দেশদেশান্তরে। কত না অদ্ভুত অদ্ভুত পরিস্থিতি, কত না বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এখন পাল তুলে ওপারে যাবার মুখে ভাবছি, এঁদের কারো কারো সঙ্গে আপনাদেরও পরিচয় করিয়ে দি। কারণ এঁদের সম্বন্ধে অন্য কেউ যে মাথা ঘামাবে সে আশা আমার কম—প্রচলিতার্থে এঁরা দেশের

আর তারই সঙ্গে ঘন তুষারপাত শুরু হয়ে গেল।

কাফিখানার মালিক উদ্বিগ্ন হয়ে বিদেশী ছেলে দুটিকে খোঁজবার জন্যে কয়েক-জনকে পাঠালেন। তারা স্কী নিয়ে কোমরে টর্চ বেঁধে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে ঐ ঘন তুষারপাতের মধ্যে যাবে কোথায়? যাবেই বা কি করে? বিশেষ কিছু লাভ হল না। তারা ফিরে এল। কিন্তু ছেলে দুটি আর ফিরল না।

পরদিন সকালবেলা বরফের উপর রোদ পড়ে যখন চারিদিক ঝলমল করে উঠল, তখন দেখা গেল রাত ভোর এত বরফ পড়েছে যে ছেলে দুটি যদি কোথাও মরেও পড়ে গিয়ে থাকে তাদের দেহ খুঁজে বার করবার কোনো উপায় নেই। আশপাশের যত কুটির যত গ্রাম আছে সব জায়গা থেকে যখন খবর এল যে ছেলে দুটি কোথাও পৌঁছয় নি তখন বোঝা গেল এই অঞ্চলের বরফের মধ্যে তাদের সমাধি হয়েছে।

সারা শীতকাল ছেলে দুটি তাদের অজানা সমাধির মধ্যে রইল শুয়ে। তারপর যখন প্রথম বসন্তের হাওয়ায় বরফ গলতে আরম্ভ করল তখন তাদের অবিকৃত দেহ আবিষ্কার হয় এই জঙ্গলের মধ্যে। আশেপাশে অনেকগুলো আধপোড়া দেশলাই-এর কাঠি ছড়ানো।

বরফের মধ্যে পথ হারিয়ে যাওয়ার এই হচ্ছে বিপদ। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার মত হলে যে ক্লান্তি আসে সে বড় ভয়ানক ক্লান্তি। দু-চারটে দেশলাই জ্বেলে কি তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়? দেহ মন চোখ সমস্ত ঘুমে জড়িয়ে আসে। হঠাৎ শীতের অনুভূতি আর থাকে না। মনে হয় বরফেরই কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়ি। তখন মনে হয় জেগে থাকার চেষ্টা করার মধ্যেই যত অস্বস্তি যত কষ্ট! ঘুমিয়ে পড়াই হচ্ছে আরাম! তারপর একবার সেই ঘুমের কোলে কেউ ঢলে পড়লে, সে ঘুম আর ভাঙ্গে না। বরফের মধ্যে মৃত্যুকে ঠিক জীবনের অবসান বলা যায় না—এ যেন এক গভীর সুষুপ্তি।'

কুতুবমিনার নন। অথচ আমার বিশ্বাস এঁরা যদি সত্যই এম্‌বিশাস্‌ হতেন তবে আজ আমার মত অখ্যাত জনের কাঁধে এঁদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবার ভার পড়তো না, আর পড়লেও সেটা আমি গ্রহণ করতুম না। কারণ এঁদের আমি ভালোবেসেছিলুম এঁরা লাওৎসের চেলা বলে। তাঁরই উপদেশ মত এঁরা জীবনের মধ্য-পথ অবলম্বন করেছিলেন। পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে, আপন প্রতিভা যতদূর সম্ভব চাপা রেখে গোপনে গোপনে তার পরিপূর্ণ বিকাশ দেবার চেষ্টা করেছেন। বাধা পড়লে লড়াই দিতেন মোক্ষম, কিন্তু সর্বক্ষণ এঁদের চরিত্রে একটা বৈরাগ্য ভাব থাকতো বলে মনে মনে বলতেন, 'হলে হল, না হলে নেই।'

কিন্তু আমাকে একটু সাবধানে, নাম পরিচয় ঢেকে চেপে লিখতে হবে। পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি এঁরা জীবন-সভাস্থলে প্রধান অতিথির আসনে বসে ফুলের মালা পরতে চান নি, তাই পাঠক সহজেই বুঝে যাবেন, কারো লেখাতেও তাঁরা হ্যামলেট, রঘুপতি হতে চান না—আমার নাতিপরিচিত লেখাতেও না।

মনে করুন তার নাম নটরাজন। তার পিতা ছিলেন পদস্থ সরকারী কর্মচারী, আশা করেছিলেন ছেলেও তাঁর মত চারটে পাস দিয়ে একদিন তাঁরই মত বড় চাকরি করবে। অন্যায্য আশা করেন নি, কারণ নটরাজন ক্লাসের পয়লা নম্বরী না হলেও প্রোমোশন পেত অক্লেশে, আর একটা বিষয়ে ইস্কুলের ভিতরে বাইরে সবাইকে ছাড়িয়ে যেত অবহেলে। ছবি আঁকাতে। তার অঞ্চলে এখনও দেওয়ালে রঙিন ছবি আঁকার (ম্যুরাল) রেওয়াজ আছে। তারই ওস্তাদ পটুয়ারা স্বীকার করতেন, নটরাজনের চতুর্দশ পুরুষে যদিও কেউ কখনো ছবি আঁকেন নি—তাঁরা খানদানী, পটুয়া হতে যাবেন কোন্‌ দুঃখে—এ ছেলে যেন জন্মেছে তুলি হাতে নিয়ে। শুধু তাই না—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে এদেশে যখন হরেক রকম রঙের অভাব চরমে পৌঁচেছে তখন নটরাজন দেশের কাদামাটি কাঁকর পাথর ফুলপাতা থেকে বানাতে আরম্ভ করলো নানা রকমের রঙ। এটা ঠিক আর্টিস্টের কাজ নয়—এর খানিকটে কেমিস্ট্রি বাকিটা ক্রাফ্‌ট্‌সম্যান্‌শিপ। পটুয়ারা নটরাজনকে প্রায় কোলে তুলে নিলেন। তখন তার বয়েস বারো-তেরো।

রবিবর্মা তার অঞ্চলেরই লোক। ওঁর ছবি কিন্তু নটরাজনকে বিশেষ বিচলিত করে নি। হঠাৎ একদিন সে দেখতে পেল নন্দলালের একখানা ছবি। জঘন্য রিপ্রডাক্‌শন্‌—রেজিস্ট্রেশন এতই টালমাটাল যে মনে হয় প্রিন্টার তিনটি বোতল

টেনে তিনটে রঙ নিয়ে নেচেছে।

নটরাজন কিন্তু প্রথম ধাক্কায় স্তম্ভিত। দ্বিতীয় দর্শনে রোমাঞ্চিত। মধ্য রজনী অবধি সে ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

নটরাজন ছিল অসাধারণ পিতৃভক্ত। তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পিতা কি আশা পোষণ করেন সে তা জানতো। কি করে তাঁকে বলে যে সে তার গুরুর সন্ধান পেয়ে গিয়েছে; সর্বস্ব ত্যাগ করে তাঁর পদপ্রান্তে তাকে যেতেই হবে। তদুপরি কোথায় মালাবার আর কোথায় শান্তিনিকেতন!

পিতাই লক্ষ্য করলেন তার বিষণ্ণ ভাব। পিতাপুত্রে সখ্য ছিল—দূরত্ব নয়। সব শুনে বললেন, 'বাঁধা পথে যে চলে না তার কপালে দুঃখ অনেক। কিন্তু আপন পথ খুঁজে নেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ আরো বেশী। তোমার উপর আমার আশীর্বাদ রইল।'

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম যুগ। যারা 'গোলামী-তালিম' চায় না, তারা যাবে কোথায়? বিশ্বকবি কবিগুরু যেন বিধির আদেশে ঠিক ঐ শুভলগ্নেই শান্তিনিকেতনে তাদের জন্য নীড় নির্মাণ করেছিলেন—যত্র বিশ্ব ভবত্যেক নীড়ম্। দূর সিন্ধু, মালাবার, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, আসাম থেকে ছেলেমেয়ে আসতে লাগলো—দলে দলে নয়, একটি দুটি করে।

যারা এল তাদের মধ্যে দু-চারটি ছিল লেখাপড়ায় বিদ্যেসাগর, বাপ-মা-খ্যাদানো বিশ্ববকাটে। বিশ্বভারতীই তো বিশ্ববকাটেদের উপযুক্ত স্থান, ঐ ছিল তাদের দৃঢ় বিশ্বাস! আসলে এরা ছিল কোনো কৌশলে ইস্কুল থেকে নাম কাটাবার তালে। অসহযোগের সহযোগিতায় তারা সে কর্মটি করলো নিশান উড়িয়ে দামামা বাজিয়ে।

বলা বাহুল্য আমি ছিলুম এই দলের।

হিন্দী-উর্দুতে বলে 'পাঁচো উঙলিয়া ঘীমেঁ আর গর্দন ডেগমে'—অর্থাৎ 'পাঁচ আঙুল ঘিয়ে আর গর্দানটাও হাঁড়ায় ঢুকিয়ে ভোজন।' আমরা যে ভূমানন্দ—ভূমা, বিশ্বপ্রেম, অমৃতের পুত্র এসব কথা তখন ছিল আমাদের ডালভাত—আমাদের মধুরতম স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি নি, এখানে এসে দেখি সে-অমৃত উপচে পড়ছে। সে যুগে বিশ্বভারতীর প্রথম নীতি ছিল, আমি অক্ষরে অক্ষরে তুলে দিচ্ছি: 'The system of examination will have no place in Visvabharati, nor will there be any conferring of degrees.' !!

বঙ্কিম চাটুয্যের কল্পনাশক্তি বড়ই দুর্বল। তিনি রচেছিলেন,

'ছাত্রজীবন ছিল সুখের জীবন
যদি না থাকিত এগজামিনেশন।'

বিশ্বভারতী বঙ্কিমের সে স্বপ্ন মূর্তমান করেছিল।

এবং ধর্মতঃ ন্যায্যতঃ প্রাগুক্তনীতির পিঠ পিঠ আসে : যেখানে পরীক্ষা নেই সেখানে ক্লাসে উপস্থিত হওয়া না-হওয়া ছাত্রের ইচ্ছাধীন। অতএব রেজিস্ট্রি নেই, রোল্-কল্ নেই!

আমাদের অভাব ছিল মাত্র একটি—উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট যা-ই হোক—চায়ের দোকান। তাই ছিল ঘরে ঘরে স্টোভ আর চায়ের সরঞ্জাম।

সত্যকুটিরের বারান্দায় মোড়ার উপর বসে শুনছি ভিতরে স্টোভের শব্দ। কেষ্‌নগরের মণি গাঙ্গুলী চা বানাচ্ছে। সামনে, গৌরপ্রাঙ্গণ পেরিয়ে, লাইব্রেরির বারান্দায় ঈষৎ প্রাণচাঞ্চল্য আরম্ভ হয়েছে। বৈতালিকের মূলগায়েন শ্রীযুক্ত অনাদি দস্তিদার (পরবর্তী যুগে খ্যাতিপ্রাপ্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ) ও দোহারদের ফুলু রায় গান বাছাই করছেন। পূজনীয় বিধু-ক্ষিতি-হরি একটু পরেই আসবেন।

তখনকার দিনে প্রথা ছিল, যারা গত চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর এই প্রথম আশ্রমে এসেছে তারা ভোরের বৈতালিকে উপস্থিত হত। আমাদের দলটা 'গুডি গুডি'দের তুলনায় ছিল সংখ্যালঘু। অবশ্য আমরা দম্ভভরে গুরুদেবকেই উদ্ধৃত করে বলতুম, The rose which is single need not envy the thorns which are many. কিন্তু তক্কে তক্কে থাকতুম, দল বাড়াবার জন্য।

হঠাৎ চোখ পড়লো নয়া মালের দিকে। দূর থেকে মনে হল চেহারাটা ভালোই—ভালোমানুষ। জানলা দিয়ে ভিতরের গাঙ্গুলীকে বললুম, 'এসেছে রে'। গাঙ্গুলী এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে গান ধরলে,

'শুনে তোমার মুখের বাণী
আসবে ছুটে বনের প্রাণী—'

অর্থাৎ বিশ্বভারতীর ডাক শুনে বনের প্রাণীরা এসে জুটেছে!

ইনিই হলেন আমাদের নটরাজন।

দুপুরবেলা খাওয়ার পর তাকে গিয়ে শুধালুম, 'টেনিস খেলতে জানো?' বড়ই গাঁইয়া—মাস ছয় পূর্বে আম্মো ছিলুম, এবং বললে পেত্যয় যাবেন না, এখনো আছি—হকচকিয়ে 'ইয়েস ইয়েস, নো নো, ইয়েস ইয়েস' বললে। 'র‍্যাকেট নেই? কুছ পরোয়া ভী নেই, আমারটা দোব'খন।' এরপর ভাব হবে

না কেন ?

তবে লাভ হল না। কলাভবনের ছাত্র। আমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় কম। তবে দেখলুম, বাউণ্ডুলে স্বভাব ধরে। তখন তখন স্কেচ বই নিয়ে খোয়াইডাঙার ভিতর ডুব মারে। সাঁওতাল গ্রাম থেকে ডিম কিনে এনে গোপনে যে সেদ্ধ করে খাওয়া যায়—আশ্রম তখনো নিরামিষাশী—সেটা ওকে শিখিয়ে দিলুম। সে তো নিত্যি নিত্যি খোয়াই পেরিয়ে সাঁওতাল গাঁয়ে যায়—তার পক্ষে ডিম যোগাড় করা সহজ।

কিন্তু ঐ গোবেচারাপারা ছোঁড়াটা পেটে যে কত এলেম ধরে সেটা অন্তত আমার কাছে ধরা পড়লো অল্পদিনের ভিতর। আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে অনেকক্ষণ অবধি এদিক থেকে, ওদিক থেকে, এগিয়ে পিছিয়ে পর্যবেক্ষণ করে তুললো দুটি ফোটো। পরে প্রিণ্ট দেখে আমার চক্ষুস্থির। এ যে, বাবা, প্রফেশনালেরও বাড়া! এবং আজ আমি হুহুরের দেবতা বিশ্বকর্মাকে সাক্ষী মেনে বলছি, পরবর্তী যুগে কি বার্লিন কি লণ্ডন কেউই টেকনিকালি আমার এমন পারফেক্ট ছবি তুলতে পারে নি—এবং স্মরণ রাখবেন, নটরাজনের না ছিল কৃত্রিম আলো বা স্টুডিয়ো।

এরপর যা দেখলুম সে আরো অবিশ্বাস্য। নটরাজনের অন্যতম গুরুর প্রথম মেয়ের বিয়ে। কোথায় গয়না গড়ানো যাবে সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। স্বল্পভাষী নটরাজন অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ শোনার পর বললে, 'আমাকে মাল-মশলা দিন। আমি করে দিচ্ছি।' সবাই অবাক ; 'তুমি শিখলে কোথায় ?' বললে 'শিখি নি, দেখেছি কি করে বানাতে হয়।' নন্দলাল চিরকালই এ্যাড-ভেঞ্চার-একস্‌পেরিমেণ্টের কলম্বাস। দিলেন হুকুম, 'ঝুলে পড়।'

বিশ্বকর্মাই জানেন স্যাকরার যন্ত্রপাতি কোত্থেকে সে যোগাড় করলো, কি কৌশলে কাজ সমাধা করলো। গয়না দেখে কে কি বলেছিলেন সেটা না বলে শুধু সবিনয় নিবেদন করি, হিন্দু বিয়েতে বরপক্ষ আকছারই সহিষ্ণুতায় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পাল্লা দিতে আসেন না—তাঁরা পর্যন্ত পঞ্চমুখে গয়নার প্রশংসা করেছিলেন।

নটরাজনের অন্যান্য গুণ উপস্থিত আর উল্লেখ করছি না। তার পরবর্তী ঘটনা বোঝার জন্য একটি গুণকীর্তন করি। এস্তেক বর্ণপরিচয় স্পর্শ না করে শুধু কান দিয়ে সে শিখেছিল অদ্ভুত সড়গড় চলতি বাঙলা। আমাকে শুধু গোড়ার দিকে একদিন শুধিয়েছিল, 'বাঙলার কি কোনো স্ট্যাণ্ডার্ড উচ্চারণ নেই ? উচ্চারণে উচ্চারণে যে আসমান জমীন ফারাক ? কোন্‌টা শিখি ?'

শান্তিনিকেতনে তখন ছিল নিরঙ্কুশ 'বাঙাল' রাজত্ব। 'পাঁচটা বাঁদরের'

বদলে 'পাস্টা বাদর' হামেশাই ঝোপঝাড় থেকে 'বেরিয়ে পড়ার' বদলে 'বেড়িয়ে পরতো', অবিরাম ঝড় ঝড় বাড়ি-ধাড়ার মাঝখানে। আমি নটরাজনকে বললুম, 'আর যা কর্ কর্, দোহাই আল্লার, আমার উচ্চারণ নকল করিস্ নি। আমি বাঙালস্য বাঙাল—খাজা বাঙাল। আর করিস নি গুরুদেবের। তাঁর ভাষা, তাঁর উচ্চারণ তাঁর মুখেই শোভা পায়। করবি তো কর্ তোর গুরু নন্দলালের উচ্চারণ। বাঙলায় এম. এ. পাশ ধুরন্ধররাও ওরকম সরল চলতি বাঙলা বলতে পারে না।'

তার পর ঝাড়া বিশটি বছর আমাদের দুজনাতে দেখাসাক্ষাৎ হয় নি, চিঠি-পত্রও না। এই বিশ বৎসরের ভিতর বাঙলা দেশে থাকলে পৌষ মেলায় কখনো-সখনো শান্তিনিকেতন গিয়েছি। ওর সাক্ষাৎ পাই নি। সত্যি বলতে কি, ওর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। শুধু কেউ কখনো অচলিত গান

জগপতি হে
সংশয় তিমির মাঝে
না হেরি গতি হে—

গাইলে মনে পড়তো নটরাজন ওর সুরটা বড় দরদভরা করুণ সুরে বাঁশীতে বাজাতো।

১৯৪৭ সাল। স্বরাজ যখন পাকা ফলটির মত পড়ি পড়ি করছে ঐ সময়ে আমি একদিন বাঙ্গালোরের এক রেস্তোরাঁয় বসে কফি খাচ্ছি। দেখি, তিনটি প্রাণী ঢুকে এককোণে আসন নিল। একজন চীনা কিংবা জাপানী ছোট্টখাট্টো এক মুঠো মেয়ে, দ্বিতীয়া সুডৌলা তরুণী—খুব সম্ভবত তামিল—এবং সঙ্গে এ কে? নটরাজন! চেহারা রত্তিভর বদলায় নি। শুধু কপালটি আরো চওড়া হয়েছে, চুলে বোধ হয় অতি সামান্য একটু পাক ধরেছে। আমার চেহারা বদলে গেছে আগা-পাশ-তলা কিন্তু আর্টিস্ট নটরাজনকে ফাঁকি দিতে হলে প্লাস্টিক সার্জারি করাতে হয়, এবং চোখ দুটো 'আই-ব্যাঙ্কে' জমা দিতে হয়। নটরাজন আমাকে দেখা মাত্র উঠে এসে আমাকে তার টেবিলে নিয়ে গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। তামিলটি লেডি ডাক্তার, বিধবা, প্র্যাকটিস করেন, এবং জাপানীটি তাঁর স্ত্রী। শুধালাম, 'তুমি আবার জাপান গিয়েছিলে না কি?' সেই মুখচোরা নটরাজন মুখ-চোরাই রয়ে গেছে। বললে 'অনেক বছর কাটিয়েছি।'

সেদিন আর বেশী কথাবার্তা হল না। শুধু বললে, শহরের তিন মাইল দূরে

ফাঁকা জায়গায় সেরামিকের ছোটখাটো কারখানা করেছে, বাড়িও। আমাকে শনিবার দিন উইক-এণ্ড করতে সেখানে নিয়ে যাবে। আমার ঠিকানাটা টুকে নিল।

এস্থলে বলে রাখা কর্তব্য বিবেচনা করি, আমি কুমোরের হাঁড়িকুড়ি থেকে আরম্ভ করে সেরামিক, পর্সেলিন, গ্লেজড্ পটারি, ফাইয়াঁস এসবের কিছুই জানি নে। শুধু এইটুকু জানি যে স্টোনওয়েয়ার পাথরের জিনিস নয়—সেটা আমরা যাকে তামচিনি বলি, মেয়েরা যে সব বোয়ামে আচার-টাচার রাখেন। এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন হল এই কারণে যে সেই সন্ধ্যায় এক বন্ধুকে নটরাজনের কথা তুলতে তিনি বললেন, 'সেরামিক বাবদে ও যা জানে না, সেটা জানার কোনো প্রয়োজন নেই। বিগেস্ট একস্পার্ট ইন দি ঈস্ট। এখানকার সরকারী সেরামিক ফ্যাক্টরির বড় কর্তা।'

শনির সন্ধ্যায় নটরাজন আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। তার বউ একটি-মাত্র কথা না বলে যা যত্ন-আত্তি করলে সেটা দেখে বুঝলুম কেন চীন-জাপানে প্রবাদ প্রচলিত আছে 'চীনা খাদ্য আর জাপানী স্ত্রী—স্বর্গ-সুখ : চীনা স্ত্রী আর জাপানী খাদ্য—নরক ভোগ।' জাপানী স্ত্রীজাতির মত কর্মঠ, শান্ত, সেবাপরায়ণ রমণী নাকি ইহসংসারে নেই।

আহারাদির পর নটরাজনের স্ত্রী বললেন, 'দুই বন্ধুতে কথাবার্তা বলুন।'

নানা কথা হওয়ার পর আমি বললুম, 'জাপানের কথা কও।'

নটরাজন সে রাত্রে কিছুটা বলেছিল, পরে আরো সবিস্তার।

বললে, 'শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর আমার ধারণা হল যে আর্টসের চেয়ে ক্রাফ্‌ট্‌সেই আমার হাত খোলে বেশী।'

আমি বললুম, 'সে আর বলতে! সেই যে, গয়না বানিয়েছিলে!'

বললে, 'সে কথা আর তুলো না। হাত ছিল তখন বড্ড কাঁচা। তা সে যাক্। নানা ক্রাফ্‌ট্‌স্ শিখলুম অনেক জায়গায়। শেষটায় চোখ পড়লো পর্সেলিনের দিকে। সামান্য কিছুটা শেখার পরই বুঝলুম, এ একটা মারাত্মক ব্যাপার, একটা নূতন জগৎ, এর সাধনায় আস্ত একটা জীবন কেটে যায়। মেলা কেতাবপত্র ঘেঁটে আবিষ্কার করলুম যে, যদিও চীন এই কর্মে একদা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, ড্রেস্‌ডেন্‌ও একদা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল, এখন কিন্তু জাপান এর রাজা।

ঘটি-বাটি বিক্রি করে চলে গেলুম জাপান।

টোকিয়ো পৌঁছনোর কয়েকদিন পরেই দেখি আমার ল্যাণ্ডলেডি চীনামাটি

নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। তার কাছ থেকে খবর পেলুম, পর্সেলিন অর্থাৎ চীনা-মাটির বাসনকোসন, কাপ-সসার বানানো এদেশে কুটিরশিল্পও বটে। সে কি করে হয়! যে মাটি দিয়ে পর্সেলিন তৈরী হয় তার থেকে বালু আর অন্যান্য খাদ সরাবার জন্য ব্যাপক বিস্তৃত ব্যবস্থা করতে হয় অনেকখানি জায়গা নিয়ে—আমি এখানে, বাঙালোরে এসে করেছি, কিন্তু ঠিক ওৎরাচ্ছে না, এখানকার মাটি ভালো নয়—খরচাও বিস্তর। ল্যাণ্ডলেডি বললে, বাজারে রেডিমেড কাদা বিক্রি হয়। আমি ল্যাণ্ডলেডিকে বললুম, সে না হয় হল, কিন্তু পোড়াবে (fiıe করবে) যে, তার জন্যে কিল্‌ন্ ফারনেস্ (পাঁজা) পাবে কোথায় ?'

আমি বাধা দিয়ে নটরাজনকে বললুম, 'আমাদের কুমোররা—'

বললে, 'হায়, হায়! ঐ টেম্পারেচারে মাটির হাঁড়িকুড়ি হয়। গ্লেজড্ পটারির—এ দেশের সব বস্তুই তাই—জন্য আরো টেম্পারেচার তুলতে হয়, আর কমসে কম দু হাজার ফারেনহাইট না হলে—'

আমি বললুম, 'থাক্, থাক্। ওসব আমি বুঝবো না।'

বললে, 'হ্যাঁ সেই ভালো। তার পর খবর নিয়ে ন্যাজেমুড়ো অবধি ওকিবহাল হয়ে গেলুম। নিজের চাই শুধু একটা পটারস হুইল—কুমোরের চাক। বাজার থেকে রেডি-মেড কাদা এনে তাতে চড়িয়ে বানাবে যা খুশী। সেগুলো ভেজা থাকতে থাকতেই তার উপর আঁকবে ছবি—নিজস্ব আপন অনুপ্রেরণায়, এবং একই ছবি দুসরা সেটে আবার নকল করবে না, যে রকম খাস পেণ্টাররা একই ছবি দু'দুবার আঁকেন না। ছবি আঁকা শেষ হয়ে গেলে সেগুলো ঠেলায় করে নিয়ে যাবে কিল্‌ন্‌ওলার কাছে। বহু লোকের কাছ থেকে এক রাশ জমা হলে তবে সে ফায়ার করবে, নইলে খর্চায় পোষায় না। তবে মোটামুটি বলে দেয় কবে এলে তোমার মাল তৈরী পাবে। মাল খালাসীর সময় দেবে তার মজুরী। তার পর তুমি তোমার মাল পর্সেলিনের দোকানে দিয়ে আসতে পারো—তারা বিক্রি করে তাদের কমিশন নেবে—কিংবা তুমি ঠেলা ভাড়া করে তার উপর মাল সাজিয়ে ফেরি করে বেড়াতে পারো।'

আমি বললুম, 'ব্যবস্থাটা উত্তম বলতে হবে। তার পর ?'

'জিনিসটা যে এত সরল সহজ করে এনেছে জাপানীরা সেটা আমি জানতুম না। সেইদিনই সব-কিছু যোগাড় করে লেগে গেলুম কাজে। টেকনিকেল দুটো একটা সামান্য জিনিস ল্যাণ্ডলেডির করার ধরন থেকে অনায়াসে শিখে নিলুম। আর এ ব্যাপারে তো এই আমার পয়লা হাতেখড়ি নয়। আর কাপ, পটে আঁকার মত ছবির বিষয়বস্তু নিয়েও আমার কোনো দুর্ভাবনা ছিল না।

মাল যখন সমূচা তৈরী হল, তখন কিছুটা দিলুম দোকানে, আর ঠেলা নিয়ে ফেরি করতে কার না শখ যায় ?

ভারতীয় বলে সর্বত্রই পেলুম অকৃপণ সৌজন্য ও সাহায্য। তুমি জানো কিনা জানি নে, এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক ভবঘুরে জাপানী না জানি কি করে ভাসতে ভাসতে পৌঁছয় তোমাদের ঢাকা শহরে। ভাবতেই কি রকম মজা লাগে —দুনিয়ার সব জায়গা ছেড়ে ঢাকা। তবে ঐ চিরসবুজের দেশ—আমারও দেখা আছে—তাকে এমনি মুগ্ধ করলো যে, সে সেখানে একটা সাবানের কারখানা খুললো এবং শেষটায় একটি হিন্দু মেয়েকে বিয়েও করলো। বাপ মাকে দেখাবার জন্য একবার নিয়ে গেল তার বউকে জাপানে। 'বুদ্ধের দেশের মেয়ে জাপানে এসেছে' খবরটা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। সেই অজ পাড়াগাঁ রাতারাতি হয়ে গেল জাপানের তীর্থভূমি। হাজার হাজার নরনারী লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সেখানে কন্যার দর্শনাভিলাষে। ভাবো, মেয়েটার অবস্থা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে বসতে হল পদ্মাসনে, আর নতনম্র জাপানীদের লাইন তাকে প্রণাম করে পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করলো।'

আমি বললুম, 'মহিলাটি ঢাকায় ফিরে তাঁর জাপান-অভিজ্ঞতা বাঙলায় লেখেন, বড় সবিনয় ভাষায়। আমি পড়েছি। সে তো এলাহি ব্যাপার হয়েছিল।'

'হবে না ? আমার আমলে আমাদের রাসবিহারীবাবু ছিলেন জাপানীদের সাক্ষাৎ দেবতা। ভারতবর্ষ থেকে জাপানে যে কেউ আসুক না কেন—এমন কি ইংরেজও—তার কাগজপত্র যেত ওঁর কাছে। তিনি 'না' বললে পত্রপাঠ আগন্তুকের জাপান ত্যাগ ছিল অনিবার্য। আর গুরুদেবের কাছ থেকে কেউ চিঠি নিয়ে এলে রাসবিহারীবাবু তাকে সমাজের সর্বোচ্চদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধের জন্মদিনে তাঁর বাড়ি থেকে প্রসাদ বিতরণ হত —কিউ দাঁড়াতো মাইল দুয়েক লম্বা। সিঙাড়া না আমাদের দেশের কি একটা খাবার—জাপানীদের কাছে রোমাণ্টিক এবং হোলি।

আমি অবশ্য পারতপক্ষে মাতৃভূমির পরিচয় দিতুম না।

তবু বিক্রি হতে লাগলো প্রচুর। তার কারণ সরল। পাত্রের গায়ে অজানা ডিজাইন, নবীন ছবি—তা সে ভালো হোক আর মন্দই হোক—সক্কলেরই চিত্ত-চাঞ্চল্য এনে দেয়। তারই ফলে আমি পরমানন্দে দিন কাটাতে লাগলুম। ফেরি-টেরি আর করি নে—নিতান্ত দু'মাসে ছ'মাসে এক আধ দিন—রোমান্সের জন্য। করে করে দু বছর কেটে গেল।

একদিন ঐ ঠেলা গাছের ছায়ায় দাঁড় করিয়ে আমি জিরোচ্ছি, এমন সময় এক থুরথুরে অতিবৃদ্ধ জাপানী খানদানী সামুরাই—অন্তত আমার তাই মনে হল —থমকে দাঁড়ালেন ঠেলার সামনে। কিন্তু এঁর মুখে দেখি তীব্র বিরক্তি। পুরু পরকলার ভিতর দিয়ে ক্ষণে তাকান আমার দিকে, ক্ষণে ঠেলার মালের দিকে। জাপানীরা অসহ্য রকমের অসম্ভব ভদ্র; অসন্তুষ্টি কিছুতেই প্রকাশ করতে চায় না। এঁর কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ যেন টুটে গেল। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'এসব কি? এসব কি করেছ? যাও, যাও, ওস্তাদ ওসিমার[১] কাছে। তোমাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।' তার পর আমাকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'এ রকম সুরেলা গলা নিয়ে কি বিশ্রী বেসুরা গান!'

আমি বাড়িতে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লুম। সত্যিই তো, আমি এ দু বছরে নূতন শিখেছি কি? কাদা কি করে তৈরী করতে হয় কিল্‌ন্ কি করে জ্বালাতে হয়—অন্য সব বাদ দিচ্ছি—কিছুই তো শিখি নি। দেশে ফিরলে ওগুলো আমায় করে দেবে কে? আর বাসনকোসনের শেপে, ছবিতে নিশ্চয়ই মারাত্মক ত্রুটি আছে, নইলে রাস্তার বুড়ো ওরকম খাপ্পা হল কেন?

চিন্তা করতে করতে মনে পড়লো শান্তিনিকেতন মন্দিরে গুরুদেবের একটা সার্‌মনের কথা। সোনার পাত্রে সত্য লুকানো রয়েছে—সবাই পাত্র দেখে মুগ্ধ, ভিতরে হাত দিয়ে খোঁজে না, সত্য কোথায়। আমার হয়েছে তাই। এখানে কাঁচা পয়সা কামিয়ে আমি অবহেলা করেছি সেরামিকের নিগূঢ় তত্ত্ব।

কিন্তু আর না।

ওস্তাদ ওসিমা সম্বন্ধে খবর নিয়ে কিন্তু বিশেষ ভরসা পেলুম না। তিনি বাস করেন এক অজ পাড়াগাঁয়ে, এবং গত দশ বছর ধরে কোনো শাগরেদ নিতে রাজী হন নি। তবে সবাই একবাক্যে বললেন, ওরকম গুণী এখন তো কেউ নেইই; সেরামিকের ইতিহাসেও কমই জন্মেছেন।

যা হয় হবে কুল-কপালে। সব জিনিসপত্র বিক্রি করে দিয়ে, একফালি বিছানা আর একটি সুটকেস নিয়ে পৌঁছলুম সেই গাঁয়ে, খুঁজে বের করলুম ওস্তাদের বাড়ি।

জাপানী ভাষা কিন্তু আমি বাঙলার মত স্রেফ্ কান দিয়ে শিখি নি। প্রথম দিন থেকে রীতিমত ব্যাকরণ অভিধান নিয়ে—তোমরা যে রকম আশ্রমে শাস্ত্রী

---

১ বর্তমান লেখক ওস্তাদের নাম ভুলে যাওয়াতে অন্যান্য কাল্পনিক নামের সঙ্গে ওসিমার আশ্রয় নিল।

মশায়ের কাছে সংস্কৃত—'

আমি বললুম, 'থাক্, থাক্।'

'ওস্তাদের ঘরে ঢুকে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম করে অতিশয় বিনয়, ততোধিক বশ্যতা প্রকাশ করে তাঁর শিষ্য হওয়ার ভিক্ষা চাইলুম।

যেন বোমা ফাটলো ; 'বেরিয়ে যাও এক্ষুনি, বেরোও এখান থেকে।'

আমি ভয়ে ভয়ে এসেছিলুম সত্যি, কিন্তু এরকম পদাঘাত প্রত্যাশা করি নি।

আরম্ভ করলুম কাকুতিমিনতি, সুদূর ইণ্ডিয়া থেকে এসেছি, আমি হত্যে দেব ইত্যাদি। আর শুধু মাটিতে মাথা ঠেকাই।

অনেকক্ষণ পর তিনি অতিশয় শান্ত সংযত কণ্ঠে বললেন, "আমি কি করি না করি সে-কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন বোধ করি নে। তবু তোমাকে বলছি—বিদেশী বলে। আমার কাছে লোক এসে দু'চার মাস তালিম নিয়ে পালিয়ে গিয়ে রটায় তারা আমার শিষ্য। কিছুই তারা শেখে নি—আর আমার নাম ভাঙিয়ে খায়। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আর কোনো শিষ্য নেব না"।'

আমি বললুম, 'নটরাজন, বরোদার ওস্তাদ গাওয়াইয়া ফইয়াজ খানও হুবহু ঠিক একই কারণে তাঁর জীবনের শেষের দিকে আর কোনো চেলা নিতেন না।'

নটরাজন বললে, 'ওঁদের দোষ দিই নে, কিন্তু আমার দিকটাও তো দেখতে হবে। আমি আমার ওস্তাদকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আমি ওরকম কোনো কুমতলব নিয়ে আসি নি। তিনি অটল অচল, নির্বাক।

কি আর করি! বারান্দায় গিয়ে বসে রইলুম বিছানাটার উপর দেয়ালে হেলান দিয়ে—আমি না-ছোড়-বান্দা, জীবনমরণ আমার পণ।

ঘণ্টাখানেক পর ওস্তাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় চলে গেলেন—আমাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি এক লম্ফে ঘরের ভিতর ঢুকে তাঁর চাকরকে খুঁজে বের করে বললুম, "দাদা, এখন তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। তুমি আমায় সাহায্য করো।" সে আগেই গুরুর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ শুনেছিল। তাকে বখশিশের লোভও দেখালুম। তার অনুমতি নিয়ে ওস্তাদের সব ক'খানা ঘরে লাগালুম ঝাঁট, ঝাড়াই-পোছাই, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তন্ন তন্ন করে। গামলার জল পাল্টালুম, রঙতুলি গুছিয়ে রাখলুম, জামা-কিমোনো ভাঁজ করলুম, বিছানা দুরুস্ত করলুম। তারপর ফের বারান্দায়, বিছানার উপর। ওস্তাদ ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে দরজার সামনে এক লহমার তরে একটু থমকে দাঁড়ালেন। কিন্তু নির্বাক। এবার চাকরকে চায়ের হুকুম দিলেন।

আমি আড়াল থেকে লক্ষ্য করলুম। ঘণ্টাখানেক পরে খেয়ে শুতে গেলেন। আমি গাঁয়ের যে একটি মাত্র খাবারের দোকান ছিল সেখানে শুঁটকি-ভাত খেয়ে এলুম। ওস্তাদ ঘুম থেকে উঠে চায়ের জন্য হাঁক দিতেই আমি রান্নাঘর থেকে চায়ের সরঞ্জাম এনে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে চা তৈরী করে কাপ এগিয়ে দিলুম। তিনি তখন আমার দিকে পিছন ফিরিয়ে ভেজা পাত্রে ছবি আঁকছিলেন। পেয়ালা হাতে নিয়েই ঘাড় ফিরিয়ে একবার ভ্রূকুটি-কুটিল নয়নে আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু নির্বাক। এরপর আমি রঙ গুলে দিতে লাগলুম। যাই বলো, যাই কও—আমিও আর্টিস্ট। কখন কোন্ রঙের দরকার হবে আগের থেকেই বুঝতে পারি। তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় না। তিনি নির্বাক।

সে রাত্রে আমি বারান্দাতেই ঘুমিয়েছিলুম। কিন্তু ঐ এক রাত্রিই।

ভোর থেকেই লেগে গেলুম চাকরের কাজে। তার পরের দিন। ফের পরের দিন। চাকরটা এখন আর তাঁর ঘরেই ঢোকে না। তিনি নির্বাক।

আমি দু বেলা হোটেলে গিয়ে শুঁটকি-ভাত খাই, আর রাত্রে চাকরের পাশে শুই।

বিশ্বাস করবে না, এই করে করে প্রায় একমাস গেল। তিনি নির্বাক।

মাসখানেক পরে একরাত্রে আমি আমার ইচ্ছা আর কিছুতেই দমন করতে পারলুম না। যা দেখেছি সেইটে কাজে লাগাবার অদম্য কামনা আমার ঘুম তাড়িয়ে দিয়েছে। অতি চুপিসাড়ে ওস্তাদের পটার্স হুইলের পাশে বসে একটা জাম-বাটি তৈরি করতে লাগলুম তন্ময় হয়ে। হঠাৎ পিঠের উপর একটা বিরাশি সিক্কার কিল আর হুঙ্কার।

"কোন্ গর্দভ তোমাকে শিখিয়েছে ওরকম ধারা বাটি ধরতে? কোন্ মর্কট তোমাকে শিখিয়েছে ওরকম আঙুল চালাতে? প্রত্যেকটি জিনিস ভুল। যেন ইচ্ছে করে যেখানে যে ভুলটি করার সেটা মেহন্নত করে করে শিখেছ। হটো ইহাঁসে!"

গুরু প্রথম নিজে করলেন। কী বলবো ভাই, তাঁর দশটি আঙুল যেন দশটি নর্তকী। প্রত্যেকটির ফাংশন যেন ভিন্ন ভিন্ন, নাচে আপন আপন নাচ। তারপর আমাকে বসিয়ে আমার হাতে হাত ধরে শুরু করলেন গোড়ার থেকে। আর শুধু বলেন, "হা আমার অদৃষ্ট, এসব গলদ মেরামত করতে করতেই তো লেগে যাবে পাঁচটি বচ্ছর!"

এই আমার প্রথম পাঠ। ভোর অবধি চলেছিল।

সকালবেলা চা খেতে খেতে শান্ত কণ্ঠে বললেন, "ভুল প্র্যাকটিস যে কী

মারাত্মক হতে পারে তার কল্পনাও তোমার নেই। তোমার ঘর ঝাঁট দেওয়া, রঙ গোলা থেকে আমি অনুমান করেছিলুম তোমার হাত আছে, কিন্তু অসম্ভব খারাপ রেওয়াজ করে করে তার যে সর্বনাশ করে বসে আছো সেটা জানলে প্রথম দিনই পুলিস ডেকে তোমাকে তাড়িয়ে দিতুম। এখন দেখি, কি করা যায়। এও আমার এক নতুন শিক্ষা! তোমাকে নেব দুই শর্তে। প্রথম, আমি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার কাজ জনসাধারণকে দেখাতে পারবে না। দ্বিতীয়, আমি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি শিক্ষা ক্ষান্ত দিয়ে পালাতে পারবে না।"

আমি বুদ্ধের নামে শপথ করলুম।

তারপর, ভাই, আরম্ভ হল আমার পিঠের উপর র‍্যাদা চালানো। একই কাজ একশ' বার করিয়েও তিনি তৃপ্ত হন না—আর মোস্ট্ এলিমেণ্টারি টাস্ক্। সঙ্গীতের উপমা দিয়ে বলতে পারি, এ যেন স্রেফ 'সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা। সা রে গা মা পা ধা নি—'

আমি বললুম, 'বোমা পড়ে জাপানী!'

নটরাজন অবাক হয়ে বললে, 'সে আবার কি?' আমি বললুম, 'সিলেটে গত যুদ্ধে প্রথম জাপানী বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য কবি রচেন,

সা রে গা মা পা ধা নি
বোমা পড়ে জাপানী
বোমার মধ্যে কালো সাপ
বিটিশে কয় বাপ রে বাপ!'

নটরাজন বললে, 'আমার অবস্থা তখন ব্রিটিশের চেয়েও খারাপ। তারা তো পালিয়ে বেঁচেছিল, আমার যে পালাবারও উপায় নেই। তবে গুরু এখন বাঙ্ময়। চা খেতে খেতে, বেড়াতে যেতে যেতে ফাইয়াঁস-পর্সেলিনের গুহ্যতম তত্ত্ব বোঝাতেন, কিন্তু রেওয়াজের বেলা সেই প্রাণঘাতী সা রে গা মা।

পাক্কা দেড়টি বছর পরে পেলুম দ্বিতীয় পাঠ!

ইতিমধ্যে দেখি, এ-দেশের ব্যাপারটাই আলাদা! অনেক দিন একটানা পাত্র গড়ে তার উপর ছবি এঁকে যখন এক ডাঁই তৈরী হল তখন গুরু কিল্নে সেগুলো ঢুকিয়ে করলেন 'ফায়ারিং'। ইতিমধ্যে পটারির সমঝদারদের কাছে নিমন্ত্রণ গেছে, অমুক দিন অমুকটার সময় তাঁর পটারির প্রদর্শনী। ঢাউস ঢাউস মোটর চড়ে, গ্রাম্যপথ সচকিত করে এলেন লক্ষপতিরা। তাঁরা চা খেলেন। সার্ভ করলুম। সবাই ভাবলেন আমি বিদেশী চাকর। একজন একটু কৌতূহল

দেখিয়েছিলেন, গুরু সেটা অঙ্কুরেই বিনাশ করলেন। তার পর ওঁদের সামনেই কিল্‌ন্ থেকে পটারি বের করা হল। পাঁচ শ থেকে আরম্ভ করে, এক এক সেট্ দু'হাজার তিন হাজার টাকায় সব—সব বিক্রি হয়ে গেল। দেশে, বিলেতে মানুষ যে রকম ছবি, মূর্তি কিনে নিয়ে আপন কলেক্‌শন বানায়।

তার পর আস্তে আস্তে অনুমতি পেলুম পাত্রের গায়ে ছবি আঁকবার। পুরো এক বছর ধরে পাত্র গড়ি, ছবি আঁকি কিন্তু কিল্‌নে ঢোকবার অনুমতি পাই নে। ভেঙে ফেলতে হয় সব। সে কী গব্বযন্ত্রণা!

এমন সময় এল গুরুর আরেকটা প্রদর্শনী। আমি গোপনে গুরুর ডাঁইয়ের সঙ্গে আমার একটা কাপ এক কোণে রেখে দিলুম। ডিজাইন দিয়েছিলুম পার্শিয়ান। আমাদের দেশে তো সেরামিকের ঐতিহ্য নেই, আর পার্শিয়ান ডিজাইন জাপানে প্রায় অজানা।

চায়ের পর কিল্‌ন্ খোলার সময় প্রায় একই সময়ে সকলের দৃষ্টি পড়ে গেল আমার কাপটার উপর। আমি আশা করেছিলুম ওটা আমি গোপনে সরিয়ে নিতে পারবো। আমি তখন ছোঁ মেরে সেটা সরিয়ে করলুম পলায়ন। ওঁদের ভিতর তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে আমার কাপ নিয়ে নীলাম। গুরু বসবার ঘরে এসে আমাকে ডাকলেন। আমি এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে কাপটি রাখলুম। তখন তাঁরা বুঝলেন, এটা কার কাজ। গুরু স্মিত হাস্যে ওঁদের সবকিছু বয়ান করে বললেন, "শিগগিরই ওর আপন প্রদর্শনী হবে। আপনারা কে কি চান অর্ডার দিয়ে যান।"

ওরা চলে গেলে আমি সব বুঝিয়ে গুরুর কাছে মাফ চাইলুম। তিনি প্রসন্ন বদনে বললেন, "দু-চার মাসের ভিতর এমনিতেই হ'ত। তোমাকে কিছু বলি নি।"

আমি কাজে লেগে গেলুম। গুরু আপন কাজ বন্ধ করে দিয়ে পই পই করে তদারকি করলেন আমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বা অঙ্গুলিচালনা।

নিমন্ত্রণ-পত্র বেরুলো তাঁর নামে। আমার প্রথম প্রদর্শনী। গুরু বললেন, "তোমার একটা ফটো ছেপে দাও চিঠিতে।"

নটরাজন বললে, 'দাঁড়াও, সে চিঠির একটা কপি বোধহয় বউয়ের কাছে আছে।' তাঁকে স্মরণ করা হলে তিনি নিয়ে এলেন একটা এ্যালবাম্। তাতে মেলা প্রেস-কাটিংস। নটরাজনের প্রদর্শনীর রিভিউ। নিমন্ত্রণপত্রে তাজ্জব হয়ে দেখি ফটোতে নটরাজনের মাথায় খাস পাঠান পাগড়ি! আমি বললুম, 'এ কি?' বললে, 'ভাই, জাপানীরা ঐ পাগড়িটাই চেনে। ওঠা হলেই ইণ্ডিয়ান!'

আমি শুধালুম, 'তারপর !'

'প্রদর্শনী হল। গুরু ময়ূরটার মত প্যাখম তুলে ঘোরাঘুরি করলেন। বেবাক্ মাল বিক্রি হয়ে গেল। কাঁড়া কাঁড়া টাকা পেলুম। কাগজে কাগজে রিভিউ বেরুলো।'

নটরাজনের স্ত্রী বললেন, 'তিনি জাপানের অন্যতম সেরা আর্টিস্ট বলে স্বীকৃত হলেন।'

নটরাজন বললে, 'সে সব পরে হবে। আমার মস্তকে কিন্তু সাতদিন পরে সাক্ষাৎ বজ্রাঘাত। চাঁদের আলোতে ঝরনাতলায় চুকচুক করে সাকে খেতে খেতে গুরু বললেন, "এইবারে বৎস, তোমার ছুটি। টোকিওতে গিয়ে আপন পসরা মেলো।"

আমি আর্তকণ্ঠে বললুম, "গুরুদেব, আমার যে কিছুই শেখা হয় নি।"

গুরু বললেন, "বৎস, শেখার তো শেষ নেই। কিন্তু গুরুর কাছ থেকে তালিম নেবার একটা শেষ থাকে। তোমাদের ইস্কুল-কলেজেও তো শেষ উপাধি দিয়ে বিদায় দেয়। তখন কি আর গুরু শোনে তোমার মিনতি যে, তোমার কিছুই শেখা হয় নি ? আমি যে সব হুনর্ পুরুষানুক্রমে পেয়েছি তার প্রত্যেকটি তোমাকে শিখিয়েছি। এবারে আরম্ভ করো সাধনা।"

আমার সব অনুনয়-বিনয় ব্যর্থ হল। বললেন, "মাঝে মাঝে এসো ; তোমার কাজ দেখে আলোচনা করবো। নির্দেশ দেবো না, আলোচনা করবো।"

আমি পরের দিন আমার সঞ্চয়ের সব অর্থ গুরুর পদপ্রান্তে রাখলুম—গুরুদক্ষিণা। তিনি একটি কড়িও স্পর্শ করলেন না। অনেক চেষ্টা দিলুম। আবার তিনি নির্বাক ! সেই প্রথম দিনের মত।'

বেশ খানিকক্ষণ কি যেন একটা ভেবে নিয়ে নটরাজন বললে, 'এর সঙ্গে কিন্তু একটা সাইড-ড্রামাও আছে।'

'সেটা কি ?'

মুচকি হেসে বললে, 'তাঁর কন্যার—'

মিসেস উঠে বললেন, 'আমি চললুম।' তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া।

নটরাজন বললে, 'তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণের অনুমতি চাইলুম।'

আমি বললুম, 'সে কি ! এর তো কিছু বলো নি !'

'বললুম তো, সে অন্য নাট্য। আরেক দিন বলবো।'

'গুরু কি বললেন ?'

'দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। বললেন "আমার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না যে আমার গুণী মেয়ে কোনো আনাড়ির হাতে পড়ে, যে সেরামিকের রস জানে না। তোমরা দুজনাতে আমার ঘরানা বাঁচিয়ে রাখবে, সমৃদ্ধ করবে।" আমার স্ত্রী সত্যি ভালো কাজ করতে পারে।'

* * *

পরের দিন শুধালুম, 'দেশে ফিরে কি করলে ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'আমি জানতুম এদেশে অলঙ্ঘ্য বাধাবিঘ্ন। কাদা-কিল্‌নের কথা বাদ দাও, আমার হ্যাণ্ডপেণ্টেড অরিজিনাল জিনিস পাঁচশ' হাজার টাকা দিয়ে কিনবে কে ? এদেশে তো এসব কেউ জানে না,—ভাববে আমি পাগল, একটা টী-সেটের জন্য পাঁচশ' টাকা চাইছি। এদেশে জাপানী ক্রকারি আসে মেশিনে তৈরী মাস্-প্রোডাকশন্। আমার তো প্রতি মাসে অন্তত সাতশ, হাজার টাকা চাই। জাপানে প্রতি মাসে পাঁচ-সাত হাজারও কামিয়েছি।'

আমি বললুম, 'এ কী ট্রাজেডি ! যা শিখলে তার সাধনা করতে পেলে না ?'

হেসে বললে, 'আমি কি পয়লা না শেষ ? বিদেশ থেকে উত্তম সায়ান্স শিখে এসে কত পণ্ডিত উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে এদেশে শুকিয়ে মরে ! আর যারা ছবি আঁকে ? তাদেরই বা ক'জনের অন্ন জোটে ? তাই একটা চাকরি নিয়েছি—দেখি, অবসর সময়ে যদি কিছু—'

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললুম, 'তোমার চাকরিটা তো ভালো। তোমাদের সেরামিক ফ্যাক্টরি শুনেছি, ভারতের সর্বোত্তম। সবচেয়ে বেশী টেম্পারেচর তুলতে পারো তোমাদের কিল্‌নে।'

অট্টহাস্য করে নটরাজন বললে, 'ইন্‌সুলেটার ! ইন্‌সুলেটার ! লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ! টেলিগ্রাফের খুঁটির মাথায় সাদা মুণ্ডুটা দেখেছ ? আমরা বানাই সেই মাল। অষ্টপ্রহর তাই বানিয়েও বাজারের খাঁই মেটাতে পারি নে। কোম্পানির ওতেই লাভ, ওতেই মুনাফা। আর দয়া করে ভুলো না, হরেক রকম ইন্‌সুলেটর সেরামিক পর্যায়েই পড়ে ! হা-হা হা-হা, যেমন দেয়ালে যে রঙ লাগায় সেও পেণ্টার, অবন ঠাকুরও পেণ্টার !'

ইন্‌সুলেটার হে, ইন্‌সুলেটার !!

বুড়ো-বুড়ী

'চিঠি নাকি, বাবাজী আজান ?'

'বিলক্ষণ, মসিয়ো···প্যারিস থেকে এসেছে।'

চিঠিখানি যে খুদ প্যারিস থেকে এসেছে তাই নিয়ে সাদা-দিল্ বাবাজী আজানের চিত্তে রীতিমত দেমাক।···কিন্তু আমার না। কে যেন আমায় বলে দিচ্ছিল, এই যে জ্যাঁ জাক্ রুসো সরণীর প্যারসিনী বলা নেই কওয়া নেই, সাত সকালে হঠাৎ আমার টেবিলের উপর এসে অবতীর্ণ হলেন, ইনি আমার পুরো দিনটারই সর্বনাশ করবেন। ঠিক। ভুল করি নি : বিশ্বেস না হয় দেখুন :

'আমার একটু উপকার করতে হবে, দোস্ত। তোকে এক দিনের তরে তোর ময়দা-কল বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে এইগুইয়ের যেতে হবে···এইগুইয়ের বড় গণ্ডগ্রাম, তোর ওখান থেকে পাঁচ ছ কোশ—কিচ্ছু না, বেড়াতে বেড়াতে পৌঁছে যাবি। পৌঁছে অনাথাশ্রমের খোঁজ নিবি। আশ্রমের ঠিক পরের বাড়িটা একটু নিচু, জানলা-খড়খড়ি ছাই-রঙা, বাড়ির পিছনভাগে একটুখানি বাগান। কড়া না নেড়েই ঢুকে পড়বি,—দরজা হামেহাল খোলা থাকে—আর ঘরে ঢুকেই আচ্ছা জোরসে চেঁচিয়ে বলবি, "সজ্জনদের পেন্নাম জানাই! আমি মরিসের বন্ধু···" তখন দেখতে পাবি এক মুঠো সাইজের ছোট্ট একজোড়া বুড়ো-বুড়ী, ওঃ! সে কী বুড়ো! বুড়ো, তার চেয়েও বুড়ো, আদ্যিকালের বুড়ো-বুড়ী তাঁদের বিরাট আরাম কেদারার গর্ত থেকে তোর দিকে হাত তুলে ধরবেন, আর তুই তখন তাঁদের আমার হয়ে আলিঙ্গন করবি, চুমো খাবি, তোর সর্ব হৃদয় দিয়ে, যেন ওঁরা তোরই। তার পর সবাই মিলে গাল-গল্প আরম্ভ হবে; ওঁনরা স্রেফ্ আমার সম্বন্ধেই কথা কইবেন, আর কিচ্ছুটি না, স্রেফ্ আমার কথা; হাজার হাজার আবোল-তাবোল বকে যাবেন, তুই কিন্তু হাসবি নি···হাসবি নি কিন্তু, বুঝেছিস?···এঁরা আমার ঠাকুদ্দা, ঠাকুমা, ওঁদের আগাপাস্তলা প্রাণ একমাত্র আমি—এবং আমাকে দশ বছর হল দেখেন নি···দশ বছর—দীর্ঘকাল! কিন্তু করি কি বল্! আমি—প্যারিস আমাকে জাবড়ে ধরে আছে; ওঁদের? ওঁদের আটকে রেখেছে বুড়ো বয়স··· এঁদের যা বয়স, আমাকে দেখবার জন্য রওয়ানা হলে পথিমধ্যে চালানী মালের মত টুকরো টুকরো হয়ে যাবেন···কিন্তু আমার কপাল ভালো, তুই তো ভাই, হোথায় আছিস, বেরাদর আমার, ময়দাকলের মালিক[১]—তোকে আদর-প্যার করে

---

১ আসলে দোদে নির্জনে বাস করার জন্য একটি অতিবৃদ্ধ পরিত্যক্ত মিল ভাড়া করেছিলেন, প্রায় বিনামূল্যে।

বেচারী বুড়ো-বুড়ীরা আনন্দ পাবে, যেন আমারই এ্যাট্রুখানিকে চুমো-চামা খাচ্ছে···আমি অনেক বার আমাদের কথা ওঁদের বলেছি, এবং আমাদের গভীর বন্ধুত্ব সম্বন্ধেও, যেটি কি না······'

জাহান্নামে যাক বন্ধুত্ব! ঠিক আজকের সকালটাতেই আবহাওয়াটি হয়েছে চমৎকার, কিন্তু বাউণ্ডুলের মত যন্ত্র-তন্ত্র চর্কিবাজি খাওয়ার মত আদপেই নয়। একে তো বইছে জোর হাওয়া, তদুপরি রৌদ্রটিও চড়চড়ে কড়া—প্রভাঁস অঞ্চলের খাঁটি দিন যাকে বলে। আমি ঠিক করে বসেছিলুম, দুটি পাহাড়ের টিপির মধ্যিখানে শুয়ে শুয়ে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দেব হুবহু একটি গিরগিটির মত, সূর্যালোক পান করতে করতে আর পাইন গাছের মর্মর গান শুনতে শুনতে— এমন সময় এল ঐ লক্ষীছাড়া চিঠিটা···কিন্তু করা যায় কি কও? মিল্‌টা বন্ধ করলুম অভিসম্পাত দিতে দিতে, চাবিটা রেখে দিলুম বেরালটার আসা-যাওয়ার ছোট্ট গর্তটার ভিতর। লাঠিটা, পাইপটি—ব্যস্‌, নাবলুম রাস্তায়।

বেলা প্রায় দু'টোর সময় পৌঁছলুম এইগুইয়েরে। গাঁটা খাঁ খাঁ করছে, সবাই খেত-খামারে। ধুলোয় ঢাকা এল্‌ম্‌ গাছে ঝিল্লি ঝিঁঝিঁ করছে যেন নির্জন খোলামাঠের মধ্যিখানে। অবিশ্যি সরকারী বাড়িটার সামনের চত্বরে একটা গাধা রোদ পোয়াচ্ছিল বটে, আর গির্জের সামনের ফোয়ারায় একপাল পায়রাও ছিল, কিন্তু অনাথাশ্রমটি দেখিয়ে দেবার মত কেউই ছিল না। কিন্তু কপাল ভালো, হঠাৎ আমার সামনে যেন পরীর মত আত্মপ্রকাশ করলে এক বুড়ী। ঘরের সামনের এক কোণে উপু হয়ে বসে চরকা কাটছিল। শুধালুম তাকে। আর পরীটিরও ছিল দৈবীশক্তি। কড়ে আঙুলটি তুলে দেখাতে না-দেখাতে তৎক্ষণাৎ চোখের সামনে যেন মন্ত্রবলে আমারই সামনে দাঁড়িয়ে উঠলো অনাথা-শ্রমটি!···বিরাট, ভারিক্কি, কালো কুঠিবাড়ি। বেশ দেমাকের সঙ্গে তার দেউড়ির উপরের পাশুটে লাল রঙের প্রাচীন দিনের ক্রুশ—চতুর্দিকে আবার দু'ছত্তর লাতিনও দেখিয়ে দিচ্ছে! ঐ বাড়িটার পাশেই দেখতে পেলুম আরেকটি ছোট্ট বাড়ি। ছাইরঙের খড়খড়ি, পিছনে ছোট্ট বাগানটি···তদ্দণ্ডেই চিনে গেলুম, কড়া না নেড়েই ঢুকে পড়লুম।

আমার বাকী জীবন ধরে আমি সেই দীর্ঘ করিডরটি দেখব; মন্দ-মধুর ঠাণ্ডা, শান্ত-প্রশান্ত, দেয়ালগুলো গোলাপী রঙের, খড়খড়ির ভিতর দিয়ে দেখি বাগানটি যেন স্বচ্ছ রৌদ্রালোকে অল্প অল্প কাঁপছে, আর শার্সিগুলোর উপর ফুলপাতায় জড়ানো বেহালার ছবি আঁকা। আমার মনে হল আমি সেদেন্‌ যুগের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত দরবারখানায় পৌঁছে গিয়েছি।···করিডরের শেষপ্রান্তে, ডানদিকে, আধ-

ভেজানো দরজার ভিতর দিয়ে আসছে দেয়াল-ঘড়ির টিক্-টাক্ শব্দ, আর একটি শিশু—ইস্কুলের বাচ্চার গলার শব্দে—প্রতি শব্দে থেমে থেমে পড়ছে : ত—খন… সেণ্ট…ইরেনে[২]…চিৎকা…র…করে…বললেন…আমি…প্রভুর…যেন…গম… শস্য…আমাকে…ময়দা…হতে…হয়ে…ঐ…সব…পশুদের…দাঁতের…পিষণে…। আমি ধীরে ধীরে মৃদু পদে সেই দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে ভিতরের দিকে তাকালুম।

শান্ত, অর্ধ দিবালোকে, ছোট্ট একটি কামরার ভিতর, গভীর একটা আরাম-কেদারার ভিতর ঘুমুচ্ছেন এক অতি বৃদ্ধ। গোলাপী ছোট্ট দুটি গাল, আঙুলের ডগা অবধি সর্ব শরীরের চামড়া কোঁচকানো, মুখ খোলা, হাত দুটি দু' জানুর উপর পাতা। তাঁর পায়ের কাছে নীল পোশাক পরা ছোট্ট একটি মেয়ে—মাথায় নান্‌দের মত টুপি, অনাথাশ্রমের মেয়েদের পোশাক পরা—সাধ্বী ইরেনের জীবনী পড়ছে—বইখানা আকারে তার চাইতেও বড়। এই অলৌকিক পুরাণ পাঠ যেন সমস্ত বাড়িটার উপর ক্রিয়া চালিয়েছে। বৃদ্ধ ঘুমুচ্ছেন তাঁর আরাম-কেদারায়, মাছিগুলো ছাতে, ক্যানারি পাখিগুলো এই হোথায় জানলার উপরে তাদের খাঁচায়। প্রকাণ্ড দেয়াল-ঘড়িটা নাক ডাকাচ্ছে—টিক্, টাক্, টিক্, টাক্। সমস্ত ঘরটাতে কেউই জেগে নেই—সুদ্দুমাত্র খড়খড়ির ভিতর যে একফালি সাদা, সোজা আলো এসে পড়েছে তার ভিতর ভর্তি জীবন্ত রশ্মি-কণা—তারা নাচছে তাদের পরমাণু নৃত্যের চক্রাকারের ওয়াল্‌ট্‌স্…এই ঘরজোড়া তন্দ্রালসের মাঝখানে সেই মেয়েটি গম্ভীর কণ্ঠে পড়ে যাচ্ছে : সঙ্গে…সঙ্গে…দুটো…সিংহ…লাফ…দিয়ে…পড়ল…তাঁর…উপর… এবং…তাঁকে…উদর…সাৎ…করে…ফেলল…ঠিক ঐ মুহূর্তেই আমি ঘরে ঢুকলুম। স্বয়ং সেণ্ট ইরেনের সিংহ দুটোও ঐ সময়ে সে-ঘরে ঢুকলে এতখানি বিহ্বলতার স্তম্ভন সৃষ্টি করতে পারতো না। সে-যেন রীতিমত নাটকীয় আচমকা আবির্ভাব! বাচ্চাটা ডুকরে উঠলো, বিরাট কেতাবখানা পড়ে গেল, ক্যানারি পাখিগুলো জেগে উঠলো, দেয়াল-ঘড়িটা ঢং ঢং করে উঠলো, বুড়ো প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন—একেবারে হকচকিয়ে গেছেন—আর আমিও কেমন যেন বোকা বনে গিয়ে চৌকাঠে থমকে গিয়ে বেশ একটু জোর গলায় বলে উঠলুম :

'সুপ্রভাত, সজ্জনগণ! আমি মরিসের বন্ধু!'

---

২ কেউ যদি পান, আমাকে দয়া করে জানাবেন কি? আগের থেকেই ধন্যবাদ দিচ্ছি।

আহা! আপনারা যদি তখন তাঁকে দেখতে পেতেন—যদি দেখতে পেতেন, বেচারী বুড়োকে দেখতে পেতেন! দুই বাহু প্রসারিত করে আমাকে আলিঙ্গন করতে, আমার হাত দুখানা ধরে ঝাঁকুনি দিতে এগিয়ে এলেন, আর ঘরময় উত্তেজিত হয়ে ছুটোছুটি লাগিয়ে শুধু বলেন,

'হে দয়াময়, হে দয়াময়!'...

তাঁর মুখের সব কোঁচকানো চামড়া হাসিতে ভরে উঠেছে। আর তোতলাচ্ছেন,

'আ মসিয়ো,...আ মসিয়ো...'

তার পর কামরার শেষ প্রান্তে ডাক দিতে দিতে গেলেন:

'মামেৎ!'

একটা দরজা খুলে গেল। করিডরে যেন একটা ইঁদুরের পায়ের শব্দ শোনা গেল...ঐ যে মামেৎ! ঐ এক ফোঁটা বুড়ী—কী যে সুন্দর দেখাচ্ছিল—মাথায় গিঁট বাঁধানো বনেট্, পরনে কারমেলিট নান্‌দের ফিকে বাদামী রঙের পোশাক, হাতে নকশা-কাটা রুমাল—আমাকে সেই প্রাচীন দিনের কায়দায় অভিনন্দন জানাবার জন্যে...ওঁদের দেখলেই কিন্তু বুকটা দরদে ভরে আসে, দুজনারই চেহারা একই রকমের! বুড়োর মাথার চুল বদলে দিয়ে বুড়ীর বনেট্ তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলে তাঁকেও মামেৎ নাম দেওয়া যেত!...শুধু সত্যিকার মামেৎকে নিশ্চয়ই তাঁর জীবনে চোখের জল ফেলতে হয়েছে অনেক বেশী, আর তাঁর সর্বাঙ্গের চামড়া কুঁকড়ে গিয়েছে আরো বেশী। বুড়োর মত ওঁরও সঙ্গে অনাথাশ্রমের একটি ছোট্ট মেয়ে, পরনে অন্য মেয়েটার মতই পোশাক, বুড়ীর সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকে, কক্‌খনো তাঁর সঙ্গ ছাড়ে না—অনাথাশ্রমে আশ্রয়প্রাপ্ত দুটি বাচ্চা মেয়ে এই দুই বুড়ো-বুড়ীকে যেন আশ্রয় দিয়ে রক্ষণ করছে—এর চেয়ে হৃদয়স্পর্শী যেন আর কিছুই কল্পনা করা যায় না।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বুড়ী আমাকে গভীর সম্মান-অভিবাদন জানাতে আরম্ভ করছিলেন, কিন্তু বুড়ো একটি শব্দ দিয়েই তাঁর সসম্মান-অভিবাদন কেটে দু'-টুকরো করে ফেললেন:

'এ তো মরিসের বন্ধু...'

সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী কাঁপতে লাগলেন, কেঁদে ফেললেন, রুমালখানা হারিয়ে ফেললেন, মুখ রাঙা হয়ে গেল, টকটকে লাল, বুড়োর চেয়েও বেশী লাল...হায়, বুড়ো-বুড়ী! এঁদের সর্ব শিরায় আছে মাত্র একটি ফোঁটা রক্ত, আর সামান্যতম অনুভূতির পরশ লাগলেই সেই ফোঁটাটি মুখে এসে পৌঁছে যায়।

'শিগ্‌গির, শিগ্‌গির—চেয়ার নিয়ে এস'···বুড়ী তাঁর বাচ্চাটিকে বললেন।

'জানলাটা খুলে দাও'—বুড়ো তাঁর বাচ্চাটিকে হুকুম দিলেন।

তার পর দু'জনাতে আমার দু' বাহু ধরে খুট খুট করে হেঁটে নিয়ে চললেন জানলার কাছে। সেটা পুরো খুলে দেওয়া হয়েছে যাতে করে ওঁরা আমাকে আরো ভালো করে দেখতে পান। আমরা এগিয়ে গেলুম আরাম-কেদারার কাছে। আমি বসলুম তাঁদের দুজনার মাঝখানে চেয়ারে। মেয়ে দুটি আমাদের পিছনে। তার পর আরম্ভ হল সওয়াল :

'কি রকম আছে সে ? কি করে সে ? এখানে আসে না কেন ? সুখে আছে তো ? · '

এটা, ওটা, সেটা—কত শত কথা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

আর আমি ? তাঁরা আমার বন্ধুবাবদে যে সব প্রশ্ন শুধোচ্ছিলেন সেগুলোর উত্তর আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যমত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তো দিলুমই—যেগুলো জানা ছিল ; আর যেগুলো জানা ছিল না সেগুলো নির্লজ্জভাবে বানিয়ে বানিয়ে। আর বিশেষভাবে অবশ্যই কিছুতেই স্বীকার করলুম না যে তার ঘরের জানলাগুলো ঠিকমত বন্ধ হয় কি না সেটা যে আমি লক্ষ্য করি নি, কিংবা তার ঘরের দেয়ালের কাগজগুলো কোন্ রঙের !

'তার ঘরের দেয়ালের কাগজগুলো কোন্ রঙের ?···নীল রঙের ঠাকুমা, হাল্কা নীল—আসমানী রঙের—ফুলের মালার ছবি আঁকা।···'

'—তাই না ?' বুড়ী একবারে গদ্‌গদ। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সোনার চাঁদ ছেলেটি !'

বুড়ো সোৎসাহে যোগ দিলেন, 'সোনার চাঁদ ছেলে।'

আর আমি যতক্ষণ কথা বলছিলুম, তাঁরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে ক্ষণে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাচ্ছিলেন, ক্ষণে সামান্য স্মিতহাস্য করছিলেন, ক্ষণে চোখে চোখে ঠার মারছিলেন, ক্ষণে একে অন্যকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারার ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন—কিংবা বুড়ো আমার একটু কাছে এসে আমায় বলেন,

'আরেকটু জোরে কও···ভালো করে শুনতে পায় না ও।'

আর উনিও, 'আরেকটু চেঁচিয়ে, লক্ষ্মীটি !···উনি সব কথা ভালো করে শুনতে পান না···'

আমি তখন গলাটা একটু চড়াই ; দুজনাই তখন একটুখানি স্মিতহাস্যে আমাকে ধন্যবাদ জানান। আর তাঁদের সেই হাল্কা ফিকে স্মিতহাস্যভরা দৃষ্টি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে তাঁরা যেন আমার চোখের নিভৃততম গভীরে খুঁজে

দেখবার চেষ্টা করেন তাঁদের মরিসের ছবি ; আর আমার হৃদয়ও যেন আমার বন্ধুর ছবি তাঁদের চোখে দেখে একেবারে গলে যায়—আবছা-আবছা, ঘোমটা-ঢাকা, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যেন অনেক দূরের থেকে, কুয়াশার ভিতর দিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

* * *

হঠাৎ বুড়ো তাঁর আরাম-কেদারার গভীর থেকে হকচকিয়ে উঠলেন :

'আমার কি মনে পড়লো, মামেৎ…সে বোধহয় এখনো দুপুরের খাবার খায় নি !'

আর মামেৎ আর্ত হয়ে শূন্যে তুলে দিয়েছেন হাত দুখানা :

'এখনো খায় নি !…হে দয়াময়, হে ভগবান !'

আমি ভাবলুম, এখনও বুঝি মরিসের কথাই হচ্ছে ; তাই তাঁদের বললুম যে, তাঁদের যাদু মরিস দুপুর হতে না হতেই খানার টেবিলে বসে যায়—তার চেয়ে দেরি সে কস্মিনকালেও করে না। কিন্তু না, এবারে উঠেছে আমার কথা। আর আমি যখন স্বীকার করলুম যে আমি তখনো খাই নি, তখন যে ধুন্দুমার আরম্ভ হল সেটা সত্যি দেখবার মত।

'শিগ্‌গির শিগ্‌গির নিয়ে এসো। ছুরি কাঁটা সব—ও বাচ্চারা! টেবিলটা ঘরের মধ্যিখানে নিয়ে এস। রবারের টেবিলক্লথ, ফুলের নক্সাদার বাসন-প্লেটগুলো! আর অত হাসাহাসি না করলেও আমাদের চলবে, বুঝলে! আর জল্‌দি, জল্‌দি, প্লীজ !'

আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই, তারা জলদি জলদিই করেছিল! তিনখানা পেলেট ভাঙতে যতখানি সময় লাগার কথা তার পূর্বেই টেবিল, খাবার-দাবার, সব তৈরী।

'সামান্য একটু ভালো-মন্দ নাশতা বই আর কিছু নয়'—আমাকে টেবিলের দিকে নিয়ে যেতে যেতে মামেৎ বললেন। 'শুধু তোমাকে একলা-একলিই খেতে হবে। আমরা? আমরা সকাল বেলাই খেয়ে নিয়েছি।'

বেচারা বুড়ো-বুড়ী! যে কোনো সময়েই ওঁদের শুধোও না কেন, ওঁদের সব সময়েই ঐ এক উত্তর, তাঁরা সকাল সকালই খেয়ে নিয়েছেন।

মামেতের দেওয়া নাশ্‌তা—দুধ, খেজুর আর একখানা আস্ত 'পাই' ; ঐ দিয়ে কিন্তু মামেৎ আর তার ক্যানারি পাখীগুলোর নিদেন আটদিনের খাওয়া-দাওয়া চলে যায়…তাই ভাবো দিকি নি, আমি একাই তাবৎ মালের শেষ কণাটুকু খেয়ে ফেললুম !…আর টেবিলের চতুর্দিকে সে কী 'কেলেঙ্কারি'! ক্ষুদে দুই

নীলাম্বরী একে অন্যকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে ফিস্‌ফিস্ করছিল, আর খাঁচার ভিতরে ক্যানারিগুলোর ভাব, যেন মনে মনে বলছে, 'দেখেছ! এ কেমন ভদ্রলোক! গোটা পাইটাই খেয়ে ফেললে!'

কথাটা সত্যি। আমি প্রায় সমস্তটাই বেখেয়ালে খেয়ে ফেলেছি—কারণ আমি তখন ঐ শান্ত শীতল ঘরটার চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখছি সেখানে কেমন যেন প্রাচীন দিনের সৌরভ ভাসছিল···বিশেষ করে দুটি ছোট্ট খাট থেকে আমি আমার চোখ কিছুতেই ফেরাতে পারছিলুম না। প্রায় যেন ছোট্ট দুটি শিশুদের দোলনা। আমি কল্পনা করতে লাগলুম—সকালে, অতি ভোরে বুড়ো-বুড়ী ঝালর-লাগানো পর্দাঘেরা খাটের গভীরে শুয়ে। ভোর তিনটে বাজলো। ঐটেই সব বুড়ো-বুড়ীর জেগে ওঠার সময়।

—ঘুমুচ্ছো, মামেৎ?

—না গো।

—কি বলো, মরিস ছেলেটি বড় লক্ষ্মী—না?

—সে আর বলতে, বড্ড লক্ষ্মী ছেলে!

আর সুদ্ধমাত্র একটির পাশে আরেকটি, বুড়ো-বুড়ীর ছোট্ট দুটি খাট দেখে আমি ওদের দুজনার মধ্যে পুরোপুরি একটি কথাবার্তা কল্পনা করে নিলুম···

ইতিমধ্যে ঘরের অন্যপ্রান্তে, আলমারির সামনে একটা ভীষণ নাটকের অভিনয় চলছিল। ব্যাপারটা হয়েছে কি, ঐ আলমারির সবচেয়ে উপরের থাকে রয়েছে এক বোয়াম লিক্যোর-ব্রাণ্ডিতে মজানো চেরি। এটা দশ বৎসর ধরে মরিসের জন্য অপেক্ষা করছে। এখন সেটাকে নামাতে হবে যাতে করে আমি এটার উন্মোচন-পর্ব সমাধা করতে পারি। মামেতের সর্ব অনুনয় উপেক্ষা করে বুড়ো স্বয়ং লেগে গেছেন সেটাকে পাওয়ার প্রচেষ্টায়। ভয়ে আড়ষ্ট বউ—আর উনি একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে চেষ্টা করছেন সেটাকে পাড়তে··· পাঠক, যেখানে আছো সেখান থেকেই ছবিটি দেখতে পাবে: বুড়ো কাঁপছেন, ঝুলে পড়ে লম্বা হবার চেষ্টা করছেন, ক্ষুদে নীলাম্বরী মেয়ে দুটি চেয়ারটাকে জাবড়ে ধরে আছে। পিছনে মামেৎ হাঁপাচ্ছেন—হাত দুটি দু'দিকে মেলে ধরেছেন, আর এ সব-কিছুর উপর ভাসছে মৃদু সুগন্ধি নেবুর সৌরভ খোলা আলমারির ভিতর থেকে, থাকে থাকে সাজানো কাপড়ের ডাঁই থেকে।

অবশেষে, অশেষ মেহন্নতের পর, সেই সুপ্রসিদ্ধ বোয়ামটি আলমারি থেকে বের করা হল, আর তার সঙ্গে টোলে টোলে ভর্তি একটি রূপোর 'মগ'-পারা গেলাস—মরিস যখন ছোট্ট ছিল সেই আমলের। গেলাসটি চেরি দিয়ে আমার

জন্য কানায় কানায় ভর্তি করা হল; মরিস এই চেরি খেতে কতই না ভালোবাসতো! চেরি আর ব্রাণ্ডি ভরতে ভরতে বুড়ো খুশ-খানা-সমঝদারের মত আমার কানে কানে বললেন :

—'বুঝলে হে, তোমার কপাল ভালোই বলতে হবে, হ্যাঁ, তোমার কথাই কইছি, এখন যা খাবে…আমার গিন্নীই এটি তৈরী করেছেন…খাসা জিনিস খাবে এখন।'

হায়রে কপাল! ওঁর গিন্নী এটি তৈরী করেছেন সত্যি, কিন্তু চিনি দিতে গেছেন বেবাক ভুলে! তা আর কি করা যায় বলো! বুড়ো বয়সে কি আর মানুষের সবকিছু মনে থাকে! বেচারী মামেৎ আমার, সত্যি বলতে কি তোমার চেরিগুলো অখাদ্যের একশেষ; হলে কি হয়, আমি চোখের পাতাটি পর্যন্ত না নাড়িয়ে তলানি অবধি সাফ করে দিলুম।

* * *

খাওয়া শেষ হওয়ার পর আমি উঠে দাঁড়ালুম ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য। ওঁরা অবশ্যি সত্যই খুশী হতেন যদি আমি আরো কিছুক্ষণ থাকতুম, যাতে করে ওঁরা লক্ষ্মী ছেলে মরিস সম্বন্ধে আরো কথা বলতে পারেন, কিন্তু বেলা তখন ঢলে পড়েছে, মিলটাও দূরে—বিদায় নিতেই হয়।

আমার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

'—মামেৎ, আমার কোটটা!…আমি ওকে চত্বর অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

সত্যি বলতে কি, মামেৎ মনে মনে দ্বিধা বোধ করছিলেন, বেশ একটু শীত পড়েছে, এ সময় আমাকে চত্বর অবধি পৌঁছে দেওয়াটা ঠিক হবে কি না; কিন্তু সেটা মুখের ভাবে প্রকাশ করলেন না। শুধু শুনতে পেলুম, ঝিনুকের বোতামওলা, সোনালি নস্যি রঙের চমৎকার ফ্রক্-কোটটি পরিয়ে দিতে দিতে লক্ষ্মী ঠাকুরমাটি কর্তাকে নিচু গলায় শুধোলেন,

'তোমার ফিরতে দেরি হবে না তো?—কেমন?'

বুড়ো একটু দুষ্টুমির মুচকি হাসি হেসে বললেন,

'—হেঁ, হেঁ!…কি জানি…হয় তো বা…'[৩]

---

৩ যৌবনে যে ফুর্তিফার্তি করতে গিয়ে আর পাঁচজনের মত মাঝে-মধ্যে দেরিতে বাড়িতে ফিরতেন, মামেৎ বকাঝকা করতেন, এটাতে ঠাট্টা করে তারই ইঙ্গিত।

একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, ওঁদের হাসতে দেখে বাচ্চা দুটি হাসলে, আর খাঁচার কোণে বসে ক্যানারি দুটোও তাদের আপন ঢঙে হাসলে···নিতান্ত তোমাকেই বলছি, পাঠক, আমার মনে সন্দ হয়, ঐ চেরি-ব্রাণ্ডির গন্ধে ওরা সবাই বোধহয় একটুখানি বে-এক্তেয়ার হয়ে গিয়েছিলেন।

ঠাকুরদা আর আমি যখন রাস্তায় নামলুম তখন অন্ধকার হব-হব। একটু দূরের থেকে পিছনে পিছনে নীলপোশাকী ছোট্ট মেয়েটি আসছিল ওঁকে ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসবার জন্য—বুড়ো ওকে দেখতেও পান নি। তিনি সগর্বে আমার বাহু ধরে চলছিলেন যেন কতই না শক্তসমর্থ মদ্দা জোয়ান। মামেৎ ভরপুর হাসিমুখে দোরে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলেন, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে খুশীতে মাথা নাড়ছিলেন যেন ভাবখানা এই 'যা-ই বলো, যা-ই কও,—আমার বুড়া এখনও তো দিব্য চলাফেরা করতে পারে।'[৪]

কোষ্ঠী-বিচার

আমি তো রেগে টং।

মুসলমান বাড়িতে সচরাচর গণৎকার আসে না, যদিও শুনেছি ঔরঙ্গজেবের মত গোঁড়া মুসলমান, হিটলারের মত কট্টর বিজ্ঞান-বিশ্বাসীরা নাকি রাশিকুণ্ডলী মাঝে-মধ্যে দেখে নিতেন। আমাদের বাড়িতে গণৎকার এসেছিল। তা আসুক। মেয়েরা জটলা পাকিয়েছিল। তা পাকাক। কাউকে রাজরাণী, কাউকে রাজেশ্বরী, কাউকে ডাক্তার হওয়ার আশা দিয়ে গিয়েছে—তা দিক, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমি রাগে টং হলুম যখন শুনলুম, পাশের বাড়ির আট বছরের মেয়ে মাধুরীলতা, আমার বোনের ক্লাসফ্রেণ্ড, সেও নাকি এসেছিল এবং গণৎকার বলেছে, তার কপালে বাল-বৈধব্য আছে।

বাল-বৈধব্য তার কপালে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে—আমি জানব কি করে, আর গণৎকারই বা জানবে কি করে? আর যদিও ধরেও নিই গণৎকার জানতোই, তবে সে বরাহমিহির সেটা বলতে গেল কেন মেয়েটাকে —ঐ আট বছরের ফুলের মত মেয়েটিকে?

এই দৈববাণীর ফল আরম্ভ হল পরের দিন থেকেই।

মাধুরী শুরু করল দুনিয়ার কুল্লে ব্রত-উপবাস, পূজা-পারণা। ইতু, ঘেঁচু

---

৪ আল্‌ফঁস্ দোদের শব্দে শব্দে অনুবাদ

হেন দেবতা নেই যে সে খুঁজে খুঁজে বের করে বাড়িতে তার পুজো লাগায় নি। তার বাড়িতে ছিলেন আমাদের দেশে সব চাইতে নামকরা নিষ্ঠাবতী ঠাকুরমা— তিনি পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, মাধুরীর পুজোপাটের ঠেলায়।

এসবের অর্থ অতি সরল। অতিশয় প্রাঞ্জল। মাধুরী ত্রিলোকবাসী সর্বদেব, সর্বমানব, এমন কি সর্ব ভূতপ্রেতকেও প্রসন্ন রাখতে চায়, যাতে করে তাঁরা তাকে বাল-বৈধব্যের হাত থেকে ঠেকিয়ে রাখেন।

কিন্তু মাধুরীর মুখের হাসি শুকিয়ে গিয়েছিল—আমার রাগ সেইখানটাতে। তার সর্বচৈতন্যে, সর্ব অস্তিত্বে মাত্র একটি চিন্তা ; তাকে আমৃত্যু বাল্য-বৈধব্য বয়ে বেড়াতে হবে। এবং সে নাকি হবে শতায়ু! তার বাপ ঠাকুর্দা তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে তখন শুধু তার ডাগর চোখ দুটি মেলে তাকাতো, কোন কথা বলত না ; স্পষ্ট বোঝা যেত আর সান্ত্বনাবাণী, স্তোকবাক্য, তত্ত্বকথা তার মনের উপর কোন দাগ কাটছে না।

মাধুরী তেমন কিছু অসাধারণ সুন্দরী ছিল না। তবে হ্যাঁ, তার চোখ দুটির মত চোখ আমি আর কোথাও দেখি নি। সেই চোখ দুটিতে তার আট বছর বয়সে যে মধুর হাসি আমি দেখতে পেয়েছিলুম সেটি আর কখনো দেখি নি। তার রঙ ছিল শ্যাম। কিন্তু মাধুর্যে ভরা। তাই সব সময়ই মনে হত, এ মেয়ের নাম মাধুরী সার্থক। সে সুন্দর নয়, মধুর। মধু তো আর গোলাপ ফুলের মত দেখতে সুন্দর হয় না।

ষোল বছর বয়সে মাধুরীর বিয়ে হল। কুলীন ঘরের মেয়ে। সে-দিক দিয়ে অন্ততঃ সবাই লুফে নেবে। ছেলেটি বিলেত-ফের্তা ইঞ্জিনীয়ার। মাদ্রাজে কর্ম করে। মাধুরীকে দেখে ওদের বাড়ির সকলেরই পছন্দ হয়েছে। আমি তখন বিদেশে।

আমার বোন মাধুরীকে বড্ড ভালবাসতো। তাই আমাকে লেখা তার চিঠি ভর্তি থাকত মাধুরীর কথায়। পুজোপাট তার নাকি বিয়ের পর আরো অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। মাদ্রাজে গিয়ে পেয়েছে আরেক নূতন সেট দেবদেবী। ওঁয়ারা তো ছিলেনই, এঁয়ারাও এসে জুটলেন। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, শুকুরবারে শুকুরবারে মসজিদে শির্ণী পাঠাতেও মাধুরীর কামাই যেত না।

বোন লিখেছিল, মাধুরীর স্বামীটি নাকি পয়লা নম্বরের বৈজ্ঞানিক, দেবদ্বিজে আদৌ ভক্তি নেই। মাধুরীর পালপার্বণের ঘটা দেখে সে নাকি রঙ্গ-রস করত, সেই পালপার্বণের আদিখ্যেতার—তার ভাষায়—কারণ শুনে নাকি হাসাহাসি করেছিল তার চেয়েও বেশী। তবে ছেলেটি খানদানী ঘরের ভদ্রছেলে ছিল বলে

এসব কথা তুলে মাধুরীর মনে কষ্ট দিতে চাইত না।

কিন্তু মোদ্দা কথা—বোন লিখেছিল—মাধুরী সুখী, মাধুরী স্বামী-সোহাগিনী।

যাক্। চিঠি পেয়ে ভারী খুশী হলুম।

তার ছ' মাস পরে বজ্রাঘাত।

মাদ্রাজে যুদ্ধের সময়, এক্‌স্‌প্লোশন না বোমাপাতের ফলে মাধুরীর স্বামী আপিসের চেয়ারের উপরই প্রাণত্যাগ করে।

সেদিন আপিস যাবার সময় সে নাকি মাধুরীকে বলে গিয়েছিল, 'তোমরা বাঙালীরা বড্ড ঢিলে। সময়ের কোন জ্ঞান নেই। আমি বাড়ি ফিরবো সাড়ে পাঁচটায়। তোমাকে যেন তৈরী পাই। দশ মিনিটের ভিতরে যেন বেরতে পারি। সিনেমা তোমার জন্য অপেক্ষা করবে না।'

মাধুরী পাঁচটা থেকে তৈরী হয়ে বসে ছিল। কে জানে, কোন্ শাড়ীখানা পরেছিল? সেই হলদে রঙেরটা? যেটা আমি তাকে প্রেজেন্ট করেছিলুম—ওর রঙের সঙ্গে সুন্দর মানাতো বলে? থাক্ ওসব। মোহনীয়া গল্প শোনাতে আমি আসি নি। সমস্ত ব্যাপারটাই এমনি ট্রাজিক যে তার উপর অলঙ্কার চাপাতে ইচ্ছে করে না।

ছ'টা বাজলো, সাতটা বাজলো—করে করে রাত এগারোটা হল। মাধুরী তার স্বামীকে এই প্রথম অন্‌পন্‌ক্‌চুয়েল হতে দেখল—এবং এই শেষ।

আর পাঁচজন বাঙালীই প্রথম দুর্ঘটনার খবর পান। তাঁরা রাত্ত এগারোটায় এসে মাধুরীকে খবরটা দেন। সঙ্গে এসেছিলেন মাধুরীর এক বান্ধবী—ধর্মে তাঁর বিশ্বাস অবিচল ছিল বলে মাধুরীর সঙ্গে সখ্য হয়। তিনি খবরটা ভাঙেন। কি ভাষায়, সোজাসুজি না আশকথা-পাশকথা পাড়ার পর, জানি নে। তবে শুনেছি, মাধুরী একসঙ্গে এতজন লোককে রাত এগারোটার সময় বাড়িতে আসতে দেখেই কেঁদে উঠেছিল।

মাধুরী কলকাতায় ফিরে এল।

এখানেই শেষ? গণৎকারের কথাই ফলল? তাও নয়।

মাদ্রাজ ছাড়ার পূর্বে মাধুরী তার সখীকে তার কোষাকোষী আর সব পুজোপাটার জিনিসপত্র তার হাতে তুলে দিয়ে বলে, সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে। মাধুরী বলে নি—কিন্তু সখী বললেন, 'ও বলতে চেয়েছিল, এত করেও যখন দেবতাদের মন পেলুম না, তখন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আমার আর কি হবে? আমার তো অন্য আর কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই।'

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

কলকাতায় ফিরে মাধুরী চাকরি নেয়। বস্তিতে করপরেশনের ইস্কুলে। সেখানে তার বসন্ত হয়। তার বোনঝি—ডাক্তার—বললে, 'ওয়ান বিগ্ ব্লার্ব—করবার কিছু নাই।'

সে শতায়ু হয়ে বাল-বৈধব্যের যন্ত্রণা উপভোগ করে নি। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে সে গত হয়। পরোপকারে প্রাণ দেয়। সে জিন্নৎবাসিনী, অমর্ত্যলোকে অনন্ত স্বামী-সোহাগিনী।

একটি অনমিত নাম : বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

'স্বর্গীয়' লিখতে গিয়েই কলম থেমে গেল; এমন কি ক্ষণজন্মা, পুরুষসিংহ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় 'পরলোক' গমন করেছেন,—এটা লিখতেও বাধো-বাধো ঠেকছে, কারণ বনবিহারী স্বর্গ, পরলোক, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না।

বনবিহারীর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা প্রায় অসম্ভব, কারণ চাকরিজীবনে তাঁকে বাধ্য হয়ে আজ পাকশী, কাল মৈমনসিং, পরশু বগুড়া করতে হয়েছে—এবং অসময়ে বেকসুর বদলি হলেও তিনি হয়তো প্রতিবাদ জানাতেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো মেহেরবাণী চাইতেন না। বনবিহারী এ জীবনে কারো কাছ থেকে কোনো 'ফেবার' চান নি, এবং ভগবানের কাছ থেকে অতি অবশ্য, নিশ্চয়ই না। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি সর্বপ্রথম কোথায় যান জানি নে, কিন্তু তার পরই চলে যান দেরাদুনে। সেখানে বেশ কয়েক বৎসর একটানা হোটেলে বাস করার পর হঠাৎ চলে যান—বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আন্দামান। স্বেচ্ছায় এবং অতিশয় প্রসন্ন চিত্তে। বলা বাহুল্য, সেখানে রোমান্সের সন্ধানে যান নি। কাব্যে, সাহিত্যে তিনি কতখানি রোমান্টিসিজম বরদাস্ত করতেন বলা কঠিন, কিন্তু সংসার-জীবনে তিনি রোমান্টিসিজমের পিছনে দেখতে পেতেন, make belief, সত্য থেকে আত্মগোপন, এস্কেপিজম এবং ভণ্ডামি এবং এর সব কটাকেই তিনি অত্যন্ত ভ্রুকুটিকুটিল নয়নে তিরস্কার জানাতেন। তারপর হঠাৎ একদিন তিনি আবার ভারতে ফিরে এলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন আমাকে বড় পীড়া দিত। তাই তাঁকে অনুরোধ জানালুম, তিনি যেন দয়া করে আমার সঙ্গে বসবাস করেন। উত্তম হক মধ্যম হক, আমি মোগলাই, বিলিতি কিছু কিছু রাঁধতে পারি; সে সময়ে আমার বাসস্থানটি ছিল প্রশস্ত ও নির্জনে—শ্মশানের কাছে অবস্থিত। আমার নিজস্ব বই তো ছিলই, তদুপরি তাঁর পরিচিত একটি লাইব্রেরি কাছেই ছিল। অবশ্য সর্বপ্রধান প্রলোভন ছিলেন

তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত বিনোদবিহারী মুখুয্যে। তাঁর বাসাও নিকটে। এই ভাইটিকে বনবিহারী আপন হাতে মানুষ করেন এবং সে যেন ধর্ম, ঈশ্বর, পরকাল, উপাসনা ইত্যাদি সর্বপ্রকার সংস্কার থেকে মুক্ত থাকে সেজন্য কোনো ব্যবস্থার ক্রুটি করেন নি। বিনোদবিহারীর ডাক নাম 'নন্তু'। বনবিহারী তাঁকে ডাকতেন 'নাস্তিক' বা 'নাস্তে'। আমার বাড়িতে এসে বাস করলে তিনি যে তাঁর নাস্তেকে অক্লেশে দু'বেলা দেখতে পাবেন সেইটেতে বিশেষ জোর দিয়ে আমি আমার চিঠিতে নিবেদন জানিয়েছিলুম। বিনোদবিহারী প্রায় দশ বৎসর পূর্বে তাঁর চোখের জ্যোতি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন ; তাই তাঁর পক্ষে অগ্রজ সন্নিধানে যাওয়া কঠিন ছিল।

আমি ক্ষীণ আশা নিয়েই আমন্ত্রণ-জানিয়েছিলুম, কারণ আমি তাঁর কৃতবিদ্য, বিত্তশালী, পিতৃভক্ত পুত্রকে উত্তমরূপেই চিনি। তাঁর শত কাতর অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি পুত্রের গৃহে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে রাজী হন নি। আমার আশা ছিল, আমি তাঁর কেউ নই, তিনি জানতেন যে আমি ধর্মে, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী একটা আস্ত জড়ভরত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অবিচল ভক্তি করি, এবং দাসের মত সেবা করবো ; বিশ্বসংসার নিয়ে তাঁর যত রকমের সমালোচনা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ আমি সহাস্য বদনে শুনেছি এবং শুনবো এবং তর্কযুদ্ধ করার মত লোকের অভাব হলে আমাকে দিয়েও কিছুটা কাজ চলবে —তিনি জানতেন, আমার জীবন কেটেছে 'তুলনাত্মক ধর্ম' চর্চায়।

তিনি এলেন না সত্য, কিন্তু আমাকে একটি অতিশয় প্রীতিপূর্ণ (তিনি সেন্টিমেন্টের আতিশয্য এতই অপছন্দ করতেন যে, সেফ্‌সাইডে থাকার জন্য সেটা বাক্যে, পত্রে সর্বত্র বর্জন করতেন) পত্র লিখে জানালেন, 'তোমার নিমন্ত্রণ মনে রইল, সময় হলেই আসবো।'

আমার ক্ষোভ-শোকের অন্ত নেই যে তাঁর সময় আর হল না। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দি, আমি কে যে তিনি আমার সেবা গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করতেন।

শেষদিন পর্যন্ত, এত সব ঘোরাঘুরির মাঝখানেও সর্বত্র তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন তাঁর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী। বনবিহারীর অধিকাংশ লেখাই ছাপাখানা পর্যন্ত পৌঁছত না। প্রকাশিত হলে ফাইলে রাখতেন না, নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও বলতেন না, 'অমুক কাগজে আমার লেখা বেরিয়েছে, পড়ে দেখো।' তাঁর পরিপক্ক যৌবনে কিন্তু তিনি আমাদের মত বালকদের প্রতি সদয় ছিলেন। সম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ বহু লেখা তিনি সোৎসাহে আমাদের পড়ে শুনিয়েছেন।

এখনো যা-কিছু আছে তাই নিয়ে শ্রীযুত বঙ্কুবিহারী প্রামাণিক নিবন্ধ লিখতে পারবেন। কোন্ লেখা কোন্ উপলক্ষে লেখা হয়েছিল, কোন্ ব্যঙ্গচিত্র আঁকবার সময় কাকে তিনি মনে মনে সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন, কিভাবে সমাজের কোন্ গুপ্ত পাপাচার তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, এর বেশীর ভাগই একমাত্র তাঁরই জানার কথা। এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের এত বড় পণ্ডিত, অধ্যাপক ঐ বিষয়ে কখনো কিছু লেখেন নি এটা কেমন জানি বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়। আমি নিজে জানি, ছাত্রদের দুই ধরনের ব্যাণ্ডেজ শিখিয়ে তাদের নাম বলে, দোষগুণ আপন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ দিয়ে যাচাই করার পর একটা তৃতীয় ব্যাণ্ডেজ হয়তো শেখালেন। কোনো বুদ্ধিমান ছেলে হয়তো লক্ষ্য করলো এটার নাম তিনি বলেন নি ; শুধোলে পর বলতেন, 'ওঃ হোয়াট্‌ ওয়ান ? ওটা ব্যাণ্ডেজ আ লা বনবিহারী' (তিনি নিজের চেষ্টায় সুন্দর ফরাসী শিখেছিলেন ও উচ্চারণটিও তাঁর চমৎকার ছিল। আমি ফরাসী শিখতে আরম্ভ করেছি জেনে তিনি আমাকে মপাসাঁ পড়ে শুনিয়েছিলেন ; নতুবা নিতান্ত বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত বনবিহারী আপন বৃহৎ ক্ষুদ্র সর্বকৃতিত্বই লুকিয়ে রাখতেন)।

বনবিহারী সম্বন্ধে প্রামাণিক কিছু লেখা প্রায় অসম্ভব। কারণ প্রায় অসম্ভব শুধুমাত্র তাঁর প্রকাশিত লেখা ও ব্যঙ্গচিত্র যোগাড় করা। বেনামে ছদ্মনামে তো লিখেছেনই, তদুপরি নিজের সৃষ্টির প্রতি তাঁর কোন প্রকারের মোহ ছিল না বলে সেগুলোকে তাদের ন্যায্য সম্মান দেবার জন্য তিনি কোনো চেষ্টা তো করতেনই না, উল্টে নিতান্ত অজানা অচেনা কাগজে প্রায়ই বাছাই বাছাই লেখা ছাপিয়ে দিতেন। এবং আমার জানতে সত্যই ইচ্ছে করে, তিনি তাঁর লেখার জন্যে কখনো কোনো দক্ষিণা পেয়েছেন কিনা।

উপস্থিত আমি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ নিবেদন করছি ; যদি কোনো দিন তাঁর প্রকাশিত রচনা ও ছবির দশমাংশের এক অংশও যোগাড় করতে পারি তবে তাঁর জীবন-দর্শন সম্বন্ধেও কিছু পেশ করার ভরসা রাখি। অথবা হয়তো তখন দেখব, তাঁর জীবন-দর্শন ছিল যে, মানুষের পক্ষে কোনো প্রকারের শাশ্বত জীবনদর্শনে পৌঁছনো সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ শাশ্বত বলে কোনো বস্তু, ধারণা বা আদর্শ এ-সংসারে আদপেই নেই।

'ভ্যানিটি অব্ ভ্যানিটিজ—অল ইজ ভ্যানিটি' বাইবেলের এই আপ্তবাক্য তাঁর মুখ দিয়ে বলাতে আমার বাধছে, কারণ নাটকীয় ভঙ্গিতে কোনো জিনিসই প্রকাশ করাতে তাঁর ছিল ঘোর আপত্তি। কারণ এসব ভঙ্গি, স্টাইল, পোজ থেকে উদ্ভূত হয় ধর্মগুরুর দঙ্গল—এবং বনবিহারীর সুদৃঢ় ধারণা ছিল যে তাঁদের সম্বন্ধে

আমরা যত কম শুনতে পাই ততই ভালো। বলার মত বিশেষ কিছু তো নেই—হয়তো বলতেন বনবিহারী—তাহলে বলতে গিয়ে অত ধানাইপানাই কেন ?

বৃষের মত স্কন্ধ, আজানুলম্বিত বাহু—এসব শাস্ত্রসম্মত লক্ষণ দিয়ে বিচার করলে বনবিহারী নিশ্চয়ই সুপুরুষের পর্যায়ে পড়তেন না; তৎসত্ত্বেও বলি, বনবিহারীর মত অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বান্ সুপুরুষ আমি দেশ-বিদেশে অতি অল্পই দেখেছি। বাঙালী ফর্সা রঙ পছন্দ করে, কিন্তু বনবিহারীর গৌরবর্ণ আমি অন্য কোনো বাঙালীর চর্মে দেখি নি। বলা বাহুল্য যে সে বর্ণ ইংরেজের ধবলকুষ্ঠ শ্বেত নয়। গৌর হয়েও সে বর্ণে ছিল কৃষ্ণের স্নিগ্ধতা। তপ্তকাঞ্চন তো সে নয়ই, 'চাঁদের অমিয়াসনে চন্দন বাটিয়া'ও সে বর্ণ মাজা হয় নি। নদীয়ার গোসাঁইকে আমি দেখি নি, কিন্তু তাঁকে কল্পনায় দেখতে গেলে তাঁর অঙ্গে আমি বনবিহারীর বর্ণ চাপাই। তাঁর চুল ছিল কটা। আমি একদিন তাঁকে বলেছিলুম, 'ঋগ্বেদে না কোথায় যেন অগ্নির দাড়িকে রক্তবর্ণ বলা হয়েছে; আপনি দাড়ি রাখলে সেটা ক্রমে ক্রমে রক্তবর্ণ ধারণ করবে।' আমার সত্যই মনে হ'ত, কেমন যেন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় কি যেন এক এ্যাটাভিজমের ফলে তিন হাজার বৎসর পর আর্য ঋষি গৌড়দ্বিজের গৃহে আবির্ভূত হয়েছেন। বনবিহারী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তর্কজাল বিস্তার করে পর্যায়ক্রমে, অপ্রমত্ত চিত্তে যে-সিদ্ধান্তটি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন তার অর্থ: যারা বলে বাঙালীর গায়ে কিঞ্চিৎ আর্যরক্ত আছে এটা তাদের ভ্রম—যারা বলে বাঙালী পরিপূর্ণ আর্য—তাদের ভ্রমের চেয়েও মারাত্মক দুষ্টবুদ্ধিজাত ভ্রম।

ঐ সময়ে আমি রেনাঁর খৃষ্ট-জীবনী পড়ি অধ্যাপক হিড্‌জিভাই মরিসের কাছে।[১] প্রথম অধ্যায়েই তিনি লিখেছেন 'যে লোক মানুষে মানুষে পার্থক্য ঘোচাবার জন্য সর্বাধিক প্রচেষ্টা দিয়েছেন (অর্থাৎ খৃষ্ট) তাঁর ধমনীতে কোন্ জাতের রক্ত প্রবাহিত সে অনুসন্ধান করতে যাওয়া অনুচিত।' বনবিহারী সমস্ত জীবন ধরে বিস্তর অক্লান্ত জিহাদ লড়েছেন, কিন্তু বর্ণ বৈষম্য চোখে পড়লেই তিনি নিষ্কাশিত করতেন তাঁর শাণিততম তরবারি। এস্থলে বলে রাখা ভালো, বনবিহারী তাঁর জিহাদ চালাতেন হৃদয়হীন যুযুধানের মত। তাই সত্যের অপলাপ না করে অনায়াসে বলতে পারি, তাঁর মত মিলিটেণ্ট নাস্তিক এ-দেশে তো কখনই জন্মায় নি, বিদেশেও নিশ্চয়ই মুষ্টিমেয়। 'পীসফুল কো-এগ্‌জিজস্টেনস্'

---

১ ইনি পার্সী দস্তুর (যাজক) সম্প্রদায়ের লোক; শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' পৃ. ১২৫।

নীতিটি তিনি আদপেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন হাসপাতালের ভিতরে বাইরে সর্বত্রই, এবং টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ডিউটির সার্জন। তাঁর বক্তব্য, 'তোমার পায়ে হয়েছে গ্যাঙ্‌গ্রীন, সেটা আমি কেটে ফেলে দেব। গ্যাঙ্‌গ্রীনের সঙ্গে আবার পীসফুল কো-এগ্‌জিস্টেনস্‌ কি?' কিন্তু পাঠক ভুলে ক্ষণতরেও ভাববেন না, বনবিহারী অসহিষ্ণু ছিলেন। এর চেয়ে বৃহত্তর, হীনতর মিথ্যা ভাষণ কিছুই হতে পারে না। 'তুমি আস্তিক। তোমার মস্তিষ্ক থেকে আমি সেই অংশ ছুরি দিয়ে কেটে ফেলব। কিন্তু তোমার প্রতি আমি অসহিষ্ণু হব কেন? বস্তুত চিকিৎসক বলে আমার সহিষ্ণুতা অনেক বেশী। তোমার পরিচিত কারো সিফিলিস হলে তুমি শুধু সিফিলিস না, সেই লোকটিকেও বর্জন করো। আমি সিফিলিস দূরীভূত করি, কিন্তু সে হতভাগ্যকে তো দূর দূর করে দূরীভূত করার চিন্তা আমার স্বপ্নেও ঠাঁই দিই না। প্লেগ এলে তুমি এ শহরের নাগরিকদের বিষবৎ বিবেচনা করে তাদের বর্জন করো; আমি তা করি নে।' এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে শপথ করতে রাজী আছি এটা তাঁর বাগাস্ফালন নয়। কাব্যে আমরা বাক্‌ ও অর্থের সমন্বয় অনুসন্ধান করি, জীবনে করি বাক্‌ ও কর্মের। এ দুটির সমন্বয় বনবিহারীতে প্রকৃতিগত ছিল। বলতে যাচ্ছিলুম 'বিধিদত্ত', কিন্তু তাঁর আত্মাকে ক্ষুব্ধ করতে চাই নে। আবার ভুল করলুম, তিনি আত্মাতে বিশ্বাস করতেন না, কাজেই হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধার মতই তাঁর আত্মাকে নিপীড়িত করার সম্ভাবনা!

বনবিহারী তাঁর বাল্যবয়সের অধিকাংশটা কাটান তাঁর মাতামহের সঙ্গে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁর নাম ভুলে গিয়েছি কিন্তু সেটা বের করা কঠিন হবে না। এই মাতামহটি ছিলেন গত শতাব্দীর ধনুর্ধর, অপরাজিত দার্শনিক এবং নৈয়ায়িক। যে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনে ছিলেন সে যুগের চূড়ামণি, তিনি ছিলেন তাঁর নিত্যালাপী সখা। যে দ্বিজেন্দ্রনাথের গৃহে বঙ্কিমাদি মনীষিগণ আসতেন তত্ত্বালোচনার জন্য সেই দ্বিজেন্দ্রনাথ গিয়েছেন দিনের পর দিন এই নৈয়ায়িকের অপরিসর পথের ক্ষুদ্রতর গৃহে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন এমনই আপন-ভোলা সাদা দিলের মানুষ যে তর্কে বিরক্তির সঞ্চার হলে তাঁর কণ্ঠ তপ্ততর ও উচ্চতর হতে আরম্ভ করত—বনবিহারীর মাতামহ এ তত্ত্ব জানতেন বলে সেটা আদৌ গায়ে না মেখে পূর্বের চেয়ে ক্ষীণতর কণ্ঠে মোক্ষমতর যুক্তি পেশ করতেন। খাওয়ার বেলা গড়িয়ে যায়—দ্বিজেন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে বেহুঁশ। শেষটায় বেলা প্রায় তিনটায় উত্তেজিত হয়ে আসন ত্যাগ করে বলতেন, 'ঝকমারি, ঝকমারি, এসব লোকের সঙ্গে তর্ক করা; আমি চললুম এবং এই

আমার শেষ আসা।' বনবিহারীর মাতামহ ক্ষীণকণ্ঠে বলতেন, 'গিন্নী পুঁই-চচ্চড়ি রেঁধেছিল।' অট্টহাস্য করে দ্বিজেন্দ্রনাথ টেনে টেনে বলতেন, 'সেটা আগে বললেই হ'ত, আগে কইলেই হ'ত।' তারপর বারান্দায় প্রতীক্ষমাণ তাঁর 'গার্জেন'কে বলতেন (মহর্ষিদেব এই আপন-ভোলা যুবরাজের জন্য একটি তদারকদার নিযুক্ত করে রেখেছিলেন), 'যাও, বাড়ি থেকে দাঁত নিয়ে এসোগে।' শুধু খাবার সময়ই তিনি বাঁধানো দাঁত ব্যবহার করতেন। আমার ভাবতে বড় কৌতুক বোধ হয় যে, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠতম দৌহিত্র বাড়ির কোর্মা-কালিয়া ছেড়ে অনাড়ম্বর নৈয়ায়িকের অপরিসর বারান্দায় পিঁড়িতে বসে পুঁই-চচ্চড়ি চিবোতে চিবোতে উচ্চকণ্ঠে পাড়া সচকিত করে তার অকৃপণ প্রশস্তি গেয়ে চলেছেন।

পরদিন 'নাউ-চিঙড়ি'! 'নাউ'—লাউ না!

এ ধরনের একাধিক বিচিত্র বিষয় আমি ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি প্রাগুক্ত বিনোদবিহারী মহাশয়ের কাছ থেকে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধরাজিতে মাত্র দু'জন দার্শনিক পণ্ডিতের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে সপ্রশংস চিত্তে উল্লেখ করেছেন যাঁরা দার্শনিক ও তত্ত্ববিদের গুরুভার কর্তব্য আপন আপন স্কন্ধে অনায়াসে তুলে নিতে পারেন ; এঁদের একজন 'পুঁই-চচ্চড়ি'-রসিক দার্শনিক—বনবিহারীর মাতামহ। এবং তাঁর সম্বন্ধে বলি, সে যুগে পিরিলি ঠাকুররা অন্যান্য ব্রাহ্মণদের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন।

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, বনবিহারী বাল্য বয়সে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবস্থায়ও সূর্যোদয় থেকে প্রারম্ভ পূজা-অর্চনা শেষ করতে করতে কোনো কোনো দিন ক্লাসের সময় পেরিয়ে যেত। এটাতে আমার সামান্য বিস্ময় লাগে, কারণ আমি যে কয়টি প্রাচীনপন্থী নৈয়ায়িককে চিনি তাঁদের সকলেই পূজা-অর্চনা সম্বন্ধে ঈষৎ উদাসীন ছিলেন। আমার আপন গুরু পথে যেতে যেতে বারোয়ারি সরস্বতী প্রতিমা দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করে বলেছিলেন, 'ন দেবায়, ন ধর্মায়।' অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রে (অবশ্য তিনি স্মৃতি জানতেন অত্যল্পই এবং সেজন্য তাঁর কণামাত্র ক্ষোভও ছিল না) এ রকম পুজোর কোনো ব্যবস্থা নেই বৌদ্ধ ধর্মে ('ন ধর্মায়'-এর ধর্ম এস্থলে 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি' থেকে নেওয়া) তো থাকার কথাই নয়। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সরস্বতীর যে 'কুখ্যাতি' (হয়তো অমূলক) আছে সেটা তাঁর স্মরণে আসতো। তা সে যাক। কারণ আমার ধর্মের সুফীদের ও খৃষ্টান মিস্টিকদের ভিতরও ক্রিয়াকর্মের প্রতি কিঞ্চিৎ অনাসক্তি লুক্কায়িত রয়েছে।

অকস্মাৎ একদিন বনবিহারী নাস্তিকরূপে সমাজে আত্মপ্রকাশ করলেন ও শুধু শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম (রিচুয়েল) নয়, শঙ্করাচার্যের নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে হাঁচি টিকটিকির বিরুদ্ধে তীব্র কর্কশ কণ্ঠে মারমুখো জিহাদ ঘোষণা করলেন। খৃষ্টান মিশনারী পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা, উদ্দীপনা এবং যুদ্ধং দেহি মনোভাব দেখলে বিস্ময়ের সঙ্গে পরাজয় স্বীকার করতো। এই যে সামান্য আমি, আমার বয়েস তখন কত হবে? ষোলগোছ,—আমাকে পর্যন্ত প্রথম দর্শনের পাঁচ মিনিটের ভিতর, কলার অভাবে কুর্তার গলার মুরী ধরে শুধোলেন, 'তুমি ঈশ্বর মানো?'

আমি ভীত কণ্ঠে বললুম, 'আজ্ঞে আমার বিশ্বাস দৃঢ় নয়, অবিশ্বাসও দৃঢ় নয়।' আমি তখন জানতুম না, এই উত্তরই চার দশক পরে কলকাতার মডার্ন মহিলাদের ভিতর ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াবে।

তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বিশ্বাস দৃঢ়ই হক, আর শিথিলই হক, সেইটে কিসের উপর স্থাপিত আমাকে বুঝিয়ে বলো।'

কী যুক্তি দেব আমি? যেটাই পেশ করি, সেটাই বুমেরাঙের মত ফিরে আসে ফের আমারই গলায়। ইতিমধ্যে আমার জন্য উত্তম মমলেট, ঘোলের শরবৎ এসেছে—দুপুর অবধি তর্ক চালালে অবশ্যই পুঁই-চচ্চড়ি আসতো!

আমি রণেভঙ্গ দিতে চাইলেও তিনি ছাড়েন না। আমি যে ধর্মের 'অধর্ম' পথে চলেছি সেইটে তিনি সপ্রমাণ করতে চান, সর্বদৃষ্টিকোণ থেকে, সর্বদৃষ্টিবিন্দু থেকে। এবং আমার সব চেয়ে বিস্ময় বোধ হল যে, আমি যে ক'জন ইয়োরোপীয় নাস্তিক দার্শনিকের নাম জানতুম—অবশ্য অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ভাবে—তাঁদের কাছ থেকে বনবিহারী ঈশ্বরঘ্ন, ধর্মঘ্ন যুক্তি আহরণ করলেন না। বিস্তর তর্কজাল বিস্তৃত করার পর, মাঝে মাঝে তিনি সেগুলো সাম্ আপ্ করতেন, এ-দেশী পরিভাষায় সুত্ররূপে প্রকাশ করতেন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে! এই প্রথম আমার গোচরে এল যে, আর্যাবর্তের মত ধর্মাবর্তের দেশেও অসংখ্য নাস্তিক প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বহুযুগ পূর্বেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে গিয়েছেন।

সেদিন আমি বড়ই উপকৃত হয়েছিলুম। ঈশ্বরবিশ্বাসে যে-সব বাতিল যুক্তি আছে সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে আমি ঈশ্বর সন্ধানে সত্য যুক্তি ও নিজস্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কথা চিন্তা করলুম। কিন্তু আমার কথা থাক।

পাঠক, আপনি মোটেই ভাববেন না, বনবিহারীর প্রধান সংগ্রাম ছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। তাঁর সংগ্রাম ছিল জড়তা, কুসংস্কার, ধর্মের নামে পাপাচার, সামাজিক অনাচার, তথাকথিত অপরাধীজনের প্রতি অসহিষ্ণুতা, যাজক সম্প্রদায়ের শোষণ, চিন্তা না করে বাঁধা পথে চলার বদ অভ্যাস, মহরমের

তাজিয়ার সামনে কুমড়ো-গড়াগড়ি, যৌন সম্পর্কের উপর তথাকথিত শালীনতার পর্দা টেনে আড়ালে আড়ালে কুমারী ও বিধবার সর্বনাশ, অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের অকারণ দম্ভ, অব্রাহ্মণের অহেতুক দাস্যমনোবৃত্তি, তথাকথিত সত্যরক্ষার্থে সত্য গোপন, স্বার্থান্বেষণে বিদেশীর পদলেহন ও অন্ধানুকরণ কিন্তু যেখানে সে মহৎ সেটাকে প্রচলিত ধর্মের দোহাই দিয়ে বর্জন, বৎসরের পর বৎসর, প্রতি বৎসর রুগ্না অর্ধমৃতা স্ত্রীকে গর্ভদান করে তার কাতর রোদন অনুনয়-বিনয় পদদলিত করে তাকে অবশ্যম্ভাবী অকাল-মৃত্যুর দিকে বিতাড়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজে, ধর্মসভায় সচ্চরিত্র সজ্জন খ্যাতি অর্জন (বলা বাহুল্য চিকিৎসক হিসাবে ঠিক এই ট্র্যাজেডি তাঁর সামনে এসেছে বহু, বহুবার), গণিকালয় থেকে একাধিকবার বিবিধ মারাত্মক ব্যাধি আহরণ করে নিরপরাধ অর্ধাঙ্গিনীর শিরায় শিরায় সেই বিষ সংক্রামণ, একবার একটি মাত্র ভুল করার জন্য অনুতপ্তা রমণীকে ব্ল্যাকমেল করে তাকে পুনঃ পুনঃ ব্যভিচার করাতে বাধ্যকরণ—

হে ভগবান! এ যে অফুরন্ত ফর্দ! কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বনবিহারীর সিকি পরিমাণ প্রকাশিত—অপ্রকাশিতের হিসেব নিচ্ছি নে এবং অধিকাংশ লেখাই যে তিনি ছিঁড়ে ফেলতেন সেও বাদ দিচ্ছি—গদ্য পদ্য ব্যঙ্গচিত্র সংগ্রহ করে কেউ যদি তাঁর জিহাদের লক্ষ্য বিষয়গুলো সংকলন করেন তবে এ-স্থলে আমার প্রদত্ত নির্ঘণ্টের চেয়ে বহুগুণে বৃহত্তর ও কঠোরতর হবে।

কী নিদারুণ ব্যঙ্গ, বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার সঙ্গে তিনি অন্যায় আচরণ, ভণ্ড কাপুরুষতাকে আক্রমণ করতেন সে তাঁর গুণগ্রাহী পাঠকমাত্রই জানেন। ভাষার শাণিত তরবারি তাঁর হাতে বিদ্যুৎবহ্নি বিচ্ছুরণ করতো এবং এই মরমিয়া মোলায়েম আ মরি বাঙলা ভাষাও যে কতখানি বহ্নিগর্ভা সে তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হ'ত বনবিহারীর অদম্য, নিঃশঙ্ক আঘাতের পর আঘাত থেকে। প্রত্যেক শব্দ প্রত্যেকটি বর্ণ বিশুদ্ধ যুক্তির উপর দণ্ডায়মান। শাস্ত্র ভাঙতে যখন যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তখন শাস্ত্রের দোহাইয়ের তো কথাই ওঠে না, তিনি বিজ্ঞানের দোহাইও দিতেন না। কোনো কিছুই অভ্রান্ত নয়, কোনো সত্যই শাশ্বত নয়; অতএব প্রত্যেকটি সমস্যা নূতন করে যাচাই করে দেখতে হবে, এবং এই সাধনা চলবে আমৃত্যু।

ঈশ্বর-বিশ্বাসকে যে তিনি গোড়াতেই আক্রমণ করেছিলেন তার অর্থ এই নয় যে তিনি এই বিশ্বাস by itself, per se অন্যান্য সংস্কারের চেয়ে বেশী বিপজ্জনক বলে মনে করতেন। তাঁর ধারণা জন্মেছিল—এবং সেটা বিস্তর অনুসন্ধান ও গবেষণা করার পর, যে—এই বাংলা দেশে যত প্রকারের সামাজিক, অর্থনৈতিক

অন্যায় অবিচার হচ্ছে, যা কিছু নারীর ন্যায্য অধিকার ও পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায় হচ্ছে,—আর ধর্মের নামে অনাচার শোষণের তো কথাই নেই—এ সব-কিছু হচ্ছে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে।[২]

যে-সব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বনবিহারী লড়াই দিতেন তাদের বিরুদ্ধে কি অন্য বাঙালী লড়ে নি ? নিশ্চয়ই লড়েছে। বর্ণবৈষম্য, আহারে-বিহারে স্ব স্ব সঙ্কীর্ণ গণ্ডী নির্মাণ, ধর্মের নামে অধর্মচর্চা—শাস্ত্রাধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে তাদের কুসংস্কারে নিমজ্জিত রাখা, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তাকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত করা, ধর্মত্যাগীকে পুনরায় স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করার পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়া ইত্যাকার বহু বহু সংস্কার আচার দূর করার জন্য চৈতন্য সংগ্রাম দেন ও সর্বজনীন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ এঁরা এবং আরো অনেকে মূঢ়তা, কুসংস্কার ও একাধিক পাপাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এঁদের তুলনায় বনবিহারীকে চেনে কে ?

কারণ বনবিহারী অন্য পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

প্রাগুক্ত সকলেই দেশ-দশকে পাপচিন্তা-পাপাচার থেকে মুক্ত করার জন্য শাস্ত্রের অর্থাৎ ধর্মের শরণ নিয়েছেন। বনবিহারী মানবিকতার শরণ নেন। প্রচলিত ধর্মও তাঁর শত্রু। একমাত্র ধর্মের moral, ethical যেটুকু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধোপে টেকে সেইটুকু গ্রহণ করা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে একখানা চিঠিতে যা লেখেন তার নির্যাস ছিল এই, শাস্ত্র মেনে হিন্দু তার সামাজিক জীবন যাপন করে না। সে মানে লোকাচার, দেশাচার। বিদ্যাসাগর যদি সর্বশাস্ত্র দিয়েও দ্ব্যর্থহীন নিরঙ্কুশ সপ্রমাণ করেন যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, শাস্ত্রসিদ্ধ তবু হিন্দু সে-মীমাংসা গ্রাহ্য না করে আপন লোকাচার দেশাচার আগেরই মত মেনে নিয়ে বিধবার বিয়ে দেবে না। অতএব বিদ্যাসাগরের উচিত যুক্তি ন্যায় ও মানবিকতার (এই ধরনেরই কিছু, আমার সঠিক মনে নেই, তবে মোদ্দা—reasonএর উপর নির্ভর করা, শাস্ত্রের উপর না করে) উপর নির্ভর করা।

২ তাই তাঁর নিজস্ব মৌলিক ফরমূলা বা ডাক্তারি প্রেসক্রিপশন ছিল :—
ভগবান আমাকে বুদ্ধি দিয়েছেন। (এই স্বতঃসিদ্ধটি আস্তিকরা
স্বীকার করেন ও বনবিহারী এটা উপস্থিত তর্কস্থলে মেনে নিচ্ছেন)
সেই বুদ্ধি বলছে, "ভগবান নেই"।
∴ ভগবান বলছেন, "ভগবান নেই"॥

Q. E. D.

বিদ্যাসাগর উত্তরে কি লিখেছিলেন, আদৌ উত্তর দিয়েছিলেন কি না সেটা বহু অনুসন্ধান করেও আমি খুঁজে পাই নি।[৩] কিন্তু তিনি যে বঙ্কিমের উপদেশ গ্রহণ করেন নি, সে কথা কারো অবিদিত নেই। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, শাস্ত্রের সাহায্যে হয়তো বা কিছু কার্যোদ্ধার হবে, যুক্তিতর্ক দিয়ে কিছুই হবে না। বিদ্যাসাগর আপন দেশবাসীকে বিলক্ষণ চিনতেন।

অতএব প্রাগুক্ত রামমোহনাদি সকলেই লুথার জাতীয় সমাজ ও ধর্মসংস্কারক। যে বাইবেল পোপ মানেন, খৃষ্টান মাত্রই মানে—সেই বাইবেল দিয়েই তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন যে প্রত্যেক মানুষেরই বিধিদত্ত অধিকার আছে—আপন বুদ্ধি অনুযায়ী বাইবেল থেকে বাণী গ্রহণ করে আপন জীবন চালনা করার; 'চিরন্তন, অভ্রান্ত' কোনো পোপকে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। তলস্তয়, গাঁধী এই সম্প্রদায়ের।

ভলতেয়ার এ পথ স্বীকার করেন নি। তিনি নির্ভর করেছিলেন যুক্তি (রীজন), শুভবুদ্ধি (মোটামুটি কমন সেন্স্), মানবতা ও ইতিহাসের শিক্ষার উপর। তাঁর কমনসেন্স্ ও ইতিহাসের উপর বরাত মানার একটা উদাহরণ দি। দক্ষিণ ভারতের হিন্দুরা ধর্মান্ধ হয়ে যে প্রথম খৃষ্টান মিশনারী সিন টমাসকে আক্রমণ করে হত্যা করেছিল বা পশ্চাদ্ধাবিত হলে পর তিনি গুহাগহ্বরে বিলীন হয়ে যান, সেই কিংবদন্তী অস্বীকার করে আলোচনা করতে গিয়ে ব্যঙ্গের সুরে ভলতেয়ার বলছেন, যে হিন্দুর পরধর্মে সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে আমরা বহুকাল ধরে বহু পর্যটকের কাছ থেকে শুনে আসছি, সেইটে হঠাৎ অবিশ্বাস করতে কাণ্ডজ্ঞানে (কমন সেন্সে) বাধে। এ দেশের বনবিহারী ভলতেয়ার—কিন্তু তিনি ভলতেয়ারের শিষ্য নন।

তবে জনসাধারণ বনবিহারীকে চেনে না কেন? তার সর্বপ্রধান কারণ, বনবিহারী নিজেকে কখনো সংস্কারক, যুগান্তকারী মহাপুরুষরূপে দেখেন নি। হয়তো তিনি ভাবতেন, উচ্চাসনে দণ্ডায়মান হয়ে অনলবর্ষী ভাষণের সাহায্যে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে, কিংবা ভাবালুতার বন্যায় দেশকে ভাসিয়ে দিয়ে কোনো দীর্ঘস্থায়ী সুদৃঢ় পরিবর্তন আনা যায় না। কিংবা হয়তো স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক বিনয়বশতঃ (সামান্য পরিচয়ের ন'সিকে লোক ভাবতো, তাঁর মত দম্ভী গর্বী ত্রিসংসারে বিরল—বিশেষতঃ লোকটা যখন স্বয়ং ঈশ্বরকে তাঁর যুগযুগাধিকৃত স্বর্গীয় সিংহাসন থেকে সরাতে চায়!) তিনি পেডেস্টেলে আরোহণ করতে

৩ কেউ যদি পান, আমাকে দয়া করে জানাবেন কি? আগের থেকেই ধন্যবাদ দিচ্ছি।

চাইতেন না, কিংবা হয়তো তিনি নৈরাশ্যবাদী ছিলেন। তা সে যা-হোক, আমরা যে তাঁর মত কিংবা তাঁর চেয়েও শক্তিশালী লোকের জন্য এখনো প্রস্তুত হই নি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

কিন্তু কেন?

বনবিহারী তো এমন কিছু নূতন কথা বলেন নি যা ভারতে কেউ কখনো বলে নি। স্থির হয়ে একটু ভাবলেই ধরা পড়বে ভারতবর্ষের চিন্তা-জগৎ (ধর্ম-শাস্ত্র-নীতি-আচার-ঐতিহ্য-কলা-জ্ঞানবিজ্ঞান) কি দিয়ে গড়া।

১। সনাতন হিন্দুধর্ম ২। বৌদ্ধধর্ম ৩। জৈনধর্ম ৪। দর্শনের মধ্যে নিরীশ্বর সাংখ্য ৫। চার্বাক প্রভৃতি লোকায়ত মতবাদ।

প্রথমটি বাদ দিলে বাকি চারটি চিন্তাধারাতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বার বার সাবধান-বাণী প্রচারিত হয়েছে, তোমার সুখ-শান্তি, তোমার পরমাগতি সম্পূর্ণ তোমারই হাতে; দৃশ্য এবং অদৃশ্য কোনো লোকেই এমন কোনো অলৌকিক শক্তি নেই যে তোমাকে কোনো প্রকারে কণামাত্র সাহায্য করতে পারে। এই চিন্তাধারা আদৌ অর্বাচীন নয়। বৈদিক যুগে দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে যখন যাগযজ্ঞহোমপশুবলি সর্বত্র স্বীকৃত, ঋষিকবিগণ যখন তাঁদের উদ্দেশ্যে সবিস্ময়ে অপৌরুষেয় মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাচ্ছি আরেকটি দ্বিধাজড়িত কণ্ঠ, আরেক সত্যান্বেষী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন—ধন্য হোক সে প্রশ্ন, ধন্য হোক তার জন্ম-লগ্ন—'তাহলে কোন্ দেবতাকে আমি স্বীকার করবো?' এই প্রশ্ন থেকেই আরম্ভ হল, চরম সত্যের—আলটিমেট রিয়েলিটির—অনুসন্ধান। এই প্রশ্নের দুটি উত্তর পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তী আরণ্যক-উপনিষদের যুগে—বেদান্তের মূল সূত্র সব-কিছুই ব্রহ্ম, এই তিন ভুবন আনন্দময় ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত। দ্বিতীয় সম্পূর্ণ বিপরীত উত্তর জন্ম নেয় ঐ সময়েই, হয়তো তার পূর্বেই, এবং সবল কণ্ঠে ধ্বনিত হয় লোকায়ত মতবাদে এবং তারও পরে তীর্থঙ্করদের কণ্ঠে, বুদ্ধদেবের কণ্ঠে—দেবদেবীতে পরিপূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ করে মানুষকে সৃষ্টির কেন্দ্ররূপে স্বীকার করা। এরই চরম বিকৃতরূপ—চার্বাকের মতবাদ, যে মতবাদ নৈতিক দায়িত্বে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না।

বৌদ্ধধর্ম এ-দেশ থেকে লোপ পেয়েছে, কিন্তু সে মতবাদ সম্পূর্ণ বহিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। তর্কযুদ্ধে পরাজিত কোনো এক সাংখ্যতীর্থ বোধ হয় বৌদ্ধবৈরী শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে বক্রোক্তি করেছিলেন, বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে যে এতখানি সন্ধি করেছে যে, সে মতবাদ আত্মসাৎ করতে তার বাধে নি, তাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলবো, না তবে কি বলবো?

আর নিরীশ্বর জৈনরা তো, এখনো ভারতবর্ষে বাস করেন।

নিরীশ্বর সাংখ্যের চর্চা করেন এখনো বহু পণ্ডিত : যাঁদের মতে ঈশ্বর প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ।

নৈয়ায়িকরা কোন্ পন্থায় ?

এবং এদেশের সহজিয়ারা সৃষ্টিকেন্দ্র করেছেন মানুষকে : 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

পূর্বেই বলেছি, বনবিহারী ভলতেয়ারের শিষ্য নন। তিনি ভলতেয়ারের শিষ্য এ-কথা তাঁর সামনে বললে তিনি নিশ্চয়ই তেড়ে আসতেন। অবশ্যই বলতেন, ভলতেয়ার যদি দেখেন যে তাঁর মতবাদ আমার মতবাদের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তবে তিনি গর্ব অনুভব করতে পারেন ; আমার তাতে কি ? আবার তাঁকে যদি বলা হ'ত, তিনি ঐতিহ্যগত বৌদ্ধ-জৈন-সাংখ্য দর্শন প্রচার করছেন তবে তিনি নিশ্চয়ই আরো মারমুখো হতেন। নিশ্চয়ই বলতেন, 'চুলোয় যাক্ ("জাহান্নমে[৪] যাক", নিশ্চয়ই বলতেন না, কারণ যে জায়গা নেই, সেখানে কোনো মতবাদকে পাঠিয়ে বনবিহারী অবশ্যই সন্তুষ্ট হতেন না!) তোমার সাংখ্য জৈন মতবাদ ; পিছন পানে তাকাও কেন ? নিজের বুদ্ধি, নিজের যুক্তি, নিজের রেশনালিটির উপর নির্ভর করতে পারো না ? কপিল-জীনের ঠ্যাকনা ছাড়া বুঝি দাঁড়ানো যায় না ? তুমি আছ, আমি আছি—ব্যস্। আমরা বের করে নেব ন্যায় আচরণ কি ? আর রাগ কোরো না, আমি আমারটা বহুপূর্বেই একাই বের করে নিয়েছি।'

ডন্ কুইকসটের সঙ্গে বনবিহারীর মাত্র একটা বিষয়ে পার্থক্য। বিস্তর মধ্যযুগীয় রোমান্টিক কাহিনী পড়ে পড়ে ডনের মাথা গরম হয়ে যায়। তিনি ভাবলেন তিনি সে যুগের শিভালরাস্ নাইটদের একজন।[৫] ব্যস্, আর যাবে

৪ জাহান্নম এসেছে হীব্রু গেহানেস থেকে ;

বলা উচিত দুটো শব্দই কগ্‌নেট। এই গেহানেস প্যালেস্টাইনের ভ্যালি অব্ ডেথ্—ভৌগোলিক উপত্যকা।

৫ এ যুগের ভাইসচ্যান্সেলর হাস্‌সান সুহ্রাওয়ার্দী যখন লাটসাহেবকে বীণা-কল্যাণীর হাত থেকে বাঁচান তখন তাঁকে রাতারাতি (অর্থাৎ এক night নাইটে-ই) নাইট (knight) করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র (?) শহীদ সুহ্রাওয়ার্দী একটি অতুলনীয় কবিতায় বলেন, 'মধ্যযুগে ড্র্যাগনের (রাক্ষস) হাত থেকে কুমারী উদ্ধার করে বীরপুরুষ নাইট হতেন. এ যুগে কুমারীর হাত থেকে ড্র্যাগনকে রক্ষা করে মানুষ নাইট হয়।'

কোথায়। দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে একাকী, সম্পূর্ণ একা তিনি খোলা তলওয়ার হাতে আক্রমণ করলেন জলযন্ত্রকে (উইণ্ড মিলকে)।

তারও বহু পরে যিনি এ-যুগের সর্বশেষ নাইট বলে নিজেকে প্রচার করেন তিনি ফীল্ড মার্শাল হেরমান্ গ্যেরিঙ—ন্যুর্নবের্গ মোকদ্দমায়। তাঁর কৃতিত্ব: জর্মনিতে তিনিই সর্বপ্রথম কন্‌সানট্রেশন ক্যাম্প স্থাপনা করেন (অবশ্য তার বহু পূর্বে ইংরেজ করেছিল বোয়ার-যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায়) এবং আইষমানের ইহুদি-হননে তাঁর সম্মতি ছিল। নিহত ইহুদিদের ভিতর লক্ষাধিক কুমারী কন্যাও ছিল।

বনবিহারী কপিল-জীন-চার্বাক পড়ে পড়ে ডনের মত মাথা গরম করেন নি। ধীরস্থির মনে চিন্তা করে, মীমাংসায় পৌঁছে তিনি আক্রমণ করলেন বঙ্গদেশের জগদ্দল জাড্যকে। এখনো তাঁর মাথা কতখানি ঠাণ্ডা সেটা বোঝা যায় এর থেকে যে, তখনো তাঁর ঠোঁটে হাস্য-ব্যঙ্গ-রস—তাঁর নব-প্রকাশিত নাস্তিক্য প্রচারকামী পত্রিকা 'বেপরোয়া'র (বাঙলা দেশে এ ধরনের কাগজ বোধ হয় এই প্রথম আর এই শেষ) প্রথম সংখ্যায় প্রথম 'war song'-এ তিনি বললেন,

'টলবো না কো অনুস্বার আর বিসর্গের
ঐ ছর্‌রাতে
কিংবা দেখে টিকির খাড়া সঙ্গীন!'

সে পত্রিকায় কি না থাকতো? ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে সাহিত্য, চিত্র—এস্তেক পদিপিসির মাদুলি, হাঁচি-টিকটিকি। এর পূর্বে তিনি 'ভারতবর্ষে' ব্যঙ্গচিত্রসহ বঙ্গজীবনবৈচিত্র্য তাবলো পদ্ধতিতে প্রকাশ করেছেন: তার একটি ছিল কেরানী—লোলচর্ম অস্থিসার জীর্ণবেশ রুক্ষ-কেশ কেরানীর ছবির নিচে ছিল,

'চাকরি গেল, চাকরি গেল, চাকরি রাখা
বিষম দায়
ঐ গো, বুঝি ন'টা বাজে, ঐ গো বুঝি
চাকরি যায়!
বিজলি-বাতির ফানুস হেন ঠুন্‌কো
মোদের চাকরি ভাই!
ফট করে সে ফাটে, কিন্তু ফাটার শব্দে
চমকে যাই।'

সর্বশেষে কেরানী যেন বৈদ্যগুরু, কবিরাজ, ডাক্তার, মহামান্য শ্রীযুত

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কেই ব্যঙ্গ করে বলছে (উইথ এ টুইস্টেড আইরিশ স্মাইল)—

'ভরা পেটে ছুটতে মানা ? চিবিয়ে খাওয়া স্বাস্থ্যকর ?
চাকরি আগে বাঁচাই দাদা, প্রাণ বাঁচানো সে তারপর ।'

রবীন্দ্রসৃষ্টির সঙ্গে আমি ঈষৎ পরিচিত। রবীন্দ্ররসিকদের রচনা আমি পড়েছি। অধুনা 'রবীন্দ্রায়ণ'ও (অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সংকলন, তদুপরি অতুলনীয় সম্পাদন) অধ্যয়ন করেছি। তারপরও বলবো, মুক্তকণ্ঠে বলবো, বনবিহারীর মত রবীন্দ্রসৃষ্টির চৌকশ সমঝদার আমি দ্বিতীয়টি দেখি নি। তাই আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে সব বিরুদ্ধ সমালোচনা বেরিয়েছে, তার মধ্যে বনবিহারীর সমালোচনাই সর্বোৎকৃষ্ট। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের অন্য সমালোচকদের প্রতি তিনি ছিলেন হাড়ে হাড়ে চটা। বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলতেন, 'রসসৃষ্টির পথে যত সব অবান্তর বস্তু নিয়ে বর্বরস্য শক্তিক্ষয়! রবীন্দ্রনাথ নাকি নগ্ন যৌনের অশ্লীল ছবি আঁকেন—তা তিনি আঁকেন নি। আর যদি আঁকেনই বা, তাতেই বা কি ? এ সব তো সম্পূর্ণ অবান্তর—রসসৃষ্টি হলেই হল! রবীন্দ্রনাথের রূপক নাকি অস্পষ্ট! তা হলে চশমা নাও—ওঁকে দোষ দিচ্ছো কেন ?'

তার পর বুঝিয়ে বলতেন, 'দে আর অল বার্কিং আপ দি রং ট্রী'—অর্থাৎ বেরালটা উঠেছে একটা গাছে, আর কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছে অন্য গাছের গোড়ায়।

সত্যেন দত্তকে আজকের দিনে লোক আর স্মরণে আনেন না; অথচ তিনি যখন সবে আসরে নেমেছেন, সেই সময় থেকেই বনবিহারী তাঁর প্রশংসা গেয়েছেন। সেই সত্যেন দত্তই যখন এই শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে মাঝে মাঝে অনুপ্রাস ও ছন্দের ম্যাজিকের (জাগ্‌লারি) 'কেরদানি' দেখাতেন, তখন বনবিহারী অতিষ্ঠ হয়ে 'বেপরোয়া'তে অপ্রিয় সমালোচনা করেন। আমরা তখন তাঁকে বলি, 'এগুলো নিছক এক্‌স্‌পেরিমেন্ট জাতীয় জিনিস; আপনি অত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন ?' আরেক টিপ নস্য নিয়ে—এইটাই ছিল তাঁর একমাত্র বদঅভ্যাস, আর ঐ করে করে করেছিলেন তাঁর কণ্ঠস্বরের সর্বনাশ—বললেন, 'তা হলে ছাপানো কেন ? যে প্রচেষ্টা রসের পর্যায়ে ওঠে নি সেটা প্রকাশ করে বিড়ম্বিত হওয়ার কি প্রয়োজন ?'

দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র, রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথও বলতেন,

শতং বদ

মা লিখো

শতং লিখো
মা ছাপো।

* * *

আরো বহু স্মৃতি বার বার মনে উদয় হচ্ছে। একদা দুরারোগ্য রোগের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথ তিনি আমাকে দেখিয়ে দেন। রিটায়ার করার বহু পরে তিনি একবার কলকাতায় এসে কি করে খবর পান আমি অসুস্থ। বিশ বছর ধরে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ নেই। তিনি খবর পাঠালেন। সব শুনে বললেন, 'এ রোগ সারে না—তবু তুমি পরেশ চক্রবর্তীর কাছে যাও। আমি বহু ছেলে পড়িয়েছি—সব ব্ল্যাঙ্কো। ঐ একটি ছেলের আক্কেলবুদ্ধি ছিল। বিলেত থেকে ও নিয়ে এসেছে এ টু জেড বিস্তর ডিগ্রী।' আমি তাঁর কাছে গেলে সে ডাক্তার বলেন, 'গুরু এই প্রথম আমাকে একটি রোগী পাঠালেন। কি বলেছেন উনি? এ রোগ সারে না? না, সারে।' তিনি আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিয়েছিলেন। এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করে করে নয়। প্রথম ওষুধ দিয়েই। কিন্তু সে আরেক কাহিনী। এবং সবচেয়ে সন্তাপের কথা, এই কৃতবিদ্য চিকিৎসক অল্প বয়সে গত হন।

* * *

৫ই জুলাই বনবিহারী পঞ্চভূতে লীন হন।

সাহিত্যিকশ্রেষ্ঠ 'বনফুল' তাঁর সম্বন্ধে 'দেশ' পত্রিকার ১৫ই শ্রাবণ সংখ্যায় অতি অল্প কয়েকটি কথা বলেছেন, কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে, এবং তার প্রত্যেকটি শব্দ যেন আমার বুকের উপর হাতুড়ি পিটছে। আমি এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে যা প্রকাশ করতে সক্ষম হই নি, তিনি অল্প কথাতেই সেটি মূর্তমান করেছেন।

"বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডারে তাঁর (বনবিহারীর) দান চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে। রাজনৈতিক সামাজিক কোনও অন্যায়ের সঙ্গে কখনও তিনি রফা করেন নি। অনবদ্য তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে সে-সবের বিরুদ্ধে সাহিত্যিক প্রতিবাদ তিনি করে গেছেন। সেকালের ভারতবর্ষ, বঙ্গবাণী, শনিবারের চিঠি, বেপরোয়া প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠায় তাঁর কীর্তি এখনও মণি-মুক্তার মতো ঝলমল করছে। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন অনমনীয় দুর্বার প্রকৃতির লোক। কখনও কারো অন্যায় সহ্য করতে পারেন নি। সুতরাং কারও সঙ্গে তিনি মানিয়ে চলতে পারেন নি, কারো সঙ্গে তাঁর বনে নি। এজন্যে শেষ জীবনে প্রায় একা একা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হয়েছে তাঁকে। অতিশয় বিচক্ষণ

চিকিৎসক ছিলেন। সিভিল সার্জন হয়ে বগুড়া থেকে রিটায়ার করেন।··· পৃথিবীতে নিখুঁত মানুষ নেই, নিখুঁত মানুষের সন্ধানেই তাঁর সারা জীবন কেটেছে। কিন্তু কোথাও সে মানুষ পান নি। নিঃসঙ্গ জীবনই কাটাতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর একটি ভাই তাঁকে ছাড়েন নি। বঙ্কুবিহারীই শেষ পর্যন্ত ছিলেন তাঁর সঙ্গে। শেষে তিনি নিজের ঠিকানাও কাউকে জানাতেন না। গত ৫ই জুলাই তিনি মারা গেছেন।"

বনফুলই তো চেনে বনবিহারীকে। আর এই 'বনবিহারী' নাম সার্থক দিয়েছিলেন তাঁর গুরুজন! জনসমাজে বাস করেও তিনি যেন সারাজীবন 'বনেই' 'বিহার' করলেন।

আমার আর মাত্র দুটি কথা বলার আছে।

বনবিহারী যে হিন্দু-সমাজ ও বাঙালীর কঠোর সমালোচনা করে গিয়েছেন তার কারণ এই নয় যে, তিনি এই দুটিকেই পৃথিবীর নিকৃষ্টতম বলে মনে করতেন। তিনি নিজকে প্রফেট বা রিফর্মার বলে মনে করতেন না। কাজেই বিশ্বভুবনের তাবৎ জাড্য দূর করার ভার আপন স্কন্ধে তিনি তুলে নেন নি। এমন কি তাঁর হাতের আলোটিও তিনি উঁচু করে তুলে ধরেন নি। সে-আলো তাই পড়েছিল মাত্র তাঁর আশপাশের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্যের উপর। তারই মলিনতাটুকু তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন মাত্র। তবুও আমার মনে হয়েছে, তিনি রবীন্দ্রনাথের 'জ্যাঠামশাই' ও রলাঁর 'জ্যঁা ক্রিস্তফ্'-এর সমন্বয়—কোনো কোনো ক্ষেত্রে। 'জ্যঁা ক্রিস্তফ্' বনবিহারীর অন্যতম প্রিয় পুস্তক (ডাক্তার হয়েও—সিরিয়াস ডাক্তাররা সাহিত্যচর্চার সময় পান কম—তিনি সম্পূর্ণ নিজের সাধনায় বিশ্বসাহিত্যের কতখানি আয়ত্ত করেছিলেন সেটা বোঝাবার চেষ্টা করবো না)।

আজ তিনি জীবিত নেই, তাই বলবার সাহস পাচ্ছি, তিনি বাঙালীকে ভালোবাসতেন। তাঁর জীবিতাবস্থায় একথা বললে তিনি বোধ হয় আর আমার মুখ দর্শন করতেন না। বাঙালী বলতে তিনি হিন্দু—বিশেষ করে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু—মুসলমান, ইলিয়ট রোড অঞ্চলের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, সকলকেই বুঝতেন।

এইবারে আমার শেষ বক্তব্যটি নিবেদন করি। এ কথাটি তাঁর জীবিতাবস্থায় বললে তিনি সুনিশ্চিত রামদা নিয়ে আমার পশ্চাদ্দেশে ধাবমান হতেন।

ইংরিজিতে বলে—"মিল্ক অব্ হিউমেন কাইণ্ডনেস্।"

অনিচ্ছায় বলছি, কিন্তু এস্থলে বলার প্রয়োজন, আমি বিস্তর দেশ-বিদেশ

দেখেছি। বহু সমাজসেবী, হাসপাতাল চালক মিশনারি, রেডক্রসের একনিষ্ঠ সেবক কর্মী সর্বত্যাগী মহাজন, স্তালিনগ্রাদের বিভীষিকাময় রক্তাক্ত রণাঙ্গন-প্রত্যাগত সার্জনকে আমি চিনি। বনবিহারীর হৃদয়ের অতিশয় গোপন কোণে যে ভুবন-জোড়া স্নেহমমতার ভাণ্ডার ছিল—সে রকম তো আর কোথাও দেখলুম না। সেই স্নেহমমতাই তাঁর আপন সুখশান্তি হরণ করেছিল। সেই বেদনাবোধই তাঁকে উত্তেজিত করতো খড়্গ ধারণ করে অন্যায়, অসত্য, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে।

এই স্নেহমমতা তিনি এমনই সঙ্গোপনে রেখেছিলেন যে, অধিকাংশ লোকই তাঁর কঠোর ভাষা, তীব্র কণ্ঠ, নির্মম ব্যঙ্গ শুনে বিভ্রান্ত হয়েছে। বনবিহারীর সেজন্য কণামাত্র ক্ষোভ ছিল না। তাঁর সহানুভূতি তিনি রাখতেন আরো গোপন করে।

আমরা বোধ হয় অত্যন্ত সহিষ্ণু। কিংবা যথেষ্ট ইতিহাস পড়ি নি। নইলে সোক্রাতেস খৃস্টের জন্য একদা যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল বনবিহারীর জন্য সেটা করা হল না কেন ?

কিন্তু এই অনুভূতিগত অভিজ্ঞতা গদ্যে প্রকাশ করা যায় না।

বনবিহারীর প্রয়াণ উপলক্ষ্যে 'বনফুল' যে সনেটটি লিখেছেন সেটি উদ্ধৃত করি :—

'বনবিহারী মুখোপাধ্যায়'

পাষাণে আঘাত হানি, অসি তীক্ষ্ণধার
চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'ল ? কঙ্কর কণ্টক
জয়ী হ'ল বিক্ষত করিয়া বার বার
বলিষ্ঠ পথিক-পদ ? ধূর্ত ও বঞ্চক
সাধুরে লাঞ্ছিত করি' বিজয়-কেতন
আস্ফালন করিল আকাশে ? অন্ধকার
গ্রাসিল কি রবি ? না—না—নতি-নিবেদন
করি' পদে উচ্চকণ্ঠে কহি বারংবার
নহে ব্যর্থ, পরাজিত, হে বহ্নি-কমল
তমোহন্ত্রী, হে প্রদীপ্ত মশাল-বর্তিকা,
অগ্নি তব অনির্বাণ, চির-সমুজ্জ্বল,
অনবদ্য অপরূপ ঊর্ধ্বমুখী শিখা।

মহাপ্রস্থানের পথে বিগত অর্জুন
অস্ত্রাগারে রেখে গেছে শরপূর্ণ তূণ।

অদৃষ্টের রঙ্গরস

আওরেঙ্গজেব মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাবৎ ভারতবর্ষে লেগে গেল ধুন্ধুমার। বাদশাহ হবেন কে ?

এস্থলে স্মরণ করিয়ে দি যে, আর্য এবং একাধিক আর্যেতর জাতির মধ্যে প্রথা —রাজার মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনা বাধায় সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তুর্কমানিস্তানের মোগলদের ভিতর এরকম কোনো ঐতিহ্য ছিল না। তাদের ছিল 'জোর যার মুল্লুক তার'। আরবদের ভিতর গোড়ার দিকে এই একই প্রবাদ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট (খলীফা) নিযুক্ত হতেন, তবে 'জোরের' বদলে সেখানে ছিল চরিত্রের, শৌর্যবীর্যের, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব। তাই বলা হ'ত, 'সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হবেন খলীফা,—হন-না তিনি হাবশী (নিগ্রো)।' এবং সেটাও ঠিক করা হ'ত গণভোট দিয়ে।

তাই মোগল রাজা মারা যাওয়া মাত্রই, কিংবা তিনি অথর্ব অসমর্থ হয়ে পড়লেই লেগে যেত রাজপুত্রদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ। কোনো কোনো সময় রাজার নাতিরাও এবং অন্য বাজে লোকও এই লড়াইয়ের লটারিতে নেবে যেতেন। অবশ্য রাজরক্ত না থাকলে তাঁর সম্রাট হবার সম্ভাবনা থাকতো না। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, ফররুখসিয়ারের রাজত্বের শেষের দিক থেকে মুহম্মদ শাহ বাদশা রঙীলার সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত সিন্ধু দেশের সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় দিল্লীতে সিংহাসনের সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। রাজার পর রাজাকে তাঁদের হাতে পুতুলের মত নাচতে হয়েছে। কিন্তু খ্যাতি, শক্তি, অর্থবলের মধ্যাহ্নগগনে থাকাকালীনও তাঁদের কারো তখ্‌ৎ-ই-তাউসে বসবার দুঃসাহস হয় নি। সৈয়দ পয়গম্বরের বংশধর,—তিনি সম্মান পাবেন মসজিদে, মক্তবে, মাদ্রাসায়— রাজসভায় কবিরূপে, ঐতিহাসিকরূপে—সমাজে গুরুরূপে, কিন্তু মোগল রাজবংশের রক্ত তাঁদের ধমনীতে ছিল না বলে দিল্লীর হিন্দু-মুসলমান তাঁদের বাদশাহ-সালামৎরূপে কিছুতেই এঁদের স্বীকার করতো না। ঠিক ঐ একই কারণে মারাঠা ও ইংরেজ দিল্লীর সিংহাসনে বসতে চায় নি। সিপাহ বিদ্রোহ চূর্ণবিচূর্ণ না করা পর্যন্ত ইংরেজ স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের অধীশ্বরী বলে ঘোষণা করবার সাহস পায় নি। এবং সেটাও করেছিল অতিশয় সভয়ে।

রাজা বা সার্বভৌম আমীরের মৃত্যুর পর যুবরাজদের ভিতর ভ্রাতৃযুদ্ধের মারফতে কে সবচেয়ে শক্তিশালী সেটা বের করা তুর্কমানিস্তানের ছোট ছোট প্রদেশে প্রবল বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে না। কিন্তু ভারতের (এবং অনেক সময় কাবুল কান্দাহার গজনীর উপরও দিল্লীর আধিপত্য থাকতো) মত বিরাট দেশে এ প্রকারের যুদ্ধ বিকট অরাজকতা ও দীর্ঘকালব্যাপী অশান্তির সৃষ্টি করতো। লোকক্ষয়, অর্থক্ষয় তো হ'তই,—অনেক সময় একই ভূখণ্ডের উপর ক্রমাগত অভিযান ও পাল্টা অভিযান হওয়ার ফলে সেখানে চাষবাস হ'ত না, ফলে পরের বৎসর দুর্ভিক্ষ হ'ত। সাধারণজনের বাড়িঘরদোর তো নষ্ট হ'তই, কলাসৃষ্টির উত্তম উত্তম নিদর্শনও লোপ পেত। এইসব যুদ্ধবিগ্রহের ফলেই ইওরোপের তুলনায় এদেশে বেঁচে আছে অতি অল্প রাজপ্রাসাদ। কোনো কোনো স্থলে পলায়মান সৈন্য পথপ্রান্তের প্রতিটি ইঁদারাতে বিষ ফেলে যেত। ফলে বৎসরের পর বৎসর ধরে পার্শ্ববর্তী জনপদবাসীর একমাত্র জলের সন্ধান অব্যবহার্য হয়ে থাকতো।

এই দলাদলি মারামারি থেকে, কি দিল্লী-আগ্রার মত বৃহৎ নগর, কি সুদূর সুবের (প্রভিন্‌স্) ছোট শহর, আমীর-ওমরাহ, সিপাহসালার, ফৌজদার প্রায় কেউ নিষ্কৃতি পেতেন না। কারণ এঁদের প্রায় প্রত্যেকেই আহ্বান, আদেশ, অনুনয়-ভরা চিঠি পেতেন প্রত্যেক যুযুধান রাজপুত্রের কাছ থেকে—'আমাকে অর্থবল সৈন্যবল সহ এসে সাহায্য করো।' তখন প্রত্যেক আমীরের সামনে জীবনমরণ সমস্যা দাঁড়াতো—আখেরে জিতবে কোন্ ঘোড়াটা, ব্যাক্ করি কোন্‌টাকে ? অতিশয় বিচক্ষণ কূটনৈতিকরাও রং হর্স ব্যাক্ করে আপন, এবং কোনো কোনো স্থলে সপরিবার, প্রাণ দিয়ে ভুলের খেসারতী দিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ থাকবার উপায় ছিল না। মোগল রাজপুত্র মাত্রই ইংরিজি প্রবাদটাতে বিশ্বাস করতেন, 'ওয়ান হু ইজ নট্ উইদ্ মী ইজ্ এগেন্‌স্ট্ মি', যে আমার সঙ্গে নয়, সে আমার বিপক্ষে।

নির্ঝঞ্ঝাটে প্রতিষ্ঠিত বাদশাদের তো কথাই নেই, অতিশয় টলটলায়মান সিংহাসনে বসে দু'দিনের রাজাও সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন সেপাই-শাস্ত্রী, ফাঁসুড়ের দল—তাঁর নিকটতম আত্মীয়দের উভয় চক্ষু অন্ধ করে দেবার জন্য—যেন তারা চিরতরে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সিংহাসন লাভের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা না করতে পারে। শান্তিকামী, ধর্মাচরণে আজীবন নিযুক্ত, সিংহাসন আরোহণে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক জনেরও নিষ্কৃতি ছিল না। নিষ্কৃতি ছিল একমাত্র পন্থায়—আত্মীয়-স্বজন দশ-দেশ ত্যাগ করে মক্কায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়া। তবে সেটাও

করতে হ'ত আগেভাগে পরিপূর্ণ শান্তির সময়। একবার ধুন্ধুমার লেগে যাওয়া মাত্রই তামাম দেশে এসে যেত এমনই অশান্তি, লুটতরাজ যে তখন আর বন্দরে গিয়ে জাহাজ ধরার উপায় থাকতো না। এমন কি পরিপূর্ণ শান্তির সময়ও আগেভাগে শেষ রক্ষা বাবদে কসম্ খাওয়া যেত না—মক্কাতে নির্বাসিত বাইরাম খান নাকি পথমধ্যে গুজরাতে আকবরের গুপ্তচর দ্বারা নিহত হন।

ইংরেজ ফার্সীতে লিখিত ইতিহাসরাজির সব কটাকেই গণ্ডায় আণ্ডা মিলিয়ে নিন্দাবাদ করে বলেছে, এ-সবেতে আছে শুধু লড়াই আর লড়াই। বিবেচনা করি, ওগুলোতে যদি গণ্ডায় গণ্ডায় শান্তিকামী পীর-দরবেশ ঘুরে বেড়াতেন, কিংবা তার চেয়েও ভালো হ'ত যদি রাজা-প্রজায় সবাই মিলে চাঁদনি চৌকে হাল্লেলুইয়া হর্ষরব তুলে ইংরেজের আগমনী গান ধরতেন, তাহলে বোধ হয় শ্বেত সমালোচকরা সন্তুষ্ট হতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মোগলরা যে-ঐতিহ্য সঙ্গে এনেছিল সেটা তার বিকৃততমরূপে দেখা দিল তাদের পতনের সময়। ফলে স্বার্থে স্বার্থে যে সংঘাত উপস্থিত হল তার সমাধান যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনো পন্থায় সম্ভব ছিল না। ঐতিহাসিকরা সেসব যুদ্ধের বর্ণনা না দিয়ে দি নেশন অব্ শপ্‌লিফটারসের জন্য সেই সৎকর্মের টেকনীক্ বয়ান করলে সত্যের অপলাপ হ'ত।

কিন্তু এসব ইতিহাস শুধু যুদ্ধে যুদ্ধে ভর্তি ছিল একথা বললে আরেকটা খুব বড় সত্য গোপন করা হয়। এদের প্রচুর সাহিত্যিক মূল্যও যে ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তার পূর্বেই একটি সত্য স্বীকার করে নিই। বিদেশাগত কিছু লোক ভিন্ন এদেশের কারোরই মাতৃভাষা ফার্সী ছিল না। এবং মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষাতে শত ভেল্কিবাজি দেখাতে পারলেও সেখানে সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ তত্ত্বও অনস্বীকার্য যে, সাহিত্য যে উপাদানে নির্মিত হয় তার অভাব ভারতবর্ষে রচিত ফার্সী ইতিহাসে কখনো ঘটে নি। তুলনা দিয়ে বলা যায়, রামায়ণের কাহিনী যত কাঁচা ভাষাতেই রচা হোক না কেন তার চিত্তাকর্ষণী শক্তি কিছু না কিছু থাকবেই।

তাই ফার্সী ভাষায় রচনাকারী ঐতিহাসিকরা হামেশাই কোনো বাদশার রাজত্বকালের তাবৎ লড়াই, বাদশার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভের জন্য আমীরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কূটনৈতিক চতুরঙ্গ ক্রীড়ার মারপ্যাচ ইত্যাদি বর্ণনা করার পর পঞ্চমুখ হতেন বাদশার বিবাহের সালঙ্কার বর্ণনা দিতে; সেই উপলক্ষে সম্মিলিত কবিকুলের বর্ণনা দিতে, এবং সর্বশেষে বাদশার ব্যক্তিগত গুণাগুণের উল্লেখ করতে। সব সময় যে তাঁরা নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে সমর্থ হতেন তা নয়, কিন্তু

বাদশা সজ্জন হলে তাঁর গুণ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হতে কোনো অসুবিধাই উপস্থিত হ'ত না।

যেমন গুজরাতের এক বাদশা ছিলেন অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ, পুণ্যশীল। তাঁর জীবিতাবস্থায়ই গুণমুগ্ধ প্রজাসাধারণ তাঁর নাম দেন 'অল্-হালীম্'—'পুণ্যশীল'। মিরাৎ-ই-সিকন্দরী গুজরাতের প্রখ্যাত ইতিহাস। তার লেখক অল্-হালীমের সময়কালীন যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা দেবার পর পরমানন্দে হুজুর বাদশার সর্বপ্রকারের পুণ্যশীল খামখেয়ালির বর্ণন-পর্বে প্রবেশ করেছেন। কে বলবে তখন আমাদের এই ঐতিহাসিক শুধু যুদ্ধবিগ্রহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েই উল্লাস বোধ করেন। বস্তুত এই অনুচ্ছেদে প্রবেশ করার পর মনে হয় তাঁর যেন আর কোনো তাড়া নেই, মাথুরে পৌঁছনের পর কীর্তনিয়ার যে অবস্থা হয়। এ ইতিহাস তাঁকে যে একদিন শেষ করে 'তামাম্ শুদ্' লিখতে হবে সে ভাবনা তাঁর চৈতন্য থেকে যেন সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে।

হুজুর অল্-হালীম্‌কে এক বিদেশাগত পাচক এক নূতন ধরনের পোলাও খাওয়ালে পর হুজুর পরম পরিতৃপ্তি প্রকাশ করে বললেন, 'উজীর। আমার প্রজারা কি কখনো-সখনো এরকমের পোলাও খায়?' উজীর স্মিতহাস্য করে বললেন, 'হুজুর, তা কখনো হয়!' হুজুর বললেন, 'একা একা খেয়ে আমি কেমন যেন সুখ পাচ্ছি নে।' হুকুম দিলেন, মহল্লা মহল্লায় বিরাট বিরাট পাত্রে করে যেন হুবহু ঐ রকমের পোলাও তৈরী করে তাবৎ আহমদাবাদবাসীদের খাওয়ানো হয়। আমাদের ঐতিহাসিকটি যেন ঈষৎ আমোদ উপভোগ করে ইঙ্গিত করেছেন, প্রধানমন্ত্রী হুজুরের এসব 'খামখেয়ালীর অপব্যয়' দেখে ভারী বিরক্ত হতেন।

তা সে যা-ই হোক তাবৎ আহমদাবাদবাসী সেদিন কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে দিনভর ফিস্টি খেলে। যে সাবরমতীর পারে বসে বহু যুগ পরে রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষুধিত পাষাণ' রচেছিলেন সেই সাবরমতীর পারে সেদিন আর কেউ ক্ষুধিত রইল না।

ঠিক ঐ রকমই দিল্লীর শেষ মোগলদের কোন্ এক বাদশার বিয়ের শোভাযাত্রায় উঁচু হাতীর পিঠ থেকে রূপো দিয়ে বানানো ফুল রাস্তার দু' পাশের দর্শকদের উপর মুঠো মুঠো ছড়ানো হয়। ঐতিহাসিক খাফী খান—কিংবা খুশ্-হাল্-চন্দ বা অন্য কেউ হতে পারেন, আমার মনে নেই—যখন তাঁর ইতিহাস লিখছেন তখন দিল্লীর বড় দুঃখের দিন। সেই জাঁকজমক শান্-শওকতের স্মরণে যেন উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছেন, 'এ অধমও সেই দর্শকদের মধ্যে ছিল। সেও তার কুর্তার দামন্ (অগ্রভাগ, অঞ্চল) দু' হাত দিয়ে প্রসারিত করে

উদ্গ্রীব আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষা করলো। এ অধমের কী সৌভাগ্য, কী খুশ-কিস্মৎ! আম্মো তিনটে ছোট ছোট ফুল পেয়ে গেলুম। জয় হোক দিল্লীশ্বরের! জগদীশ্বর তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন!'

এ যুগের ইতিহাস বিষাদময়, কিন্তু ঘটনাবহুল বলে একাধিক ফার্সীজ্ঞ হিন্দুও তার সুদীর্ঘ বিবরণ লিখে গিয়েছেন। তার একটি ঘটনার বর্ণনা দেবার জন্য বক্ষ্যমাণ লেখেন। কিন্তু তৎপূর্বে এক লহমার তরে আহমদাবাদ ফিরে যাই।

মিরাৎ-ই-সিকন্দরী ইতিহাস বলে, অল্-হালীম্ আহমদাবাদের দুর্দান্ত শীতে লক্ষ্য করলেন, গৃহহীনদের দুরবস্থা। আদেশ দিলেন যে, প্রতি চৌরাস্তায় যেন সন্ধ্যার পর কাঠ পুড়িয়ে আগুন জ্বালানো হয়। বহু গৃহহীন এমন কি গৃহস্থও সেই আগুন ঘিরে বসে আগুন পোহাতে পোহাতে গাল-গল্প, গান-বাজনা করে রাত কাটাতো। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে অল্-হালীম্ বৃহৎ আবাস নির্মাণ করে দিলেন—ভিখিরি-গরীবের বসবাসের জন্য। ঐতিহাসিকরা বলতে পারবেন, এ ধরনের 'পুয়োর হোম' পৃথিবীর এই সর্বপ্রথম কি না।

শীতে যাতে তারা কষ্ট না পায় তার জন্য লেপের ব্যবস্থাও হল। মিরাৎ-ই সিকন্দরীর লেখক বলছেন, 'কিন্তু এসব লক্ষ্মীছাড়া ভ্যাগাবণ্ডদের কেউ কেউ আপন আপন লেপ বিক্রী করে দিয়ে মদ খেত। খবরটা কি করে জানি হুজুরের কানে গিয়ে পৌঁছল।' আমার মনে সন্দেহ হয়, হয়তো বা আমাদের সেই সিনিক প্রধানমন্ত্রী উজীর-ই-আজম্ সাহেবই মজা চেখে চেখে বাঁকা নয়নে তাকিয়ে হুজুরের অপব্যয়ের চরম পরিণামটি হুজুরেরই খেদমতে পেশ করেন!

তিনি নিজে করে থাকলে সেটা বুমেরাঙের মত তাঁরই কাছে ফিরে আসে। হুজুর বললেন, 'এটা কি করে ঠেকানো যায়, বলো তো উজীর।' উজীর অন্য-দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ভাবখানা করলেন, স্বাধীন সম্ভ্রান্ত আসমুদ্র রাজস্থানব্যাপী গুর্জরভূমির মহামান্য সম্রাটের অতিমান্য প্রধানমন্ত্রী 'নেপকঁ্যাতা' নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন না! হুজুর কিন্তু উজীরের অতশত সুক্ষ্মানুভূতির পশ্চাদ্ধাবন করেন না। বললেন, 'রাতটা ভেবে দেখো।' উজীর-ই-আলা যে ভাবে কুর্নিশ করে বিদায় নিলেন তাতে মনে হল না যে, তিনি ত্রিযামা-যামিনী অনিদ্রায় যাপন করবেন।

পরদিন ফজরের নমাজের পরই, অর্থাৎ ব্রাহ্ম-মুহূর্তেই প্রধানমন্ত্রীর তলব পড়লো। হুজুর সহাস্য আস্যে তাঁকে বললেন, 'বুঝলে হে উজীর সাহেব, আমিই কাল রাত্রে চিন্তা করে দাওয়াইটা বের করেছি। প্রত্যেককে আলাদা লেপ না দিয়ে চার-চারজনকে এক-একটা করে বড় লেপ দাও। চারজনই তো আর

মদের গোলাম হবে না যে এক জোট হয়ে লেপ বিক্রী করে দেবে। যারা খায় না তারা ঠেকাবে।'

এ ধরনের চুটকিতে মিরাৎ-ই-সিকন্দরী ভর্তি। তাছাড়া দীর্ঘতর কাহিনীও এ কেতাবে আছে। এমন কি বিশাল বিরাট বীরপুরুষ মুহম্মদ বেগড়ার (এর গোঁপ নাকি এতই দীর্ঘ ছিল যে তিনি তার দুই প্রান্ত মাথা ঘুরিয়ে পিছনে এনে ঘাড়ের উপরে গিঠ বেঁধে রাখতেন!) যৌন জীবনও তিনি নির্বিকারচিত্তে সালঙ্কার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রাদেশিক ইতিহাস বলে এ কেতাব তার ন্যায্য মূল্য পায় নি।

শেষ মোগলদের ইতিহাসে একটি অতিশয় হতভাগ্যের জীবন ও একটি ঈষৎ হাস্যরস-মিশ্রিত ঘটনা—এই দুটি আমার মনে আসে। পুজোর বাজারে অন্য পত্রিকায় একটা করুণ রস লিখে আমার রেশন খতম। দ্বিতীয়টাই শুনুন।

পূর্বেই নিবেদন করেছি মোগলসম্রাট মাত্রেরই মৃত্যু হলে রাজপুত্রদের ভিতর লাগত যুদ্ধ। আওরেঙ্গজেবের মৃত্যুর পরও তার ব্যতিক্রম হল না। লড়াই জিতে বাদশাহ হলেন শাহ আলম বাহাদুর শাহ। পাঁচ বৎসর রাজত্বের পর তাঁর মৃত্যু হলে পুত্র জাহান্দার শাহ তখ্‌তে বসলেন। মোগল বংশের উপর আর কেউ এঁর মত কলঙ্ক-কালিমা লেপন করেন নি। একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। একটি বাইজী—লাল্‌কুনওর্‌কে তিনি দিয়েছিলেন বেগমের সম্মান ও তাঁকে নিয়ে বেরোতেন দিল্লীর প্রকাশ্য রাস্তায় মদ্যপান করতে।[১] তখনকার দিনে আজকের পানওলার দোকানের মত মদের দোকান থাকতো—অর্থাৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোঁ করে এক পাত্র মদ্যপান করে ফের অন্য দোকানে আরেক পাত্র—করে করে বাড়ি পৌঁছনো যেত। কিংবা রাস্তায় গড়াগড়ি দেওয়া যেত। হুজুর বাদশাহ সালামৎ সেই বাইজী লাল্‌কুনওরের পাশে দাঁড়িয়ে এইসব অতি সাধারণ শ্রেণীর দোকান

---

১ এ যুগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে হিটলারের প্রধান সেনাপতি ব্লমবের্ক বৃদ্ধ বয়সে ভালো করে অনুসন্ধান না করে তাঁর স্টেনোকে বিয়ে করে ফেলেন। অথচ ইনি একদা একাধিক শহরে দেমি-মঁদেন ছিলেন। বিয়ের রাত্রে পৃথিবীর ঐ সর্বপ্রাচীন ব্যবসায়ের মেয়েরা তাদের পাড়ায় পাড়ায় বিয়েটা সেলেব্রেট করে—যেন তারা সমাজে কল্কে পেয়ে গেল—এবং শুধু তাই না, যে-সব পুলিস তাদের উপর চোটপাট করতো তাদের ফোন করে তাদের হেলথ্‌ ড্রিঙ্ক করে। পরে হিমলার দলীল-দস্তাবেজসহ হিটলারের কাছে কেলেঙ্কারিটা ফাঁস করলে পর তিনি ব্লমবের্ককে রিটায়ার করতে আদেশ দেন।

ও তাদের খদ্দেরের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে করতে পাত্রের পর পাত্র গলায় ঢালতেন এবং লাল্‌কুনওরের তো কথাই নেই। তিনি একদা যে হাফ-গেরস্থ অঞ্চলে (ফরাসীতে হুবহু একেই বলে 'দেমি-মঁদ', এদের স্ত্রীলোক বাসিন্দা 'দেমি-মঁদেন') তাঁর ব্যবসা চালাতেন, সেখানকার লোফাররা এসে সেখানে জুটতো। বাদশা সালামৎ দরাজ দিলে ঢালাই পাইকিরি হিসাবে মদ্য বিতরণ করতেন। তখনকার দিনে দিল্লীর বাদশারা বয়েলের গাড়ি চড়ে বেড়াতে ভালোবাসতেন। তার ড্রাইভারও সেই সর্বজনীন গণতান্ত্রিক পানোৎসবে অপাংক্তেয় হয়ে রইত না। রাস্তায় ভিড় জমে যেত। আমীর-ওমরাহ হঠাৎ এসে পড়লে পাল্কি ঘুরিয়ে নিতেন ; পদাতিক ভদ্রজন এই বেলেল্লাপনার মাঝখানে পড়ে বিব্রত না হওয়ার জন্য গুত্তা মেরে ডাইনে বাঁয়ের কোনো দোকানে আশ্রয় নিতেন।

মুসলমান শাস্ত্রে মদ্যপান নিষিদ্ধ। অবশ্য দেশবাসী জানতো যে রাজা বাদশারা এ আইনটি এড়িয়ে যান, কিন্তু তাঁরাও চক্ষুলজ্জার খাতিরে খোলাখুলি-ভাবে সচরাচর মদ্যপান করতেন না। এ যুগে রাজা ফারুক প্রায় জাহান্দার শা'র মত আচরণ করে কাইরোর জনসাধারণের আক্কেল গুড়ুম করে দেন। রোজার মাসে—আবার বলছি উপবাসের মাসে তিনি তাঁর নিত্যপরিবর্তিত দেমি-মঁদেন নিয়ে প্রশস্ত দিবালোকে এক 'বার' থেকে আরেক 'বারে' ঘুরে বেড়াতেন—মাতা এবং প্রাসাদের অন্যান্য মুরুব্বীদের সর্ব সদুপদেশ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে। এঁরই পরিত্যক্তা এক দেমি-মঁদেন প্রেয়সী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই 'মহাপুরুষটি' গুরুভোজন বা অত্যধিক পানের ফলে গতাসু হবেন। বহ্বান্ন ভক্ষণ করে রাজ্যচ্যুত অবস্থায় ইনি অধুনা রোম শহর থেকে সাধনোচিত ধামে গেছেন—ঝিনুকের ভিতরকার বস্তু মাত্রাধিক খাওয়ার ফলে।

তা যা-ই হোক্, জাহান্দার শাহ একদিন ইত্যাকার রোঁদ মারতে মারতে বেএক্তেয়ার হয়ে যান—না হওয়াটাই ছিল ব্যত্যয়—এবং আধামাতাল গাড়োয়ান হুজুর ও লাল্‌কুনওরকে কোনো গতিকে গাড়িতে তুলে পাশাপাশি শুইয়ে দিয়ে লালকেল্লা পানে গাড়ি চালায়। বয়েল দুটো সর্বশ্রেষ্ঠ জাতের। পথ চিনে সোজা কেল্লার ভিতরে প্রাসাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। লাল্‌কুনওর টলতে টলতে প্রাসাদে ঢুকলেন। বয়েল দুটো চললো—আপন মনে বয়েলখানার দিকে, কারণ গাড়োয়ান সম্পূর্ণ বেহুঁশ।

ঘণ্টাখানেক পরে পড়ল খোঁজ খোঁজ রব। বাদশা কোথায়, বাদশা কোথায় ? এ যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। খবরটা যদি রটে যায় তবে বাদশার যে-

কোনো ভাই, চাচা, ভাতিজা নিজেকে রাজা বলে অবশ্যই ঘোষণা করবেন এবং তাহলেই তো চিত্তির। বিরাট লালকেল্লা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল, কিন্তু হুজুর যেন মহাশূন্যে অন্তর্ধান করেছেন।

তখন এক সুবুদ্ধিমানের মাথায় অলৌকিক অনুপ্রেরণা এল। এক মাইল দূরের বয়েলখানাতে অনুসন্ধান করে দেখা গেল, হুজুর অঘোর নিদ্রায়, গাড়োয়ানও তদ্বৎ।

বলা বাহুল্য, পথচারী মদ্যপায়ী মহলে হুজুর অতিশয় জনপ্রিয় হলেও আমীর-ওমরাহ—মায় প্রধানমন্ত্রী, যদিও তিনি জানতেন; জাহান্দারশাহ তখ্‌ৎ-হীন হলে তাঁরও নবীন রাজার হাতে জীবন সংশয়—সকলেই তাঁর উপর বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন।

ওদিকে দুই প্রধান আমীর সিন্ধু দেশের সৈয়দ আব্দুল্লা ও সৈয়দ হুসেন আলী ব্যাক করছেন অন্য ঘোড়া—জাহান্দারশাহের ভ্রাতা আজীম্ উশ্-শান-এর পুত্র সুদর্শন, সুপুরুষ—বলা হয় তৈমুরের বংশে এরকম বলবান সুপুরুষ আর জন্মান নি—ফররুখ সিয়ারকে। তাঁরা দিল্লীর দিকে রওয়ানা হয়েছেন সিংহাসন অধিকার করতে। যুদ্ধে জাহান্দার পরাজিত হয়ে বন্দী হলেন। সিংহাসন হারিয়ে তিনি যত না শোক প্রকাশ করেছিলেন তার চেয়ে বেশী মর্মবেদনা প্রকাশ করলেন, বার বার বেদনাতুর, মিনতিভরা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে, 'আমার লাল্‌কুনওরকে আমার কাছে আসতে দাও, দয়া করে লাল্‌কুনওরকে আসতে দাও।' সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তখনই তাঁদের স্বরূপ দেখাতে আরম্ভ করেছেন—অর্থাৎ তাঁরা গ্ল্যাডস্টোনের মত কিংমেকারস্, তাঁরা রাজা ম্যানুফেকচার করেন—লাল্‌কুনওর অনুমতি পেলেন জাহান্দার-এর বন্দীজীবনের সাথী হওয়ার।

অধম শুধু পটভূমিটি নির্মাণ করছে; নইলে জাহান্দার শাহ বা ফররুখ সিয়ার কেউই আমার লক্ষ্য প্রাণী নন। তবু ফররুখ সিয়ার সম্বন্ধে যৎসামান্য বলতে হয়। ইনি বুদ্ধি ধরতেন কম, এবং যে কূটনীতিতে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেইটে প্রয়োগ করতে চাইতেন দুই ধুরন্ধর পক্বসিদ্ধ, অস্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে। তাঁদের একজন প্রধানমন্ত্রীর ও অন্যজন প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করে বাদশাহ সালামৎকে প্রায় উপেক্ষা করে রাজত্ব চালনা করতে লাগলেন। নানাপ্রকার মেহেরবানী বণ্টন করে দুই ভাই শক্তিশালী আমীর-ওমরাহ গোষ্ঠী নির্মাণ করলেন এবং প্রত্যক্ষত সন্দেহ রইল না যে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে যাই করুন না কেন, শাহী ফৌজ তাঁদের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করবে না। বেচারা বাদশাহ ক্রমেই ক্ষমতা হারাতে লাগলেন এবং শেষটায় চেষ্টা দিলেন, যেসব ভাগ্যান্বেষী অ্যাডভেনচারাররা ইরান তুরান থেকে দিল্লী আসত তাদের নিয়ে একটা দল সৃষ্টি করতে।

একদা এঁদের মধ্যে যাঁরা সত্যকার কৃতবিদ্য কিংবা রণবিশারদ তাঁরা দিল্লী দরবারে ও জনসাধারণের ভিতর সম্মান পেতেন। কিন্তু পাঁচশত বৎসর মোগল রাজত্ব চলার পর দিল্লীর খাসবাসিন্দা মুসলমান ও হিন্দুগণ একটা জোরদার 'স্বদেশী' পার্টি তৈরী করে ফেলেছিলেন। সৈয়দ ভাইরা ছিলেন এ দলের নেতা। (দুর্ভাগ্যক্রমে এ যুগের ঐতিহাসিকরা এই 'স্বদেশী' দলের মাহাত্ম্য পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন নি; আর ইংরেজ ঐতিহাসিক অবশ্যই চাইতো না যে এরই অনুকরণে নিত্য নবাগত ইংরেজ ভাগ্যান্বেষীদের বিরুদ্ধে ভারতে একটা 'স্বদেশী' পার্টি গড়ে উঠুক)।

নিরুপায় হয়ে ফররুখ সিয়ার তাঁর শ্বশুর যোধপুরের রাজা অজিত সিংকে দিল্লীতে আসবার জন্য সানির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে দূত পাঠালেন। কারণ তখন তিনি সত্যই বুঝে গিয়েছিলেন যে, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে আর বেশী দিন বরদাস্ত করবেন না। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে অন্য ক্রীড়নক তখ্‌ৎ-ই-তাউসে বসাবেন।

অজিত সিং দিল্লী পৌঁছনো মাত্রই সৈয়দরা তাকে সংবর্ধনা করতে অগ্রসর হলেন—বাদশা সালামৎ তখন কার্যত লালকেল্লায় বন্দী। তাঁরা ঐ 'স্বদেশী' বিদেশীর জিগিরটি উচ্চকণ্ঠে গাইলেন। অজিত সিংও বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, সৈয়দদের সঙ্গে মোকাবেলা করার মত শক্তি তাঁর নেই। ফররুখ সিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করা বাবদে তিনি সম্পূর্ণ সম্মতি স্পষ্ট ভাষায় দিয়েছিলেন কি না বলা কঠিন।

সৈয়দদ্বয় ফররুখ সিয়ারকে ধরে আনবার জন্য অন্দরে সৈন্য পাঠালেন। হারেমে রমণীরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে উঠলেন। তুর্কী রমণীদের সাহস যথেষ্ট, নূরজাহান জাহানারা অতি কৃতিত্বের সঙ্গে তাবৎ ভারত শাসন করেছেন, কিন্তু এঁদের ভিতর কেউ সে রকম ছিলেন না, কিংবা হয়তো দম্ভী ফররুখ সিয়ার এঁদের মন্ত্রণায় কর্ণপাত করেন নি। অবশ্য তাঁকে সবলে টেনে আনতে দূতদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। কারণ তাঁর শরীরে ছিল অসাধারণ বল।

সৈয়দদ্বয়ের সামনে তাঁকে আনা হলে তাঁদের একজন আপন কলম-দান খুলে, চোখে সুরমা (কাজল) লাগাবার শলাকা ঘাতকের হাতে দিলেন। ফররুখ সিয়ারকে সবলে চিৎ করে ফেলে অন্ধ করা হল। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, ঐ নিষ্ঠুর কর্ম যে করেছিল সে তাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধ করে নি—সে ভেবেছিল,

বলা তো যায় না, হয়তো একদিন তিনি আবার রাজা না হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী হবেন, তখন সে মৃত্যুদণ্ড তো এড়াবেই, হয়তো বা বখশিশও পেতে পারে। ফররুখ সিয়ারকে নহবৎখানায় বন্দী করে রাখা হল। লালকেল্লার আজকের দিনের প্রধান প্রবেশপথ ও দেওয়ান-ই-আম-এর মাঝখানে এটা পড়ে।

ওদিকে কিন্তু দিল্লীর অন্য এক মহল্লায় এক ভিন্ন কমেডি শুরু হয়েছে।

সৈয়দদ্বয় অনেক চিন্তা ততোধিক তর্কবিতর্ক আলোচনা করে স্থির করেছেন যে, ফররুখ সিয়ারের খুড়ো রফী-উশ্-শানের (ইনি আজীম্-উশ্-শানের পরের ভ্রাতা—আওরেঙ্গজেবের দৌহিত্র) জ্যেষ্ঠ পুত্র তরুণ মুহম্মদ ইব্রাহীমকে সিংহাসনে বসানো হবে। সেই মর্মে দূত পাঠানো হয়েছে রফী-উশ্-শানের হাভেলিতে। সেখানে ইব্রাহীম তাঁর ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সহ বাস করেন।

দূতের দল উপস্থিত হওয়া মাত্রই হাভেলিতে উচ্চৈঃস্বরে বামাকণ্ঠের ক্রন্দন রোদন চিৎকার অভিসম্পাত আরম্ভ হল।

কারণটা সরল। কয়েকদিন ধরেই দিল্লী শহর শত রকমের গুজবে ম-ম করছে। ফররুখ সিয়ার সিংহাসনচ্যুত হলে হতেও পারেন—যদিও অনেকেই প্রাণপণ আশা করছিলেন, অজিত সিং যাই করুন, আপন জামাতাকে সিংহাসনচ্যুতি থেকে রক্ষা করবেন নিশ্চয়ই, নইলে তাঁর নিধন অবধারিত ও দিল্লীবাসীদের কাছে যে ব্যক্তি পুত্রকে হত্যা করে তার চেয়েও ঘৃণ্য—যে তার মেয়েকে বিধবা হতে দেয়। •(কিছুদিন পর ফররুখ সিয়ার নিহত হওয়ার পর অজিত সিং রাস্তায় বেরোলেই তাঁর সশস্ত্র পাইক-বরকন্দাজকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রাস্তার ছোঁড়ারা তাঁর পাল্কীর দুই পাশে ছুটতে ছুটতে তারস্বরে ঐক্যতান ধরতো, 'দামাদকুশ, দামাদকুশ'—জামাতৃহন্তা, জামাতৃহন্তা! পুত্রকে হত্যা করে কেউ এভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে আমার স্মরণে আসছে না।)

ফররুখ সিয়ার সিংহাসন হারালে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের যে কার প্রতি 'নেক্-নজর' —অবশ্য যে-ই রাজা হোন তাঁকে হতে হবে ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে পুত্তলিকা মাত্র— পড়বে তার কিছু স্থিরতা ছিল না। দূতরা তাই যখন হাভেলির সামনে এসে সুসংবাদ দিলে, তারা এসেছে সমারোহ সহকারে নবীন রাজা মুহম্মদ ইব্রাহীমকে তাঁর অভিষেকের জন্য নিয়ে যেতে, তখন সবাই নিঃসন্দেহে ভাবলে এটা একটা আস্ত ধাপ্পা। আসলে আর কেউ বাদশা হয়ে দূত পাঠিয়েছেন ইব্রাহীমকে ছলে বলে পকড় করে নিয়ে গিয়ে হয় হত্যা করতে, নিদেন অন্ধ করে দিতে—যাতে করে পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বীরা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়; এ রেওয়াজ তো রাস্তার ভিখিরি পর্যন্ত জানে, জানবে না শুধু রাজবাড়ির হারেমের মহিলারা! তওবা! তওবা!!

বিরাট বাড়ি। বিস্তর কুটুরি, চিলেকোঠা। তদুপরি এসব কারবার তো দিল্লী শহরে হামে হাল লেগেই আছে। তাই দু-চারটে গুপ্তঘর, পালিয়ে যাবার সুড়ঙ্গও যে নেই, এ-কথাই বা বলবে কে? হারেম-মহিলারা তড়িঘড়ি ইব্রাহীম ও তার ছোট ভাই রফী উদ্-দৌলাকে কোথায় যে লুকিয়ে ফেললেন তার সন্ধান পেতে—আদৌ যদি পাওয়া যায়—লাগবে সময়। ওদিকে দূতদের পই পই করে বলা হয়েছে, তারা যাবে আর আসবে, ছররার মত দ্রুতবেগে, এবং পথমধ্যে যেন তিলার্ধকাল বিলম্ব না করে। কারণটি অতিশয় স্বপ্রকাশ। দিল্লী শহরের দুগ্ধ-পোষ্য শিশু পর্যন্ত জানে, একবার যদি খবর রটে যায় এবং সেটা কিছু মাত্র অসম্ভব নয়—যে ফররুখ সিয়ার সিংহাসনচ্যুত হয়ে গিয়েছেন এবং সে সিংহাসন তখনো শূন্য তা হলে আওরেঙ্গজেব-বংশের যে কোন রাজপুত্র দুঃসাহসে ভর করে নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করে দেবে। সৈয়দ-ভায়ারা বিলক্ষণ জানতেন যে, যদিও আমীর-ওমরাহ সোওয়ার-সেপাই তাঁদের পক্ষে, তবু এ তত্ত্বটি ভুললে বিলকুল চলবে না যে, ফররুখ সিয়ার ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় সম্রাট। তারপর আরেকটা কথা। আওরেঙ্গজেবের এক বংশধর যদি অন্য বংশধরকে খেদিয়ে দিয়ে সিংহাসন দখল করেন, তবে জনসাধারণ হয়তো কোনো পক্ষই নেবে না। কিন্তু সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তো কোনো রাজাদেশে, সিংহাসনে হক্কধারী কোনো রাজপুত্রের হুকুমে বাদশাহ ফররুখ সিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করেন নি! তাঁরা কে? আসলে সিন্ধু প্রদেশের দুই ভাগ্যান্বেষী। একজন ফররুখ সিয়ারের প্রধানমন্ত্রী, অন্যজন প্রধান সেনাপতি। অর্থাৎ তাঁর কর্মচারী এবং তাঁরই নুননেমক খেয়েছেন অন্তত ছ'টি বছর ধরে। তাই মনিবকে সিংহাসনচ্যুত করে এঁরা যে অপকর্মটি করলেন এটা নেমকহারামীর চূড়ান্ত! দিল্লীর জনসাধারণ উজবুক নয়। তারা যদি ক্ষেপে যায় তবে সৈন্য-সামন্ত নিয়েও দিল্লীকে ঠাণ্ডা করা রীতিমত মুশকিল হবে।

অতএব সৈয়দদের সর্বাপেক্ষা জরুরী প্রয়োজন, তড়িঘড়ি আওরেঙ্গজেবের কোন সন্তানকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর কাছ থেকে ফরমান নিয়ে আইনত এবং ঐতিহ্যগত পন্থায় দিল্লীর রাজভক্ত প্রজাগণকে মোকাবেলা করা।

কিন্তু দূতরা গুপ্তঘরের সন্ধান পাবে কি করে? বাচ্ছাটাকে কেড়ে নিতে চাইলে বেরালটা পর্যন্ত মারমুখো হয়ে ওঠে। এরা আবার তুর্কী রমণী—যুগ যুগ ধরে ইয়া তাগড়া তাগড়া মর্দকে কড়ে আঙুলের চতুর্দিকে ঘুরিয়েছে।

অবশ্যই পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, ফররুখ সিয়ারকে হারেমের ভিতর থেকে ধরে আনা গেল, আর এখন এই চ্যাংড়াটাকে কাবু করা যাচ্ছে না?

ব্যাপারটা সরল। ফররুখ সিয়ারের হারেমের তুর্কী রমণীরা যে বাদশার সঙ্গে

সঙ্গে সর্ব সম্মান হারিয়ে বসেছেন। এরা বাধা দিলে সেপাইরা তাদের উপর প্রয়োগ করবে পশুবল। এরা জানে দুদিন বাদেই এইসব নিষ্প্রভ, হৃতজ্যোতি, লুপ্তসম্মান সুন্দরীদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে 'সোহাগপুরা'তে। আল্লা জানেন, কোন্ কাষ্ঠরসিক এই পরিত্যক্তা রমণীদের দীনদরিদ্র নির্লজ্জভাবে অবহেলিত শেষ আশ্রয়স্থলকে 'সোহাগপুরা' নাম দিয়েছিল। এরা সেখানে পাবেন সের্ফ গ্রাসাচ্ছাদন। তার বীভৎস বর্ণনা থেকে আমি পাঠককে নিষ্কৃতি দিলুম।···কিন্তু যে ইব্রাহীম এখন রাজা হতে চললেন তাঁর মুরুব্বীদের তো ভিন্ন শিরঃপীড়া!

তাই নূতন রাজাকে আনতে গিয়ে দূতদের প্রাণ যায়-যায়। মরীয়া হয়ে তাঁর মা, মাসী, জ্যেঠি, খুড়ি এক কথায় তাবৎ রমণীরা আরম্ভ করেছেন দূতের গুষ্টীকে বেধড়ক ঠ্যাঙাতে। ছেঁড়া জুতো, খোঁচা খোঁচা খ্যাংরা-খররা, হেন বস্তু নেই যা দিয়ে তাঁরা ওদের পেটাতে কসুর করছেন। বেচারীরা খাচ্চে বেদরদ মার, দু'হাত দিয়ে যতখানি পারে সে মার ঠেকাবার চেষ্টা করছে। একখানা কাঠির ঝাঁটার সপাং করে মুখের উপর মার—সেটা কোন্ জঙ্গীলাটের কোন্ অস্ত্রের চেয়ে কম! বেচারীরা এঁদের গায়ে হাত তোলা দূরে থাক, ঠেলাটি পর্যন্ত দিতে পারে না। কালই তো এঁরা লালকেল্লার প্রাসাদে গিয়ে আবাস নেবেন। তখন বেচারীদের হালটা হবে কি? খুদ বাদশা সালামতের পিসিকে মেরেছিল ধাক্কা, খুড়িকে মেরেছিলে কনুই দিয়ে গুত্তা—বেয়াদবী বেতমিজী তবে আর কাকে বলে! বন্দ্ করো ব্যাটাদের পিঞ্জরা মেঁ, ঝুলিয়ে রাখো বদমাইশদের লাহোরী দরওয়াজার উপর! সৈয়দ-ভায়ারা কি তখন আর তাদের স্মরণে আনবেন!

এই একতরফা জেনানা আক্রমণ, তথা গৃহনির্মিত সাতিশয় মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রের দফে দফে বয়ান প্রত্যেক ঐতিহাসিক দিয়েছেন বড়ই প্রেমসে। এই মারপিটের বর্ণনাতে পৌঁছে এ যুগের ঐতিহাসিকরা ভাবেন, তাঁরা যেন বেহেশ্‌তে পৌঁছে গেছেন—নড়বার নামটি পর্যন্ত করেন না।

আর আর্ত চিৎকার উঠছে সম্মার্জনী-লাঞ্ছিত হতভাগ্যদের—'দোহাই আল্লার, কসম আল্লার, পয়গম্বর সাক্ষী, আমরা কোনো কুমৎলব নিয়ে আসি নি। আমরা এসেছি হুজুরকে তাঁর ন্যায্য তখ্‌তের উপর বসাতে।' কিন্তু অরণ্যে রোদন আর জনারণ্যে রোদনে ফারাক থাকলে জনসমাবেশকে 'অরণ্য' নাম দেওয়া হল কেন?

ওদিকে দুই 'কিং-মেকার্স' বা রাজা নির্মাণের রাজমিস্ত্রি মহা প্রতাপান্বিত শ্রীযুত সৈয়দ আব্দুল্লা ও সৈয়দ হুসেন আলী লালকেল্লার দিওয়ান-ই-আম-এর

ভিতর বসে আছেন যেন কাঠ-কয়লার আগুনে আঙ্গিঠার উপর। দূতের পর দূত পাঠিয়ে যাচ্ছেন রফী-উশ্‌-শানের হাভেলীতে, কিন্তু সে যেন সিংহের গুহাতে মানুষ পাঠানো। কেউই আর ফিরে আসে না। যে যায়, সে-ই ঝাঁটা-পেটার দ'য়ে লীন হয়ে যায়, কিংবা রাস্তা থেকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে 'অগুরুচন্দন-ঠারের ভাষায়' বোঝাতে চেষ্টা করে যে, প্রতিটি মুহূর্ত জীবন-মরণ সমস্যা সঙ্কটময় করে তুলছে। ভিতরে একপাল লোক ছুটেছে গুপ্তঘরের সন্ধানে, তাদের পিছনে ছুটেছে জেনানা-রেজিমেণ্ট পেটিকোট-পল্টন আসমান-ফাটানো চিল্লি-চিৎকার করতে করতে। সর্বপ্রকারের সংগ্রামানভিজ্ঞ আপনাদের সেবক, এই দীন লেখক, তাঁদের হাতে যে সব মারণাস্ত্র আছে, তাঁদের রণকৌশল, ব্যূহনির্মাণাদির আর কী বর্ণনা দেবে? বাবুর্চিখানার খুন্তি সাঁড়াশী থেকে আরম্ভ করে সেই মোগল যুগে কত কি থাকতো তার বর্ণনা দেব নিরীহ বাঙালী, আমি! মাশাল্লা!

চতুর্দিকে, আকাশে-বাতাসে সেই অভূতপূর্ব উত্তেজনা, দ্রুতগতিতে ধাবমান বহুবিধ নরনারী, চিৎকার আর্তরব, আল্লার শপথ, রসুলের নামোচ্চারণ, হজরৎ আলীর অনুকম্পার জন্য করুণ ফরিয়াদ, মহরমের দিনের ইমাম হাসন-হুসেনের ঝাণ্ডা নিয়ে কাড়াকাড়ি হেন, এমন সময়—

এমন সময় অতি ধীরে ধীরে একটি বালক—বালকই বটে, কারণ সে অজাতশ্মশ্রু অজাতগুম্ফ—ঐ যে হোথা মুদির দোকান দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে এই হাভেলির সামনে এসে একবার মাত্র সেই হুলস্থুল কাণ্ডের দিকে একটা শান্ত দৃষ্টি ফেলে বাড়িতে ঢুকলো। তার পরনে মুনময়লা সুতির পাজামা, তার উপর একটা অতি সাধারণ কুর্তা। মাথায় টুপিটি পর্যন্ত নেই, পায়ে চটি আছে কি না ঠিক ঠাহর হল না। সে কুর্তার সামনের দিকটার (পূর্বোল্লিখিত 'দামন' বা অঞ্চল) দুই খুঁট দুই হাত দিয়ে এগিয়ে ধরে তাতে সামলে রেখেছে পায়রাকে খাওয়াবার দানা। স্পষ্ট বোঝা গেল, এইমাত্র পাড়ার মুদির দোকান থেকে সে বেসাতিটা কিনে এনেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে তার বুঝতে বিলম্ব হল না যে, হট্টগোলের উৎপাতে পায়রাগুলো উধাও হয়ে গিয়েছে। তখন তার খেয়াল গেল চতুর্দিকের ছুটোছুটি আর চেল্লাচেল্লির দিকে। সে কিন্তু নির্বিকার। আস্তে আস্তে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে লাগলো—বাড়িটা যেন চাঁদনি চৌক।

এবারে বাইরে শোনা গেল এক পদস্থ অশ্বারোহীর কটুবাক্য আর তীব্র চিৎকার—ইনি অন্ততপক্ষে ফৌজদারই হবেন। 'ওরে সব না-মর্দ, বেওকুফ, বেকার নাকম্মার দল। এই এখ্‌খুনি বেরিয়ে আয়, কাম খতম্‌ করে। নইলে হজরৎ আলীর ঝাণ্ডার কসম খেয়ে বলছি, তোদের কিয়ামতের শেষ-বিচারের

দিন এই লহমাতেই হাজির হবে। আল্লার গজব, আল্লার লানৎ তোদের উপর, তোদের বাল্-বাচ্চার উপর।'

এই হুঁশিয়ারী, এই দিব্যিদিলাশা যেন তিলিস্মাৎ-ভানুমতীর কাজ করলো।

দূতদের দুজনার দৃষ্টি হঠাৎ গেল সেই দামনে-দানা-ভরা বালকটির দিকে। লাফ দিয়ে পড়লো সেই দুই নরদানব তার উপর। এক ঝটকায় তাকে কাঁধে ফেলে দে-ছুট দে-ছুট দেউড়ির দিকে, দেউড়ি ছাড়িয়ে রাস্তা পেরিয়ে আল্লায় মালুম কোন দিকে! কি যে ঘটলো কিচ্ছুই বোঝা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে উঠলো বামাকুলের আর্তনাদ—'ইয়াল্লা, এরা যে রফী উদ্-দরজাৎকে নিয়ে গেল রে। ধরো, পাকড়ো ওদের। পাকড়ো, পাকড়ো, জানে ন্ পায়, যেতে না পায় যেন! ইয়া রহ্মান, ইয়া রহীম!'

কিন্তু কে ধরে তখন কাকে?

হারেমের মেয়েরা ভাবতেই পারেননি যে রফী-উশ্-শানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র নাবালক বাচ্চা রফী-উদ্-দরজাৎকে ধরে এরা চম্পট দেবে। যতক্ষণ এরা জেনানা জঙ্গীলাট হয়ে সার্বভৌম মহম্মদ ইব্রাহীম আর মধ্যম রফী উদ্-দৌলাকে পঞ্চত্ব, কম্‌সেকম্ অন্ধত্ব থেকে রক্ষা করছিলেন, ততক্ষণে, যার নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনো ভয়-ভীতি ছিল না, সেই সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা রফী উদ্-দরজাৎকে নিয়ে 'দুশমন' উধাও হয়ে গিয়েছে।

আজব সেই লড়াই তাজ্জবভাবে ফৌরন্ থেমে গেল। দোস্ত দুশমন কোনো পক্ষের কেউ মারা গেল না, হার মানলো না, সন্ধি করলো না, ধরা দিল না—আচানক্ সবকুচ্ হ্ বিলকুল ঠাণ্ডা!

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় দিওয়ান-ই-আম্ থেকে নহবৎখানা পর্যন্ত পাইচারির বদলে ছুটোছুটি আরম্ভ করেছেন। এঁরা বিস্তর লড়াই লড়েছেন, জীবন এঁদের বহুবার বিপন্ন হয়েছে, কিন্তু এবারে তাঁরা যে রকম ঘেমে নেয়ে কাঁই হয়ে গেলেন এরকমটা আর কখনো হন নি। ক্রোধে, জিঘাংসায় তাঁরা শুধু একে অন্যকে বলছেন, যে-কটা না-মর্দকে তাঁরা পাঠিয়েছিলেন তাঁদের জ্যান্ত শরীর থেকে চামড়া তোলবার হুকুম দেবেন, নয় ফোঁটা ফোঁটা গরম তেল তাদের ব্রহ্মতালুতে ঢেলে ঢেলে নিধন করবেন।

এমন সময় সেই দুই পাহলোয়ান এসে উপস্থিত শাহজাদা রফী উদ্-দরজাৎকে সঙ্গে নিয়ে।

শাহজাদা হোক আর ফকীরজাদাই হোক, সে কিন্তু পুঁটুলি পাকিয়ে দু হাত দিয়ে জোরে পাকড়ে আছে পায়রার দানা-ভর্তি তার কোঁচড়। এসব বাদশা-

উজীরের ব্যাপার দিল্লী শহরে এখন আছে তো তখন নেই—কিন্তু পায়রার দানা কটি পায়রার দানা, শাহজাদা মিয়া রফীর কাছে এটা ভয়ঙ্কর সত্য।

ইতিমধ্যে সৈয়দ ভায়ারা হুঙ্কার দিয়ে উঠেছেন, 'কম্‌বখ্‌ৎ, না-দান্‌—এ কাকে ধরে এনেছো তোমরা? বাদশা হবেন বড় ভাই, ধরে আনলে ছোটটাকে। তোমাদের জ্যান্ত না পুঁতলে—'

সৈয়দদ্বয় তখন নাগরিক, ফৌজদার এমন কি তৈমুরের বংশধর, বাবুর-হুমায়ূনের পুত্র-পৌত্র বাদশাহ-সালামৎদের ও জান-মালের মালিক। এ সব কথা দূত দুটি ভালো করেই জানে। কিন্তু আজকের ঝাঁটার মার তাদের করে দিয়েছে বেপরোয়া। চরম বিরক্তি আর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'যা পেয়েছেন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হন। আর আমাদের মারুন আর কাটুন, যা খুশী করুন।'

দুই ভাই তাড়াতাড়িতে ব্যাপারটা জানতে পেরে বুঝলেন, এখন আবার নূতন করে পাইক-বরকন্দাজ পাঠিয়ে বড় দুই ভাইয়ের একজনকে—তাঁরা ইব্রাহীমের চেয়ে রফী উদ্‌-দৌলাকেই পছন্দ করেছিলেন বেশী—ধরে আনাতে সময় লেগে যাবে বিস্তর। আজকের ভাষায় ততক্ষণ টাইম-বম্‌ ফেটে যাবে!

একে দিয়েই তা হলে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। গত্যন্তর কি?

আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়েই বা লাভ কি? ইব্রাহীমই হোক আর রফী উদ্‌-দৌলাই হোক, যেই হোক, তাকে তো হতে হবে ওঁদের হাতেরই পুতুল। সে পুতুল তার মায়ের গর্ভ-ফ্যাক্টরি থেকে পয়লা চালানে বেরিয়েছে, না তেসরা কিস্তিতে তাতে কীই বা যায় আসে? ফরাসী সম্রাটের চেয়েও সরল কণ্ঠে তখন তাঁরা বলতে পারতেন, 'লে' তা সে মু'—'ভারতবর্ষ? সে তো আমরা দু'ভাই!' বাদশা? যে কোনো গড্‌-ড্যাম আওরেঙ্গজেব-বংশের গর্ভস্রাব—!

নবীন রাজার অভিষেকের জন্য দুই ভ্রাতা তাঁর দুদিকে চলেছেন রাজার দুই বাহু ধরে। আল্লা জানেন, কার আদেশে তাঁর দুই বদ্ধমুঠি শিথিল করার ফলে এই এখন পায়রার দানা ঝরঝর করে দিওয়ান-ই-আমের পাথরের মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল।

চতুর্দিকে সৈয়দদের মিত্র ও পরামর্শদাতা আমীর-ওমরাহ তাঁদের মহামূল্যবান কিংখাবের পাগড়ী, শুভ্র মলমলের আঙ্গারাখা, তার ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে নীচের সাচ্চা জরির বোনা সদরীয়ার সোনালী আভা, কোমরে কাশ্মীরের সর্বশ্রেষ্ঠ শাল দিয়ে তৈরী কোমরবন্ধ, তার বাঁ দিকে গোঁজা জাঁতির মত জাম্‌দর অস্ত্র, ডাইনে ঝুলছে দিমিশ্‌কের তলোয়ার—খাপের উপর মুষ্টিতে বিচিত্র মণিমাণিক্যের জড়োয়া কাজ, পরনে সাটিনের পাজামা, পায়ে জরির কাজ করা শুঁড়-তোলা

সিলিমশাহী। উষ্ণীষে মুক্তোর সিরপেঁচ, বুকে মোতির হার, হাতে হীরের আংটি।

এদের ভিতর দিয়ে চলেছেন বাদশাহজাদা। পরনে মুনময়লা পাজামা, গায় মামুলী কুর্তা। ব্যস্। পাঁচ লহমা পরে যিনি হবেন দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা! এ যে জগদীশ্বরের কৌতুকবোধের চূড়ান্ত নিদর্শন।

সৈয়দদের একজন শাহজাদার মাথায় বসিয়ে দিলেন তাঁর আপন পাগড়ী—মস্তকাভরণহীন অভিষেক কল্পনাতীত। সেই বিরাট সাইজের পাগড়ী শাহজাদার কান দুটো গিলে ফেলল। অন্য ভ্রাতা তাঁর মুক্তোর সাতলখা হার পরিয়ে দিলেন তাঁর গলায়। ময়লা কুর্তার উপর সে মালা দেখালো ঘোলা জলের উপর রাজহংস!

এবং রফী উদ্-দরজাৎ এই বেশেই বসলেন—যা-তা সিংহাসনের উপর নয়—আসল ময়ূর সিংহাসনের উপর। এও আরেক রঙ্গ। কারণ সচরাচর মোগল বাদশারা বসতেন আটপৌরে সিংহাসনের উপর। ফররুখ সিয়ারের অভিষেকের বাৎসরিক পরব না অন্য কোনো উপলক্ষে তোষাখানা থেকে আগের দিন ময়ূর-সিংহাসন আনানো হয়েছিল; সেটা তখনো তোষাখানায় ফেরত পাঠানো হয় নি বলে যেন কনট্রাস্‌ট্‌টা চরমে পৌঁছনোর জন্য পাজামা-কুর্তা পরে শ্রীযুত রফী বসলেন তারই উপর!

এর পরের ইতিহাস আরো চমকপ্রদ, আরো অচিন্তনীয়। কিন্তু তার ভিতর খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়ে যাবেন, কিন্তু এরকম কৌতুকজনক বড়-কিছু একটা পাবেন না। আমি একেবারে কিছু পাই নি। শুধু খুন আর লড়াই। নৃশংস আর বীভৎস। আমি তাই বাকিটা সংক্ষেপেই বলি—নিতান্ত যাঁরা ছোট গল্প পড়ার পরও শুধোন, 'তারপর কি হল?' তাঁদের জন্য।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় শত্রুর শেষ রাখতে নেই বলে ফাঁসুড়ে পাঠিয়ে ফররুখ সিয়ারকে খুন করালেন। এক বছরের ভিতরই ধরা পড়লো রফী উদ্-দরজাতের যক্ষ্মা। সে বছর যেতে না যেতেই তিনি মারা গেলেন। মারা যাওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর বড় ভাই রফী উদ্-দৌলাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। তিনিও ঐ বৎসরই মারা গেলেন। তারপর বাদশা হলেন মুহম্মদ শাহ বাদশাহ। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ইতিমধ্যে সৈয়দ ভ্রাতাদের দুর্দিন ঘনিয়ে এল। একজন আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হলেন, অন্যজন বন্দী অবস্থায় বিষপ্রয়োগবশতঃ।

বস্তুত এ যুগের ইতিহাস পড়লে বার বার স্মরণে আসে:

রাজত্ব-বধূরে যে-ই করে আলিঙ্গন
তীক্ষ্ণধার অসি পরে সে দেয় চুম্বন!

দ্বিজ

এই গত শারদীয়া বেতার জগতে 'কোষ্ঠীবিচার' নামক একটি কথিকা এ-অধম নিবেদন করে। বিবরণটি ছিল সত্য ঘটনা অবলম্বনে বর্ণিত। তৎসত্ত্বেও আমার এক দোস্ত সেটি পড়ে কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হন। আমি সবিনয় বললুম, 'ব্রাদার, এটা বরহক্ জলজ্যান্ত ঘটেছিল; আমাকে দুষছো কেন?' তিনি বললেন, 'তুমি সেটি রসস্বরূপে প্রকাশ করতে চেয়েছ; সেক্ষেত্রে সত্যি-মিথ্যের কোনো অজুহাত নেই।' একদম খাঁটি কথা। তাই এবারে কিন্তু যেটি নিবেদন করবো সেটি পড়ে তিনি প্রসন্ন হবেন, এমত আশা করি, আর আপনারা পাঁচজন তো আছেনই। এই সুবাদে আরেকটি সামান্য বক্তব্য আমার আছে। হিন্দু-মুসলমান বাঙালী-অবাঙালী কাউকেই আমি বেদনা দিতে চাই নে। দিলে সেটা অজানিত এবং তার জন্যে এইবেলাই বে-কৈফিয়ৎ মাফ চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আমার বক্তব্য দুষ্টবুদ্ধিজনিত ভ্রমাত্মক সপ্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সেটি সংহরণ করতে আমি অক্ষম—এটা গুরুর আদেশ।

এদানির কিছু লোক আবার আমার কাছ থেকে প্রাচীন দিনের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে ভালোমন্দ শুনতে চান। আমি তাঁদের লুক্কায়িত বক্তব্যটিও বিলক্ষণ মালুম করতে পেরেছি; সেটি এই, 'যা বুড়োচ্ছ, দুদিন বাদেই ভীমরতি ধরবে এবং তখন হয়ে দাঁড়াবে একটি চৌকশ "লিটারারি বোর"; যতবধি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ তোমার আপন কথা ধানাই-পানাই না করে আশ্রমের কথা কও, গুরুদেব কথা কও ইত্যাদি।'

তাই সই। দেশকাল ঠিক ঠিক রাখবো। পাত্র ভিন্ন নামে ভিন্ন বেশে আত্মপ্রকাশ করবেন।

১৯২০।২১ সনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কলেজ কোর্স খোলেন। ঐ সময় গাঁধীজী সরকারী ইস্কুল কলেজের পড়ুয়াদের গোলামী-তালিম বর্জন করতে আহ্বান জানান। ফলে ভারতের সর্বপ্রদেশ থেকে যে সব মেধাবী ছিল, গাঁধীজীর বাণী গ্রহণ করলো তারা, জমায়েৎ হল শান্তিনিকেতনে। আর এলেন কয়েকটি খাজা মাল, যাঁরা বছরের পর বছর পৌনঃপুনিক দশমিকের পাইকিরি হিসেবে বেধড়ক ফেল মেরে যাচ্ছিলেন। অবশ্য এদের একজন বলেছিল, 'ঐসন্ এ্যানসার বুক লিখেছিলুম, স্তর, যে এগজামিনার বললে "এনকোর"। তাইতে ফের একই পরীক্ষা দিতে হল।' এঁদের মধ্যে আমার মত গুণ্ডাপ্রকৃতির দু-চারটি কাবেল সন্তান ছিলেন।

ইতিমধ্যে এলেন বিশ্বনাথ তিরুমল রাও অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম্ থেকে। এঁকে নিয়ে যখন দু'দলে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল তখন ধরা পড়লো ইনি বরের পিসি, কনের মাসি। অর্থাৎ ইনি যেমন অনেকটা ইন্দ্রনাথের মত অন্ধকার রাস্তায় স্যাডিস্ট ক্লাস-টীচারের মাথায় হঠাৎ কম্বল ফেলে তাকে কয়েক ঘা বসিয়ে বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে এখানে চলে আসেন, ঠিক তেমনি কলাভবনে প্রবেশ করার পর দেখা গেল, তিনি একই হাতে পাঁচটা তুলি নাচাতে পারেন—যাদুকররা যেমন পাঁচটা বল নাচায়। স্কেচে ওস্তাদ, ফিনিশে তালেবর।

তদুপরি আরেকটি অতিশয় আশ্রমপ্রিয় সদ্‌গুণ তাঁর ছিল, যার প্রসাদাৎ তিনি সর্বত্রই কল্কে পেতেন। উচ্চতায় যদ্যপি পাঁচ ফুট দুই, কিন্তু পেশীগুলো যেন মানওয়ারি জাহাজের দড়া দিয়ে তৈরী, এবং ফুটবলে চৌকশ। বীরভূমের কাঁকরময় গ্রাউণ্ডে ডজন খানেক আছাড় খেয়ে সর্বাঙ্গে রক্তলাঞ্ছন আঁকার পরও তিনি বুলেটবেগে ছুট লাগাতে কসুর করতেন না এবং হাসিমুখে। বিচক্ষণ জন সে হাসিতে নষ্টামির গোপন চিহ্ন দেখতে পেত।

আমাদের দোস্তি প্রথম দিন থেকেই। নাম যখন শুধালুম সেটা দ্রুতগতিতে দায় সারার মত বলে নিয়ে জানালে, 'ওটা তোলা নাম। আমার ডাকনাম চিন্নি। তোমার?'

'সীতু।'

পরবর্তী যুগে চিন্নি, ওরফে মিঃ রাও, স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দিল্লীতে কাজ করে। তার ভুলে ভর্তি অনর্গল বাঙলা কথার তুবড়িবাজি রাশভারি শ্যামাপ্রসাদের মুখেও কৌতুকহাস্য এনে দিত এবং বিশেষ করে ঐ কারণেই তিনি চিন্নিকে মাত্রাধিক স্নেহ করতেন। চিন্নি উত্তম ইংরিজি বলতে পারত, কিন্তু তার বক্তব্য, দিল্লীর মন্ত্রণালয়ই হোক আর ভুবনডাঙার ঝুরঝুরে চায়ের দোকানই হোক, সে তার শান্তিনিকেতনে শেখা বাঙলা ছাড়বে কেন? স্বয়ং গুরুদেবের সঙ্গে সে বাঙলায় কথা কইত নির্ভয়ে—চারটিখানি কথা নয়, এবং শ্যামাপ্রসাদ এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করে, চিন্নির ডজন ডজন ভুল-ভর্তি বাঙলা সম্বন্ধে বলতেন, 'রাও কিন্তু তার বাঙলা প্রতিদিন ইমপ্রুভ করে যাচ্ছে।' অর্থাৎ ভুল বাড়ছে!

শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিত্ব রিজাইন দিলে পর চিন্নিও তার জুতো থেকে দিল্লীর ধুলো ঝেড়ে ফেলে মাদ্রাজ চলে যায়। সেখান থেকে ইউনেস্কোর আহ্বানে তাইল্যাণ্ড, কলম্বো, জিনীভা, ওয়াশিংটন, বাগদাদে কীর্তিজাল বিস্তার করে।

সে যে দড়মালে তৈরী সেটা আশ্রমে তার আঠারো বছর বয়সেই ধরা পড়ে। সেখানে ইস্কুলের ছেলেরা দুবেলা উপাসনা করে; প্রস্তাব হল আমাদেরও করতে

হবে। চিন্নি উচ্চকণ্ঠে জানিয়ে দিল সে নাস্তিক। ফৈসালা করার জন্য আমাদের মীটিং বসলো। প্রিন্সিপাল মেসেজ পাঠালেন, তিনি চান, আমরা যেন উপাসনা করি। চিন্নি বললে, 'ইস্কুলের ছেলেদের বাপ-মা উপাসনার কথা জেনেশুনেই বাচ্চাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমাদের অধিকাংশই এসেছি তাঁদের অমতে (এ কথাটা খুবই খাঁটি ; আমাদের গার্জেনদের অধিকাংশই ছিলেন সরকারী চাকুরে ; তাঁরা অসহযোগ আন্দোলনে সায় দেন কি প্রকারে ? আমার পিতাকে তো ইংরেজ রীতিমত ভয় দেখায়)। আমরা সাবালক ; আমি নাস্তিক।' চিন্নি পার্লামেণ্টেরেনও বটে—তার দোস্ত মসোজীকে চ্যালেঞ্জ করে বললে, 'তুমি তো ক্রীশ্চান ; তোমার সর্ব প্রার্থনা পাঠাতে হয় প্রভু যীশুর মাধ্যমে। আশ্রমের উপাসনায় যোগ দেবে কি করে ?' আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুই তো মিয়া ভাই (মুসলমান)! পাঁচবেকৎ নেমাজ করিস' (করবো বলে বাবার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এসেছিলুম)। সভাপতির দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওর ঘাড়ে আরো ছুটো চাপানো কি ধর্মসম্মত ?' ইত্যাদি, ইত্যাদি। রেভারেণ্ড এ্যানড্রুজ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন সভাকে রাজী করাতে। পাদ্রীসাহেবের যাবতীয় স্কিল, তদুপরি তাঁর সরল আন্তরিকতা, তিনি সবকিছু প্রয়োগ করে খুব সুন্দর বক্তৃতা দেন। কিন্তু ভোটে চিন্নিপন্থীরা কয়েকটি ভোটে জিতে গেল। তখন সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হ'ল, গুরুদেব যা আদেশ দেবেন তাই হবে। এ্যানড্রুজ সাহেবকেই আমরা দূত করে পাঠালুম।

গুরুদেব মাত্র একটি শব্দ উচ্চারণ করেন—'না'।

এই গেল চিন্নির পরিচয়।

ইতিমধ্যে আরেকটি ছেলে এল অন্ধ্র থেকে। মাধব রাও। সেও চমৎকার ফুটবল খেলে।

* * *

রাজ রাজমহেন্দ্রবরাম নগর—অর্থাৎ রাজমনড্রীর শ্রীযুত জগন্নাথ রাও চিন্নির বন্ধু। তিনি চিন্নিদের বাড়ির ছেলের মত। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ব্রাহ্মছাত্র অন্ধ্রদেশের শ্রীযুত চালামায়া গুরুদেবের প্রচুর কবিতা গল্প উপন্যাস এবং বিশেষ করে তাঁর ধর্ম সম্বন্ধীয় রচনা অনবদ্য তেলুগুতে অনুবাদ করেন। জগন্নাথ রাও সেগুলো পড়ে আকণ্ঠ রবীন্দ্রভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। চিন্নির আশ্রমাগমনের ফলে তাঁর আশ্রমদর্শনের সদিচ্ছা প্রবলতর হল। চিন্নিকে আকস্মিক আনন্দদানের উদ্দেশ্যে তাকে কোনো প্রকারের নোটিশ না দিয়ে শুধু চিন্নির পিতামাতাকে জানিয়ে এক শুভপ্রাতে রওনা দিলেন কলকাতা অভিমুখে।

কলকাতায় উঠলেন বড়বাজার অঞ্চলে এক অন্ধ্র মেসে। সেখানে শুধোলেন, শান্তিনিকেতন কি প্রকারে যেতে হয়? কেউ কিছু জানে না বলে টাইমটেবল যোগাড় করা হল—সেখানেও শান্তিনিকেতনের সন্ধান নেই। তখন একজন বললে, কাছেই তো পোয়েটের বাড়ি; সেখানে গেলেই জানা যাবে। শ্রীযুত জগন্নাথ রাও তাই করলেন। সেখানে দেখেন 'বিশ্বভারতী পাবলিকেশন্‌স' দফতর খোলা বটে, কিন্তু লোকজন কেউ নেই। শেষটায় একটি ছোকরা কেরানীকে আবিষ্কার করা হলে সে বললে, হাওড়া থেকে যেতে হয়, সে কখনো ওখানে যায় নি। যাঁরা যাওয়া-আসা করেন, তাঁরা সবাই গেছেন শ্মশানে। শান্তিনিকেতনের কে এক মিস্টার রাও সেই ভোরে হাসপাতালে মারা গেছেন।

জগন্নাথ রাও ত্রিভুবন অন্ধকার দেখলেন। সম্বিতে ফিরে আর্তকণ্ঠে শুধোলেন, 'কে?' ছোকরাটি বললে, বড়ই দুঃখের বিষয়। মিস্টার রাও আশ্রমের হয়ে ফুটবল খেলতে যান শিউড়িতে। সেখানে খেলাতে জোর চোট লাগার ফলে তাঁর হার্নিয়া স্ট্রেন্‌গুলেটেড্‌ হয়ে যায়। এ্যান্‌ড্রুজ সাহেব এখানকার হাসপাতালকে জরুরী চিঠি লিখে লোকজন সহ তাঁকে পাঠান কাল রাত্রে। সবই করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে বাঁচানো গেল না।

জগন্নাথ রাও টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন। চিন্নি ওয়াল্‌টেয়ারে আরেকবার এই রকম খেলার মাঠে বেহুঁশ হয়।

রাস্তা থেকে আবার ফিরে গেলেন ছোকরাটির কাছে। শুধোলেন, 'তার বাড়িতে তার পাঠানো হয়েছে?' ছোকরাটি বললে সে জানে না।

জগন্নাথ রাও মেসে ফিরে এসে শয্যা নিলেন। দেশবাসীরা পরামর্শ করে তাঁর কথামত চিন্নির বাড়িতে তার পাঠালেন দুঃসংবাদটা জানিয়ে।

জগন্নাথ রাওয়ের কোনোই ইচ্ছা আর রইল না শান্তিনিকেতন যাবার, কিন্তু তিনি পরিবারের বন্ধু—এখন এত দূর কলকাতা অবধি এসে যদি সবিস্তার খবর নেবার জন্য সেখানে না যান তবে সবাই দুঃখিত হবেন।

নিতান্ত কর্তব্যের পীড়নে জগন্নাথ রাও হাওড়া গিয়ে, বোলপুরের ট্রেন ধরলেন।

বিকেলের দিকে যখন আশ্রমে পৌছলেন তখন গেস্ট্‌ হাউসে হিতলাল (বর্তমান কালোর দোকানের কালোর পিতা) ভিন্ন কেউ ছিল না—হিতলাল ইংরিজি জানে না। জগন্নাথ বিছানাপত্র সেখানে রেখে বেরুলেন কলাভবনের সন্ধানে। চিন্নি তাঁকে কলাভবনের ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখত।

সে কলাভবন বাড়ি আর নেই। তবে তার ভিতটা এখনো দেখতে পাওয়া

যায়, গুরুদেবের 'দেহলী' বাড়ির কাছে, বোলপুর যাবার রাস্তার পাশে।

কলাভবন সে সময়টায় নির্জন থাকে। নিচের তলায় কাউকে না পেয়ে তিনি সিঁড়ি দিয়ে ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছে সেখান থেকে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন,—

আমি যাচ্ছিলুম বোলপুর—নস্যি কিনতে; হঠাৎ শুনি, সেই অবেলায় কলাভবনে শোরগোল, স্পষ্ট চিনতে পেলুম আর্টিস্ট রমেন চক্রবর্তীর গম্ভীর গলা। কিন্তু আর্ত কণ্ঠে…তুমি যাও, শিগগীর যাও, জল নিয়ে এস। আমি ততক্ষণে দেখছি,—

তিন লম্ফে সেখানে পৌঁছে দেখি, চিন্নি 'দেহলী' বাড়ির দিকে কালবোশেখী বেগে ছুটেছে। আমি সেদিকে খেয়াল না করে সিঁড়ি বেয়ে মাঝখানে উঠে দেখি কে একজন লোক দু'পা ইয়া ফাঁক আর দু'হাত ওয়া লম্বা করে ধূলি-শয়নে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। জোয়ারের সমুদ্র বেলাতটকে মড়া ফিরিয়ে দিলে সে যেরকম শুয়ে থাকে। ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে, আর বিড় বিড় করে বলছে, 'চিন্নি, চিন্নি!' চক্রবর্তী বললেন, সে আবার কি? তিনি বিশ্বনাথ রাওয়ের ডাকনাম জানতেন না। আমি বুঝিয়ে বললুম। চক্রবর্তী বললেন, দেখো তো, সৈয়দ, ডাক্তার এসেছে কি না, বিকেলে তো মাঝে-সাঝে আসে। আমি বললুম, দেখি, মনে তো হচ্ছে ভিরমি কেটে যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখি, ওদের কেউই আর সেখানে নেই।

চিন্নি ভালো অভিনয় করতে জানে। রাত্রে তার ঘরে সে দেখালে জগন্নাথ রাও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ তাকে দেখে—সে আর চক্রবর্তী তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন—থমকে গিয়ে কাঁপতে লাগলেন। দু'হাত দুদিকে দুটো হাঁটুর সঙ্গে এক তালে মৃগী রুগীর মত কাঁপতে কাঁপতে ধপাস্। চিন্নি বললে, 'অবশ্য আমার মুখেও জগন্নাথ বিস্ময় দেখতে পেয়েই ভয় পেয়েছিল আরো বেশী। ভাগ্যিস্ রমেনবাবু সঙ্গে ছিলেন! আমাকে ঐ আবছায়া আলোতে একলা-একলি দেখতে পেলে তার কোনো সন্দেহ থাকতো না যে, আমার ভূত কলাভবনের মায়া কাটাতে না পেরে সন্ধ্যার নির্জনে সেখানে আবার এসেছে।'

হঠাৎ দেখি জগন্নাথ রাওয়ের মুখ একেবারে রক্তহীন, মাছের পেটের মত পাণ্ডুটে হয়ে গিয়েছে। কাঁপতে কাঁপতে যা বললেন তা শুনে রমেনবাবুর মত ঠাণ্ডা মাথা স্থিরবুদ্ধির লোক পর্যন্ত অচল দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এতক্ষণে জগন্নাথের খেয়াল গেছে যে, তিনি চিন্নির বাপ-মাকে তার করে জানিয়ে বসে আছেন যে চিন্নি নেই।

আমি তেড়ে বললুম, 'আপনি তো আচ্ছা—নেভার মাইণ্ড!—রাও তো

আপনাদের দেশে প্রত্যেক সেকেণ্ড ইডিয়ট।'

জগন্নাথ বার বার বলেন, 'চিন্নি তো আমায় জানায় নি যে আরেকজন অন্ধ্রবাসী এসেছে। তার উপর ফুটবল, তারপর পেটে—'

রমেনবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'ওহে! এতক্ষণ তো খুব রগড় করলে! শোনো, ব্যাপারটা সিরিয়স! এ্যানড্রুজ সাহেবের কাছে যাও। আর কারো টেলিগ্রাম বাপ-মা বিশ্বাস নাও করতে পারেন। গুরুদেব তো বার্লিনে!'

সাহেব মোটেই চটলেন না। নাস্তিক চিন্নির জন্য খাঁটি খৃষ্টান ছ'পাতা লম্বা তার করলেন সব বুঝিয়ে। আর আমি চিন্নিকে তাঁর সামনেই বললুম, এবার প্রার্থনা করোগে, বাড়িতে যেন ভালো-মন্দ কিছু একটা না হয়। তুই অন্ধ্র ভাইজ্যাগ্ বাগের ট্রেন ধরলেন।

চিন্নি ফোকটে ছুটি মেরে হপ্তা তিনেক পরে ফিরল। আমরা শুধালুম, 'কি, আপন ছেরাদ্দ সাঁপটাবার মত ঠিক সময়ে পৌচেছিলি তো? হুঁকোটা লে, খুলে ক'!'

চিন্নি বললে, 'টেলিগ্রাম পৌচেছিল দেরিতে। ইতিমধ্যে দাদাকে আনানো হয়েছে মাদ্রাজ থেকে। বাড়িতে কান্নাকাটি সে আর কি বলতে—অবশ্য আমার শোনা কথা। যেদিন তার পৌছল সেদিন বামুন এসেছে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে। আর ট্র্যাজেডিটা দেখ, বাড়িসুদ্ধ সবাই শোকে এমনি বিকল যে, কে একজন তারটা সই করে নিয়ে একপাশে রেখে দিয়েছে, ঘণ্টা তুই কেউ খোলে নি, ভেবেছে, কি আর হবে, কণ্ডলেন্‌স্‌-টেন্‌স্‌। খুলেছিল শেষটায় আমার ছোট ভাই। সেও নাকি প্রায় ঐ জগন্নাথ রাওয়ের মত পাঙাশ মেরে রাম ইডিয়টের মত গা-গা ডাক ছেড়েছিল। বাকিরা ভাবলে, আবার কে মরলো? তারপর কেউ বিশ্বাস করে না তারটাকে, যদিও সবাই করতে চায়। এ্যানড্রুজ সাহেব এত বিখ্যাত লোক, তিনি আমাদের চিন্নিটার জন্য ইত্যাদি…।'

শেষটায় বিশ্বাস করেছিলেন বটে, কিন্তু আমি না পৌছানো পর্যন্ত কারো কারো মনের ধোঁকা কাটে নি।

রাত্রে ছাতের উপর পাশাপাশি শুয়ে আছি দু'জনাতে। আমি বললুম, "চিন্নি, ঘুমুলি?'

'না।'

'আর তোর মা?'

'বিশ্বাস করবি নে, সেটা ভারি ইন্‌ট্রেস্টিং। জগন্নাথ রাওয়ের তার পৌছনোর পর থেকেই মায়ের মুখে শুধু এক বুলি, "কিছুতেই হতে পারে না। আমার ছেলে

নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। এই তো বছরের পয়লা দিনে আমি গণৎকার ঠাকুরকে ফি বছরের মত এবারও সব ক'টা ছেলের কোষ্ঠী দেখিয়েছি। তিনি এবারও বলেছেন, চিন্নির সামনে ফাঁড়াটি পর্যন্ত নেই"।'

চিন্নি বললে, 'যখন পুরুতঠাকুর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে এসেছে তখনো তার মুখে ঐ এক বুলি, "কি হবে এসব ব্যবস্থা করে? গণৎকার বলেছে, এ বছরে চিন্নির জ্বর-জ্বালাটি পর্যন্ত নেই"।'

কে তাঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে বোঝাবে চিন্নি নেই?

আর শ্রাদ্ধে যা টাকা খরচা হওয়ার কথা ছিল সেটা মা দিয়েছে গণৎকারকে।